জীববিজ্ঞান

• প্রথম পত্র •

অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বর্দ্ধন
ড. সুবীর সেন
ড. রাজীব কুমার ভক্ত

ক্যালকাটা বুক হাউস
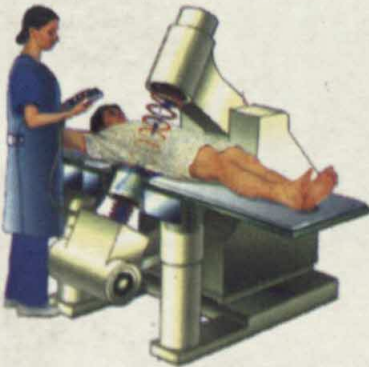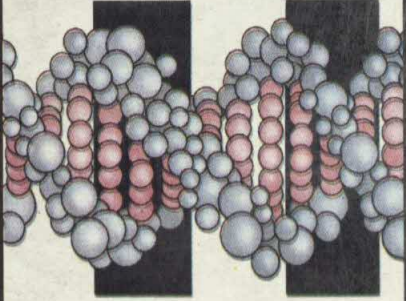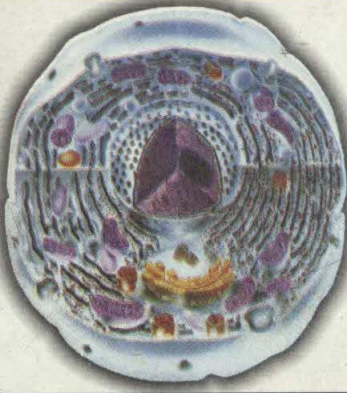
ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

১। সাম্যের অধিকার :

- ★ আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
- ★ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- ★ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- ★ অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২। স্বাধীনতার অধিকার :

- ★ বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- ★ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- ★ সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ★ ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ★ ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
- ★ যে-কোনো জীবিকা, পেশার বা ব্যাবসা-বাণিজ্য করার অধিকার।
- ★ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

- ★ কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
- ★ চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

- ★ সকল শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
- ★ রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ★ ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫। সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঃ

- ★ স্বতন্ত্র ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতিগত সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ।
- ★ ধর্ম, ভাষা, জাতি, বর্ণগত কারণে শিক্ষালয়ে ভরতির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ★ ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পছন্দমতো শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার।
- ★ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হবে না।

৬। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ

- ★ মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে-প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Writ) জারি করতে পারবে; হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যান্ডামাস (Mandamus), সারশিয়োরী (Certiorari), প্রহিবিশান (Prohibition) ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ৫১এ)

১। সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।

২। মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।

৪। আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

৫। ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন ।

৬। দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।

৭। অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।

৮। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।

৯। সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।

১০। জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা।

১১। পিতামাতা/ অভিভাবকের দায়িত্ব ৬ - ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত নতুন পাঠক্রম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুযায়ী (টি.বি. নম্বর প্রাপ্ত) একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত।

[Vide T.B. No. HSC / BIOS-03 / XI / 2005, dated 07.03.2005]

উচ্চমাধ্যমিক

জীববিজ্ঞান

একাদশ শ্রেণির জন্য

প্রথম পত্র

অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বর্দ্ধন, এম. এস-সি.
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, শারীরবিদ্যা বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি।
প্রাক্তন অধ্যাপক, রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ড. সুবীর সেন, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি।
প্রাক্তন পোস্ট ডক্টরেট ফেলো, অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স, বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি।

ড. রাজীব কুমার ভক্ত, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি.
রিডার, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা, প্রাক্তন ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা।

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশকঃ
শ্রী চঞ্চল ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৩
পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ মার্চ, ২০০৫
পুনর্মুদ্রণ (নতুন সিলেবাস) ঃ মার্চ, ২০০৬

মূল্য ঃ একশত নয় টাকা মাত্র।

গ্রন্থন ঃ
লেজার টাইপ সেটার
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ঃ
সি. বি. অফসেট
২৪এ, বাগমারি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪
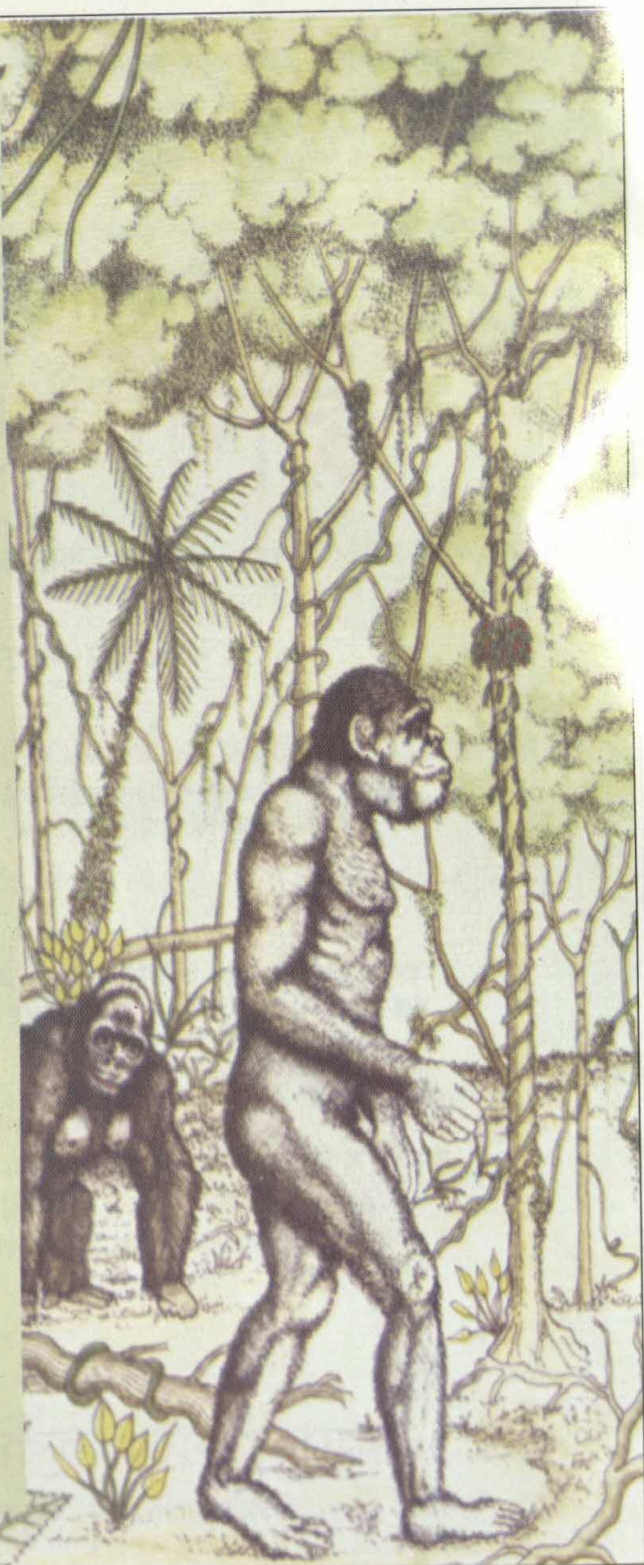
পুস্তকটির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস ও পুনঃসংযোজন অনেকদিন পরে এবার করা হল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটার সঙ্গো সঙ্গো বিষয়গুলির অনেক পরিবর্ধন হয়েছে এবং জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত বহু নতুন শাখা-উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে। জীববিজ্ঞানের গবেষণা, পঠনপাঠন এখন আণবিক স্তরে হয়েছে। মানুষের কল্যাণে প্রয়োগভিত্তিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব কথা মাথায় রেখে নতুন পাঠক্রমে প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তুর আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়গুলি ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, উদাহরণ সহযোগে সরল ও সাবলীল ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ করে পরিবেশিত হয়েছে।
- বিষয়গুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজনে উপযুক্ত সহজ চিত্র দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য উপস্থাপন করে বিষয়গুলিকে আরও সহজবোধ্য করা হয়েছে।
- পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন বিষয়গুলি, যেমন—বংশগতি, বায়োটেকনোলজি, প্রাণভেষজ প্রয়োগ ইত্যাদি, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গো পরিমিত স্থানে সহজ ভাষায় চিত্র ও তথ্য সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পুস্তকটির প্রতি অধ্যায়ের শেষে রচনাভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক, অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ইত্যাদি প্রশ্নাবলির সংযোজন এই পুস্তকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- পুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দ সংক্ষেপের পূর্ণরূপ এই পুস্তকের শেষে সংযোজন করা হয়েছে যা এই পুস্তকটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

আমরা আশা রাখি যে, বইটি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। বহুবার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করা হবে। পাঠকপাঠিকাদের গঠনমূলক সমালোচনা বইটিকে ভবিষ্যতে আরও উচ্চমানে উন্নীত করবে এই আমাদের আশা। পরিশেষে ছাত্রছাত্রীদের বইটি ভালো লাগলে ও উপকারে এলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

গ্রন্থকারত্রয়
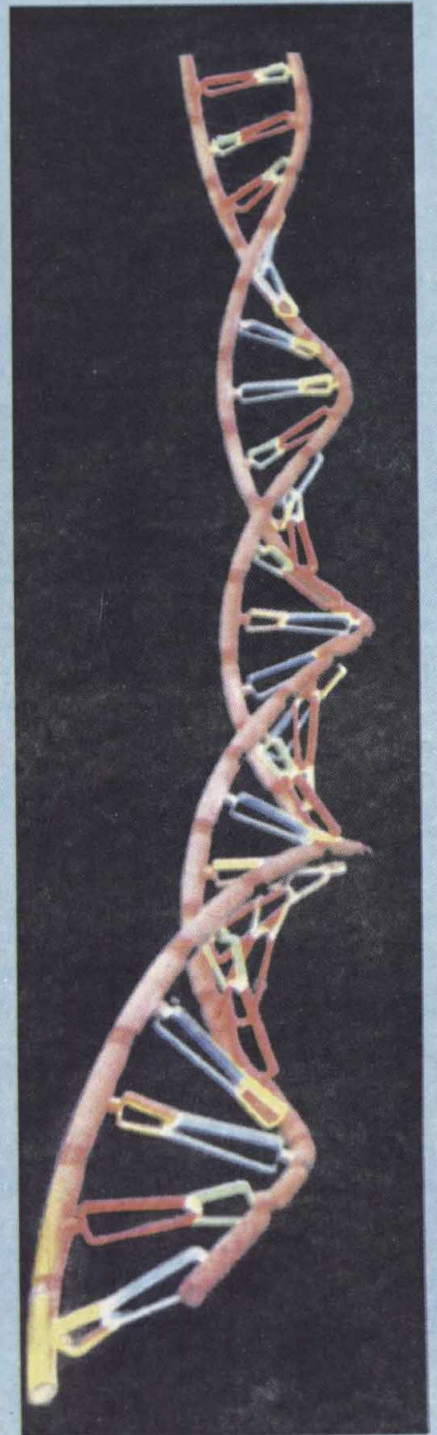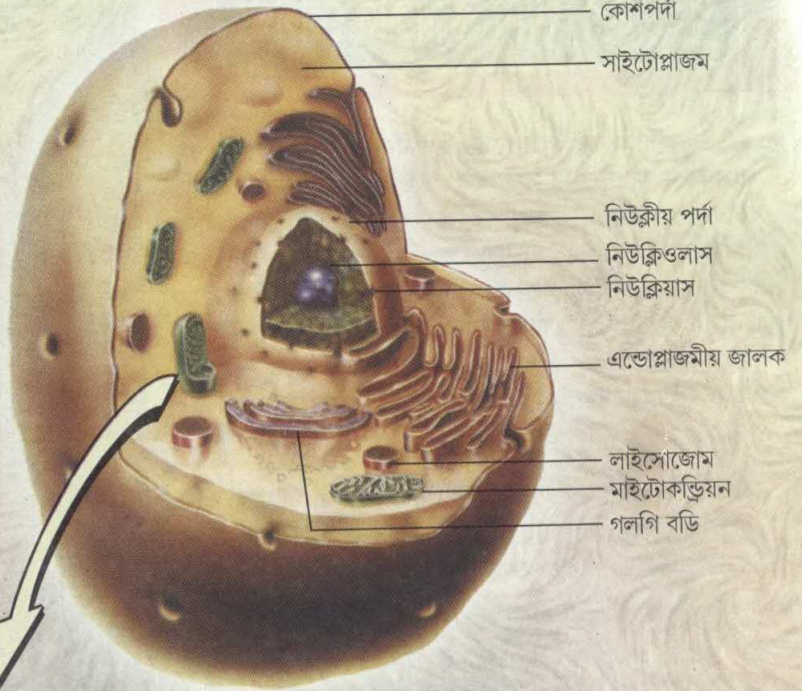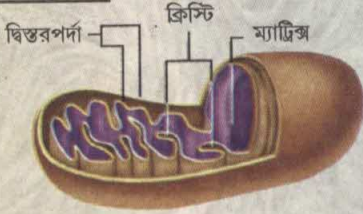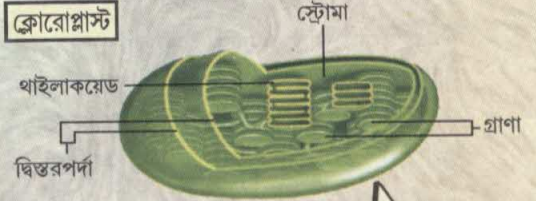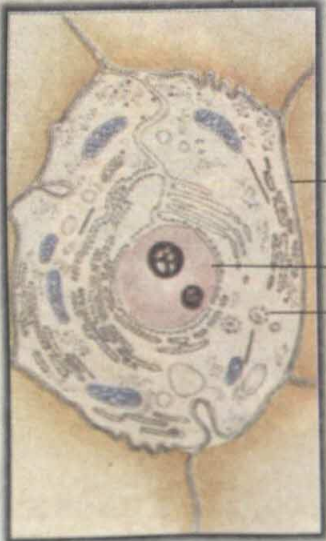
একটি আদর্শ প্রাণীকোশ
কোশপর্দা
সাইটোপ্লাজম
নিউক্লীয় পর্দা
নিউক্লিওলাস
নিউক্লিয়াস
এন্ডোপ্লাজমীয় জালক
লাইসোজোম
মাইটোকন্ড্রিয়ন
গলগি বডি
মাইটোকন্ড্রিয়ন
দ্বিস্তরপর্দা
ক্রিস্টি
ম্যাট্রিক্স
ক্লোরোপ্লাস্ট
স্ট্রোমা
থাইলাকয়েড
গ্রাণা
দ্বিস্তরপর্দা
প্রাণীকোশ
কোশপর্দা
নিউক্লিয়াস
সেন্ট্রোজোম
কোশপ্রাচীর
উদ্ভিদকোশ

মেন্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা
পরাগযোগ
P
বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ
বিশুদ্ধ বেঁটে মটর গাছ
P = বিশুদ্ধ জনিতৃ জনু
F_1 = প্রথম অপত্য জনু
F_2 = দ্বিতীয় অপত্য জনু
F_3 = তৃতীয় অপত্য জনু
F_1
সংকর লম্বা মটর গাছ
মেন্ডেল
স্বপরাগযোগ
ফিনোটাইপের অনুপাত
3 : 1
F_2
বিশুদ্ধ
সংকর
বিশুদ্ধ
জিনোটাইপের অনুপাত
1 : 2 : 1
F_3
বিশুদ্ধ লম্বা
3 : 1
3 : 1
বিশুদ্ধ বেঁটে
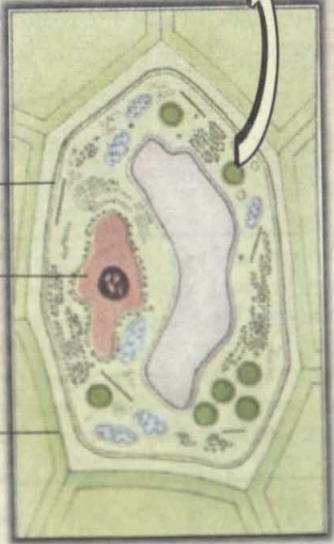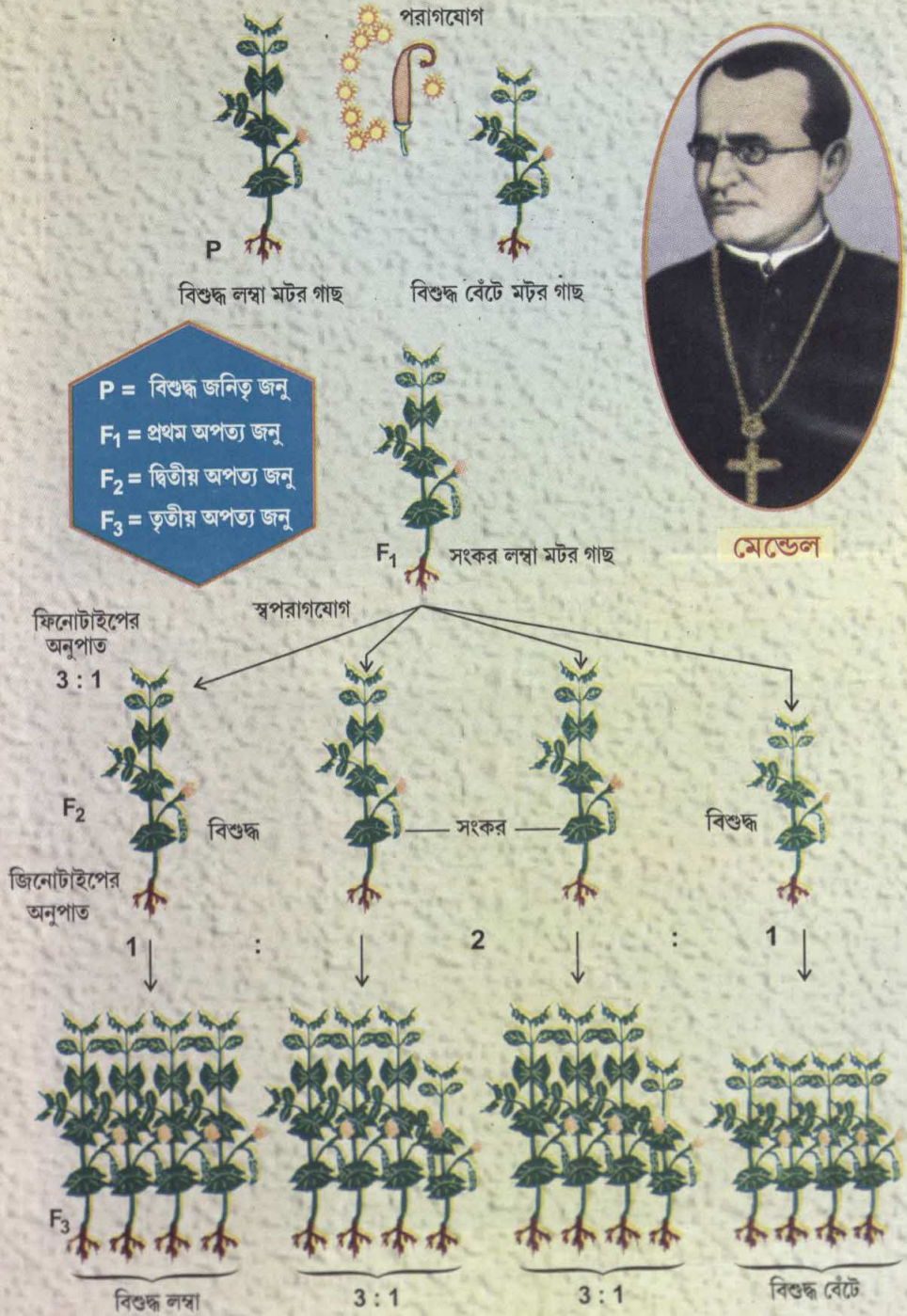
• মাদক উৎপাদনকারী দুটি উদ্ভিদ •

গাঁজা গাছ (*Cannabis sativa*)

আফিং গাছ (*Papaver somniferum*)

সুন্দরবন

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের মানচিত্র

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ দপ্তরের সৌজন্যে)

বজবজ
সোনারপুর
বিষ্ণুপুর
বারুইপুর
ফলতা
ক্যানিং
ডায়মন্ডহারবার
জয়নগর
বাসন্তী
গোসাবা
মথুরাপুর
কুলপি
কুলতলি
রায়দিঘি
কাকদ্বীপ
পাথর প্রতিমা
সাগরদ্বীপ
নামখানা
বাংলাদেশ
বঙ্গোপসাগর

- বসতি অঞ্চল
- শহর অঞ্চল
- বনাঞ্চল (অভয়ারণ্য)
- প্রাচীন এলাকা
- কোর অঞ্চল
- বাকার অঞ্চল

সুন্দরবন সংরক্ষিত অরণ্য

সুন্দরবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ

জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্‌গম
Viviparous germination

সুন্দরী
Heritiera minor

গরান
Cercops roxburghiana

গোলপাতা
Nipa fruticans

শ্বাসমূল
Pneumatophores

বেঁটে খেজুর
Phoenix paludosa

প্রাকৃতিক জলাশয়

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক জলাশয়

পরিবেশদূষণ

অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য জীবমণ্ডলের দূষণ

কলা
(*Musa paradisiaca*)

নারকেল
(*Cocos nucifera*)

আম (*Mangifera indica*)

পেয়ারা (*Psidium guajava*)

কুল
(*Zizyphus mauritiana*)

লেবু
(*Citrus limon*)

টম্যাটো (*Lycopersicon lycopersicum*)
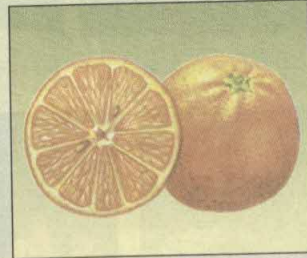
কমলা (*Citrus aurantium*)

বেদানা
(*Punica granatum*)

আপেল
(*Malus sylvestris*)

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উন্নত মানের প্রতিপালিত উদ্ভিদ

হিমালয়ের তিনটি বিপন্ন অর্কিড

Dendrobium densiflorum

Vanda caeruba

Cymbidium macrorhizon

অ্যাস্টার *(Aster novae-angliae)*

জিঙ্গো *(Ginkgo biloba)*

ট্রিফার্ন *(Cyathea gigentia)*

কলচিকাম *(Colchicum luteum)*

কলসবৃক্ষ *(Nepanthes khasiana)*

রয়েল বেঙ্গল টাইগার *(Panthera tigris)*

সিংহ *(Panthera leo)*

ভারতীয় গণ্ডার *(Rhinoceros unicornis)*

হাতি *(Elephas indicus)*

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাসটার্ড *(Choritis nigricep)*

বিশাল ঈগল *(Pithecophaga jetferyi)*

• টেস্টটিউব বেবি •

লন্ডন টাইমসের প্রতিবেদন (31শে জুলাই, 1978)

টেস্টটিউবের মধ্যে নিষেক প্রক্রিয়া

লন্ডনের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে নবজাতিকা ডাক্তারদ্বয়ের সঙ্গে

ডাক্তার প্যাট্রিক ক্রিস্টফার স্টেপটি

নবজাতিকা লুইস জয় ব্রাউন

ডাক্তার জেফ্রে এডোয়ার্ড

লুইস জয় ব্রাউন
(বর্তমানে ডাক বিভাগের কর্মী)

বাবা জন ব্রাউন, লুইস জয় ব্রাউন
এবং মা লেসলী ব্রাউন

বিভিন্ন কৌশলে প্রাপ্ত দেহের কয়েকটি অংশের প্রতিচ্ছবি

1. ডোপ্‌লার আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান

ুলার শিরা

শব্দতরঙ্গের সাহায্যে গ্রীবায় রক্ত প্রবাহের ত্রুটি জানা

2. রেডিওনিউক্লাইড স্ক্যান

মেরুদণ্ড
পেলভিস
শ্রোণি অস্থিকলা

শ্রোণি অঞ্চলে কোশের অতিসক্রিয়তা জানা

3. আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান

উদর প্রাচীর
মূত্রথলি
প্রোস্টেটগ্রন্থি

শব্দতরঙ্গের সাহায্যে তরলপূর্ণ অঙ্গের (মূত্রথলির) প্রতিচ্ছবি

4. এক্সরে

সন্ধি
অস্থি

দ্বিমাত্রিক ছবির সাহায্যে নিবিড় কলা (অস্থি) দেখা

5. SPECT স্ক্যান

মস্তিষ্ক
বেশি সক্রিয় অঞ্চল
স্বল্প সক্রিয় অঞ্চল

মস্তিষ্কের কোশের সক্রিয়তা জানা

6. C T স্ক্যান

C T স্ক্যান
যকৃৎ
গ্যাস-বুদ্‌বুদ্
পাকস্থলী
বৃক্ক
মেরুদণ্ড

উদরের উপরিভাগের প্রস্থচ্ছেদের সুস্পষ্ট চিত্র

7. বেরিয়াম এনেমা

অনুপ্রস্থ কোলন
মেরুদণ্ড
শ্রোণি
মলাশয়
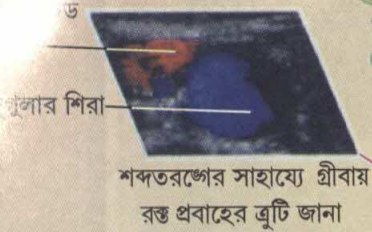
তরল বেরিয়াম মলদ্বার দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ফাঁপা অংশের এক্সরে

8. অ্যানজিওগ্রাম

ধমনির সংকীর্ণ অংশ
জঙ্ঘার পেশি
ধমনি
অস্থি

কনট্রাস্ট এক্সরের সাহায্যে রক্তবাহে অস্বাভাবিকতা জানা

চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রাণুষঙ্গ
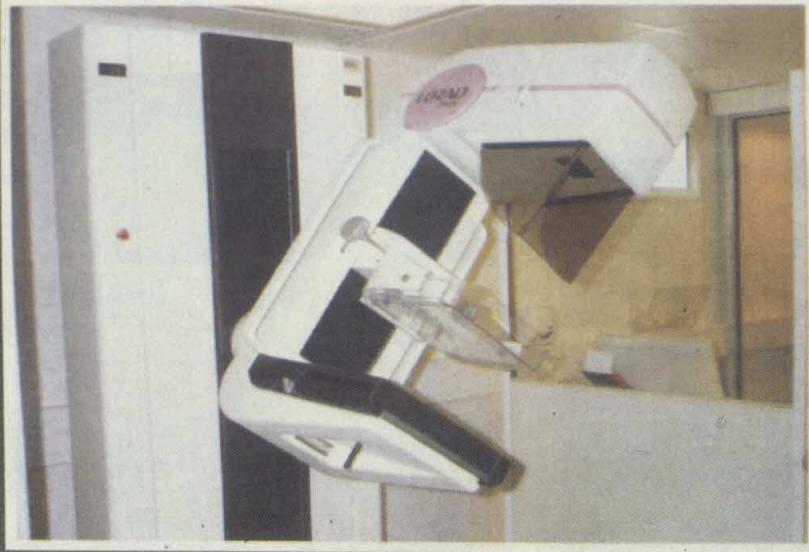
দন্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত আধুনিক এক্সরে মেশিন

চৌম্বক অনুনাদভিত্তিক প্রতিচ্ছবিকরণের যন্ত্র (MRI)

SYLLABUS FOR BIOLOGICAL SCIENCES

FIRST PAPER

Full Marks — 80 | **Periods—70** | **Pages : 200**

Chapter	Heading	Contents	Periods	Pages
1.	Nature and Scope of Biological Sciences	1.1 Status of Biology		1
		1.2 Science of Life		½
		1.3 Biology in ancient period (Mention Charak, Susruta, Aristotle, Darwin)	2	2
		1.4 Scope of Biology		2
		1.5 Importance of Biological Sciences in this millennium		1
2.	Unit of Life	2.1 Tools and Techniques (Microscopes-Simple and Compound with diagram, EM (Brief idea)	2	2
		2.2 Cell fractionations and Tracer Techniques (Brief idea) (Principles and uses of ^{32}P, ^{14}C)	2	
		2.3 Cell as the basic unit of life.	1	1
		2.4 Discovery of cell		1
		2.5 Cell Theory		1
		2.6 Ultra structural components of the cell wall, Plasma-membrane, Plastid, Endoplasmic Reticulum, Golgi Bodies, Mitochondria, Ribosomes, Lysosomes, Nucleus, Centrosomes, Microbodies, Microtubles, Cytoskeleton, Cilia and Flagella	6	12
3.	Cell Function	3.1 Diffusion-Definition and Factors	3	½
		3.2 Osmosis-Types, Membranes, Plasmolysis and Deplasmolysis		2
		3.3 Absorption — Active and Passive transport with mechanism		2
		3.4 Osmoregulation in fresh water and marine animals		1
4.	Enzymes	4.1 Definition and Properties		1
		4.2 Types with examples	2	1
		4.3 Mechanism of Action (Lock and Key. Allosterism, Regulation of Enzyme action)		2
5.	Chromosome	5.1 Morphology of Chromosomes		3
		5.2 Parallelism between gene and chromosome	2	½
		5.3 Chemical Properties-Types of Nucleic Acids and differences		1
		5.4 Physical structure of DNA-Watson and Crick Model. Replication of DNA (Brief idea)	2	3
		5.5 Types of RNA (mRNA, tRNA, rRNA) Mode of transcription (Brief idea)	2	3
				2
		5.6 DNA as the genetic material (Experiments on bacterial transformation and viral transduction)	2	3
		5.7 Definition of Euchromatin and Heterochromatin and differences		1
		Brief idea of polytene and Lamp brush chromosomes		1

Chapter	Heading	Contents	Periods	Pages
6.	Cell Division	6.1 Cell cycle and phases (control mechanism excluded)		1
		6.2 Important characters of malignant cell		1
		6.3 Process and significance of meiosis (with diagram)	2	5
7.	Genetics	7.1 Laws of Heredity (Mendel's Laws of Heredity)		1
		7.2 (i) Backcross, Test cross, Incomplete dominance, Multiple Gene, Linkage, Crossing Over.	3	3
		(ii) Sex linked inheritance-Colour blindness, Haemophilia		2
		7.3 Mutation — Definition and types Importance of mutation.	1	3
		7.4 Gene structure and function Mechanism of protein synthesis, (Brief idea) Genetic code.	1	2
8.	Photosynthesis	8.1 Major Photosynthetic pigments		
		8.2 Outline concept of light and dark reaction phases		
		8.3 Basic idea of bacterial photosynthesis	4	15
		8.4 C_2, C_3, C_4 pathway, C. A. M. (C_2 and CAM in brief with diagram only)		
9.	Respiration	9.1 Mechanism of glycolysis, Kreb's cycle (Flow chart only, no enzyme, but A. T. P., H_2O and CO_2 calculation)		
		9.2 Outline idea of Electron Transport system		19
		9.3 Relationship of photosynthesis and respiration	5	
		9.4 Application of Fermentation		
		9.5 Photorespiration		
10.	Growth, Metamorphosis and Aging	10.1 Phases and factors of Growth		2
		10.2 Differences between plant growth and animal growth. Grand period of growth.	1	1
		10.3 Differences between growth and development		½
		10.4 Metamorphosis—Definition, Types and role of Hormones		1½
		10.5 Senescence and aging of plants and animals and its factors	2	3
		10.6 Abscission		1
		10.7 Pheromones		½
		10.8 Growth of seedlings and the role of Gibberellic acid	2	1
		10.9 Photoperiodism		2
11.	Origin and Evolution of Life	11.1 Haldane and Oparin concept of the Origin of Life		2
		11.2 Distribution of Life form in time and space (Through charts)		1
		11.3 Modern concept of Natural Selection		3
		11.4 Mimicry and Colouration	4	1
		11.5 Speciation and Isolation		1
		11.6 Species concept		1
		11.7 Human Evolution in brief		2
		11.8 Bio diversity		4
12.	Population Biology	12.1 Concepts of Population Growth, Population control.		
		12.2 Mental health, Tobacco smoking and chewing, Alcohols and alcoholism, Drug addiction. Global immunization.	2	5

Chapter	Heading	Contents	Periods	Pages
13.	Environmental Biology	13.1 Definition of Ecosystem and its dynamics (Detritus, biogeochemical cycles in brief) Concepts of Biosphere, with special reference to Sundarban. Auto-ecology, Synecology	2	7
		13.2 Environmental Pollution		6
		Concept of pollution of water, soil and air		2
		Source and nature of pollutants		
		Effects and probable control strategies of water and air Pollution (Brief description)		4
		Concept of noise pollution and radioactive hazards	3	2
		Biomagnification, Bio accumulation, 3 diseases due to excess absorption of metallic compounds in blood. Pb. — Dislexia, Hg — Manimata, Cd — Etai Etai.		2
		13.3 Green House Effect on biological system, Acid Rain, Ozone hole BOD, COD, Thermal pollution, Green Bench, Pollution Control Board and its role. Earth Summit. Toxicology of industrial wastes. Wet land as nature's kidney.	2	6
14.	Application of Biology	14.1 (a) Biofertilizers Pesticides and Biological Pest Control — Benefits and Hazards		1½ 2½
		(b) Domestication of animals and plants		3
		(c) Conservation of endangered Species (with examples, 2 from plant, 2 from animal) Red Data Book, Green Data Book. Insects and their products-Seri, Api and Lac culture.	4	6
		14.2 Biotechnology and its applications (a) Cloning and Transgenic-Application in microbes, plants and animals		6
		(b) Sperm and Ova bank, Surrogate mother, Test Tube Baby.	2	2
		(c) Totipotency of cells and maintenance of cell line	1	2
		(d) Idea about plant cell and tissue culture, micropropagation.	1	4
		(e) Role of phytohormones in horticulture and agriculture	2	3
		(f) Bio-medical Applications (maximum 2 for each of the following) (a) Diagnostic instruments : ECG, EEG, Auto-analyzer (b) Imaging — USG, CT Scan, X-ray, Fluoroscopy, Endoscopy, MRI		4
		(c) Therapeutic : Laser Therapy, Dializer, Pacemaker (Reserve and Artificial), Heart-Lung Machine.	2	

Chapter	Heading	Contents	Periods	Pages
13.	Environmental Biology	13.1 Definition of Ecosystem and its dynamics (Detritus, biogeochemical cycles in brief) Concept of Biosphere, with special reference to Sundarban. Auto-ecology, Synecology	2	7
		13.2 Environmental Pollution		6
		Concept of pollution of water, soil and air		2
		Source and nature of pollutants		
		Effects and probable control strategies of water and air Pollution (Brief description)		4
		Concept of noise pollution and radioactive hazards	3	2
		Biomagnification, Bio accumulation, 3 diseases due to excess absorption of metallic compounds in blood. Pb. — Dislexia. Hg — Manimata, Cd — Etai Etai.		2
		13.3 Green House Effect on biological system, Acid Rain, Ozone hole BOD, COD, Thermal pollution, Green Bench, Pollution Control Board and its role. Earth Summit, Toxicology of industrial wastes. Wet land as nature's kidney.	2	6
14.	Application of Biology	14.1 (a) Biofertilizers Pesticides and Biological Pest Control — Benefits and Hazards		1½ 2½
		(b) Domestication of animals and plants		3
		(c) Conservation of endangered Species (with examples, 2 from plant, 2 from animal) Red Data Book, Green Data Book. Insects and their products-Seri, Api and Lac culture.	4	6
		14.2 Biotechnology and its applications		
		(a) Cloning and Transgenic-Application in microbes, plants and animals		6
		(b) Sperm and Ova bank, Surrogate mother, Test Tube Baby.	2	2
		(c) Totipotency of cells and maintenance of cell line	1	2
		(d) Idea about plant cell and tissue culture; micropropagation.	1	4
		(e) Role of phytohormones in horticulture and agriculture	2	3
		(f) Bio-medical Applications (maximum 2 for each of the following)		
		(a) Diagnostic instruments : ECG, EEG, Auto-analyzer		
		(b) Imaging — USG, CT Scan, X-ray, Fluoroscopy, Endoscopy, MRI		4
		(c) Therapeutic : Laser Therapy, Dialyzer, Pacemaker (Reserve and Artificial), Heart-Lung Machine.	2	

○ সূচিপত্র ○

● একাদশ শ্রেণি ●

জীববিজ্ঞানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব

[NATURE AND SCOPE OF BIOLOGICAL SCIENCES]

1.1. জীববিজ্ঞানের অবস্থা (Status of Biological Sciences)

ভূমিকা (Introduction) : পরীক্ষা ও নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান (Science) **বলে।** বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণ বা জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সার্বিক আলোচনা করা হয় তাকে **জীববিজ্ঞান** বলা হয়। এই বিজ্ঞানের মূলকথা **জীবন** বা **প্রাণ** (Life)। যাদেরই প্রাণ আছে (যেমন—মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি) তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান, বিজ্ঞানের যে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি থেকে আহরণ করা হয় সেগুলিকে একসঙ্গে **জীববিজ্ঞান** বলা হয়।

চিত্র 1.1. : ল্যামার্ক

জীববিজ্ঞান বা বায়োলজি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে *Bios* = জীবন এবং *Logos* = জ্ঞান নামে দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। বিজ্ঞানী **জাঁ ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক** (Jean Baptist Lamarck) 1801 খ্রিস্টাব্দে বায়োলজি শব্দটি প্রচলন করেন। কিন্তু **অ্যারিস্টট্‌লকে** (Aristotle, 384-321 BC) **জীববিজ্ঞানের জনক** বলা হয়। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রাণী ও উদ্ভিদকে জীবিত বস্তু বলে চিহ্নিত করেন।

❖ **জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Biological Sciences) :**

(i) **জীব সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারই জীববিজ্ঞান (Biology)।**

(ii) **জীব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সরবরাহকারী বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাকে জীববিজ্ঞান বলে।**

□ **জীববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু :** পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ ও মানুষসহ সব প্রাণীদের সম্বন্ধে জানা এবং তাদের গঠন, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি, উৎপত্তি, অভিযোজন, অভিব্যক্তি, বংশগতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা। আধুনিক যুগে কোশতত্ত্ব, কলাপালন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি নতুন বিষয়গুলির প্রসার ও প্রয়োগ ঘটেছে। এর ফলে কৃষিকার্য, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, উদ্ভিদ ও পশুপালন, রেশম চাষ, পরিবেশবিদ্যা, জলাশয় ও অরণ্য সংরক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি জ্ঞান প্রয়োগ করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। এছাড়া বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে জীববিজ্ঞানের বহু অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। বর্তমানে জীববিজ্ঞান এমন একটি অবস্থায় উন্নীত হয়েছে যে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা বিশেষত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সহযোগে **প্রাণ-রসায়ন** (Bio-chemistry) এবং পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানের সহযোগে **প্রাণ-পদার্থবিদ্যা** (Bio-physics) শাখার সৃষ্টি হয়েছে। জীববিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভবপর হচ্ছে। আজকাল পরিসংখ্যানবিদ্যার সঙ্গে জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় **জীব-পরিসংখ্যানবিদ্যা** (Bio-statistics) নামে নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। **ভূবিদ্যার** (Geology) বহু বিষয় জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, যেমন—অতীতকালের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ যারা এই পৃথিবীতে ছিল, তাদের অনেকেই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব বিলুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব **জীবাশ্ম** (Fossil) হিসাবে পাওয়া যায়। জীবাশ্ম সম্বন্ধে জানতে হলে ভূবিদ্যার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে ভূবিদ্যার সঙ্গে জীববিজ্ঞানের একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এছাড়া আরও বহু অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখা জীববিজ্ঞানের বহু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করছে। মাত্র দেড়শ বছর আগেও জীববিজ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে জীববিজ্ঞান শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

1.2. জীবনের বিজ্ঞান (Science of Life)

পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন রকমের অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণ আছে বলে সব প্রাণী ও উদ্ভিদকে এককথায় **সজীব বস্তু** (Living or animate object) বলে। সজীব বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও

জীবনযাত্রার নানা প্রণালী সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। যে বিষয় অধ্যয়ন করলে জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়, তাকেই জীববিজ্ঞান বলে।

চিত্র 1.2 : জীবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

জীবের গঠন ও কার্যাবলি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাই জীববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান জীবজগতের আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য, গঠনগত বৈচিত্র্য, কার্যগত বৈষম্য, বিচিত্র জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা প্রভৃতি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কাজের সূত্র অন্বেষণে প্রয়াসী। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে প্রকল্প গঠিত হয়। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে কোনো প্রকল্প বিজ্ঞানী মহলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হলে এটি তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত লাভ করে।

❖ (a) **জীবনের সংজ্ঞা (Definition of Life)** : জীবন বা প্রাণের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রধান দুটি সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হল :

1. **বৃদ্ধি, প্রজনন, পরিব্যক্তি, বিবর্তন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী বিশেষ অবস্থাকে জীবন বলে।**
2. **সজীব বস্তু ও পরিবেশের আন্তঃবিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশকেই জীবন বা প্রাণ বলা হয়।**

◘ (b) **জীবের জীবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics features of life process)** : প্রতিটি জীবে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যেমন—(1) আকার ও আয়তন, (2) প্রোটোপ্লাজমের অস্তিত্ব, (3) দেহ সংগঠন, (4) উত্তেজিতা, (5) অভিযোজন ক্ষমতা, (6) বৃদ্ধি, (7) চলন ও গমন, (8) বিপাক, (9) পুষ্টি, (10) শ্বসন, (11) রেচন, (12) ক্ষরণ, (13) ছন্দবদ্ধতা, (14) পরিবৃত্তিতা, (15) জৈব অভিব্যক্তি, (16) জনন, (17) জীবন চক্র, (18) জরা ও মৃত্যু ইত্যাদি।

◎ 1.3. প্রাচীন যুগের জীববিজ্ঞান (Biology in Ancient Period) ◎

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীববিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। তাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে আধুনিক জীব বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। নীচে কয়েকজন বিজ্ঞানীর জীবনী আলোচনা করা হল।

▲ I. চরক (Charak)

1913 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের History of Indian Medicine-এ লিখিত তথ্য অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব 600 অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় 200 অব্দের মধ্যে অর্থাৎ 800 বছরের কোনো সময়ে সম্ভবত কাশ্মীরে **চরক** জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষের রোগজনিত দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরী, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি বৈদিক যুগের সুচিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ত্রিপিট'কে দেখা যায়, চরক খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কণিষ্কের রাজত্বকালে রাজবৈদ্য ছিলেন। কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধেও অনেক মতবিরোধ আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে তিনি রাজত্ব করেছিলেন তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি।

◘ **চরকের অবদান** : ঋষিপুত্র আত্রেয় প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চরক। তাঁর প্রণীত 'চরকসংহিতা' প্রধানত 'অগ্নিবেশ-তন্ত্রে'র সম্প্রসারিত ও সংশোধিত সংস্করণ। এই কাজ তিনি একা করেননি। দৃঢ়বল নামে আর একজন প্রাচীন

চিকিৎসক অগ্নিবেশ-তন্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সংস্কার করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র হিসাবে চরকসংহিতা আজও তথ্যবহুল সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৪টি বিভাগে বিভক্ত, যেমন—(i) সূত্রস্থান, (ii) নিদানস্থান, (iii) বিমানস্থান, (iv) শারীরস্থান, (v) ইন্দ্রিয়স্থান, (vi) চিকিৎসাস্থান, (vii) কল্পস্থান ও (viii) সিদ্ধস্থান। এইগুলি আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। চরকসংহিতায় মোট অধ্যায়ের সংখ্যা 120টি। **সূত্রস্থানে** আয়ুর্বেদের লক্ষণ ও প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক দোষগুলির বিবরণ ও বিভিন্ন রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বলা আছে। **নিদানস্থানে** রয়েছে রোগের ভেদ, পর্যায় ও লক্ষণগুলির বিবরণ **বিমানস্থানে** আলোচিত হয়েছে। অম্লাদি রসের কার্যকারিতা ও বিভিন্ন রোগের মূলে তাদের ভূমিকার কথা **শারীরস্থানে** শরীরের গঠন অনুসারে রোগের প্রভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। **ইন্দ্রিয়স্থানে** রোগের উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের ভূমিকার বিশদভাবে বর্ণিত আছে। চরকসংহিতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল **চিকিৎসাস্থান**। এখানে বিভিন্ন রোগের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচিত হয়েছে। বহু দুরারোগ্য রোগ, যেমন—যক্ষ্মা, কর্কট প্রভৃতি চিকিৎসার পদ্ধতি এই অংশে উল্লেখ রয়েছে। **কল্পস্থানে** দ্রব্যগুণ বিচার ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই চরকসংহিতায় আলোচিত হয়েছে। রোগের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সব রোগের মূলে আছে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাব বা দোষ। একে **ত্রিদোষবাদ** বলে। এই তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষা করাই স্বাস্থ্যের কারণ। আধুনিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা আজও একথা বিশ্বাস করেন। চরক মনে করতেন জীবজগৎ ও মানুষ **অপ** (Water), **ক্ষিতি** (Earth), **তেজ** (Fire), **মরুৎ** (Air), **ব্যোম** (Sky)—এই পঞ্চভূত (Five elements) দিয়ে গঠিত। চরকের পুষ্টি, বিপাক ও অনাক্রম্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় চরকসংহিতা অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া বংশবিদ্যা ও মাতৃগর্ভে শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বহু সংকেত ও তথ্য পাওয়া যায়।

▲ II. সুশ্রুত (Susruta)

◘ **সুশ্রুত** ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। তিনি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরাজ ধন্বন্তরির কাছে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তথ্য থেকে মনে হয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। সুশ্রুতের সময় থেকে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্প্রসারিত হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের পরে **সুশ্রুতসংহিতা** গ্রন্থের স্থান। বর্তমানে সুশ্রুতসংহিতা নামে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা সুশ্রুতের লেখা রচনা নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গবেষকরা মনে করেন সুশ্রুত প্রণীত মূল গ্রন্থটি (সুশ্রুততন্ত্র) বিনষ্ট হওয়ায় নাগার্জুন তার সংস্কার সাধন করেন। নাগার্জুন রচিত সংস্কৃত গ্রন্থটি হল সুশ্রুতসংহিতা। এই গ্রন্থটির বিশ্বজোড়া খ্যাতির প্রমাণ ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ। উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন, জার্মান, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সুশ্রুত অনূদিত হয়েছিল।

◘ **সুশ্রুতের অবদান** : তিনি সব জীবকে দুভাগে বিভক্ত করেন, যেমন—**স্থবর** অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং **জঙ্গম** অর্থাৎ প্রাণী। তার লেখাতে উদ্ভিদের বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন—বনস্পতি (অপুষ্পক), বৃক্ষ (ফুল ও ফলযুক্ত), বীরুৎ (লতা-গুল্ম) এবং ওষধি (ফল হয়ে মরে যায়)। প্রাণীদের তিনি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন—(i) কুলাকার নদীকূলে বিচরণকারী (গোরু, মোষ), (ii) **জাঙ্গল**—জঙ্গলে বসবাসকারী (হরিণ), (iii) গুহাশয়—গুহাবাসী— বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। সাপকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়—বিষহীন ও বিষধর। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকদের মধ্যে সুশ্রুতকে শল্যবিদ্যার জনক বলা হয়। অস্ত্রচিকিৎসায় নানা প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। প্রায় 121টি বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতির উল্লেখ সুশ্রুতে আছে। সুশ্রুতসংহিতায় মোট 66টি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে চিকিৎসাস্থান সবচেয়ে বড়ো এবং এটি 40 অধ্যায়ে বিভক্ত। শল্য চিকিৎসাকে মোট 7টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— **ছেদন** (Amputation), **ভেদন** (Accession), **লেখন** (Scarping), **এষ্যন** (Probing), **আহরণ** (Extraction), **বিস্রবণ** (Drainage) এবং **সীবন** (Suturing)।

প্রাচীন ভারতে শল্যবিদ্রা যে কুশলী ও পারদর্শী ছিলেন তা তাদের যন্ত্রের বর্ণনা থেকে সহজে বোঝা যায়। ভগন্দর, টনসিল, চোখের ছানি, ভ্রূণ, হার্নিয়া প্রভৃতি অস্ত্রোপচারের বিবরণ সুশ্রুতে দেওয়া আছে। উদ্ভিদের আঁশ ও পশুলোম দিয়ে অস্ত্রোপচারের পর কাটাস্থান সেলাই করা হত। অস্ত্রোপচারের পর গরম বিশুদ্ধ জল দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, কাপড়ের গজ ঢুকানো, পটি বাঁধা, পুলটিস দেওয়া প্রভৃতির বিবরণ দেখে মনে হয় এগুলি আধুনিক শল্যবিদ্যার প্রয়োগ। হাড় ভাঙলে বা চিরে গেলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন একটি পরিচ্ছেদে সেগুলি সঠিকভাবে লেখা আছে।

রিনোপ্লাস্টি (Rhinoplasty) বা নতুন নাসিকা প্রস্তুত বিদ্যা প্রথম ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারি। **মনু-সংহিতায়** ব্যভিচারের জন্য অপরাধীর নাক ও কান কাটার নির্দেশ ছিল। নতুন নাক তৈরির কথা সুশ্রুতে বলা আছে গাছের পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান কেটে গণ্ড বা গলা থেকে কিছুটা কলা বা টিসু কেটে নাকের কাটা অংশের উপর সযত্নে বসিয়ে

সেলাই করলে আস্তে আস্তে দেহের সঙ্গে জুড়ে যাবে। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সুবিধের জন্য নতুন নাকের মধ্যে দুটি নল বসানোর বিধান ছিল। একই ভাবে গলার কিছু কলা বা টিসু কেটে কাটা কানের জায়গায় নতুন কান তৈরি করা হত। বার্লিনের বিখ্যাত চিকিৎসক **হির্শবের্গ** বলেছেন ইউরোপের প্লাস্টিক সার্জারির প্রাথমিক ধারণা ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। তাই আজও সুশ্রুতের অবদান ও কৃতিত্বের জন্য চিকিৎসার জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন।

▲ III. অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle—384-322 B.C.)

গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টট্‌ল** সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত স্টাজিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব 384 অব্দে অ্যারিস্টট্‌ল জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা নিকোমেকাস একজন সুচিকিৎসক ও ম্যাসিডনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সভাসদ ছিলেন। বাবার কাছে তিনি শল্যবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। **প্লেটোর** কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য 17 বছর বয়সে তিনি এথেন্সে আসেন এবং 20 বছর তাঁর বিদ্যাপীঠে বা অ্যাকাডেমিতে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর খ্রিস্টপূর্ব 347-48 অব্দে তিনি ওই অ্যাকাডেমি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর নানা কারণে অ্যারিস্টট্‌ল এথেন্স পরিত্যাগ করে মিসিয়ার অন্তর্গত আসোসে একটি নতুন বিদ্যাপীঠ ও আলোচনা-চক্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি তিন বছর ছিলেন। এর পর তার সহকর্মী ও বন্ধু **থিওফ্রেস্‌টাসের** অনুরোধে লেস্‌বস্ দ্বীপের কাছে মিটিলিনে চলে আসেন। আসোস ও মিটিলিনে থাকার সময় তিনি জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। পাঁচ বছর এভাবে কাটানোর পর আলেকজান্ডারের শিক্ষকতার ভার নিয়ে তিনি আবার ম্যাসিডোনে ফিরে আসেন খ্রিস্টপূর্ব 342-43 অব্দে। তিনি কিশোর আলেকজান্ডারকে দার্শনিক অথবা বিজ্ঞানী করে তোলার পরিবর্তে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। আলেকজান্ডারের জন্য তিনি দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ (Monarchy ও Colonies) রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ দুটিতে রাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতি বিশদভাবে লেখা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব 334-35 অব্দে ফিলিপের মৃত্যুর অল্পদিন পরে অ্যারিস্টট্‌ল আবার এথেন্সে এসে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ করতে আরম্ভ করলেন। এই সময় তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শহরের উপকণ্ঠে ছোটো ছোটো কয়েকটি বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। এই বিদ্যাপীঠগুলিকে 'লাইসিয়াম' বলা হত। লাইসিয়াম পরিচালনার জন্য আলেকজান্ডার অ্যারিস্টট্‌লকে প্রচুর অর্থ দান করেন। লাইসিয়ামে পদার্থবিদ্যা, রাজনীতি, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। খ্রিস্টপূর্ব 323 অব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক কারণে অ্যারিস্টট্‌লের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে যায়। সেসময়ে তিনি তার বিদ্যালয় পরিচালনার ভার সহকর্মী ও বন্ধু থিওফ্রেস্‌টাসের হাতে অর্পণ করে ক্যালসিসে চলে আসেন। তার পরের বছর অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব 322 অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চিত্র 1.3 ঃ অ্যারিস্টট্‌ল

□ **অ্যারিস্টট্‌লের অবদান ঃ** (i) অ্যারিস্টট্‌ল বহু গ্রন্থের লেখক। প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, জননতত্ত্ব, জ্যোতিষ, সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর লেখা বহুমুখী প্রতিভা ও অপরিসীম জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। (ii) তাঁর লেখা **Historia Animalium** গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই তথ্যবহুল গ্রন্থে তিনি জীবজন্তুর বিচিত্র ব্যবহার, গুণাগুণ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। (iii) অ্যারিস্টট্‌ল প্রায় 500 প্রাণীর নিখুঁত বর্ণনা করেন এবং এর মধ্যে প্রায় 50টি প্রাণীর ব্যবচ্ছেদ করে অভ্যন্তরীণ চিত্র অঙ্কন করেন। (iv) ভূমধ্যসাগরে Cuttle-fish (Sepia) নামে এক ধরনের সামুদ্রিক কম্বোজ পাওয়া যায়। অ্যারিস্টট্‌ল এই প্রাণীটির ডিম পরিস্ফুরণের পদ্ধতি বর্ণনা করেন। তা ছাড়া টর্পেডো (*Torpedo ocellata*) ও বড়শি মাছের (Angler fish) বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেন। তিমি যে স্থলজ স্তন্যপায়ীদের মতো জরায়ুজ তা তিনি প্রথম আবিষ্কার করে দেখান। (v) অ্যারিস্টট্‌ল প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস করেন। তিনি প্রাণীদের দু'ভাগে বিভক্ত করেন—(১) রক্তবহুল ও (২) রক্তহীন। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে এটি মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে তুলনীয়। (vi) তা ছাড়া প্রাণীদের জনন রহস্য সম্বন্ধে তাঁর বিশদ বিবরণ সবাইকে আকৃষ্ট করে।

▲ IV. চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin—1809-1882)

বিবর্তনের আধুনিক ধারণার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। বিবর্তন মতবাদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানী **ডারউইন** বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি 1809 খ্রিস্টাব্দের 12ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের শ্রুসবেরিতে (Shrewsbury) এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি কিছুদিন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়টি তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারেনি। এর পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। চার্লস লিয়েল (Charles Lyell) -এর 1830 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গবেষণাপত্র ডারউইনকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। অতীত যুগের পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সমতলভূমি, মরুভূমি প্রভৃতির সৃষ্টি ও যুগ যুগ ধরে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেসব তথ্যের বিবরণ লিয়েল-এর গবেষণাপত্রে ছিল। তাঁর শিক্ষক ও বন্ধু উদ্ভিদবিদ অধ্যাপক জোন হেন্স্লোর (John Henslow) পরামর্শে 1831 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকাগামী এইচ. এম্. এস. বিগ্ল (H. M. S. Beagle) নামক জাহাজে তিনি প্রকৃতিবিদ হিসাবে নিযুক্ত হন। 1831 খ্রিস্টাব্দের 27শে ডিসেম্বর যাত্রা আরম্ভ হয়। তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়ান। এর মধ্যে কিছু দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের নিকটবর্তী ছিল। এসব দ্বীপগুলির মধ্যে **গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জ** ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিভ্রমণের সময় তিনি বিবর্তন, বিভিন্ন প্রজাতির বিস্তার ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। সেসময় তিনি নানা জায়গা থেকে জীবাশ্ম ও সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করেছিলেন। গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেখে ডারউইন আশ্চর্য হয়ে যান। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট পার্থক্য (Variation) দেখতে পান। দ্বীপগুলিতে বিভিন্ন উপজাতির ফিঞ্চ (Finch) পাখি ছিল। প্রায় 600 মাইল দূরে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের ফিঞ্চ পাখিদের সঙ্গে এসব ফিঞ্চ পাখির অনেক রকম পার্থক্য তিনি লক্ষ করেন। তা ছাড়া তিনি গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জের প্রাণীকুলের সঙ্গে আফ্রিকার কেপ ভার্দে (Cape Verde) দ্বীপপুঞ্জের প্রাণীদের মোটামুটি পরিবেশ এক হলেও দুই অঞ্চলের প্রাণীকুলের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করেন। ডারউইন মনে করেন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে স্থানের ব্যবধান যত কম হয় ততই এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বাড়ে। 1837 খ্রিস্টাব্দে ডারউইন নানা রকম তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ করে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। এসময় টোমাস রবার্ট ম্যালথামে র লেখা প্রবন্ধ "An Essay on the Principle of Population" এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালসের (Alfred Russel Wallace)-এর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা ডারউইনকে প্রভাবিত করে। 1858 খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশে ব্যস্ত তখন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace) নামে একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ মালয় আর্কিপেলাগোর প্রাণী ও উদ্ভিদের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁর কাছে পাঠান। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওয়ালেসের পাঠানো তথ্যগুলি ডারউইনের তথ্যের অনুরূপ ছিল।

চিত্র 1.4 : চার্লস রবার্ট ডারউইন

পরিশেষে 1858 খ্রিস্টাব্দের 1লা জুলাই লিনিয়ান সোসাইটি অব্ লন্ডন-এর অধিবেশনে ডারইউন এবং ওয়ালেসের যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ 1859 খ্রিস্টাব্দের 24শে নভেম্বর বহু তথ্য সম্বলিত **'On the Origin of Species by means of Natural Selection'** নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চার্লস ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদ সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জীবনের শেষের দিকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি লন্ডন থেকে 'ডাউনে' গিয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং অনেকগুলি বই লেখেন। 1882 খ্রিস্টাব্দে ডারউইনের মৃত্যু হয়।

◘ **ডারউইনের মতবাদের মূল বিষয় :** (i) জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence)। (ii) যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest)। (iii) প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)। (iv) নতুন প্রজাতির সৃষ্টি (Origin of new species)।

❂ 1.4. জীববিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Biological Sciences) ❂

সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে মানুষ জীববিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর অগ্রগতি ও পরিধি ছিল সীমিত কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণা ও মূল্যবান তথ্যের পরিবেশন বিজ্ঞানের এই শাখা হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী, জটিল ও তথ্যবহুল। জীববিদ্যার সাহায্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্রতম জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সব জীবের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সম্পর্ক, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, মানবকল্যাণে এদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় জানা যায়। নিম্নলিখিত আলোচনা থেকে জীববিদ্যার তথা উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার পরিধি, গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।

1. **খাদ্য উৎপাদনে (Food production)** : মানুষসহ সব প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, যেমন—কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন প্রভৃতি সঞ্চয় করে নিজেদের ও প্রাণীদের চাহিদা পূরণ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ ও খাদ্যের উৎপাদন প্রয়োজন, তা নাহলে পৃথিবী থেকে অল্প সময়ের মধ্যে জীবজগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও সহযোগী শাখার সাহায্যে কীভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আলোচনা করা হল।

(i) **অধিক ফলনশীল বীজ উৎপাদনে**—সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় আজকাল উচ্চ-ফলনশীল এবং রোগ-প্রতিরোধক্ষম বিভিন্ন জাতের উন্নত ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তুলো প্রভৃতি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। (ii) **বীজশূন্য ফল উৎপাদনে**— বীজশূন্য ফল উৎপাদন ব্যবহারিক জীববিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। স্বাভাবিকভাবে পরাগযোগ ঘটতে না দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে বীজশূন্য ফল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে **উদ্ভিদে** অক্সিন প্রয়োগে বীজশূন্য ফল উৎপাদনকে **পার্থেনোকার্পি** (Parthenocarpy) বলে। জনপ্রিয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য আজকাল প্রচুর পরিমাণে বীজশূন্য কলা, আপেল ও পেয়ারার চাষ হচ্ছে। (iii) **ফলের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধিতে**— জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা কমলালেবু, আপেল, আঙুর প্রভৃতি ফলের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। (iv) **কীটপতঙ্গ দমনে**— নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফসলের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিসাধন করে। এ সমস্ত কীট-পতঙ্গের জীবন-ইতিহাস, আক্রমণের পদ্ধতি এবং তার প্রতিরোধ জীববিদ্যার শাখা **কীটবিদ্যা** বা Entomology-র সাহায্যে জানা যায় এবং প্রয়োজনীয় দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। (v) **মৎস্য চাষে** — জীববিদ্যার সহযোগী শাখা পিসিকালচার ও ফিশারির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হরমোন প্রয়োগ করে কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে মাছের উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। আজকাল সংকর মাছ উৎপাদনের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। (vi) **উন্নত জাতের পশুপাখি উৎপাদনে**— সুপ্রজননবিদ্যা ব্যবহার করে গোরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পশুপাখির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন হচ্ছে। ফলে ডেয়ারি এবং পোলট্রি বর্তমানে একটি অর্থকরী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

2. **রোগ প্রতিরোধে (Prevention of disease or Prophylaxis)** : দিন দিন মানুষের নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার যৌথ প্রচেষ্টায় আজকাল অধিকাংশ রোগই মানুষের আয়ত্তাধীন। যেসব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে রোগ নির্ণয় এবং ওষুধ তৈরিতে জীববিদ্যার অবদান অনস্বীকার্য।

3. **শিল্পোদ্যোগে (For Industry)** :

(i) **রেশম শিল্পে** — সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় জীববিদ্যার সাহায্যে উন্নত মানের রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বেশি উৎপাদনশীল রেশম মথের উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রেশম মথের গুটি থেকে বেশি পরিমাণে উন্নত মানের তসর, গরদ, মুগা প্রভৃতি রেশম উৎপন্ন হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হচ্ছে। (ii) **লাক্ষা শিল্পে**—বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু তৈরিতে লাক্ষার অবদান অপরিসীম। গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অংশ, পালিশ, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র প্রভৃতি উৎপাদনে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। তাই লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। (iii) **বস্ত্রশিল্পে**—বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল, যেমন—পাট ও তুলো উদ্ভিদ যোগান দিচ্ছে। জীববিদ্যার সাহায্যে সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় অধিক ফলনশীল পাট ও তুলোর সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে।

4. **বন্যপ্রাণী ও বনসংরক্ষণে (Conservation of Wild life and Forests)** : বন ও বন্যপ্রাণী শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, **ইকোসিস্টেমের** ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই বনমহোৎসব, সংরক্ষিত অরণ্য, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে জীববিদ্যার সহায়তায় বন ও বন্যপ্রাণীকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে।

5. **পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিশোধনে (Conservation of Environment and Prevention of Pollution)** : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা শিল্পের প্রসার লাভ ঘটেছে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। যানবাহন, কলকারখানা থেকে নানা প্রকার দূষিত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ওষুধের ব্যবহারের ফলে বাতাস ও জল ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। কীভাবে বেশি পরিমাণ গাছপালা রোপণ করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ করা যায় তা কেবলমাত্র জীববিদ্যার সাহায্যেই জানা যায়।

6. **বন্যা ও ভূমিক্ষয়রোধে (For Prevention of Flood and Erosion of Soil)** : অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং প্রবল বন্যার জন্য ভূমিক্ষয় এক প্রাকৃতিক অভিশাপ। মাটির প্রকৃতি জেনে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোপণ করে বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধ করা হয়।

7. **তেল সন্ধানে (In Search of Oil) :** বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি, যেমন—পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান উপাদান। প্রয়োজনের তুলনায় এসবের সরবরাহ এতই কম যে অদূর ভবিষ্যতে মানবসভ্যতা চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই দেশের সর্বত্র তেল সন্ধানের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। তেল সন্ধানে **জীবাশ্ম বিজ্ঞান** (Paleontology) এবং **প্রত্নরেণু বিজ্ঞান** (Palaeo-Palynology) সাহায্য করছে। গভীর মৃত্তিকাস্তরে প্রাপ্ত পরাগ এবং এককোশী প্রাণী ফোরামিনিফেরার জীবাশ্ম সম্ভাব্য তেলের অবস্থানের নির্দেশ দিচ্ছে।

8. **মহাকাশ গবেষণায় (In Space Research) :** মহাকাশচারীরা মহাকাশযানে ক্লোরেল্লা (Chlorella) নামক একপ্রকার শৈবাল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এছাড়া ক্লোরেল্লা মহাকাশচারীর শ্বসনে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন মহাকাশচারীদের শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

9. **জনবিস্ফোরণ রোধে (Prevention of Population Explosion) :** বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভয়াবহ জনবিস্ফোরণ ঘটাতে চলছে। মানুষ জীববিদ্যালব্ধ জ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের নিত্য নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ব্যতীত মানুষ এখন অধিক কার্যকরী এবং দীর্ঘস্থায়ী ও অক্ষতিকর ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণায় মগ্ন। জন্মনিরোধক ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগে উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে।

10. **মানব সুপ্রজননবিদ্যায় (Human Genetics) :** বিভিন্ন প্রকার বংশগত রোগ ও সিন্ড্রোম যেমন— বর্ণান্ধিতা (Colour blindness), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), টাক (Baldness), টারনার সিন্ড্রোম (Turner syndrome), ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম (Klinefelter syndrome) প্রভৃতি অস্বাভাবিকতা সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হয়। এসব রোগ থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে সুপরিকল্পিতভাবে রোগ নিরূপণ করা প্রয়োজন যাতে রোগগ্রস্ত অপত্যের আবির্ভাব না হয়। এ ব্যাপারে সুপ্রজননবিদ্যার সাহায্য নেওয়া উচিত।

11. **জিনগত কারিগরিবিদ্যা এবং বংশগত পরামর্শদান (Genetic Engineering and Genetic Counselling) :** (i) **জিনগত কারিগরিবিদ্যা**—বংশগতি বিদ্যার জ্ঞান থেকে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি **জিনগত কারিগরিবিদ্যা বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** (Genetic engineering) নামে পরিচিত। এই বিদ্যার সাহায্যে ক্রোমোজোমে জিনের প্রতিস্থাপন করা হয়, অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী জিনকে দেহ থেকে অপসারণ করে তার জায়গায় সুস্থ জিন বসিয়ে মানুষকে নীরোগ করা যায়। জিনগত কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে মানুষের বংশগত রোগের, যেমন— হিমোফিলিয়া, মধুমেহ ইত্যাদিরও নিরাময় করা যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভ্যাকসিন ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি করা হয়। (ii) **বংশগত পরামর্শদান**—বংশগত রোগবিহীন সন্তান জন্ম দেবার পরামর্শ জীববিদ্যার যে শাখাতে দেওয়া হয় তাকে **বংশগত পরামর্শদান বা জেনেটিক কাউনসেলিং** (Genetic counselling) বলে।

○ 1.5. এই সহস্রাব্দে বা মিলেনিয়ামে জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব ○ (Importance of Biological Sciences in this Millennium)

'অব্দ' শব্দের অর্থ হল সাল বা বছর। শতাব্দ হল একশো বছর। **সহস্রাব্দ বা মিলেনিয়াম হল হাজার বছর**। যিশুখ্রিস্টের জন্মকাল থেকে খ্রিস্টাব্দের গণনা আরম্ভ হয়েছে। এক খ্রিস্টাব্দ থেকে দু'হাজার খ্রিস্টাব্দ হল দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। দু'হাজার এক খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় সহস্রাব্দ। আমরা এখন দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ করে তৃতীয় সহস্রাব্দের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। খ্রিস্টের জন্মের বহু বছর আগে থেকে প্রথম সহস্রাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতি হয়েছে। ভারতবর্ষ, ব্যাবিলন, মিশর, চীন ও গ্রিসের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বহু পুরোনো। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইউরোপে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জোয়ার আসে।

○ বর্তমান সহস্রাব্দে জীববিজ্ঞানের গুরুত্ব (Importance of Biological Sciences at present Millenium) ○

1. **স্বাস্থ্য (Health) :** আজকাল শরীর ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি সমাজের চেহারা অনেকটা বদলে দিয়েছে। বিভিন্ন রকম জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কারের ফলে লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ আজ নতুন আশার আলোকে সঞ্জীবিত। শল্যচিকিৎসায় এসেছে যুগান্তর। ভাঙা হাড়কে জোড়া দেওয়া ও কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন করা আজকাল কোনো সমস্যাই নয়। এখন চোখ, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অধিরোপন করা যাচ্ছে এবং পুনর্গঠন করছে শরীরের যে-কোনো অঙ্গকে।

2. **বংশগত রোগ ও তার চিকিৎসা (Genetic Diseases and their Treatment)** : বিজ্ঞানীরা প্রায় চার হাজারের মতো বংশগত রোগ সনাক্ত করতে পেরেছেন। তাদের মধ্যে আছে হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, ক্যানসার ও এইডস। এদের কোনোটিরই প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন জিনথেরাপি ছাড়া এদের আরোগ্যের অন্য কোনো পথ নেই।

3. **জিন প্রযুক্তিবিদ্যা (Genetic Engineering)** : যে কোনো সজীব কোশের জিনগুলির মধ্যে অন্য জীবের জিন বা DNA প্রতিস্থাপন বা যুক্ত করে কোশের পরিবর্তন, সংযোজন ঘটিয়ে নতুন জিনপুঞ্জ গঠনের পদ্ধতিকে জিন প্রযুক্তিবিদ্যা বলে। আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে, খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনে, কৃষিতে ও বিভিন্ন শিল্পে জিন প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে।

4. **জৈব জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা (Biotechnology)** : জীবের মধ্যে জিনের কারিগরি ঘটিয়ে তাদের কোশে বা দেহে প্রয়োগ করে মানুষের কল্যানে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকে জৈব জীবপ্রযুক্তিবিদ্যা বলে। এই কৌশলে বেশি ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়; গৃহপালিত জীবজন্তু, যেমন— গোরু, মোষ, ভেড়া, শূকর, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি প্রাণীদের থেকে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

5. **জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ (Conservation of Germplasm)** : আজকাল মানুষের নানা প্রকার কার্যকলাপে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হচ্ছে। তাই এদের রক্ষা করার জন্য জার্মপ্লাজমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তরল নাইট্রোজেন মানুষের নানারকম অঙ্গ – 196°C সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে কোনো অসুস্থ মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট, কোশ, কাণ্ড, মুকুল, বীজ ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা হয়। এদের প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো যায়।

6. **খাদ্য উৎপাদন (Food Production)** : বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছি। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে জীব প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ও নতুন নতুন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভাবন, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি। পশুপালন, কৃত্রিম উপায়ে মৎস্যচাষ প্রভৃতিও আমাদের বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাচ্ছে।

7. **কলাপালন ও তার ব্যবহার (Tissue Culture and its Uses)** : কোশতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, রোগবিদ্যা, নতুন উদ্ভিদ তৈরি প্রভৃতি গবেষণায় টিসুকালচারের গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়। টিসুকালচার থেকে স্বাভাবিক ও টিউমার কোশের আচরণ সম্বন্ধে জানা যায়। টিসুকালচার করার সময় পোলিও ভাইরাস মানুষের কোশকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল এবং এর থেকে গবেষণা করে পোলিওর টিকা তৈরি করা হয়েছিল। এর পর একইভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, মাম্পস ইত্যাদির টিকা তৈরি করা হয়েছে। আজকাল পরীক্ষাগারে টিসুকালচার করে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞানেও এ সবগুলি খুবই কার্যকরী। বহু উদ্ভিদ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগমুক্ত উদ্ভিদ থেকে অগ্রমুকুলের ভাজককলা কালচার করে রোগমুক্ত উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়।

8. **জার্মপ্লাজমের সংরক্ষণ (Conservation of Germplasm)** : আজকাল জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের কথা শুনতে পাই। অরণ্য ধ্বংস, দূষণ, কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার ইত্যাদির জন্য অনেক প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই এদের রক্ষা করার জন্য জার্মপ্লাজমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

9. **বন্ধ্যাত্ব নিবারণ (Abolition of Sterility)** : ক্লোনিং-এর সাহায্যে টেস্টটিউব বেবি বা নলজাতক শিশু আজকাল জন্মগ্রহণ করছে। গর্ভধারণে অসমর্থ মায়ের ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে দেহের বাইরে টেস্টটিউবের মধ্যে বাবার শুক্রাণুর সাহায্যে নিষিক্ত করে নিষিক্ত ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে স্থাপন করে নিঃসন্তানকে সন্তান দান করা হচ্ছে। আজকাল বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য পেয়েছে।

10. **পরিব্যক্তির প্রয়োগ (Application of Mutation)** : আধুনিক বিজ্ঞানীরা মিউটেশনকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উন্নত শস্যবীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে এমন শস্যবীজ তৈরি করা হচ্ছে, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। মনে করা হচ্ছে এই সহস্রাব্দে বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে আরও উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম বহু শস্যবীজ তৈরি করতে পারবেন।

11. **কম্পিউটারের প্রয়োগ (Application of Computer)** : প্রযুক্তি বিজ্ঞানে আধুনিক সংযোজন হল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক। কম্পিউটার হল একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। তথ্য সংগ্রহ, রোগ নির্ণয়, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি বহু কাজ করার জন্য কম্পিউটারের প্রয়োজন হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, যেমন— আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, স্ক্যানিং ইত্যাদিতে কম্পিউটার বিশেষ প্রয়োজন।

গত এক সহস্রাব্দে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু পৃথিবীর এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে জীবমণ্ডলের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন আজ বিপর্যয়ের মুখে এবং তাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পরিবেশ সমস্যা সবদেশে প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে,

কারণ—কৃষিক্ষেত্রে নিবিড় কর্ষণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, অরণ্য ধ্বংস, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, ক্ষতিকারক বিদেশি প্রযুক্তি, জনসংখ্যার চাপ, দূষণ সমস্যা, জলাশয় ভরাট, প্লাস্টিকের ব্যবহার ইত্যাদি। এই সহস্রাব্দে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে হবে। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি হল—(i) জনসংখ্যা হ্রাস, (ii) ভূমির সদ্ব্যবহার, (iii) কৃষিজমির পরিচর্যা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা, (iv) বন সম্পদ সংরক্ষণ, (v) দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (vi) পরিবেশ উন্নয়ন (vii) শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণ-চেতনা বৃদ্ধি, (viii) জাতীয় সুরক্ষার জন্য চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। এসব সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিতে পারলে এই সহস্রাব্দ মানুষের কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

○ অনুশীলনী ○

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay-type questions) :

1. (a) জীববিজ্ঞান কাকে বলে? (b) জীববিজ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করো। **2.** (a) বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীববিজ্ঞান-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করো। (b) উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা বলিতে কী বোঝো ? **3.** (a) ক্রমবর্ধমান মানব সমাজের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি সবই জীববিদ্যার উপর নির্ভরশীল—আলোচনা করো। **4.** চিকিৎসাক্ষেত্রেও খাদ্য সমস্যা সমাধানে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স-এর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো। **5.** বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে জীববিজ্ঞান-এর সম্পর্ক আলোচনা করো। **6.** জীববিজ্ঞান-এর বিভিন্ন শাখাগুলির নাম লেখো এবং যে-কোনো পাঁচটি শাখার সংজ্ঞা লেখো। **7.** (a) জীবন কী? (b) বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করো। **8.** (a) সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য কী কী? (b) উদাহরণসহ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। **9.** (a) জীব ও জড় বলিতে কী বোঝো ? (b) জীব ও জড়ের পার্থক্য নির্দেশ করো। **10.** (a) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায়? **11.** (a) চরক কে ছিলেন? (b) চরকের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। **12.** (a) সুশ্রুতের জীবনী ও তাঁর অবদানের বিবরণ দাও। **13.** অ্যারিস্টটলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর অবদানের বিবরণ দাও। **14.** (a) চার্লস রবার্ট ডারউইন কেন বিখ্যাত? (b) তার মতবাদের মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করো। **15.** এই সহস্রাব্দে জীবন বিজ্ঞানের গুরুত্বগুলি লেখো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer-type questions) :

1. জীবন বিজ্ঞান-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করো। জীব ও জড় বলতে কী বোঝো ? **2.** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যে-কোনো দুটির ওপর জীবনবিজ্ঞানের অবদান অর্থাৎ প্রয়োগ ও গুরুত্ব উল্লেখ করো—(i) পরিবেশ সংরক্ষণ, (ii) মানব সুপ্রজনন বিদ্যায়, (iii) সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, (iv) মহাকাশ গবেষণায়, (v) শিল্পোদ্যোগে, (vi) কীটপতঙ্গ দমনে। **3.** জীবন কাকে বলে? জীবনের লক্ষণ কী ? **4.** সজীব বস্তুর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নাম লেখো। **5.** জড় ও জীব কাকে বলে? তিনটি করে উদাহরণ দাও। **6.** জীবন বিজ্ঞানের প্রধান পরিধি সম্বন্ধে কী জানো? **7.** উদ্ভিদ ও প্রাণীর তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পার্থক্য দেখাও। **8.** সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য—প্রোটোপ্লাজম এবং চলন ও গমন সম্বন্ধে কী জানো? **9.** বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত রক্ষায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা কীরূপ? **10.** ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা (Applied Botany) ও ফলিত প্রাণীবিদ্যার (Applied Zoology) বিভাগগুলির নাম করো। **11.** চিকিৎসাক্ষেত্রে ও খাদ্য-সমস্যা সমাধানে জীবন বিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা করো। **12.** চরক ও সুশ্রুতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। **13.** অ্যারিস্টটল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর লেখা একটি বই-এর নাম লেখো। তার দুটি অবদান উল্লেখ করো। **14.** চার্লস ডারউইন কোন্ জাহাজে করে পরিভ্রমণ করেছিলেন? তিনি কোথায় গিয়েছিলেন এবং কী কী লক্ষ করেন?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer-type questions) :

1. জীবনের ব্যাখ্যায় প্রথম প্রয়াসী হন কে? **2.** কোন্ শব্দ থেকে 'বায়োলজি' কথাটির উৎপত্তি? **3.** সর্বপ্রথম বায়োলজি শব্দটি কে ব্যবহার করেন এবং আনুমানিক কত খ্রিস্টাব্দ থেকে? **4.** উদ্ভিদবিদ্যার (Botany) নামকরণ কোন্ শব্দ থেকে হয়েছে? **5.** এমব্রায়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা বলতে কী বোঝো? **6.** জেনেটিকস শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? **7.** মর্ফোলজি (Morphology) কথাটির অর্থ কী ? **8.** ইভলিউশন (Evolution) কোন্ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে? **9.** প্যাথোলজি (Pathology) বলতে কী বোঝো ? **10.** সজীব ও নির্জীব বস্তুর কয়েকটি উদাহরণ দাও। **11.** 'প্রোটোপ্লাজম' কথার অর্থ কী? **12.** উত্তেজিতা ও উদ্দীপক বলতে কী বোঝো ? **13.** বিপাকের উদ্দেশ্য কী? **14.** এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না এমন দুটি প্রাণীর নাম করো। **15.** শাখা-প্রশাখাবিহীন দুটি উদ্ভিদের নাম করো। **16.** চরকসংহিতা কী? **17.** রিনোপ্লাস্টি কাকে বলে? **18.** লাইসিয়াম কী? **19.** ডারউইন কোন্ জাহাজে প্রকৃতিবিদ নিযুক্ত হয়েছিলেন? **20.** ডারউইনের প্রকাশিত বিখ্যাত পুস্তকের নাম কী ?

D. টীকা লেখো (Write notes on) :

(i) জীবের বৈশিষ্ট্য (ii) চরকের অবদান (iii) অ্যারিস্টটল (iv) কলাপালনের গুরুত্ব (v) পরিব্যাপ্তির প্রয়োগ ।

জীবনের একক
[UNIT OF LIFE]

◎ 2.1. যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার কৌশল (Tools and Techniques) ◎

➧ **ভূমিকা (Introduction) :** কোনো অজৈব ও জৈব বস্তুর বিস্তারিত গঠন এবং কোশীয় উপাদানের গঠন খালিচোখে দেখা যায় না। লেন্সের সাহায্যে অথবা লেন্স দিয়ে তৈরি বিশেষ যন্ত্র অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সব বস্তুর ও কোশের সাংগঠনিক চিত্র এবং অজৈব বস্তু ও জৈব বস্তুর প্রধানত কোশের বিভিন্ন উপাদানগুলির আকার, আকৃতি, গঠন ইত্যাদি বিশদভাবে জানা সম্ভব। সুতরাং কোশ জীববিদ্যার পঠন পাঠন ও গবেষণায় **অণুবীক্ষণ যন্ত্রের** ব্যবহার ও গুরুত্ব অপরিসীম।

• অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) •

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition) :** যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর বিবর্ধিত দৃশ্য দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Gr. *Mikros*—ক্ষুদ্র; *skopeein*— দেখা) বলে।

◘ 2. **অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of microscope) :** অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত আলোকরশ্মির প্রকৃতি অনুযায়ী দুই প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র গঠিত হয়, যেমন—আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

▲ I. আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Light Microscope) ▲

❖ (a) **সংজ্ঞা**—**যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলোকরশ্মি, যেমন—সূর্যালোক, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদির সাহায্যে বস্তু আলোকিত করে একটি বা দুটি লেন্সের সাহায্যে বস্তুর বিবর্ধিত চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।**

(b) **প্রকারভেদ**—আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রধানত দুই প্রকারের, যেমন—সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

◆ 1. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple Microscope) :

যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শুধুমাত্র একটি লেন্সের সাহায্যে বস্তুর বিবর্ধিত দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।
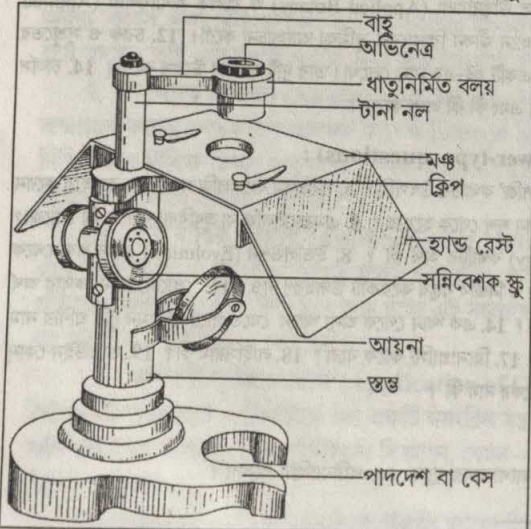
চিত্র 2.1 : সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের এই লেন্সটিকে অভিনেত্র (Eye piece) **বলে।** বিজ্ঞানী লিউয়েনহক (Leeuwenhoek) সর্বপ্রথম সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন।

● **সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ণনা (Description of Simple Microscope)** — সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠনপ্রণালী নীচে আলোচনা করা হল—

1. পাদদেশ (Foot)— এই অংশটি সবচেয়ে নীচের অংশ যার উপরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অন্যান্য অংশগুলি অবস্থান করে। পাদদেশের সামনের দিকটি দ্বিবিভক্ত। **2. স্তম্ভ** (Pillar)—এই অংশটি পাদদেশের সঙ্গে উল্লম্ব (vertical) ভাবে অবস্থান করে এবং এর সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অন্য সব অংশ যুক্ত হয়। **3. উল্লম্ববাহু** (Vertical limb)— এটি একটি ছোটো নলাকার রডের মতো যা স্তম্ভের উপর উল্লম্বভাবে যুক্ত থাকে এবং সন্নিবেশক স্ক্রু (Adjustment screw)-এর সাহায্যে উল্লম্ববাহুকে ওঠানো-নামানো যায়। **4. ভাঁজকরা বাহু** (Folded arm)— উল্লম্ববাহুর সঙ্গে যুক্ত এটি একটি অনুভূমিক বাহু যার মুক্ত প্রান্তে একটি লেন্স

যুক্ত করা থাকে। **5. মঞ্চ** (Stage)—স্তম্ভের উপরের দিকে যুক্ত এটি একটি চতুর্ভুজাকৃতি কাচের প্লেট যার উপরে নমুনা বা বস্তু রেখে পর্যবেক্ষণ করা হয়। মঞ্চের উপরে দুটি ক্লিপ থাকে। **6. আয়না বা প্রতিফলক** (Mirror or reflector)—এটি একটি অবতল লেন্স যা স্তম্ভের নীচের দিকে সংযুক্ত থাকে। প্রতিফলক আয়নার সাহায্যে পরীক্ষার বস্তুকে আলোকিত করা হয়। **7. লেন্স** (Lens)—একটিমাত্র লেন্স ভাঁজ করা বাহুর মুক্ত প্রান্তে অবস্থান করে। এই লেন্সের প্রবর্ধক শক্তি 5×, 10× অথবা 20× হতে পারে; অর্থাৎ এই লেন্সের সাহায্যে যথাক্রমে 5 গুণ, 10 গুণ অথবা 20 গুণ বিবর্ধিত বস্তুর চিত্র দেখা যায়।

◆ 2. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Microscope) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দুটি ভিন্ন লেন্স ব্যবহৃত হয় এবং দুটি লেন্স যুগ্মভাবে বস্তুর বিবর্ধিত চিত্র গঠন করে তাকে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।**

সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সীমিত বিবর্ধন ক্ষমতা যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরীভূত করা হয়। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর বিস্তারিত গঠন জানা যায়।

চিত্র 2.2. ঃ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

● **একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা (Description of different parts of a Compound Microscope)** ঃ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—যান্ত্রিক অংশ ও দৃষ্টি-সম্বন্ধীয় অংশ।

(a) **যান্ত্রিক অংশ (Mechanical parts)** ঃ একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যান্ত্রিক অংশগুলি নিম্নরূপ— **1. পাদদেশ** (Foot)— এটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সবচেয়ে নীচের অংশ যার উপরে অন্য সব অংশ অবস্থান করে। পাদদেশের সামনের দিকটি দ্বিবিভক্ত। **2. স্তম্ভ** (Pillar)— এই অংশটি পাদদেশের সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত থাকে। স্তম্ভের বিভিন্ন অংশে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নানা অংশ যুক্ত থাকে। **3. বাহু** (Arm)— এটি সামান্য বাঁকা একটি হাতল বিশেষ যা স্তম্ভের সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত থাকে। **4. মঞ্চ** (Stage)— এই অংশটি চ্যাপটা, চতুর্ভুজাকৃতি যার মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি গিয়ে বস্তুকে আলোকিত করে। মঞ্চের উপরে দুটি ক্লিপ থাকে। **5. ডায়াফ্রাম** (Diaphragm)— মঞ্চের নীচের তলে এটি সংযুক্ত থাকে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। **6. দেহ ও দেহনল** (Body and body tube)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের এটি মূল অংশ যার উপরের অংশে **অভিনেত্র লেন্স** (Eye piece lens) এবং নীচের অংশে **অভিলক্ষ লেন্স** (objective lens) যুক্ত থাকে। **7. নোজ পিস্** (Nose piece)—এটি চাকতির মতো, ঘূর্ণায়মান অংশ যার সঙ্গে অভিনেত্র লেন্স যুক্ত থাকে। **8. স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু** (Coarse adjustment screw)—দেহনলের সঙ্গে যুক্ত এই স্ক্রুর ঘূর্ণনের ফলে দেহনলটি ওঠানামা করে এবং বস্তুটিকে ফোকাস করা হয়। **9. সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু** (Fine adjustment screw)—এই স্ক্রুর ঘূর্ণনের ফলে সূক্ষ্ম মাপের ফোকাস সম্ভব হয়।
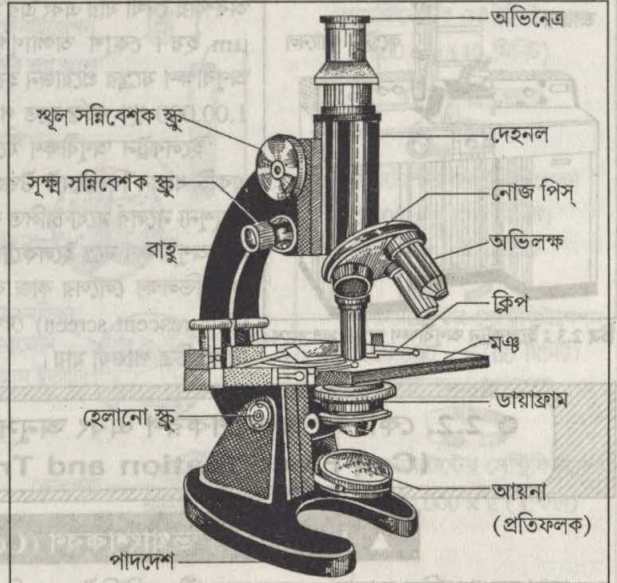
(b) **দৃষ্টি সম্বন্ধীয় অংশ (Optical parts)** ঃ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টি সম্বন্ধীয় অংশগুলি নিম্নরূপ—

1. **প্রতিফলক আয়না** (Reflecting mirror)—একটি সম-অবতল আয়না পাদদেশের উপরে যুক্ত থাকে যার সাহায্যে আলো প্রতিফলিত হয়ে বস্তুকে আলোকিত করে। 2. **অভিনেত্র** (Eye piece)—দেহনলের উপরে এটি বসানো থাকে এবং এই লেন্সের উপরে চোখ রেখে বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হয়। অভিনেত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা 6×, 10× বা 15× হতে পারে। 3. **অভিলক্ষ্য লেন্স** (Objective lens)—এই লেন্সটি দেহনলের নীচে নোজ পিসের সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। বিভিন্ন বিবর্ধন শক্তির অভিলক্ষ্য লেন্স ব্যবহার করা হয়, যেমন—10×, 40×, 60× ও 100×।

▲ II. ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope or EM) ▲

❖ (a) **সংজ্ঞা**—**যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে বস্তু আলোকিত করে নমুনা বস্তুর অধিক বিবর্ধিত দৃশ্য ফ্লুয়োরেসেন্স পর্দায় বা ফটোতে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।**

চিত্র 2.3 : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মূল অংশ।

সর্বপ্রথম **এম নল ও ই রুশকা** (M. Knoll and E. Ruska) 1931 খ্রিস্টাব্দে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

(b) **ব্যাখ্যা**—আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুকে সর্বোচ্চ 1500 গুণ বিবর্ধিত অবস্থায় দেখা যায় এবং এর সর্বোচ্চ পৃথকীকরণ ক্ষমতা (Resolving power) 0·3 μm হয়। কোশ অঙ্গাণুগুলি আরও বিশদভাবে দেখতে হলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা 20,000 থেকে 1,00,000 গুণ পর্যন্ত হতে পারে এবং এর পৃথকীকরণ ক্ষমতা 0·0001 μm হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রন রশ্মি দিয়ে বস্তুকে আলোকিত করা হয়। একটি ধাতব ফিলামেন্ট উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন রশ্মি সৃষ্টি হয়। এই ইলেকট্রন রশ্মি বায়ুশূন্য নলের মধ্যে চালিত করে বিশেষভাবে প্রস্তুত বস্তুর উপর আপতিত করা হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে **ইলেকট্রোম্যাগনেট বা তড়িৎচুম্বক** (Electromagnet) অভিনেত্র ও অভিলক্ষ্য লেন্সের কাজ করে। এখানে বস্তুর বিবর্ধিত চিত্র ফ্লুয়োরেসেন্ট পর্দায় (Fluorescent screen) দেখা যায় এবং সেখান থেকে ছবি (photo) তুলে বস্তুর বিশদ চিত্র পাওয়া যায়।

✪ 2.2. কোশের ভগ্নাংশকরণ এবং অনুসরণ প্রক্রিয়াকরণের কৌশল ✪ (Cell Fractionation and Tracer Techniques)

▲ A. কোশের ভগ্নাংশকরণ (Cell fractionation) ▲

কোশ অঙ্গাণুগুলির আকার ও ঘনত্ব অনুযায়ী সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথক করে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। বিজ্ঞানী **ক্লড, ডুভে** ও তাঁদের **সহকর্মীরা** (1950) প্রথম এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে পদ্ধতিতে কোশ অঙ্গাণুগুলি তাদের জড় ধর্ম, যেমন—আকার, ঘনত্ব ইত্যাদি অনুযায়ী বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা হয় সেই পদ্ধতিকে কোশ ভগ্নাংশকরণ (Cell fractionation) বলে।**

◘ (b) **পদ্ধতি (Method) :** যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোশ ভগ্নাংশকরণ করা হয় তাকে **ডিফারেন্সিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন** (Differential centrifugation) বলে।

কোশ ভগ্নাংশকরণ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে ঘটে : হোমোজেনাইজেশন (Homogenization) এবং সেন্ট্রিফিউগেশন (Centrifugation)। এই পদ্ধতিগুলি পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা হল।

1. **হোমোজেনাইজেশন (Homogenization) : যে পদ্ধতিতে কোনো অঙ্গের খণ্ডাংশে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে টুকরো টুকরো করে ঘন কোশীয় মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়, তাকে হোমোজেনাইজেশন বলে।** হোমোজিনাইজ করা কলাকে হোমোজিনেট (Homogenate) বলে, যার মধ্যে কোশ এবং কোশের অঙ্গাণুগুলি মিশ্র অবস্থায় থাকে। এইরূপ হোমোজিনেটকে পরবর্তী কয়েকটি ধাপে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়।

2. **সেন্ট্রিফিউগেশন (Centrifugation) : যে পদ্ধতিতে জৈব নমুনা নির্দিষ্ট গতিতে ঘূর্ণনের সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো কোশ উপাদান অধঃক্ষিপ্ত করা হয় তাকে সেন্ট্রিফিউগেশন বলে।** প্রথমে কম অভিকর্ষজ গতিতে এবং পরে বেশি অভিকর্ষজ গতিতে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। এর ফলে প্রথমে বড়ো কোশ অঙ্গাণু এবং পরে ছোটো আকারের কোশ অঙ্গাণু অধঃক্ষিপ্ত হয়। ঘূর্ণনের বিভিন্ন ধাপগুলি নিম্নরূপ—

(i) **প্রথম ধাপের ঘূর্ণন**—হোমোজিনেটকে প্রথমে 800 × g* (অর্থাৎ 800 গুণ অভিকর্ষজ বলে) গতিতে 10 মিনিট ধরে

* g = gravity (অভিকর্ষজ বল)

ঘূর্ণন করা হয়। এর ফলে **নিউক্লিয়াস** অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং অন্য সব কোশ অঙ্গাণু অধঃক্ষেপের উপরের তরলে অর্থাৎ সুপারন্যাটান্টে (Supernatant) থাকে।

(ii) **দ্বিতীয় ধাপের ঘূর্ণন**—প্রথম ধাপের ঘূর্ণনে পাওয়া সুপারন্যাটান্টকে নিয়ে 15,000 × g গতিতে 10 মিনিট ঘূর্ণন করা হয়। এর ফলে প্রাপ্ত অধঃক্ষেপে **মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম ও পারাক্সিজোম** থাকে এবং সুপারন্যাটান্ট পরবর্তী পর্য্যায়ের জন্য গৃহীত হয়।

(iii) **তৃতীয় ধাপের ঘূর্ণন**—দ্বিতীয় ধাপের ঘূর্ণনে প্রাপ্ত সুপারন্যা টান্টকে 100,000 × g গতিতে 60 মিনিট ঘূর্ণন করা হয়। এর ফলে প্রাপ্ত অধঃক্ষেপে **কোশ পর্দা ও এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা** থাকে। এই ঘূর্ণনে প্রাপ্ত সুপারন্যাটান্ট পরবর্তী পর্যায়ের কাজে লাগানো হয়।

(iv) **চতুর্থ ধাপের ঘূর্ণন**—তৃতীয় ঘূর্ণনের সুপারন্যাটান্টকে 200,000 × g গতিতে তিন ঘণ্টা (180 মিনিট) ঘূর্ণন করা হয়। এর ফলে প্রাপ্ত অক্ষঃক্ষেপে রাইবোজোম থাকে এবং সুপারন্যাটান্টে সাইটোসল বা সাইটোপ্লাজম থাকে।

এইভাবে বিভিন্ন কোশ অঙ্গাণু তাদের আকার অনুযায়ী **প্রভেদক ঘূর্ণন** (Differential centrifugation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথক করা হয়। সমগ্র কৌশলটি চিত্রের (চিত্র 2.4) সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।
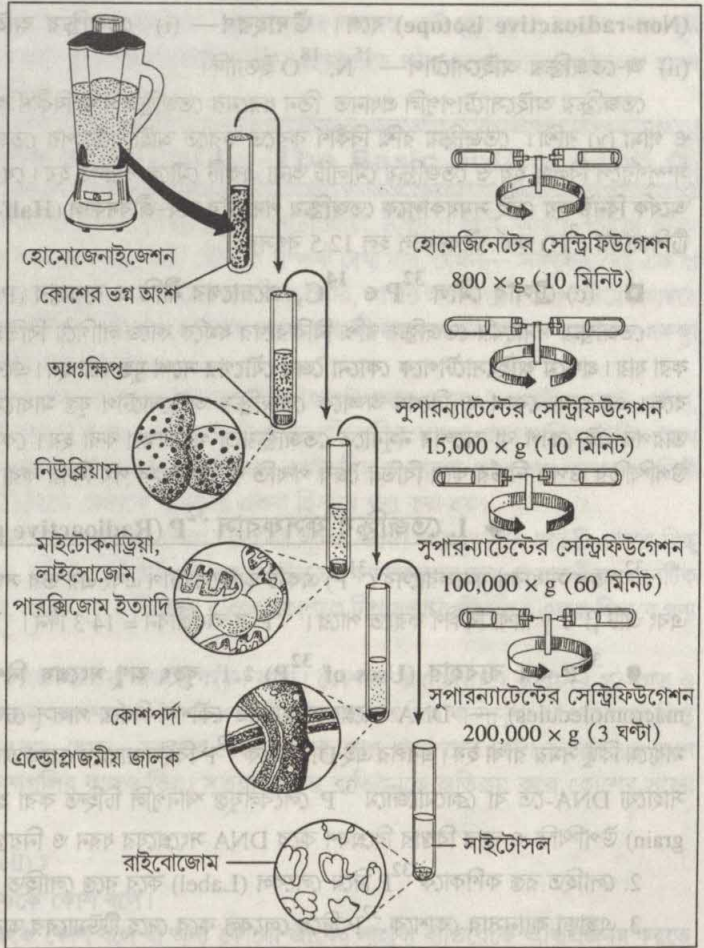
চিত্র 2.4 : কোশের বিভিন্ন কোশঅঙ্গাণু পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া।

▲ B. ট্রেসার কৌশল (Tracer technique) ▲

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** যে কৌশলের মাধ্যমে কোশের মধ্যে কোনো অণু-পরমাণুর অবস্থান ও পরিমাণ জানা যায় এবং এই অণুর অবস্থান কখন, কীভাবে ও কোথায় পরিবর্তিত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় সেই বিশেষ কৌশলকে ট্রেসার কৌশল (**Tracer technique**) বা অণুসরণ কৌশল বলে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Radioactive isotope) ব্যবহার করে **পালস্ চেজ লেবেলিং (Pulse chase Labelling)** বা **অটোরেডিওগ্রাফি** (Autoradiography) পদ্ধতিকে ট্রেসার কৌশলে প্রয়োগ করা হয়। যে তেজস্ক্রিয় মৌল ট্রেসার কৌশলে ব্যবহার করা হয় তাকে **ট্রেসার মৌল** (Tracer element) বলে।

◘ (b) **তেজস্ক্রিয় ও অ-তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Radioactive and non-radioactive isotopes) :** একই আণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট ভিন্ন আণবিক ভর যুক্ত মৌলকে আইসোটোপ বলে।

যে আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive ray) বিকীর্ণ করে তাকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Radioactive isotope) বলে এবং যে আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ করতে পারে না তাকে অ-তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Non-radioactive isotope) বলে। **উদাহরণ—** (i) **তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ** — ^{14}C, ^{3}H, ^{32}P, ^{35}S ইত্যাদি, (ii) **অ-তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ**— ^{15}N, ^{18}O ইত্যাদি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি প্রধানত তিন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ করে, যেমন— **আলফা** (α) রশ্মি, **বিটা** (β) রশ্মি ও **গামা** (γ) রশ্মি। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ করতে করতে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পায় এবং একসময় তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় ও তেজস্ক্রিয় মৌলটি অন্য একটি মৌলে পরিণত হয়। **যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হয় সেই সময়কালকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ-জীবনকাল (Half-life) বলে।** যেমন—তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন বা ট্রিশিয়ামের (^{3}H) অর্ধ জীবনকাল হল 12·5 বৎসর।

■ (c) **ট্রেসার মৌল ^{32}P ও ^{14}C, প্রয়োগের নীতি ও ব্যবহার** (Principle and use of ^{32}P and ^{14}C) ঃ

তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জৈবিক পদ্ধতির প্রক্রিয়াজনিত তথ্য আবিষ্কার করা যায়। **প্রথমে আইসোটোপকে কোনো জৈব যৌগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।** একে আইসোটোপ লেবেলিং (Isotope labelling) বলে। এর জন্য কোশ বা বিশেষ অঙ্গকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভৌত-রাসায়নিক অবস্থায় রাখা হয়। তারপর এই কোশ বা অঙ্গের নমুনাতে তেজস্ক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোশ বা কলার বিশেষ স্থানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন জৈব পদ্ধতি বা বিপাকের পথ নির্ণয় করা হয়।

◆ I. তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ^{32}P (Radioactive phosphorus ^{32}P) ◆

^{32}P হল সাধারণ ফসফরাসের (^{31}P) একটি আইসোটোপ এবং এর ভর সংখ্যা = 32। ^{32}P একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, এবং এটি β ও γ রশ্মি বিকীর্ণ করতে পারে। ^{32}P-র অর্ধজীবন = 14·3 দিন।

● **^{32}P-এর ব্যবহার (Uses of ^{32}P) ঃ 1. বৃহৎ অণু সংশ্লেষ নির্ণয়ে** (In determination of synthesis of macromolecules) — DNA সংশ্লেষের হার ও কৌশল নির্ণয়ে পালস্-চেজ পরীক্ষায় DNA বা ক্রোমোজোমকে ^{32}P যুক্ত মাধ্যমে কিছু সময় রাখা হয়। এরপর এই DNA-কে ^{32}P বিহীন মাধ্যমে রেখে অটোরেডিওগ্রাফি (Autoradiography) পরীক্ষার সাহায্যে DNA-তে বা ক্রোমোজোমে ^{32}P লেবেলযুক্ত স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়। অটোরেডিওগ্রামে সিলভার দানার (Silver grain) উপস্থিতি ও তার বিস্তার বিশ্লেষণ করে DNA সংশ্লেষের ধরন ও নিয়ন্ত্রণ জানা যায়।

2. লোহিত রক্ত কণিকাকে ^{32}P দিয়ে লেবেল (Label) করে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সামগ্রিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।
3. এছাড়া ক্যানসার কোশকে ^{32}P দিয়ে লেবেল করে দেহে টিউমারের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

◆ II. ^{14}C বা তেজস্ক্রিয় কার্বন (Radioactive carbon ^{14}C) ◆

স্বাভাবিক কার্বন হল ^{12}C। এই কার্বনের আইসোটোপ বা ^{14}C একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং এটি শুধুমাত্র β রশ্মি বিকীর্ণ করতে পারে। স্বাভাবিক কার্বনের ভরসংখ্যা = 12 এবং তেজস্ক্রিয় কার্বনের (^{14}C) ভর সংখ্যা =14। ^{14}C-এর অর্ধজীবনকাল = 5570 বৎসর। জলে, বাতাসে এবং জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণ (>0·1%) কার্বন ^{14}C পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর উপর কসমিক রশ্মির ক্রিয়ার ফলে প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ^{14}C উৎপাদিত হয়। এই ^{14}C খুব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। সজীব দেহ প্রকৃতি থেকে কার্বনের দুটি আইসোটোপ ^{12}C ও ^{14}C গ্রহণ করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে জীবদেহ ^{14}C গ্রহণ করতে পারে না, একটি জীবদেহে সারাজীবন ধরে যত পরিমাণ ^{14}C সঞ্চিত হয়েছে তা মৃতদেহ বা মৃতদেহাংশ থেকে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হতে থাকে। জীবদেহে যে পরিমাণ ^{14}C সঞ্চিত হয় তার সাহায্যে জীবদেহের বয়স নির্ণয় করা হয়।

● **^{14}C-এর ব্যবহার (Use of ^{14}C) ঃ** বহুদিন পূর্বে মৃত জীবদেহে এবং বর্তমানে উপস্থিত জীবদেহে ^{14}C-এর তেজস্ক্রিয়তা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মৃত জীবদেহ বা দেহাংশের বয়স নির্ণয় করা যায়। ^{14}C-এর অর্ধ-জীবনকাল হল 5570 বৎসর। এই নীতি প্রয়োগ করে জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা হয় এবং এই পদ্ধতিকে **রেডিয়োকার্বন ডেটিং** (Radiocarbon dating) বলে।

^{14}C-এর অন্যান্য ব্যবহার (Other uses of ^{14}C) : (i) শৈবালের সালোকসংশ্লেষের সময় $^{14}CO_2$ ব্যবহার করে 3-ফসফোগ্লিসারেটে ^{14}C পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন 3-ফসফোগ্লিসারেট গঠন করে। (ii) গ্লুকোজ অণুর একটি কার্বনকে (C_1), ^{14}C দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে ক্রেবস চক্রের সাহায্যে সেই গ্লুকোজের দহনের ফলে সৃষ্ট CO_2-তে ^{14}C পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয়, গ্লুকোজের কার্বনই কার্বন ডাইঅক্সাইড গঠন করে। (iii) একইভাবে প্রমাণ করা যায়, ^{14}C ব্যবহার করে গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সৃষ্টি হয়।

2.3. কোশ—জীবনের মৌলিক একক (CELL — The Basic unit of Life)

জীবজগৎ বৈচিত্র্যময় এবং প্রায় 40 লক্ষ প্রজাতির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণী সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের গঠন যতই জটিল হোক না কেন সকলের মধ্যে একটি মৌলিক সম্পর্ক দেখা যায়, যেমন— সকলের দেহ এক বা একাধিক কোশ দিয়ে তৈরি। উদাহরণ—প্রোটোজোয়ার দেহ একটিমাত্র কোশ দিয়ে তৈরি, আবার অনেকগুলি কোশ দিয়ে ক্রমান্বয়ে কলা, অঙ্গ, তন্ত্র এবং সবশেষে একটি বহুকোশী জীবের সৃষ্টি হয়। **সুতরাং কোশ হল জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক। যেমন কোনো পদার্থের রাসায়নিক গঠনের একক হল পরমাণু।**

কোশের জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কোশের মধ্যে বিভিন্ন জৈব উপাদান যেমন— প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি এবং কিছু অজৈব উপাদানও আছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি শক্তির আদান প্রদানজনিত বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া বা বিপাক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং সমস্ত কোশেই এই সব প্রক্রিয়ার একটা মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং প্রতিটি কোশের জৈব রাসায়নিক কাঠামোর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোশকে জীবনের একক হিসাবে গণ্য করা হয়।

বিভিন্ন কোশের আকার, আকৃতি, কাজ ভিন্ন হলেও প্রত্যেক কোশ জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে; অর্থাৎ প্রতিটি কোশে কিছু জীবন-প্রক্রিয়া যেমন—উত্তেজিতা, বিপাক, জনন, বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটে। জীবনের এইসব লক্ষণ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জেনেটিক কোড় একই অবস্থায় প্রতিটি কোশে পাওয়া যায়, এদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে কোশকে নিশ্চয়ভাবে জীবনের একক হিসাবে গণ্য করা যায়।

জীবনের প্রাথমিক একক হিসাবে কোশের সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কোশকে সাধারণভাবে জীবনের গঠনগত ও কার্যগত একক বলা হয়। অর্থাৎ সমস্ত জীবের সমস্ত কোশের একটা গঠনগত মিল ও কার্যগত মিল বা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গের কোশগুলির **আকৃতি ও গঠন** ভিন্ন হয়; যেমন—যকৃতের কোশ, বৃক্কের কোশ, শুক্রাশয়ের কোশ, ডিম্বাশয়ের কোশ ভিন্ন আকার-আকৃতির হয়; আবার এইসব কোশগুলির কাজও ভিন্ন। সুতরাং সমস্ত ব্যতিক্রমকে অতিক্রম করে কোশের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে—

❖ **কোশের সংজ্ঞা (Definition of Cell) :**

1. **জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একককে কোশ বলে।**
2. **জীবনের ও জীবদেহের ক্ষুদ্রতম একককে কোশ বলে যা অন্য কোনো জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মপ্রজনন করতে সক্ষম।**
3. **আবরণবেষ্টিত নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাজমকে কোশ বলে।**

2.4. কোশের আবিষ্কার (Discovery of Cell)

বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোশ এবং কোশ-অঙ্গাণু আবিষ্কারের গবেষণায় অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং পরিশেষে কোশবাদ তত্ত্ব নিয়ে অনেক মতবাদ প্রকাশ করেছেন। এই পর্যালোচনায় প্রধান কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হল।

কোশ আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief history of discovery of cell)

1. **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384 — 322 B. C.) : জীব বৈচিত্র্যের মধ্যে একক গঠনের ধারণা প্রকাশ করেন।
2. **লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি** (Leonardo de Vinci, 1452—1519) : প্রথমে বস্তু পর্যবেক্ষণের জন্য লেন্স ব্যবহার করেন।
3. **ফ্রান্সিস্ জানসেন ও জ্যাকেরিয়াস জানসেন** (Francis Janssen and Zacharias Janssen, 1590) : চশমা বিক্রেতা জানসেন ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম দুটি ভিন্ন লেন্সের সাহায্যে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন।

4. **গ্যালিলিও গ্যালিলি** (Galileo Galilei, 1613) ঃ গ্যালিলিও গ্যালিলি ক্ষুদ্র প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেন।
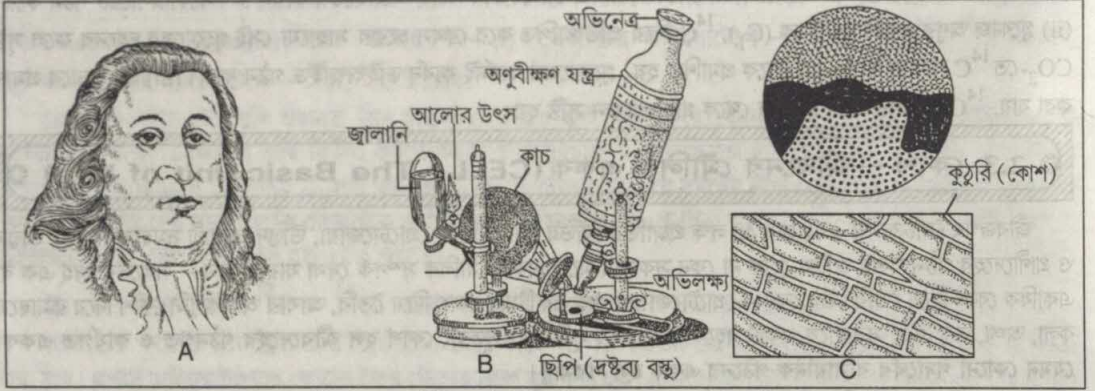
চিত্র 2.5 ঃ A-রবার্ট হুক, B-রবার্ট হুকের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং C-ছিপির কুঠুরি ও কোশপ্রাচীর।

5. **রবার্ট হুক** (Robert Hooke, 1665) ঃ রবার্ট হুক নিজের তৈরি উন্নত যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের ছিপির (cork) পাতলা ছেদ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এই ছিপির ভিতরে মৌচাকের মতো কতকগুলি কুঠুরি দেখতে পান এবং এই কুঠুরিগুলির নাম দেন কোশ (Cell, *L. Cella* = ফাঁপা খোপ)। তাঁর ধারণা ছিল কোশগুলির ভিতরে কিছুই থাকে না এবং কোশের প্রাচীরই একমাত্র সজীব বস্তু।

চিত্র 2.6 ঃ লিউয়েনহক

6. **লিউয়েনহক** (Leeuwenhoek, 1650-1700) ঃ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শুক্রাণু, রক্তকোশ এবং কোশের ভিতরে নিউক্লিয়াস প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেন।
7. **রবার্ট ব্রাউন** (Robert Brown, 1831) ঃ রবার্ট ব্রাউন উদ্ভিদ কোশে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন।
8. **ওয়াগনার** (Wagner, 1832) ঃ ওয়াগনার নিউক্লিয়াসের ভিতরে নিউক্লিওলাস আবিষ্কার করেন।
9. **দুজার্দিন** (Dujardin, 1835) ঃ দুজার্দিন কোশের মধ্যে জেলির মতো তরল পদার্থ দেখেন ও তার নাম দেন সারকোড় (sarcode)।
10. **পারকিঞ্জি** (Purkinje, 1839) ঃ পারকিঞ্জি কোশের ভিতরে অর্ধতরল পদার্থের নাম দেন প্রোটোপ্লাজম।
11. **স্লেইডেন** (Schleiden, 1838) ঃ উদ্ভিদবিদ স্লেইডেন উদ্ভিদদেহের একক হিসাবে কোশের কথা বলেন।
12. **সোয়ান** (Schwann, 1839) ঃ প্রাণীবিদ সোয়ান প্রাণীদেহের একককে কোশ বলে আখ্যা দেন।
13. **হেকেল** (Haeckel, 1866) ঃ হেকেল প্রমাণ করেন যে নিউক্লিয়াস বংশগতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং এক বংশ থেকে পরের বংশে সঞ্চারিত করে।
14. **ফ্লেমিং** (Flemming, 1880) ঃ ফ্লেমিং মাইটোসিসের পদ্ধতি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে মাইটোসিস কোশ বিভাজনের মাধ্যমে কোশের পরম্পরা বজায় থাকে।
15. **ওয়াল্ডেয়ার** (Waldeyer, 1890) ঃ ওয়াল্ডেয়ার ক্রোমোজোম আবিষ্কার ও নামকরণ করেন।

✪ 2.5. কোশবাদ (Cell Theory) ✪

কোশের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। জীবদেহের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে কোশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কোশের অভ্যন্তরীণ বস্তুকে প্রোটোপ্লাজম বলে এবং প্রোটোপ্লাজমের চারিদিকে একটি কোশপর্দা থাকে। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম নিয়ে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হয়। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন কোশ-অঙ্গাণু ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। কোশের আকার, আকৃতি,

গঠন বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্ন কোশের কাজ নানা প্রকারের। এইসব ভিন্নতা সত্ত্বেও সমস্ত কোশে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই কোশ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বা মতবাদ দেওয়া হয় তাকেই **কোশবাদ** (Cell theory) বলে।

চিত্র 2.7 : শ্লেইডেন   চিত্র 2.8 : সোয়ান

শ্লেইডেন ও সোয়ান (Schleiden and Schwann, 1839) সর্বপ্রথম কোশ তত্ত্ব বা কোশবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁদের বর্ণিত কোশবাদ হল—

1. নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং পর্দা দিয়ে আবৃত এক খণ্ড প্রোটোপ্লাজমকে কোশ বলে।

2. নিউক্লিয়াসকে আবৃত করা প্রোটোপ্লাজমের অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা কোশের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় এবং জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে কোশবাদের আধুনিক রূপ দেন। কোশবাদের এই ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

◻ আধুনিক কোশতত্ত্ববাদ :

(a) আধুনিক কোশবাদের মূল বক্তব্য (Main idea of Modern cell theory) :

1. সমস্ত জীবের আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় একককে কোশ বলে।

2. কোনো জীবের বিশেষ ধর্ম ওই জীবের বিশেষ কোশের উপর নির্ভর করে।

3. মাতৃকোশ থেকে অপত্যকোশ সৃষ্টি হয় এবং কোশের পরম্পরা ও ধারাবাহিকতা জিন দিয়ে পরিচালিত হয়।

4. জীবনের ক্ষুদ্রতম একক হল কোশ।

5. সমস্ত জীব এক বা একাধিক কোশ দিয়ে গঠিত হয় এবং একটি কোশ থেকে সৃষ্টি হয়।

(b) কোশবাদের ব্যতিক্রম (Exceptions to cell theory) : 1. প্রোটোবাইওটা (Protobiota) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাইরাস (Virus), ভাইরয়েড (Viroids) ও প্রয়োন (Prions)-এর দেহে প্রকৃত প্রোটোপ্লাজম থাকে না। 2. ভাউকেরিয়া (Vaucheria) জাতীয় শৈবাল, রাইজোপাস ও মিউকর জাতীয় ছত্রাকের দেহকোশ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত।

● একটি আদর্শ (ইউক্যারিওটিক) প্রাণীকোশ ও তার বিভিন্ন উপাদান (A typical Eukaryotic Animal cell and its different components) :

চিত্র 2.9 : একটি আদর্শ কোশের বিভিন্ন কোশ-অঙ্গাণুর সংক্ষিপ্ত চিত্র।

❖ **(a) ইউক্যারিওটিক কোশের সংজ্ঞা (Definition of Eukaryotic Cell) :** যে কোশের নিউক্লিয়াসে সুগঠিত নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লিওলাস ও ক্রোমাটিন জালক এবং সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বডি, এন্ডোপ্লাজমীয় জালক প্রভৃতি পর্দাবৃত কোশীয় অঙ্গাণুগুলি থাকে, তাকে ইউক্যারিওটিক কোশ বলে।

(b) **বিভিন্ন কোশীয় উপাদানের নাম (Name of different cellular components)** : কোশপ্রাচীর, প্লাজমা মেমব্রেন, প্লাসটিড্, এন্ডোপ্লাজমীয় জালক, গলগি বডি, মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজোম, লাইসোজোম, নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রোজোম, মাইক্রোবডি, মাইক্রোটিবিউল, সাইটোস্কেলিটন, সিলিয়া ও ফ্লাজেলা ইত্যাদি।

2.6.A. কোশপ্রাচীর (Cell Wall)

❖ (a) **কোশপ্রাচীরের সংজ্ঞা (Definition of Cell wall)** : **উদ্ভিদকোশে কোশপর্দা বা প্লাজমাপর্দার বাইরে যে জড়, পুরু, দৃঢ়, ভেদ্য ও স্থিতিস্থাপক আবরণ থাকে তাকে কোশপ্রাচীর বলে।**

◘ (b) **কোশপ্রাচীরের গঠন (Structure of Cell wall)** : পরিণত উদ্ভিদকোশের কোশপ্রাচীর তিনটি স্তর দিয়ে গঠিত হয় :

চিত্র 2.10 : কোশপ্রাচীরের গঠন।

1. **মধ্যচ্ছদা** (Middle lamella)— দুটি কোশের প্রাথমিক কোশপ্রাচীরের মধ্যস্থলে আন্তর কোশীয় ধাত্র পদার্থ দিয়ে এটি তৈরি হয়। এখানে **পেকটিন** নির্মিত কলয়েড জাতীয় পদার্থ থাকে।
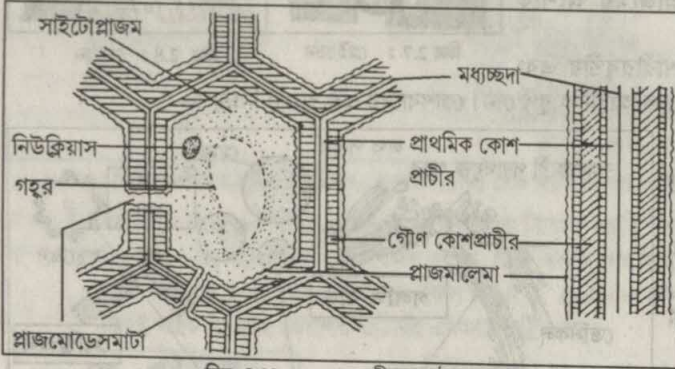
2. **প্রাথমিক কোশপ্রাচীর** (Primary Cell wall)— মধ্যচ্ছদার নীচে কোশের সব থেকে বাইরের আবরণী স্তরটি হল প্রাথমিক বা মুখ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর পাতলা, ভেদ্য ও স্থিতিস্থাপক এবং মুখ্যত সেলুলোজ নির্মিত যদিও এখানে সামান্য পরিমাণ পেকটিন, লিগনিন ও সুবেরিন থাকে। এই প্রাচীর 1- 3 μm পুরু হতে পারে। পাতার আবরণী কোশের প্রাথমিক কোশপ্রাচীরে মোম জাতীয় **কিউটিন** (Cutin wax) থাকে যা বাষ্পমোচনের হার অনেকটা কমায়।

3. **গৌণ কোশপ্রাচীর** (Secondary Cell wall)— প্রাথমিক কোশপ্রাচীরের ভিতরে এবং প্লাজমা পর্দার বাইরে পুরু, শক্ত ও ভেদ্য আবরণকে গৌণ কোশপ্রাচীর বলে। এটি 5–10 μm পুরু এবং মুখ্যত **সেলুলোজ** নির্মিত, যদিও এখানে সামান্য পরিমাণ **হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন** ইত্যাদি থাকে।

◘ (c) **কোশপ্রাচীরের পরাণু গঠন (Ultra structure of Cell wall)** :

1. কোশপ্রাচীরের প্রধান উপাদান হল **সেলুলোজ** নামে এক ধরনের পলিস্যাকারাইড যা প্রায় 3000 গ্লুকোজ অণু দিয়ে তৈরি।

2. প্রায় 100টি সেলুলোজ অণু শৃঙ্খলের আকারে এবং সমান্তরালভাবে থেকে **মাইসেলি** নামে অতিসূক্ষ্ম গুচ্ছ গঠন করে।

3. প্রায় 20টি মাইসেলি (Micelle) একত্রিত হয়ে **মাইক্রোফাইব্রিল** (Microfibril) গঠন করে এবং মাইক্রোফাইব্রিলগুলি গুচ্ছাকারে **ম্যাক্রোফাইব্রিল** (Macrofibril) গঠন করে।

● **প্লাজমোডেসমাটা (Plasmodesmata)** : কোশপ্রাচীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি উদ্ভিদকোশের মধ্যে এই ছিদ্রপথ দিয়ে সাইটোপ্লাজমীয় পদার্থ চলাচল করতে পারে। কোশপ্রাচীরে অবস্থিত এইপ্রকার সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ সেতুকে **প্লাজমোডেসমাটা** বলে। জল ও বিভিন্ন পদার্থ সংবহনে প্লাজমোডেসমাটা সহায়তা করে।
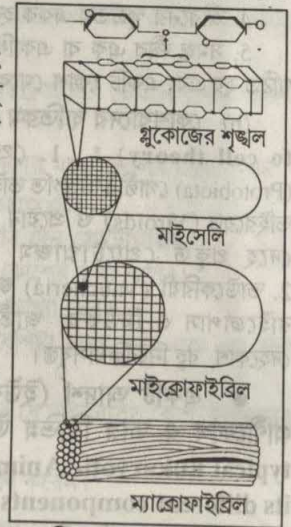
চিত্র 2.11 : কোশপ্রাচীরের পরাণু গঠনের চিত্ররূপ।

◘ (d) **কোশপ্রাচীরের কাজ (Function of Cell wall)** : 1. কোশের নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে। 2. কোশকে যান্ত্রিক শক্তি জোগায়। 3. কোশপ্রাচীরের দৃঢ়তার ফলে বাইরের আঘাত থেকে কোশকে রক্ষা করে। 4. এর ভেদ্যতা ধর্মের জন্য কোশে জল ও খনিজ পদার্থের আদান প্রদান হয়। 5. কোশপ্রাচীরের প্লাজমোডেসমাটা দুটি পাশাপাশি কোশের সংযোগ স্থাপন করে। 6. কোশ-প্রাচীরের কিউটিন ও সুবেরিনের উপস্থিতিতে বাষ্পমোচনের হার কমে এবং উদ্ভিদদেহে জল সংরক্ষিত হয়।

❂ 2.6.B. কোশপর্দা বা প্লাজমা পর্দা বা প্লাজমালেমা ❂
(Cell membrane or Plasma membrane or Plasmalemma)

❖ (a) **কোশপর্দার সংজ্ঞা (Definition of Cell membrane) ঃ স্থিতিস্থাপক, পাতলা, সজীব, নির্বাচিত ভেদ্য, ত্রিস্তরীয়-লাইপোপ্রোটিন নির্মিত যে পর্দা কোশের প্রোটোপ্লাজমকে ঢেকে রাখে তাকে কোশপর্দা বা প্লাজমাপর্দা বা প্লাজমালেমা বলে।**

◘ (b) **কোশপর্দার গঠন (Structure of Cell membrane) ঃ**

1. **কোশপর্দার আণবিক সংগঠন** (Molecular organisation of Cell membrane) ঃ (i) লোহিত রক্তকণিকার হিমোলাইসিস্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোশপর্দা পৃথক করা হয় এবং একে রেড সেল ঘোস্ট (Red cell ghost) বলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে—এই কোশপর্দাতে 52% প্রোটিন, 40% লিপিড ও 8% কার্বোহাইড্রেট থাকে। কার্বোহাইড্রেট লিপিডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে তাকে **গ্লাইকোলিপিড** (Glycolipid) বলে এবং প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে **গ্লাইকোপ্রোটিন** (Glycoprotein) বলে।

(ii) 8% কার্বোহাইড্রেটের 7% কার্বোহাইড্রেট লিপিডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাকে **গ্লাইকোলিপিড** বলে এবং বাকি 1% প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাকে **গ্লাইকোপ্রোটিন** বলে।

(iii) লিপিড উপাদান ধারাবাহিকভাবে দ্বিস্তরে সজ্জিত থাকে এবং এর পোলার প্রান্ত জলঅনুরাগী (Hydrophilic) অর্থাৎ জলে দ্রাব্য ও ননপোলার প্রান্ত জলবিরাগী (Hydrophobic) অর্থাৎ জলে অদ্রাব্য। প্লাজমা পর্দায় উপস্থিত প্রধান লিপিডগুলি হল— ফসফোলিপিড্, কোলেস্টেরল, গ্যালাক্টোলিপিড ইত্যাদি।

(iv) কোশ পর্দার বাইরের দিকের প্রোটিনকে **প্রান্তীয়** (Peripheral or Extrinsic) **প্রোটিন** বলে এবং কোশপর্দার মধ্যে অবস্থিত প্রোটিনকে **অন্তস্থ** (Integral or Intrinsic) **প্রোটিন** বলে। প্রোটিনের সাহায্যে পদার্থের চলাচল, কোশের অ্যান্টিজেনিক ধর্ম, উৎসেচকের কাজ ইত্যাদি পালিত হয়।

2. **কোশপর্দার বিভিন্ন আণবিক মডেল (Different Molecular models of Cell membrane) ঃ**

(i) **ই. ওভারটনের** (E. Overton, 1902) মতে কোশপর্দা একস্তর লিপিড দিয়ে তৈরি।

(ii) **গর্টার ও গ্রেন্ডেলের** (Gorter and Grendell, 1926) মতে কোশপর্দা দুটি লিপিড স্তর দিয়ে গঠিত।

(iii) **ড্যানিয়েলি ও ডাভসনের** (Danielli and Davson, 1935) মতে কোশপর্দা দ্বিস্তর যুক্ত একটি লিপিড দিয়ে তৈরি যার দুদিকেই গ্লোবিউলার প্রোটিনের আবরণ রয়েছে।

(iv) **রবার্টসনের** (Robertson, 1959) **একক পর্দা মডেল** (Unit membrane model of Robertson)—রবার্টসনের মতে কোশের ভিতরের সমস্ত কোশ-অঙ্গাণুর আবরণী পর্দা **প্রোটিন—লিপিড—প্রোটিন (P—L—P)** ত্রিস্তর দিয়ে গঠিত এবং এই আবরণীকে **একক আবরণী** (Unit membrane) বলে আখ্যা দেন। এই একক পর্দা গড়ে 7·5 nm চওড়া যার ভিতরে লিপিড পর্দার মাপ 3·5 nm এবং লিপিডের দুদিকে 2·0 nm পুরু দুটি প্রোটিন স্তর রয়েছে।

চিত্র 2.12 ঃ রবার্টসনের একক পর্দা।

(v) **তরল মোজেইক মডেল** (Fluid Mosaic Model by Singer and Nicolson, 1972)—সিংগার ও নিকলসনের মতে কোশপর্দা হল একটি অর্ধতরল পদার্থ যার তরল প্রকৃতি দ্বিস্তর লিপিড গঠন করে এবং এই তরলের মধ্যে গ্লোবিউলার
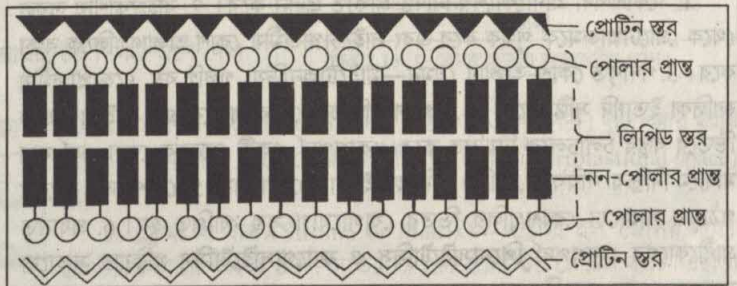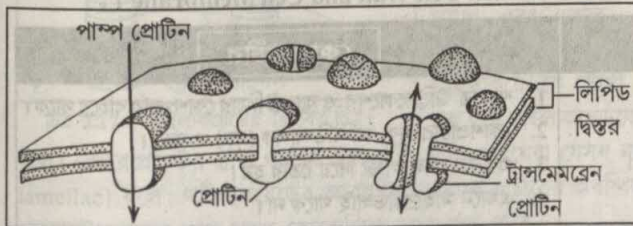
চিত্র 2.13 ঃ কোশপর্দার তরল মোজেইক মডেলের বাহ্যিক গঠন।

প্রোটিন মোজেইকের মতো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। কোশপর্দার লিপিড অণুগুলি প্রধানত ফসফোলিপিড জাতীয়। এই লিপিড অণুগুলির পোলার প্রান্ত **জল অনুরাগী** (Hydrophilic) অর্থাৎ জলে দ্রাব্য এবং নন-পোলার (Non-polar) প্রান্ত **জল বিরাগী** (Hydrophobic) অর্থাৎ জলে অদ্রাব্য। লিপিডের পোলার প্রান্ত পর্দার বাইরের দিকে এবং নন-পোলার প্রান্ত পর্দার ভিতরের দিকে থাকে। লিপিড অণুতে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার ফলে পর্দার তরল ধর্ম প্রকাশ পায়। প্রোটিনগুলি লিপিডের উপর ভাসমান থাকে বা আংশিক অথবা পূর্ণ নিমজ্জিত থাকে। প্রোটিনের সাহায্যে পদার্থের কোশীয় সংবহন, কোশান্তর সংযোগসাধন, শক্তি সরবরাহ ইত্যাদি কাজ সাধিত হয়।
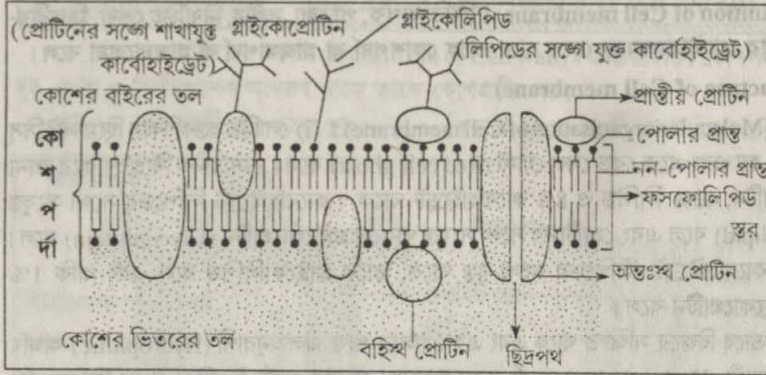
চিত্র 2.14 : তরল মোজেইক মডেলের আণবিক গঠন।

গ্লোবিউলার প্রোটিন বা গ্লোবিউলিন দু'ধরনের হয়—(i) **অন্তঃস্থ প্রোটিন বা ইনটিগ্রাল প্রোটিন** (Integral or intrinsic protein)—এইপ্রকার প্রোটিনগুলি প্লাজমাপর্দার লিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে অবস্থান করে। **ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন** (Transmembrane protein)— কয়েকটি অন্তঃস্থ প্রোটিন প্লাজমাপর্দার সম্পূর্ণ বেধ (thickness) বরাবর অবস্থান করে। এই প্রোটিনগুলি ছিদ্রযুক্ত এবং এই ছিদ্রপথে কিছু অণু পর্দার একদিক থেকে অন্যদিকে পরিবাহিত হয়।

(ii) অন্যদিকে, যে প্রোটিনগুলি লিপিডস্তরের বাইরে দুর্বল তড়িৎবন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে তাদের **বহিস্থ প্রোটিন** বা **এক্সট্রিনজিক প্রোটিন** (Extrinsic protein) বা **প্রান্তীয় প্রোটিন** (Peripheral protein) বলে।

প্লাজমাপর্দার বাইরের তলে প্রাণীকোশের শ্বেতসার অণু **গ্লাইকোলিপিড** (Glycolipid) বা **গ্লাইকোপ্রোটিন** (Glycoprotein) হিসাবে উপস্থিত থাকে। এগুলি কোশপর্দাকে সুরক্ষিত রাখে।

◻ (c) কোশপর্দার কাজ (Function of cell membrane) :

1. কোশপর্দা প্রাণীকোশের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে। 2. বহিঃকোশীয় তরল থেকে প্রোটোপ্লাজমকে পৃথক করে এবং সাইটোপ্লাজমীয় কোশ অঙ্গাণুগুলিকে রক্ষা করে। 3. পর্দাবৃত কোশ-অঙ্গাণু যেমন—মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। 4. কোশের ভিতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে বস্তুর চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোশপর্দা একটি প্রভেদক ভেদ্য পর্দা যার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় পরিবহন, সক্রিয় পরিবহন ইত্যাদি দেখা যায়। 5. কোশপর্দার বিশেষ গঠনের সাহায্যে কোশগুলির ভিতর যোগাযোগ সূত্র স্থাপিত হয়। 6. প্রধানত প্রাণীকোশের কোশপর্দা **পিনোসাইটোসিস্ ও ফ্যাগোসাইটোসিস্** প্রক্রিয়ার সাহায্যে যথাক্রমে তরল ও কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে।

চিত্র 2.15 : A– ফ্যাগোসাইটোসিস্ ও B–পিনোসাইটোসিস্ পদ্ধতি।

● কোশপর্দা ও কোশপ্রাচীরের পার্থক্য (Difference between Cell Wall and Cell Membrane) :

কোশপর্দা	কোশপ্রাচীর
1. সব সজীব কোশের প্রোটোপ্লাজমের বাইরের পর্দা।	1. শুধুমাত্র উদ্ভিদকোশের ও ব্যাকটেরিয়ার কোশপর্দার বাইরে থাকে।
2. কোশপর্দা পাতলা, স্থিতিস্থাপক ও সজীব।	2. কোশপ্রাচীর পুরু, অস্থিতিস্থাপক (দৃঢ়) ও জড়।
3. লাইপোপ্রোটিন (লিপিড ও প্রোটিন) দিয়ে তৈরি হয়।	3. প্রধানত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।
4. এখানে মাইক্রোভিলাই থাকতে পারে।	4. এখানে মাইক্রোভিলাই থাকে না।

কোশপর্দা	কোশপ্রাচীর
5. অর্ধভেদ্য বা প্রভেদক ভেদ্য।	5. সবসময় ভেদ্য।
6. কোশকে দৃঢ়তা দান করে না।	6. কোশকে দৃঢ়তা দান করে।
7. বিভিন্ন কোশঅঙ্গাণু সৃষ্টিতে সাহায্য করে।	7. কোশঅঙ্গাণু সৃষ্টিতে ভূমিকা নেই।
8. পিনোসাইটোসিস্ ও ফ্যাগোসাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।	8. কোশপ্রাচীরের এরূপ কোনো ভূমিকা নেই।
9. কোশ পর্দার কোনো অলংকরণ দেখা যায় না।	9. কিছু কোশের কোশপ্রাচীরে বিভিন্ন রকম অলংকরণ দেখা যায়।

✪ 2.6.C. প্লাসটিড (Plastid) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ছত্রাক ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদ কোশের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত দ্বি-একক পর্দা দিয়ে ঘেরা, বর্ণহীন ও বর্ণযুক্ত, গোলাকার, ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার যেসব অঙ্গাণু উদ্ভিদের খাদ্য সংশ্লেষ, খাদ্য সঞ্চয় ও বর্ণ গঠন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে তাদের প্লাসটিড (Plastid)** বলে।

◘ (b) **প্লাসটিডের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plastid)** ঃ বর্ণ ও কাজের প্রকার অনুযায়ী প্লাসটিড তিন ধরনের—ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।

▲ A. ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) (Gr. *Chlor* = green; *plast* = living) ঃ

❖ (a) **ক্লোরোপ্লাস্টের সংজ্ঞা** (Definition of Chloroplast)—**সবুজ রঞ্জক পদার্থযুক্ত প্লাসটিড যা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সাহায্যে O_2 এবং স্থৈতিক রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন করে তাকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে।**

(b) **ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন** (Structure of Chloroplast) ঃ **আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের** (Light microscope) সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্টে দুটি অংশ দেখা যায়, যেমন—(i) গ্রাণা— এগুলি 0·3—1·7 μm মাপের ক্ষুদ্র দানাযুক্ত বস্তু। (ii) ধাত্র (Matrix)—গ্রাণাগুলি এই পদার্থে নিমজ্জমান থাকে।
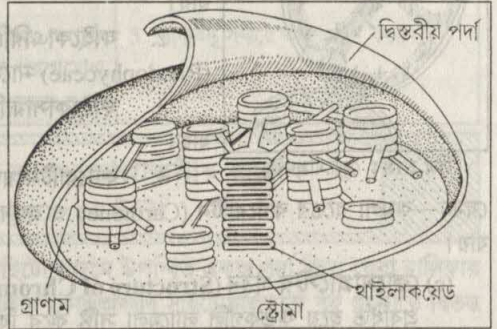
চিত্র 2.16 ঃ ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরীণ গঠন।

○ **ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে** ক্লোরোপ্লাস্টের তিনটি অংশ দেখা যায়, যেমন—

1. **আবরণী পর্দা** (Envelope)— ক্লোরোপ্লাস্টের আবরণটি লাইপো-প্রোটিন দিয়ে গঠিত দ্বি-একক পর্দা। দুটি পর্দার মাঝে যে ফাঁকা স্থান থাকে তাকে **পেরিপ্লাসটিডিয়াল স্পেস** (Periplastidial space) বলে।

চিত্র 2.17 ঃ থাইলাকয়েডের বিবর্ধিত চিত্র।

2. **স্ট্রোমা বা ধাত্র** (Stroma or Matrix)— স্ট্রোমা হল জেলির মতো কোলয়েড জাতীয় অস্বচ্ছ তরল যাতে 50% ক্লোরোপ্লাস্টের প্রোটিন থাকে। এছাড়া এতে রাইবোজোম, DNA, RNA, কয়েকটি খনিজ পদার্থ ইত্যাদি থাকে।

3. **থাইলাকয়েড** (Thylakoids)— থাইলাকয়েড দেখতে চ্যাপটা থলির মতো এবং এগুলি স্ট্রোমার তরলে অবস্থান করে। থাইলাকয়েডগুলি সমান্তরালভাবে স্তরীভূত থাকলে তাকে **গ্রাণা** (Grana) বলে এবং অস্তরীভূত থাইলাকয়েডকে **স্ট্রোমা থাইলাকয়েড** (Stroma thylakoid) বলে। দুটি গ্রাণার মধ্যবর্তী থাইলাকয়েডকে **ইন্টার গ্রাণা থাইলাকয়েড** (Inter grana thylakoid) বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণা পাশের গ্রাণামের সঙ্গে পর্দাঘেরা যেসব নালি দিয়ে যুক্ত থাকে তাদের **স্ট্রোমা ল্যামেলি** (Stroma lamellae) বলে। থাইলাকয়েডের আবরণীর অন্তঃস্থ প্রাচীরের অবস্থিত দানাগুলিকে **কোয়ান্টোজোম** (Quantosome) বলে। কোয়ান্টোজোমের মধ্যে সবুজ ক্লোরোফিল রঞ্জক কণা থাকে।

থাইলাকয়েডে প্রায় 50% ক্লোরোপ্লাস্ট-প্রোটিন ও সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকে। থাইলাকয়েড পর্দাতে সবুজ রঞ্জক পদার্থ, ক্লোরোফিল উপস্থিত থাকে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ক্লোরোফিল 'a' ও 'b' পাওয়া যায় এবং শৈবালে ক্লোরোফিল 'c' ও 'd' পাওয়া যায়।

(c) **ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ (Functions of Chloroplast) :**

1. ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক স্থৈতিক শক্তিতে (গ্লুকোজ) রূপান্তরিত করে। ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণা অঞ্চলে আলোক বিক্রিয়া ও স্ট্রোমা অঞ্চলে অন্ধকার বিক্রিয়া হয়।
2. ক্লোরোপ্লাস্টে উপস্থিত উৎসেচক RNA, প্রোটিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষ করে।
3. ক্লোরোপ্লাস্টে উপস্থিত ক্লোরোফিল কণা সূর্যালোক বর্ণালির লাল ও বেগুনি-নীল বর্ণ শোষণ করে।

▲ B. ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast : Gr. *Chroma* = colour, *plast* = living) :

❖ (a) **ক্রোমোপ্লাস্টের সংজ্ঞা (Definition of Chromoplast) : সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্ট ছাড়া উদ্ভিদকোশে লাল, হলুদ, কমলা প্রভৃতি রঙের যেসব প্লাসটিড পাওয়া যায় তাদের ক্রোমোপ্লাস্ট** (Chromoplast) বলে।

চিত্র 2.18 : ক্রোমোপ্লাস্ট।

ফুলের পাপড়ি ও অন্যান্য রঙিন অংশ, পাকা ফলের খোসা, গাজরের পরিবর্তিত মূল, টম্যাটো ইত্যাদি স্থানে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। ক্রোমোপ্লাস্টে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ থাকার জন্য বিভিন্ন বর্ণ গঠিত হয়।

(b) **ক্রোমোপ্লাস্টের বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ (Different Pigments of Chromoplast) :**

1. **লাইকোপিনি** (Lycopene)— লাল রং-এর রঞ্জক, এগুলি পাকা টম্যাটোতে পাওয়া যায়।
2. **ফাইকোএরিথ্রিন** (Phycoerythrine)— লাল রং-এর রঞ্জক, এগুলি **রোডোফাইসি** (Rhodophyceae) নামে শৈবালের গাত্রে থাকে।
3. **ফাইকোসায়ানিন** (Phycocyanine)—নীল রং-এর রঞ্জক, এগুলি শৈবালে পাওয়া যায়।
4. **ক্যারোটিনয়েড** (Carotenoid)—ক্যারোটিনয়েড নামে রঞ্জক পদার্থ দু'প্রকারের হয়, যেমন—কমলা রঙের **ক্যারোটিন** (Carotene) ও হলুদ রঙের **জ্যান্থোফিল** (Xanthophyll)। ক্যারোটিনয়েড গাজরে পাওয়া যায়।

(c) **ক্রোমোপ্লাস্টের গঠন (Structure of Chromoplast) :** ক্রোমোপ্লাস্ট দ্বি-একক পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে। ভিতরের পর্দা প্রবর্ধিত হয়ে কতকগুলি ল্যামেলা সৃষ্টি করে কিন্তু ল্যামেলাগুলি স্তরীভূত হয় না, পৃথক পৃথক থাকে। ক্রোমোপ্লাস্টে সামান্য ক্লোরোফিল থাকে, তাই এখানে সালোকসংশ্লেষ হয় না বললে চলে।

(d) **ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ (Function of Chromoplast) :** ক্রোমোপ্লাস্টের প্রধান কাজ হল উদ্ভিদের ফুলসহ বিভিন্ন অংশের বর্ণ সৃষ্টি করা। এর ফলে পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় ও পরাগযোগ হয় এবং ফলের বিস্তারেও এই বর্ণ সাহায্য করে।

▲ C. লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast : Gr. *Leuko* = white, *plast* = living) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : উদ্ভিদকোশের সাইটোপ্লাজমে যে রঞ্জক পদার্থবিহীন অর্থাৎ বর্ণহীন প্লাসটিড থাকে তাকে লিউকোপ্লাস্ট বলে।**

উদ্ভিদের মূলের কোশে এবং উদ্ভিদের যে অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না সেখানে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। এদের আকৃতি ডিম্বাকার, দণ্ডাকার বা গোলাকার হতে পারে। এই প্লাসটিড ভ্রূণ ও জার্ম কোশে (germ cell) পাওয়া যায়।

(b) **গঠন (Structure) :** লিউকোপ্লাস্ট দ্বি-একক পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে। ভিতরের পর্দা থেকে ল্যামেলা সৃষ্টি হয় কিন্তু ল্যামেলাগুলি থাইলাকয়েডের মতো স্তরীভূত হয় না, এককভাবে থাকে। তাই ধাত্রে গ্রাণা থাকে না কিন্তু শ্বেতসার দানা, প্রোটিন দানা ইত্যাদি থাকে।

(c) **কাজ (Function) :** লিউকোপ্লাস্ট প্রধানত দ্রবীভূত সরল খাদ্যকে অদ্রবীভূত জটিল খাদ্যে পরিণত করে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সঞ্চয় করে।

(d) **প্রকারভেদ (Types)** : খাদ্য সঞ্চয়ের প্রকার অনুযায়ী লিউকোপ্লাস্ট বিভিন্ন প্রকারের :

(i) **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (Amyloplast)—এখানে শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে যেমন—আলু, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

(ii) **প্রোটিনোপ্লাস্ট** (Proteinoplast) বা **অ্যাল্যুরোনপ্লাস্ট** (Aleuroneplast)—এই লিউকোপ্লাস্ট প্রোটিন সঞ্চয় করে। এদের বিভিন্ন উদ্ভিদ বীজে পাওয়া যায়।

(iii) **এলাইওপ্লাস্ট বা ওলিওজোম** (Elaioplast or, Oleosomes)—এই লিউকোপ্লাস্টিড ফ্যাট বা তেল সঞ্চয় করে। বিভিন্ন তৈলবীজে যেমন সরষে, বাদাম, নারকেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

● **ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্টের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Chloroplast, Chromoplast and Leukoplast) :**

ক্লোরোপ্লাস্ট	ক্রোমোপ্লাস্ট	লিউকোপ্লাস্ট
1. সবুজ রঞ্জক পদার্থযুক্ত।	1. সবুজ ছাড়া অন্য রঙের প্লাসটিড।	1. সম্পূর্ণ বর্ণহীন প্লাস্টিড।
2. প্রধান রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল।	2. প্রধান রঞ্জক পদার্থ ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।	2. কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না।
3. উদ্ভিদদেহের যেসকল স্থানে সূর্যালোক পড়ে সেখানে পাওয়া যায়।	3. সূর্যালোক পড়া, না পড়া যে-কোনো স্থানে পাওয়া যেতে পারে।	3. কেবলমাত্র সূর্যালোক না পড়া স্থানে লিউকোপ্লাস্ট থাকে।
4. চাকতির মতো থাইলাকয়েড পাওয়া যায়। থাইলাকয়েডগুলি স্তরীভূত হয়ে গ্রাণা তৈরি করে।	4. থাইলাকয়েড থাকে না। সুতরাং গ্রাণা অনুপস্থিত।	4. থাইলাকয়েড থাকে না। সুতরাং গ্রাণা অনুপস্থিত।
5. সৌরশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে।	5. উদ্ভিদের ফুল, ফল ও অন্যান্য অংশে বর্ণ প্রদান করে এবং এভাবে পরাগযোগ, ফল ও বীজের বিস্তারে সহায়তা করে।	5. খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ে অংশগ্রহণ করে।

◎ 2.6.D. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম বা এন্ডোপ্লাজমীয় জালক ◎ (Endoplasmic Reticulum or ER)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : সজীব ইউক্যারিওটিক কোশের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একক পর্দা দিয়ে ঘেরা নালিকার মতো বা চ্যাপটা থলির মতো পরস্পর সংযোগকারী যে জটিল জালকাকার কোশঅঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমকে বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে ও প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে তাকে এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (Endoplasmic reticulum)** বলে।

◘ (b) **গঠন (Structure)**— এন্ডোপ্লাজমীয় জালকের তিন প্রকার গঠন দেখা যায়, যেমন—

1. **সিস্টারনি বা ল্যামেলি** (Cisternae or Lamellae)—সিস্টারনিগুলি দেখতে লম্বা ও চ্যাপটা থলির মতো, অনেকগুলি সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। এদের ব্যাস প্রায় 40—50 µm।

2. **ভেসিক্ল বা অণু গহ্বর** (Vesicle)—এগুলি দেখতে সূক্ষ্ম বিন্দুর মতো এবং সিস্টারনির প্রান্তে এগুলি পাওয়া যায়। এদের ব্যাস ~ 30-500 µm হয়।

3. **নালিকা** (Tubules)—এগুলি শাখা-প্রশাখাযুক্ত নলের মতো। এদের ব্যাস 50-190 µm পর্যন্ত হয়।

চিত্র 2.19 : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম।

◘ (c) **প্রকারভেদ (Types)** : জালিকার সূক্ষ্ম নালিকার গায়ে রাইবোজোম দানার উপস্থিতি অনুযায়ী এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম দুই প্রকারের—

1. **মসৃণ বা দানাহীন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম** (Smooth or Agranular Endoplasmic Reticulum সংক্ষেপে SER)—এইপ্রকার এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে রাইবোজোম দানা যুক্ত থাকে না। তাই এদের দেখতে মসৃণ হয়।

2. **অমসৃণ বা দানাযুক্ত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম** (Rough or Granular Endoplasmic Reticulum **সংক্ষেপে RER**)— এই প্রকার এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে সারিবদ্ধভাবে রাইবোজোম দানা যুক্ত থাকে তাই এদের দেখতে অমসৃণ হয়। এই অংশে প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। 80S অধঃএকক প্রকৃতির রাইবোজোম এখানে যুক্ত থাকে।

◻ (d) **এন্ডোপ্লাজমিক জালকে উপস্থিত উৎসেচক (Enzymes present in ER) ঃ** NADH সাইটোক্রোম C-রিডাক্টেজ, NADH সাইটোক্রোম b_5 রিডাক্টেজ, ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসাইল CoA ডিহাইড্রোজিনেজ, পেপটিডেজ, গ্লাইকোসিল ট্রান্সফারেজ, হাইড্রোলেজেস।

◻ (e) **কাজ (Functions)** ঃ 1. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম সাইটোপ্লাজমকে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে এবং সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। 2. নিউক্লীয় পর্দা, গলগি বডি ও মাইক্রোবডি ইত্যাদির গঠনে অংশগ্রহণ করে। 3. অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামে (RER) উপস্থিত রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। 4. মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (SER) লিপিড, স্টেরয়েড, ফসফোলিপিড, ইত্যাদি সংশ্লেষে সহায়তা করে। 5. এদের নলাকার গঠনের মাধ্যমে কোশের বাইরের বহিঃকোশীয় তরল কোশের ভিতরে আসতে পারে। 6. মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (SER) গ্লাইকোজেনোলাইসিস্ (গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করা) প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বলে মনে করা হয়। 7. সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ সৃষ্টির মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে পৃথক রাখে। 8. ATP সংশ্লেষে সহায়তা করে। 9. ঔষধ ও বিষাক্ত টক্সিন পদার্থ অপসারিত করতে SER সাহায্য করে।

❂ 2.6.E. গলগি বডি বা গলগি অ্যাপারেটাস বা গলগি কমপ্লেক্স ❂ (Golgi body or Golgi apparatus or Golgi complex)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ সজীব ইউক্যারিওটিক কোশে নিউক্লিয়াসের কাছে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত ক্ষরণ কাজে নিযুক্ত একক পর্দা ঘেরা নলাকার বা গোলাকার যে সকল অঙ্গাণু উপর-নীচ সমান্তরালভাবে, ঘনসন্নিবিষ্ট অবস্থায় স্তূপাকারে থাকে তাকে গলগি বডি (Golgi body) বলে।**

চিত্র 2.20 ঃ গলগি বডি।

◻ (b) **গঠন (Structure)** ঃ গলগি বডি দেখতে নালিকা বা গহ্বরের মতো। এটি সিস্টারনি, মাইক্রোভেসিকলস এবং ভ্যাকুওল নিয়ে গঠিত।

1. **সিস্টারনি বা ল্যামেলি** (Cisternae or Lamellae) ঃ সিস্টারনিগুলি একক আবরণী দিয়ে আবৃত লম্বা, চ্যাপটা ও সরু নালিকাবিশেষ যা সংখ্যায় 3-20টি হয়। এগুলি পর পর প্রায় সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। দুটি সিস্টারনির মধ্যে 200-300Å ব্যবধান থাকে।

2. **মাইক্রোভেসিকল্** (Microvesicle) — সিস্টারনি নালিকার পরিধির দিকে অত্যন্ত ছোটো ছোটো গোলাকার থলির মতো যে অঙ্গাণু দলবদ্ধভাবে থাকে তাদের **ভেসিকল্** (Vesicle) বলে। এগুলির ব্যাস 30-40 Å।

3. **ভ্যাকুওল** (Vacuole)— ভ্যাকুওলগুলি বড়ো বড়ো গহ্বর বিশেষ যা সিস্টারনির কাছাকাছি থাকে। ভ্যাকুওলের ব্যাস প্রায় 60-200 Å।

● **জোন অফ্ এক্সক্লুশন (Zone of Exclusion)**— গলগি বডির কাছাকাছি সাইটোপ্লাজমীয় অংশে অন্য কোনো কোশীয় অঙ্গাণু থাকে না, তাই এই অঞ্চলকে **জোন অফ্ এক্সক্লুশন** বলে।

◻ (c) **গলগি বস্তুর কাজ (Functions of Golgi body)** ঃ 1. গলগি বডির প্রধান কাজ কোশের ক্ষরণ। এগুলি লাইসোজোম ও পারক্সিসোমের উৎসেচক সৃষ্টি করে এবং উৎসেচক, যোজক কলার ধাত্র, প্লাজমা পর্দার উপাদান ইত্যাদি পরিবহনে সহায়তা করে। 2. গলগি বডি থেকে হরমোন ক্ষরিত হয়। 3. বিভিন্ন খাদ্যের সঞ্চয় করে। 4. লাইসোজোম সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 5. কোশপর্দা ও কোশপ্রাচীর গঠনে অংশ নেয়। 6. শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম (Acrosome) গঠনে সহায়তা করে। 7. সরল শর্করা থেকে নানারকম পলিস্যাকারাইড গঠনে সহায়তা করে।

✪ 2.6.F. মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria) ✪
(*Mito* = fibril or thread, *chondrion* = granule)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : ইউক্যারিওটিক কোশের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা দ্বিপর্দাবেষ্টিত দণ্ডাকার, ডিম্বাকার বা সূত্রাকার যে অঙ্গাণুগুলি কোশীয় শ্বসনের সাহায্যে খাদ্যের স্থৈতিক শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে তাদের মাইটোকনড্রিয়া (**Mitochondria**) বলে।

চিত্র 2.21 : মাইটোকনড্রিয়ার অন্তর্গঠন।

◘ (b) **মাইটোকনড্রিয়ার গঠন (Structure of Mitochondria)** :

1. **ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক গঠন** (Electron Microscopic structure) : (i) মাইটোকনড্রিয়া দুটি পর্দা ও দুটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে তৈরি হয়। (ii) বাইরের পর্দাটি প্রায় 6'0 nm পুরু এবং এর থেকে 6-8 nm দূরত্বে অন্তঃপর্দা থাকে। (iii) অন্তঃপর্দাটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে এবং একে **ক্রিস্টি** (Cristae) বলে। (iv) অন্তঃপর্দা মাইটোকনড্রিয়াকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে যেমন— **বহিঃপ্রকোষ্ঠ** (Outer chamber)— এটি অন্তঃপর্দা ও বহিঃপর্দা দিয়ে ঘেরা প্রকোষ্ঠ। **অন্তঃপ্রকোষ্ঠ** (Inner chamber)— এটি অন্তঃপর্দা দিয়ে ঘেরা প্রকোষ্ঠ এবং এখানে একপ্রকার ঘন প্রোটিন সমৃদ্ধ, ধাত্র পদার্থ (Mitochondrial matrix) থাকে। (v) **ধাত্র** (Matrix)—অন্তঃপর্দা দিয়ে আবৃত অন্তঃপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত তরল হল ধাত্র (Matrix)। ধাত্রে DNA, ফ্যাট, প্রোটিন, RNA, রাইবোজোম (35S + 25S = 55S) ও ক্রেবস চক্রের উৎসেচক থাকে।

চিত্র 2.22 : মাইটোকনড্রিয়ার একটি ক্রিস্টির বিবর্ধিত চিত্রের গঠন।

✪ **F_1 দানা বা এলিমেন্টারি দানা বা অক্সিজোম বা ফারনানডেজ-মোরান অধঃএকক** : (**F_1 Particle**, or **elementary particle**, or **oxysome** or **Farnandez-Moran sub unit**)—অন্তঃপর্দা ও ক্রিস্টির উপরে এবং ধাত্রের দিকে টেনিস র‍্যাকেটের মতো কতকগুলি বস্তু ধাত্রের দিকে থাকে। এদের **এলিমেন্টারি দানা, বা F_1 বস্তু, বা অক্সিজোম বা ফারনানডেজ-মোরান অধঃএকক** বলে। F_1 বস্তুগুলি 10 Å দূরত্বে থাকে এবং এগুলি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় যেমন— ভূমি (Base), বৃন্ত (Stalk) ও মস্তক (Head)।

2. **রাসায়নিক গঠন** (Chemical composition) : মাইটোকনড্রিয়া প্রোটিন (60-70%), লিপিড (25-30%) এবং RNA (0·5%) নিয়ে গঠিত। এছাড়া মাইটোকনড্রিয়ার নিজস্ব **রাইবোজোম বা মাইটোরাইবোজোম** (Mitoribosome 55S টাইপের) DNA এবং কিছু দানা থাকে।

◘ (c) **মাইটোকনড্রিয়ার কাজ (Functions of Mitochondria)** :

1. মাইটোকনড্রিয়া শক্তির রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোশীয় বিপাকের শেষে ATP তৈরি হয়। ATP জীবের সমস্ত কাজে শক্তি জোগান দেয়। তাই ATP-কে **এনার্জি কারেন্সি** (Energy currency) বলে। শক্তি জোগানকারী ATP মাইটোকনড্রিয়াতে তৈরি হয় বলে মাইটোকনড্রিয়াকে **কোশের শক্তিঘর** (Power house of cell) বলে।
2. মাইটোকনড্রিয়াতে **ক্রেবস চক্র এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা জারণ** সম্পন্ন হয়। এছাড়া অ্যামাইনো অ্যাসিডের জারণও এখানে ঘটে।

3. মাইটোকনড্রিয়া কয়েকটি উপচিতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, যেমন— ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষণ, RNA, DNA ও প্রোটিন সংশ্লেষণ এখানে ঘটে।

2.6.G. রাইবোজোম (Ribosome)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** কোশের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, কোশের মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে এবং নিউক্লীয় পর্দা ও এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার গায়ে পর্দাবিহীন রাইবোনিউক্লীয় প্রোটিনের যে কণা লেগে থাকে, প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী সেই দানা বা কণাকে রাইবোজোম (Ribosome) বলে।
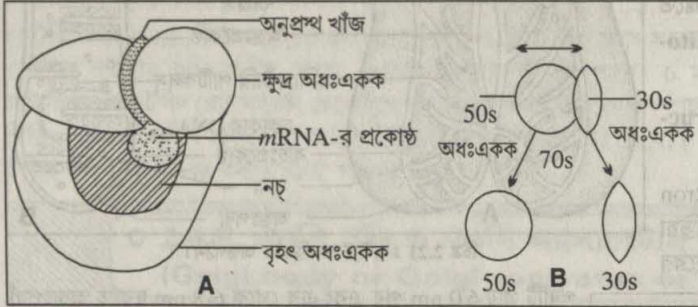
চিত্র 2.23 : A- রাইবোজোমের পরাণু গঠন; B-70s রাইবোজোমের গঠন।

(b) প্রকারভেদ (Types) : (i) সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত রাইবোজোমকে **সাইটোরাইবোজোম** (Cytoribosome) বলে। (ii) মাইটোকনড্রিয়াতে উপস্থিত রাইবোজোমকে **মাইটোরাইবোজোম** (Mitoribosome) বলে। (iii) কোশে রাইবোজোমগুলি যখন এককভাবে সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে তখন তাদের **মোনোজোম** (Monosome) বলে। (iv) প্রোটিন সংশ্লেষের সময় mRNA-এর উপর সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলি রাইবোজোম দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে— এদের **পলিরাইবোজোম** (Polyribosome) বা **পলিজোম** (Polysome) বলে।

(c) রাইবোজোমের গঠন ও প্রকারভেদ (Structure and types of Ribosome) :

1. রাইবোজোম দেখতে গোলাকার বা উপবৃত্তাকার প্রায় 23 nm ব্যাসযুক্ত একপ্রকার দানার মতো। একটি রাইবোজোম দুটি অধঃএকক বা সাব-ইউনিট (sub-unit) দিয়ে তৈরি— একটি বড়ো ও অন্যটি ছোটো। ম্যাগনেসিয়াম আয়নের (Mg^{++}) স্বল্প গাঢ়ত্বের জন্য (Low concentration) রাইবোজোম অধঃএকক দুটি পরস্পর যুগ্মভাবে থাকে।

2. ইউক্যারিওটিক কোশের রাইবোজোমের অধঃক্ষেপণ গুণাঙ্ক = 80S (S = Sedimentation coefficient or Svedberg unit) এবং প্রোক্যারিওটিক কোশের অধঃক্ষেপণ গুণাঙ্ক = 70S।

3. ইউক্যারিওটিক কোশের 80S রাইবোজোমের দুটি অধঃএকক হল 60 S ও 40 S। প্রোক্যারিওটিক কোশের 70 S রাইবোজোমের দুটি অধঃএকক হল 50 S ও 30 S। রাইবোজোম্যাল RNA (r RNA) ও ক্ষারীয় প্রোটিন দিয়ে রাইবোজোম তৈরি হয়। পাশের তালিকাযুক্ত ছবি দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে।

চিত্র 2.24 : প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক রাইবোজোমের উপাদানের তুলনা।

4. অনেক সময় (প্রোটিন সংশ্লেষের সময়) একাধিক রাইবোজোম বার্তাবহ আর এন এ (m RNA)-এর সঙ্গে পলিরাইবোজোম (Polysome or, Polyribosome) গঠন করে।

(d) রাইবোজোমের কাজ (Functions of Ribosome) :

1. রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষের কার্যকরী স্থান প্রদান করে। রাইবোজোমের দুটি সাব-ইউনিটের মাঝে m RNA অবস্থান করে এবং বড়ো সাব-ইউনিটের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী t RNA বিভিন্ন স্থানে বসে পলিপেপটাইড বা প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। এই কারণে রাইবোজোমকে **প্রোটিনের ফ্যাক্টরি** (Protein factory) বলে।

2. রাইবোজোম ফ্যাট বিপাকে সহায়তা করে।

2.6.H. লাইসোজোম (Lysosome)

(Gr. *Lysis* = Dissolution, *soma* = body) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**— **প্রধানত প্রাণীকোশে উপস্থিত একক পর্দা ঘেরা, বিভিন্ন আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচকপূর্ণ ছোটো ছোটো থলির মতো সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু, যেগুলি অন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় পরিপাকে সহায়তা করে তাদের লাইসোজোম (Lysosome) বলে।**

চিত্র 2.25 : লাইসোজোমের গঠনের চিত্ররূপ।

◘ (b) **গঠন (Structure)**— (i) লাইসোজোম লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি একক পর্দা দিয়ে ঘেরা প্রায় 50টি **আর্দ্রবিশ্লেষণকারী উৎসেচক** (Hydrolytic enzyme) পূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় কোশ-অঙ্গাণু।

◘ (c) **বহুরূপতা (Polymorphism)**— লাইসোজোম বিভিন্ন আয়তনের হয় এবং এদের বিভিন্ন কাজ অনুযায়ী রূপভেদ বা **লাইসোজোমের বহুরূপতা** (Polymorphism of Lysosome) দেখা যায়। লাইসোজোমের চারটি রূপভেদ পাওয়া যায়।

চিত্র 2.26 : লাইসোজোমের বহুরূপতা।

(i) **প্রাথমিক লাইসোজোম** (Primary lysosome)— এদের ব্যাস প্রায় 0·4 μm এবং ঘন থলির মতো দেখতে। এগুলিকে **সঞ্চয়ী কণা** (Storage granule) বলা হয়।

(ii) **গৌণ লাইসোজোম** (Secondary lysosome)— ফ্যাগোসাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গহ্বর বা **ফ্যাগোজোম** (Phagosome) এবং প্রাথমিক লাইসোজোমের মিলনে গৌণ লাইসোজোম বা **হেট্যারোফ্যাগোজোম** (Heterophagosome) সৃষ্টি হয়। গৌণ লাইসোজোমে খাদ্য পাচিত হয়, তাই একে **পাচন গহ্বর**-ও (Digestive vacuole) বলে।
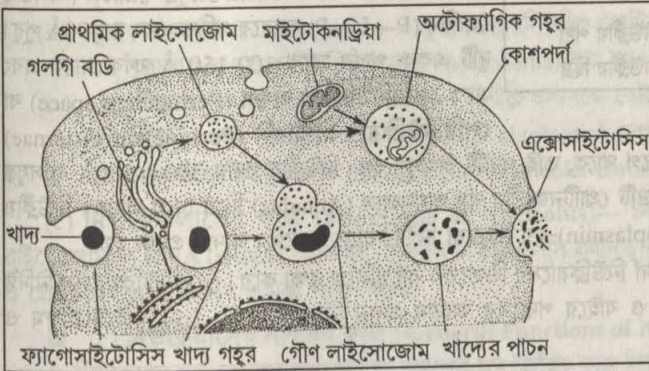
(iii) **রেসিডিউয়াল বডি** (Residual bodies)— এই প্রকার লাইসোজোমে অপাচ্য বস্তু উপস্থিত থাকে।

(iv) **অটোফ্যাগিক গহ্বর** (Autophagic vacuole) বা **সাইটোলাইসোজোম** (Cytolysosome) বা **অটোফ্যাগোজোম** (Autophagosome)— এই প্রকার লাইসোজোমে কোশের সাইটোপ্লাজম ও অকেজো কোশ-অঙ্গাণু পাচিত হয়।

◘ (d) **লাইসোজোমের কাজ (Functions of Lysosome)** : 1. লাইসোজোমে উপস্থিত উৎসেচক পাচন প্রক্রিয়ায় প্রোটিনকে ডাইপেপটাইড ও কার্বোহাইড্রেটকে মোনোস্যাকারাইডে পরিণত করে। 2. অটোফ্যাগি প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোশের অংশবিশেষ নবীকরণ হয়। 3. ব্যাঙাচির রূপান্তরের সময় লেজ, ফুলকা ইত্যাদি অবলুপ্ত হয়। 4. রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস্ রোগে লাইসোজোমের উৎসেচকের প্রভাবে তরুণাস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 5. শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম একপ্রকার লাইসোজোম বিশেষ যা ডিম্বাণুর পর্দা বিনষ্ট করতে সাহায্য করে। 6. শ্বেত রক্তকণিকার লাইসোজোম ফ্যাগোসাইটোসিস্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। 7. লাইসোজোমের উৎসেচকের ঘাটতির ফলে কিছু পদার্থ (যেমন— গ্লাইকোজেন, গ্লাইকোলিপিড ইত্যাদি) লাইসোজোমের ভিতর সঞ্চিত থাকে। এর ফলে প্রায় 20টি **কনজেনিট্যাল** (Congenital) রোগ সৃষ্টি হয়। এই রোগগুলিকে **সঞ্চয়ী রোগ** (storage disease) বলে। 8. উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজের ভিতর প্রোটিন ও স্টার্চ কমানোর জন্য লাইসোজোমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

2.6.I. নিউক্লিয়াস (Nucleus)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : ইউক্যারিওটিক কোশের প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, দুটি একক পর্দা দিয়ে ঘেরা, প্রায় গোলাকার ও ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত যে কোশীয় অঙ্গাণু কোশের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে নিউক্লিয়াস বলে।**

◘ (b) **নিউক্লিয়াসের গঠন (Structure of Nucleus)** : একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসে চারটি অংশ থাকে। যেমন— 1. নিউক্লীয় পর্দা, 2. নিউক্লীয় রস বা নিউক্লিওপ্লাজম, 3. ক্রোমাটিন জালিকা বা নিউক্লীয় জালিকা বা ক্রোমোজোম, 4. নিউক্লিওলাস।
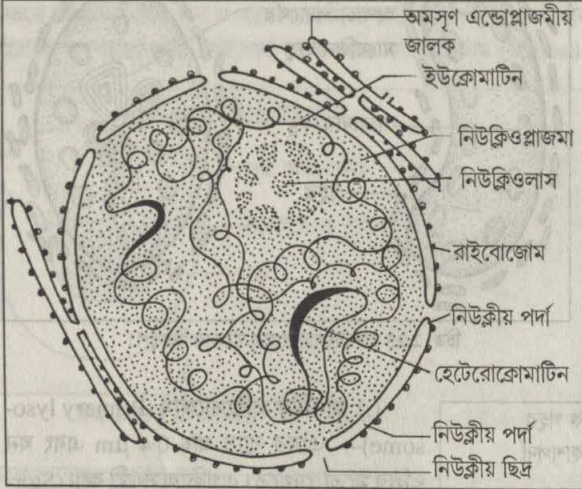
চিত্র 2.27 : একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস।

◆ **1. নিউক্লীয় পর্দা (Nuclear membrane) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা— সমগ্র নিউক্লিয়াসকে আবৃত করে রাখে যে পর্দা তাকে নিউক্লীয় পর্দা বা ক্যারিওথিকা** (Karyotheca) **বলে।**

(b) **গঠন**— সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজমকে পৃথক করে রাখা এই পর্দা আলাদা দুটি একক পর্দা দিয়ে গঠিত হয় যার একটি পর্দা নিউক্লিয়াসের ভিতরের দিকে থাকে। প্রতিটি একক পর্দা ত্রিস্তরযুক্ত প্রোটিন-লিপিড : প্রোটিন (P—L—P) সমন্বয়ে গঠিত এবং 75-90Å পুরু। দুটি একক পর্দার মাঝে 100-150 Å ফাঁক থাকে এবং একে **পেরিনিউক্লিয়ার অঞ্চল** (Perinuclear space) বা **পেরিনিউক্লিয়ার সিস্টারনি** (Perinuclear cisternae) বলে। বাইরের একক পর্দাতে কিছু রাইবোজোম লেগে থাকে, তাই পর্দাটি অমসৃণ হয়। নিউক্লীয় পর্দায় 300—500Å ব্যাসযুক্ত **নিউক্লীয় ছিদ্র** (Nuclear pore) থাকে এবং এই ছিদ্রটি প্রোটিনজাতীয় বস্তু **অ্যানুলাস** (Annulus) দিয়ে ঢাকা থাকে। নিউক্লীয় পর্দায় অবস্থিত প্রোটিন **নিউক্লিওপ্লাজমিন** (Nucleoplasmin)-এর সাহায্যে নিউক্লিয়াসে পদার্থের আদান প্রদান হয়।

(c) **নিউক্লীয় পর্দার কাজ**— (i) নিউক্লীয় পর্দা নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলিকে রক্ষা করে। (ii) নিউক্লিয়াসের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে। (iii) নিউক্লিয়াসের ভিতরে ও বাইরে পদার্থের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজমকে আলাদা করে রাখে।

◆ **2. নিউক্লীয় রস বা নিউক্লিওপ্লাজম (Nuclear Sap or Nucleoplasm) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা — নিউক্লীয় পর্দার ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, ক্ষুদ্র দানাদার, স্বল্প আম্লিক, অর্ধতরল পদার্থ থাকে তাকে নিউক্লীয় রস বা নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিম্ফ (Karyolymph)** বলে।

(b) **গঠন**— এই তরলে DNA, RNA, বিভিন্ন প্রোটিন (হিস্টোন, প্রোটামাইন, ফসফো প্রোটিন ইত্যাদি), অনেক উৎসেচক (DNA ও RNA পলিমারেজ, রাইবোনিউক্লিয়েজ, ফসফাটেজ, ডাইপেপটাইডেজ ইত্যাদি), কো-এনজাইম, ATP এবং নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ (Na, K, Ca, Mg, P) প্রভৃতি পাওয়া যায়। নিউক্লিওপ্লাজমে ক্রোমাটিন জালিকা ও নিউক্লিওলাস অবস্থান করে।

(c) **নিউক্লীয় রসের কাজ**— নিউক্লীয় রস নিউক্লিয়াসের তরল ধাত্র হিসাবে কাজ করে।

◆ **3. নিউক্লীয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা (Nuclear reticulum or Chromatin reticulum) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা— নিউক্লীয় রসে অবস্থিত, ক্ষারধর্মী রঞ্জকে রঞ্জিত, নিউক্লীয় প্রোটিন দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম সুতোর মতো জালকাকার অংশকে নিউক্লীয় জালিকা বলে।**

(b) **গঠন**— এই সুতোর মতো অংশকে অর্থাৎ সূত্রগুলিকে **ক্রোমাটিন সূত্র** (Chromatin thread) বলে। এগুলি প্রধানত DNA ও হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কোশের ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমাটিন সূত্রগুলি জালকাকারে থাকে কিন্তু বিভাজন দশায় এগুলি কুণ্ডলীকৃত হয়ে সুস্পষ্ট ক্রোমোজোমের আকার ধারণ করে। ক্রোমাটিন সূত্র দু'ধরনের হয় (রঞ্জিত হওয়ার ধর্ম অনুযায়ী) যেমন—হেট্যারোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন।

◆ 4. নিউক্লিওলাস (Nucleolus) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**— নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্ষুদ্র, ঘন, গোলাকার, গাঢ় রং ধারণকারী বস্তু যা কোশের স্থির দশায় শুধুমাত্র পাওয়া যায় তাকে নিউক্লিওলাস (**Nucleolus**) বলে।

(b) **গঠন (Structure)**— নিউক্লিওলাস প্রধানত RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয়। নিউক্লিওলাসে চারটি অঞ্চল দেখা যায়—
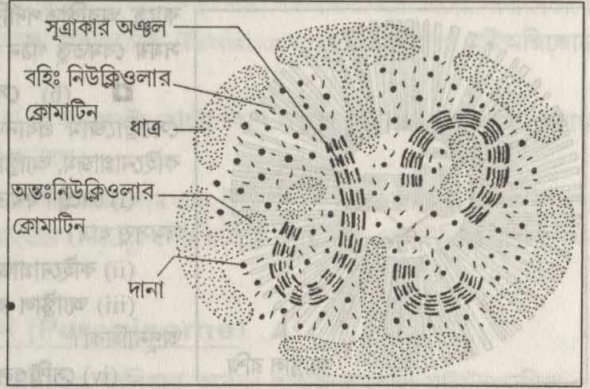
চিত্র 2.28 : নিউক্লিওলাসের গঠন।

(i) **অ্যামরফাস বা অনিয়তাকার অঞ্চল** (Amorphous zone)— প্রোটিন দিয়ে তৈরি এই অঞ্চলটি নিউক্লিওলাসের ধাত্র গঠন করে এবং এই অঞ্চলে দানাদার ও ফাইব্রিলার বস্তু থাকে।

(ii) **গ্রানিউলার বা দানাদার অঞ্চল** (Granular zone) — এই অঞ্চলের দানাগুলি রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন দিয়ে গঠিত, দানাগুলি 150-200 Å ব্যাসযুক্ত। এগুলিকে নিউক্লিয়াসের রাইবোজোম বলে এবং এগুলি সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোম গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(iii) **সূত্রাকার অঞ্চল** (Fibrillar zone)— সূক্ষ্ম রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন সূত্র দিয়ে এই অংশ গঠিত হয় এবং 50-80 Å দীর্ঘ এই সূত্রাকার অঞ্চলকে **নিউক্লিওনেমা** (Nucleonema) বলা হয়।

(iv) **ক্রোমাটিন অঞ্চল** (Chromatin zone)— নিউক্লিওলাসকে বেষ্টন করে পরিধি বরাবর যে ক্রোমাটিন থাকে তাকে **বহিঃনিউক্লিওলার ক্রোমাটিন** (Perinucleolar chromatin) এবং নিউক্লিওলাসের মধ্যে ক্রোমাটিনের যে অংশ প্রবিষ্ট হয় তাকে **অন্তঃনিউক্লিওলার ক্রোমাটিন** (Intranucleolar chromatin) বলে।

(c) **নিউক্লিওলাসের কাজ (Functions of Nucleolus)**— নিউক্লিওলাসের ক্রোমাটিন অঞ্চলের DNA থেকে রাইবোজোম্যাল RNA (rRNA) তৈরি হয়। সুতরাং নিউক্লিওলাস প্রধানত রাইবোজোম্যাল RNA তৈরি করে এবং রাইবোজোম ও প্রোটিন সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

◘ (c) নিউক্লিয়াসের সাধারণ কাজ (General Functions of Nucleus) :

1. নিউক্লিয়াস হল কোশের প্রাণকেন্দ্র যা কোশের সব জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই একে "**কোশের মস্তিষ্ক**" (Brain of the cell) বলে।
2. নিউক্লিয়াসে উপস্থিত DNA কোশের যাবতীয় ধর্ম ও গুণাবলি এক বংশ থেকে অপর বংশে বহন করে।
3. নিউক্লিয়াস থেকে RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয়।
4. কোশ বিভাজনে নিউক্লিয়াস প্রধান ভূমিকা পালন করে।

● নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Nucleus and Nucleolus) :

নিউক্লিয়াস	নিউক্লিওলাস
1. কোশের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত ঘন প্রধান কোশ-অঙ্গাণু।	1. নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিওপ্লাজমে অবস্থিত ঘন অঙ্গাণু।
2. নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লীয় জালিকা ও নিউক্লিওপ্লাজম দিয়ে নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।	2. অনিয়তাকার অঞ্চল, দানাদার অঞ্চল, সূত্রাকার অঞ্চল ও ক্রোমাটিন অঞ্চল দিয়ে নিউক্লিওলাস গঠিত হয়।
3. পর্দা আবৃত কোশীয় অঙ্গাণু।	3. পর্দা আবৃত থাকে না।
4. কোশের চারত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী যাবতীয় জিন বহন করে এবং সমস্ত জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	4. কোশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী কোনো জিন বহন করে না বা কোনো জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে না, শুধুমাত্র রাইবোজোম সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।

2.6.J. সেন্ট্রোজোম (Centrosome)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) :** প্রাণীকোশে এবং কোনো কোনো উদ্ভিদ কোশের সাইটোপ্লাজমে ও নিউক্লিয়াসের খুব কাছে অবস্থিত পর্দাবিহীন তারার মতো যে কোশীয় অঙ্গাণু কোশের বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠন করে তাকে সেন্ট্রোজোম বলে।

চিত্র 2.29 : সেন্ট্রিওলের আণুবীক্ষণিক গঠন।

◘ (b) **সেন্ট্রোজোমের গঠন (Structure of centrosome) :** সেন্ট্রোজোম প্রধানত চারটি অংশ নিয়ে গঠিত, যেমন—সেন্ট্রোস্ফিয়ার, কাইনোপ্লাজম, অ্যাস্ট্রাল রশ্মি বা অ্যাস্টার এবং সেন্ট্রিওল।

(i) **সেন্ট্রোস্ফিয়ার**—সেন্ট্রোজোমের বাইরের দিকের দানাবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় সমসত্ত্ব ধাত্র।

(ii) **কাইনোপ্লাজম**—সেন্ট্রোজোমের কেন্দ্রের সাইটোপ্লাজমীয় অংশ।

(iii) **অ্যাস্ট্রাল রশ্মি (অ্যাস্ট্রাল)**—সেন্ট্রোস্ফিয়ার থেকে চারদিকে বিচ্ছুরিত অণুনালিকা।

(iv) **সেন্ট্রিওল**—কাইনোপ্লাজমের কেন্দ্রে অবস্থিত অণুনালিকা দিয়ে তৈরি দুটি ফাঁপা পিপার মতো অংশ।

▲ সেন্ট্রিওল (Centriole) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : প্রধানত প্রাণীকোশে উপস্থিত ফাঁপা, নলাকৃতি নটি ত্রয়ী অণুনালিকা দিয়ে তৈরি যে কোশীয় অঙ্গাণু মাকু বা বেমতন্তু সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং কোশ বিভাজনে সাহায্য করে, তাকে সেন্ট্রিওল বলে এবং সেন্ট্রিওলের চারপাশে কোশীয় অঙ্গাণু ও বড়ো কণা বিহীন গাঢ় সাইটোপ্লাজমকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) বলে।**

সেন্ট্রোস্ফিয়ারসহ সেন্ট্রিওলকে একসঙ্গে **সেন্ট্রোজোম** (Centrosome) বলে। একটি কোশে একটি সেন্ট্রোজোম থাকে এবং এর মধ্যে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে। **একত্রে দুটি সেন্ট্রিওলকে ডিপ্লোজোম** (Diplosome) **বলে**। নলাকৃতি সেন্ট্রিওলের পরিমাপ $0{\cdot}2 \times 0{\cdot}5\ \mu m$ হয়।

(b) **সেন্ট্রিওলের পরাণুগঠন (Ultrastructure of Centriole) :** সেন্ট্রিওলগুলি দেখতে নলাকার, ফাঁপা দু'মুখ খোলা পিপের মতো। দুটি সেন্ট্রিওল পরস্পরের সমকোণে অবস্থান করে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে সেন্ট্রিওলের পরিধির গাত্র **নটি ত্রয়ী অণুনালিকা** (Microtubule) দিয়ে গঠিত। একটি ত্রয়ী এককের তিনটি অণুনালিকা একত্রে একটি **ব্লেড** (Blade) গঠন করে। প্রতিটি ব্লেডের অণুনালিকাগুলি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজানো থাকে। প্রতিটি ব্লেডের অণুনালিকা-গুলিকে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে পরপর A, B এবং C অক্ষর দিয়ে নামকরণ বা চিহ্নিত করা হয়। সেন্ট্রিওলে কোনো কেন্দ্রীয় অণুনালিকা থাকে না এবং কোনো বিশেষ বাহু থাকে না। অণুনালিকাগুলি একে অন্যের সঙ্গে **যোজক বা লিংকার** (Connective or linker) তন্তুর দিয়ে যুক্ত হয় এবং এইসব গঠন নিয়ে সামনের দিক থেকে সেন্ট্রিওলটি গোরুর গাড়ির চাকার মতো দেখতে হয়। প্রতিটি অণুনালিকা কয়েকটি **প্রোটোফিলামেন্ট** (Protofilament) দিয়ে তৈরি। কেন্দ্রের দিকের 'A' অণুনালিকা 13টি প্রোটোফিলামেন্ট এবং 'B' ও 'C' অণুনালিকাগুলি প্রত্যেকটি 10টি করে প্রোটোফিলামেন্ট নিয়ে গঠিত হয়।
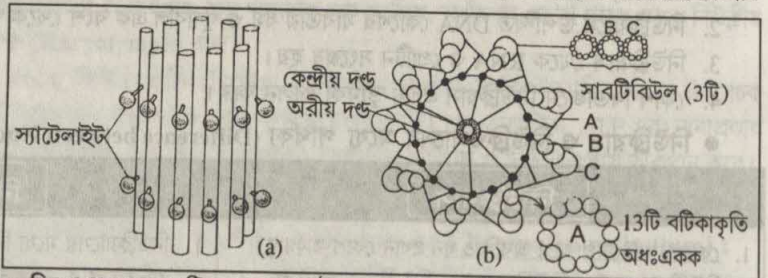
চিত্র 2.30 : (a) সেন্ট্রিওলের পরাণু গঠন; (b) সেন্ট্রিওলের মাইক্রোটিবিউল বিন্যাসের চিত্ররূপ।

(c) **সেন্ট্রিওলের কাজ (Functions of Centriole) :** 1. প্রাণীকোশ বিভাজনের সময় বেমতন্তু (Spindle fibre) গঠন করে। 2. ক্রোমোজোম বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলিকে বিপরীত মেরুর দিকে যেতে সাহায্য করে। 3. সিলিয়া ও ফ্লাজেলা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। 4. দূরবর্তী সেন্ট্রিওল থেকে শুক্রাণুর লেজ তৈরি হয়।

2.6.K. মাইক্রোবডি (Microbodies)

কোশ-ভগ্নাংশকরণ (cell fractionation) পদ্ধতির সাহায্যে কোশের মধ্যে লাইসোজোম ছাড়া অন্য একপ্রকার কোশ-অঙ্গাণু পৃথক করা যায়। এই অঙ্গাণুগুলিতে উপস্থিত উৎসেচক কোশের বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া পরিচালিত করে। এদের সাধারণভাবে **মাইক্রোবডি** (Microbodies) বলে যেগুলি প্রধানত প্রাণীকোশে **পারক্সিজোম** (Peroxisome) ও উদ্ভিদকোশে **গ্লাইঅক্সিজোম** (Glyoxysomes) নামে পরিচিত।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : একক পর্দা দিয়ে ঘেরা যে সব ছোটো ছোটো কোশ-অঙ্গাণু সূক্ষ্ম দানাযুক্ত অথবা কেলাস ঘটিত পদার্থে পূর্ণ থাকে তাদের মাইক্রোবডি (Microbodies) বলে।**

◘ (b) **প্রকারভেদ (Types) :** প্রাণীকোশে মাইক্রোবডিকে **পারক্সিজোম** এবং উদ্ভিদকোশে মাইক্রোবডিকে **গ্লাইঅক্সিজোম** বলে। প্রাণীকোশে বিপাকের ফলে সৃষ্ট হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে (H_2O_2) পেরক্সিজোম বিনষ্ট করে এবং উদ্ভিদকোশে সঞ্চিত লিপিডকে গ্লাইঅক্সিজোম কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে।

▲ I. পারক্সিজোম (Peroxisome) ▲

ডি. ডুভে এবং তাঁর **সহকর্মীরা** (1965) সর্বপ্রথম পারক্সিজোম আবিষ্কার করেন। পারক্সিজোমগুলি মাইটোকনড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে পৃথক কোশ-অঙ্গাণু; কারণ, এদের DNA ও রাইবোজোম থাকে না এবং এরা একটিমাত্র পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে।

(a) **গঠন (Structure) :** 1. পারক্সিজোমগুলি ক্ষুদ্র, ডিম্বাকৃতি, 0·6 μm – 0·7 μm ব্যাসযুক্ত এবং একক পর্দা দিয়ে ঘেরা।

2. পারক্সিজোমে 50টির বেশি বিভিন্ন উৎসেচক থাকে। এর মধ্যে প্রধান উৎসেচকগুলি হল—পেরক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, D-অ্যামাইনো অক্সিডেজ ও ইউরেট অক্সিডেজ।

3. পারক্সিজোমের সূক্ষ্ম, দানাযুক্ত বস্তু কেন্দ্রস্থলে জমাট বেঁধে একটি অস্বচ্ছ কোর (core) গঠন করে।

4. বিভিন্ন কোশে পারক্সিজোমের মধ্যে নলাকৃতি অধঃএকক দিয়ে তৈরি কেলাসজাতীয় বস্তু থাকে।

5. পারক্সিজোমের কেন্দ্রে বস্তু না থাকলে সেই পারক্সিজোমকে **মাইক্রো-পারক্সিজোম** (Microperoxisome) বলে।

6. পারক্সিজোমে জিনোম (DNA) বা রাইবোজোম থাকে না।

চিত্র 2.31. : একটি পারক্সিজোমের চিত্ররূপ।

(b) **কাজ (Functions) :** 1. পারক্সিজোমে উপস্থিত 50টিরও বেশি উৎসেচক কোশের বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

2. ইউরেট অক্সিডেজ, D-অ্যামাইনো অক্সিডেজ এবং α-হাইড্রক্সিল-অ্যাসিড-অক্সিডেজ উৎসেচকগুলি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করে এবং ক্যাটালেজ উৎসেচক H_2O_2-কে বিনষ্ট করে। H_2O_2 বিনষ্টকারী ধর্মের জন্যই এই কোশ-অঙ্গাণুগুলিকে পারক্সিজোম বলে।

3. এখানে ক্যাটালেজ উৎসেচক "সেফটি ভালভ্" (Safety valve)-এর কাজ করে। ক্যাটালেজ H_2O_2-কে H_2O এবং O_2তে রূপান্তরিত করে এবং মৃত্যুর হাত থেকে কোশকে বাঁচায়।

4. পারক্সিজোম লিপিড সংশ্লেষেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

▲ II. গ্লাইঅক্সিজোম (Glyoxysome) ▲

যেসব পারক্সিজোম সদ্য অঙ্কুরিত উদ্ভিদে সঞ্চিত ফ্যাটি অ্যাসিডকে গ্লাইঅক্সাইলেট (Glyoxylate) চক্রের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে তাদের **গ্লাইঅক্সিজোম** বলে।

গ্লাইঅক্সাইলেট চক্রে ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপাকের ফলে সৃষ্ট দুই অণু অ্যাসিটাইল CoA ও সাকসিনিক অ্যাসিড তৈরিতে কাজে লাগে। এই সাকসিনিক অ্যাসিড গ্লাইঅক্সিজোমের বাইরে এসে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। গ্লাইঅক্সাইলেট চক্র প্রাণীকোশে পাওয়া যায় না বলে প্রাণীকোশ ফ্যাটি অ্যাসিডকে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করতে পারে না।

✪ 2.6.L. মাইক্রোটিবিউল (Microtubule) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ ইউক্যারিওটিক কোশের সাইটোপ্লাজমে টিবিউলিন নামে প্রোটিন দিয়ে তৈরি অতি ক্ষুদ্র, ফাঁপা, নলাকার যে সকল কোশ-অঙ্গাণু কোশের অন্তঃকাঠামো তৈরি করে ও সিলিয়া, ফ্লাজেলা এবং স্পিন্ডিল গঠনে সহায়তা করে তাকে মাইক্রোটিবিউল (Microtubule) বা অণুনালিকা বলে।**

চিত্র 2.32 ঃ বিভিন্ন প্রকার মাইক্রোটিবিউল।

◻ (b) মাইক্রোটিবিউলের পরাণুগঠন (Ultrastructure of Microtubules)

অণুনালিকা বা মাইক্রোটিবিউল নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।
1. মাইক্রোটিবিউলগুলি ফাঁপা, শাখাহীন, নলের মতো দেখতে হয়।
2. এদের ব্যাস 25 nm (250Å) এবং কয়েক মাইক্রোমিটার লম্বা।
3. নলের প্রাচীর 6 nm পুরু এবং এখানে 13টি অধঃএকক বর্তমান। এদের প্রোটোফাইব্রিল বলে। 4. মাইক্রোটিবিউলের প্রধান উপাদান হল **টিবিউলিন** প্রোটিন। টিবিউলিন 'A' বা α ও 'B' বা β প্রোটিন একত্রে হেটারোডাইমার গঠন করে যার আণবিক ওজন 1,10,000 থেকে 1,20,000 ডালটন। 5. মোট 13টি হেটারোডাইমার বলয়াকারে অবস্থান করে এবং এগুলি মাইক্রোটিবিউলের প্রাচীর গঠন করে।
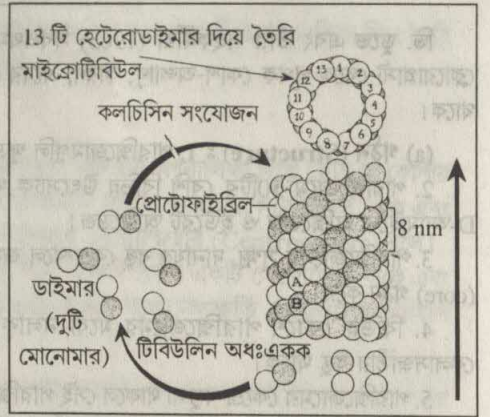
চিত্র 2.33 ঃ মাইক্রোটিবিউলের ডাইমার গঠন।

◻ (c) মাইক্রোটিবিউলের কাজ (Functions of Microtubule) ঃ

1. **যান্ত্রিক কাজ**—মাইক্রোটিবিউল কোশের অন্তঃকাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করে ফলে যান্ত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা কোশের নির্দিষ্ট আকার ও গঠন নির্ধারণ করে। 2. **পরিবহন**—কোশের মধ্যে খাদ্য চলাচলে সাহায্য করে। 3. **স্পিন্ডিল গঠন**—কোশ বিভাজনের সময় স্পিন্ডিল বা বেমতন্তু গঠন করে ও বিপরীত মেরুর দিকে ক্রোমোজোম আকর্ষণ বা প্রেরণ করতে সাহায্য করে। 4. **সিলিয়া ও ফ্লাজেলা গঠন**—সিলিয়া ও ফ্লাজেলা গঠনে এবং এদের চলনে সহায়তা করে। 5. স্পারমাটিড থেকে শুক্রাণু গঠনের সময় কোশের আকৃতি পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 6. উদ্ভিদ কোশে সাইটোপ্লাজমের আবর্তন গতি (Cyclosis movement) নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

✪ 2.6.M. সাইটোস্কেলিটন (Cytoskeleton) বা সাইটোপ্লাজমীয় কঙ্কালতন্ত্র (Cytoplasmic skeletal system) ✪

কোশের সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রের মধ্যে প্রোটিন ঘটিত কিছু উপাদান দেখা যায় যেগুলি কোশের বিভিন্ন ধর্ম, যেমন—সল-জেল রূপান্তর, সান্দ্রতার পরিবর্তন, অন্তঃকোশীয় চলন (যেমন—সাইক্লোসিস্), অ্যামিবয়েড চলন, বেমতন্তু গঠন ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে পালন করতে সাহায্য করে। কোশের এইরূপ বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণকারী প্রোটিনঘটিত বিশেষ উপাদানকে **সাইটোস্কেলিটন** (Cytoskeleton) বলে।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ প্রোটিন তন্তু নির্মিত যে জটিল জালকাকার বস্তু ইউক্যারিওটিক কোশের সাইটোপ্লাজমের সব অংশে ছড়িয়ে থাকে এবং যেগুলি কোশের বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করে ও কোশের সামঞ্জস্যপূর্ণ, নির্দিষ্ট অভিমুখে চলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে সাইটোস্কেলিটন (Cytoskeleton) বলে।**

সাইটোস্কেলিটনের গঠন খুবই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। যখন কোশের আকৃতির পরিবর্তন হয়, অথবা কোশ বিভাজিত হয় বা কোশ বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, সাইটোস্কেলিটনের সাংগঠনিক পরিবর্তন অবিরত ঘটতে থাকে। সাইটোস্কেলিটনকে সাইটোমাসকুলেচার (Cytomusculature)-ও বলে, কারণ— সাইটোস্কেলিটনের সক্রিয়তার ফলে কোশের হামাগুড়ি চলন, পেশি সংকোচন, মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে বিভিন্ন পরিবর্তন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

◘ (b) **পরাণুগঠন (Ultrastructure)** : তিন ধরনের প্রোটিন উপাদান নিয়ে সাইটোস্কেলিটন গঠিত হয়; এগুলি হল— **অ্যাক্‌টিন ফিলামেন্ট** (Actin filament), **অণুনালিকা** (Microtubule) এবং **অভ্যন্তরীণ ফিলামেন্ট** (Intermediate filaments)। প্রতিটি ফিলামেন্ট প্রোটিন নির্মিত বিশেষ অধঃএকক নিয়ে গঠিত। যেমন—অ্যাক্‌টিন ফিলামেন্ট অ্যাকটিন অধঃএকক নিয়ে গঠিত হয়, মাইক্রোটিবিউলিন টিবিউলিন প্রোটিন (Tubulin) দিয়ে সৃষ্টি হয় এবং অভ্যন্তরীণ ফিলামেন্টে ফাইব্রাস প্রোটিন (Fibrous protein) অর্থাৎ ভিমেন্‌টিন (Vimentin) ও ল্যামিন (Lamin) নিয়ে গঠিত হয়।

চিত্র 2.34 : সাইটোস্কেলিটন

বিশেষ গবেষণার ফলে জানা যায় যে—সাইটোস্কেলিটন বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন দিয়ে গঠিত; যেমন—টিবিউলিন, অ্যাক্‌টিন, ট্রোপোমায়োসিন (Tropomyosin) ও মায়োসিন (Myosin) ইত্যাদি। এসব প্রোটিনের পেশিকলায় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সুতরাং পেশিকোশে এবং সাধারণ কোশে একই প্রক্রিয়ার উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
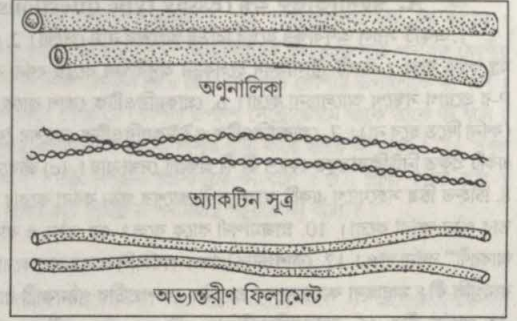
◘ (c) **কাজ (Functions)** : 1. সাইটোপ্লাজমকে অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত করে। 2. কোশের অভ্যন্তরীণ ধর্ম, যেমন সল-জেল রূপান্তর, সান্দ্রতার পরিবর্তন ইত্যাদি পালনে সহায়তা করে। 3. অন্তঃকোশীয় চলন ও অ্যামিবয়েড চলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 4. কোশ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

✪ 2.6.N. সিলিয়া ও ফ্লাজেলা (Cilia and Flagella) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** : **ইউক্যারিওটিক কোশে অবস্থিত একপ্রকার চলনশীল, আণুবীক্ষণিক, কোশপর্দাবৃত, সূক্ষ্ম, সূত্রাকার প্রোটোপ্লাজমীয় প্রবর্ধককে ফ্লাজেলা বা সিলিয়া (Cilia and Flagella) বলে।**

◘ (b) **সিলিয়া ও ফ্লাজেলার পরাণুগঠন (Ultrastructure of Cilia and Flagella)** :

1. সিলিয়া ও ফ্লাজেলার অন্তর্গঠন একই রকমের। সিলিয়া সংখ্যায় অনেক এবং আকারে ছোটো হয়। কিন্তু ফ্লাজেলা সংখ্যায় কম এবং বেশ দীর্ঘকায় হয়।
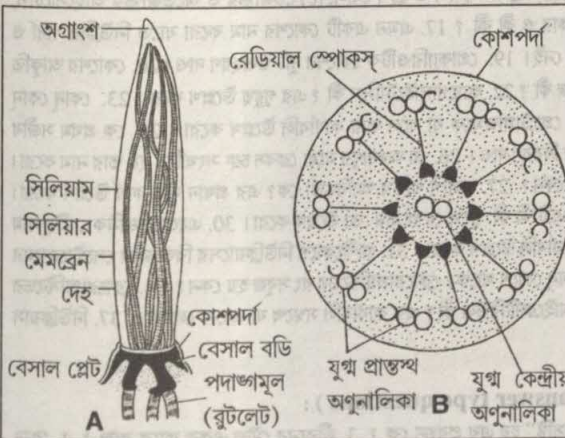
চিত্র 2.35 : সিলিয়ার পরাণু গঠনের চিত্র (A) সম্পূর্ণ সিলিয়া ও (B) সিলিয়ার প্রস্থচ্ছেদ।

2. তিনটি মূল উপাদান বা অংশ নিয়ে সিলিয়া বা ফ্লাজেলা গঠিত হয়, যেমন—(i) **সিলিয়াম বা অক্ষীয় তন্তু**— এখানে কেন্দ্রস্থলে দুটি পৃথক মাইক্রোটিবিউল এবং পরিধিতে 9 জোড়া অণুনালিকা বা মাইক্রোটিবিউল থাকে। সমস্ত অণুনালিকা (Microtubule)-গুলি (9 + 2) একত্রে **অ্যাক্সোনিম** (Axoneme) গঠন করে। (ii) **বেসাল বডি বা কাইনেটোসোম** (Kinetosome)-এর গঠন সেন্ট্রিওলের মতো এবং এটি সিলিয়া বা ফ্লাজেলার গোড়াতে থাকে। (iii) **রুটলেট** (Rootlet)— এটি বেসাল বডির নীচের তন্তুময় অংশ।

◘ (c) **সিলিয়া ও ফ্লাজেলার কাজ (Functions of Cilia and Flagella)** : 1. জীবের গমনে সহায়তা করে। 2. সিলিয়ার আন্দোলনের ফলে জলস্রোত সৃষ্টি হয় এবং খাদ্য সংগ্রহ চলে। 3. ফ্লাজেলার সঞ্চালনে শুক্রাণুর গমন হয়। 4. শ্বাসনালিতে সিলিয়া কঠিন বস্তু প্রবেশে বাধা দেয়। 5. সিলিয়া ও ফ্লাজেলা স্পর্শ অনুভূতির কাজ করে।

০ অ নু শী ল নী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম লেখো। 2. একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করো। 3. ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাকে বলে ? একটি ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ণনা করো 4. কোশ ভগ্নাংশকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। 5. ট্রেসার মৌল ^{14}C ও ^{32}P-র প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করো। 6. প্রোক্যারিওটিক কোশ কাকে বলে? একটি ইউক্যারিওটিক কোশ অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো। (বর্ণনা দিতে হবে না)। 7. প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোশের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 7. (a) কোশকে জীবের "ক্রিয়াশীল একক" বলা হয় কেন? (b) একটি প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশে কী কী অঙ্গাণু দেখা যায়? (c) জীবনের অপচিতিমূলক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী একটি অঙ্গাণু সম্পর্কে যা জানো লেখো। 8. চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি আদর্শ প্রাণীকোশের গঠন বর্ণনা করো। 9. কোশ কাহাকে বলে? একটি আদর্শ উদ্ভিদকোশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো ও তার গঠন বর্ণনা করো। 10. প্লাজমাপর্দা কাকে বলে? এর গঠন ও কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 11. একটি চিত্রের সাহায্যে "রবার্টসনের একক আবরণী" বর্ণনা দাও। 12. কোশপর্দার বিভিন্ন কার্যাবলি আলোচনা করো। 13. কোশপ্রাচীর কাকে বলে? এর গঠন ও কার্য বর্ণনা করো। 14. কোশপ্রাচীরের কার্যগুলি কী? মধ্যচ্ছদা কাকে বলে? প্রাথমিক কোশপ্রাচীর গঠনকারী রাসায়নিক পদার্থগুলির নাম উল্লেখ করো। 15. কোশপ্রাচীর কী? কোশপর্দার সঙ্গে এর পার্থক্য কী? 16. কোশপ্রাচীর কীভাবে সৃষ্টি হয়? কোশপ্রাচীরের গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করো। 17. মাইটোকন্ড্রিয়া কাকে বলে? এর গঠন ও কার্যাবলির বর্ণনা দাও। 18. গলগি বডির আণুবীক্ষণিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 19. গলগি বডি কাকে বলে? তার কার্যাবলি বর্ণনা করো। 20. রাইবোজোম কী? এর অবস্থান, গঠন ও কার্য বর্ণনা করো। 21. এন্ডোপ্লাজমীয় জালক কত প্রকার? এদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করো। 22. সেন্ট্রিওলের গঠনের সঠিক বর্ণনা দাও। এর কার্যাবলি উল্লেখ করো। 23. প্লাস্টিড কাকে বলে? সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণকারী প্লাস্টিডের মধ্যে মুখ্য প্লাস্টিডের গঠন সম্বন্ধে যা জানো উল্লেখ করো। 24. প্লাস্টিড ও মাইটোকনড্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সচিত্র বর্ণনা দাও এবং তাদের কার্যাবলি উল্লেখ করো। 25. ক্লোরোপ্লাস্টের আণুবীক্ষণিক গঠনের সচিত্র বর্ণনা দাও। 26. নিউক্লিয়াসের গঠন এবং এর জৈব কার্যাদি আলোচনা করো। নিউক্লিয়াসকে জীবের মস্তিষ্ক বলা হয় কেন? একটি পূর্ণগঠিত নিউক্লিয়াসের প্রতিটি অংশের নাম লেখো। 27. মাইক্রোবডি বলতে কী বোঝো ? বিভিন্ন প্রকার মাইক্রোবডির বর্ণনা দাও। 28. মাইক্রোটিবিউলের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 29. চিত্রসহ সিলিয়া ও ফ্লাজেলার পরাণুগঠন বর্ণনা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাকে বলে ? 2. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাকে বলে ? 3. আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলতে কী বোঝো ? 4. ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলতে কী বোঝো ? 5. ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কী দেখা যায় ? 6. স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কী দেখা যায়? 7. " কোশ-ভগ্নাংশকরণ" প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝো ? 8. " ডিফারেনসিয়্যাল সেনট্রিফিউগেশন কৌশল" বলতে কী বোঝো ? 9. "ট্রেসার মৌল" কাকে বলে? 10. আইসোটোপ কী ? 11. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলতে কী বোঝো ? 12. ট্রেসার কৌশলের উদ্দেশ্য কী ? 13. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের "অর্ধজীবন" বলতে কী বোঝো ? 14. "রেডিয়োকার্বন ডেটিং" বলতে কী বোঝো ? 15. পার্থক্য লেখো— (a) আলোক ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র। (b) সরল ও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, (c) TEM ও SEM, (d) ট্রেসার মৌল ও ট্রেস মৌল, (e) তেজস্ক্রিয় ও অতেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, (f) কোশ প্রাচীর ও কোশ-পর্দা। 16. কোশ কাকে বলে ? কোশ কত প্রকার ও কী কী ? 17. এমন একটি কোশের নাম করো যাতে নিউক্লীয় পর্দা ও মাইটোকনড্রিয়া নেই। 18. একটি কোশের নাম করো যার মধ্যে নিউক্লিয়াস নেই। 19. প্রোক্যারিওটিক কোশের দুটি উদাহরণ দাও। 20. কোশের আকৃতি বর্ণনা করো। 21. একক আবরণী কাকে বলে? মাইক্রোভিলাই কী ও এর কাজ কী ? 22. ফ্যাগোসাইটোসিস কী ? এর গুরুত্ব উল্লেখ করো। 23. কোন্ কোন্ কোশীয় অঙ্গাণু কেবল উদ্ভিদ্ কোশে দেখা যায়? 24. নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমকে যা বলে তার কার্যাবলি উল্লেখ করো। 25. কে প্রথম সজীব কোশে মাইটোকনড্রিয়ার উপস্থিতি প্রমাণ করেন এবং শ্বসনকালে তার কার্যের বিবরণ দাও। 26. যে অঙ্গাণুর মধ্যে ক্রেবস চক্র সংঘটিত হয় তার নাম করো। কোন্ কোশে এর উপস্থিতি সর্বাধিক হয়? একে কোশের শক্তিঘর বলা হয় কেন? 27. গলগি বডির আবিষ্কর্তা কে? এর প্রধান দুটি কার্য উল্লেখ করো। 28. রাইবোজোম কী? এর কাজ কী? 29. লাইসোজোম কী? কোশের মধ্যে এটি কী কী রূপে দেখা যায় তা উল্লেখ করো। 30. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায় না। এরূপ কোশের নাম লেখো। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কার্যাবলি উল্লেখ করো। 31. প্রাণীকোশে নিউক্লিয়াসের বিভাজনে সেন্ট্রোজোমের ভূমিকা কী? 32. প্রাণীর কোন্ কোশে সেন্ট্রোজোম থাকে না? 33. প্লাস্টিড কোন্ কোশে থাকে? ক্লোরোপ্লাস্টিডের রং সবুজ হয় কেন? 34. ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল অণুগুলি সজ্জিত থাকে? 35. গ্রাণা কাকে বলে? 36. মাইক্রোটিবিউল কী? এর কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 37. নিউক্লিয়াস কী? এর বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করো।

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. কোশ কথাটি প্রথম প্রবর্তন করেন কে ? 2. "কোশ থেকে কোশের সৃষ্টি" হয় এর প্রবক্তা কে ? 3. জীবনের মৌল একক কাকে বলে ? 4. কোন্ কোশের নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় আবরণী ও নিউক্লীয় জালিকা থাকে না ? 5. নিউক্লীয় আবরণী ও নিউক্লীয় জালিকাযুক্ত নিউক্লিয়াসকে কী বলে ? 6. দৃঢ় কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট, আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশ কাকে বলে ? 7. উদ্ভিদ কোশে বাইরের দৃঢ় জড় আবরণীকে কী বলে ? 8. মধ্যচ্ছদা কী ? কোশের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ? 9. কোশপ্রাচীর কী দিয়ে তৈরি? 10. প্লাজমোডেসমাটা কী ? 11. প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে অবস্থিত পাতলা সজীব পর্দাকে কী বলে? 12. প্রোটিন-লিপিড প্রোটিন দিয়ে তৈরি ত্রিস্তরী কোশ পর্দার রাসায়নিক উপাদানগুলি কী কী ? 13. একক পর্দা কথাটি প্রবর্তন কে করেন ? 14. কোশপর্দার

তরলায়িত নক্সা প্রবর্তন কে করেন ? 15. "প্রোটোপ্লাজম জীবনের ভৌত ভিত্তি" এই কথাটি কে বলেছিলেন ? 16. নিউক্লিয়াস ছাড়া প্রোটোপ্লাজমীয় তরলকে কী বলে ? 17. পর্দাবৃত সাইটোপ্লাজমীয় জালককে কী বলে ? 18. সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রকে কী বলে ? 19. প্রোটন সংশ্লেষে নিয়োজিত সাইটোপ্লাজমীয় উপাংশকে কী বলে ? 20. শৃঙ্খলিত রাইবোজোমকে কী বলে ? 21. মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোশের শক্তিঘর বলে কেন ? 22. মাইট্রোকন্ড্রিয়ার অন্তঃপর্দার অবস্থিত গোলাকার বস্তুকে কী বলে ? 23. এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার কে নামকরণ করেন ? 24. রাইবোজোম নাম কে করেন ? 25. মাইটোকনড্রিয়া নাম কে দেন ? 26. পর্দাবৃত চ্যাপটা থলি যারা ক্ষরণ কার্যে লিপ্ত তাদের কী বলে ? 27. আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচক যুক্ত পর্দাবৃত কোশীয় উপাংশকে কী বলে। 28. কোশের কোন্ অঙ্গাণুকে 'আত্মঘাতী থলি' বলে ? 29. টিবিউলিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি নলাকৃতি কোশীয় উপাংশকে কী বলে ? 30. সেন্ট্রোস্ফিয়ার ও সেন্ট্রিওলযুক্ত কোশীয় উপাংশকে কী বলে ? 31. অণুনালিকা দিয়ে তৈরি যে কোশীয় উপাংশ সেন্ট্রোজোমে থাকে তাকে কী বলে ? 32. কাইনেটোজোম ও বেসাল বডি থেকে কী তৈরি হয় ? 33. দ্বিপর্দাযুক্ত যে কোশীয় উপাংশে রঞ্জক বা সঞ্চিত খাদ্য থাকে তাকে কী বলে ? 34. সবুজ রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে কী বলে ? 35. পীত-কমলা রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে কী বলে ? 36. বর্ণহীন প্লাস্টিডকে কী বলে ? 37. গ্রাণা কাকে বলে ? 38. থাইলাকয়েড কাকে বলে ? 39. থাইলাকয়েডে অবস্থিত রঞ্জযুক্ত অংশকে কী বলে? 40. নিউক্লীয় পর্দামধ্যস্থ গহ্বরকে কী বলে ?

D. টীকা লেখো (Write notes on) :

1. রবার্ট হুক। 2. রবার্ট ব্রাউন। 3. কোশ। 4. কোশ মতবাদ। 5. ফ্যাগোসাইটোসিস। 6. পিনোসাইটোসিস। 7. এন্ডোসাইটোসিস। 8. এক্সোসাইটোসিস। 9. প্লাসমোডেসমাটা। 10. গৌণ কোশপ্রাচীর। 11. সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র। 12. মাইটোকনড্রিয়া। 13. গলগি বডি। 14. রাইবোজোম। 15. লাইসোজোম। 16. এন্ডোপ্লাজমীয় জালক। 17. সেন্ট্রিওল। 18. প্লাস্টিড। 19. গ্রাণাম। 20. স্ট্রোমা। 21. ক্লোরোপ্লাস্ট। 22. নিউক্লিয়াস। 23. নিউক্লিওলাস।

কোশের কাজ
[CELL FUNCTIONS]
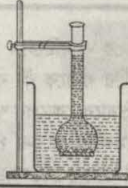
➧ **ভূমিকা (Introduction) :** কোশের ক্রিয়াশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন পদার্থ কোশের ভিতরে ও কোশের বাইরে চলাচল করে। কোশের এই কাজ ব্যাপন, অভিস্রবন, নিষ্ক্রিয় শোষণ, সক্রিয় শোষণ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

◎ 3.1. ব্যাপন (Diffusion) ◎

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে ভৌত প্রক্রিয়ায় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি তাদের নিজস্ব গতিশক্তির জন্য বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রক্রিয়া শেষে দুটি স্থান সমঘনত্বযুক্ত হয়, তাকে ব্যাপন বলে।**

◘ (b) **ব্যাপনের উদাহরণ (Examples of Diffusion) :** একটি কাচের বিকার বা গ্লাসে কিছুটা পরিষ্কার জল নিয়ে তাতে তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4$)-এর একটি স্ফটিক রাখলে কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে স্ফটিকটি আস্তে আস্তে জলে দ্রবীভূত হয়েছে। প্রথমে স্ফটিক সংলগ্ন জল

চিত্র 3.1 : ব্যাপন প্রক্রিয়ার পরীক্ষা।

রঙিন হবে। এর পর যখন সম্পূর্ণ স্ফটিকটি দ্রবীভূত হবে তখন স্ফটিকের অণুগুলি জলের সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে, ফলে পাত্রের সব জায়গার জল সমানভাবে তুঁতে রঙে রঙিন হবে।
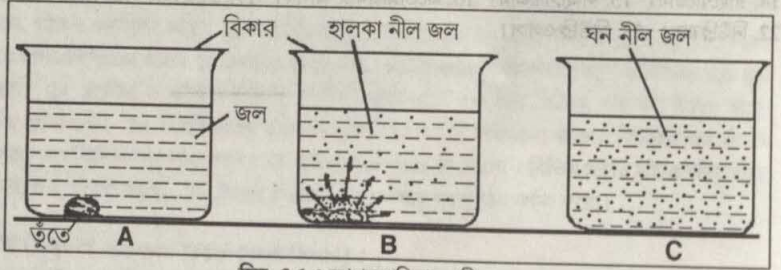
◘ (c) **ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ (Factors affecting Diffusion) :**

1. **ঘনত্বের পার্থক্য** (Difference in density)— গাঢ় ও লঘু অংশে ব্যাপনকারী পদার্থের ঘনত্বের পার্থক্য যত বেশি হবে ব্যাপন চাপের পার্থক্য ততই বেশি হবে ফলে ব্যাপনের হার তুলনামূলকভাবে বাড়বে।

2. **ব্যাপনের মাধ্যম** (Medium of Diffusion)— মাধ্যমের ঘনত্ব কম হলে ব্যাপনের হার বেড়ে যায় এবং মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হলে ব্যাপনের হার কমে যায়।

3. **অণুর আয়তন** (Volume of Molecule)— ব্যাপনকারী পদার্থের অণুর আয়তন ছোটো হলে ব্যাপনের হার বেশি হয় এবং অণুর আয়তন বড়ো হলে ব্যাপনের হার কমে যায়।

4. **আণবিক গুরুত্ব** (Molecular weight)— ব্যাপনের হার পদার্থের আণবিক গুরুত্বের বর্গমূলের (Square root) সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক (Inversely proportional) সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ আণবিক গুরুত্বের বর্গমূলের মান যত কম হবে পদার্থের ব্যাপন হার ততই বেশি হবে। ব্যাপনের হার $\propto 1/\sqrt{\text{আণবিক গুরুত্ব}}$

5. **অণুর আকৃতি** (Shape of the molecule)— অণুর আকৃতি লম্বাটে হলে মাধ্যমে ঘর্ষণজনিত বাধা বেড়ে যায় ফলে ব্যাপনের হারও কম হয়। অপরদিকে অণুর আকৃতি গোলাকার হলে ব্যাপনের হার বেড়ে যায়।

6. **দ্রাবক বা মাধ্যমের সান্দ্রতা** (Viscosity of solvent)— দ্রাবক বা মাধ্যমের সান্দ্রতা বেশি হলে পদার্থের (দ্রাব) চলাচলে ঘর্ষণজনিত বাধা বেশি হয়, ফলে ব্যাপনের হার কমে যায়।

7. **গ্যাসীয় পদার্থ ব্যাপনে গ্রাহামের সূত্র** (Graham's law of diffusion of gases)— গ্রাহামের সূত্র অনুযায়ী গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপনে ওই পদার্থের ঘনত্বের বর্গমূলের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ—
ব্যাপনের হার $\propto 1/\sqrt{\text{ঘনত্ব}}$

8. **ব্যাপনে ফিক্সের সূত্র** (Fick's law of diffusion)— ফিক্সের মতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাপনের হার ঘনত্বের নতিমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক। অর্থাৎ—ব্যাপনের হার $\propto$ ঘনত্বের নতিমাত্রা (Concentration gradient)।

9. **দ্রাব্যতা** (Solubility)— মাধ্যমে ব্যাপনযোগ্য অণুটির দ্রাব্যতার উপর ব্যাপনের হার নির্ভর করে। অর্থাৎ, মাধ্যমে অণুর দ্রাব্যতা বেশি হলে অণুর ব্যাপনহার বেশি হবে।

10. **পর্দা** (Membrane)— পর্দা অতিক্রম করে কোনো অণুর ব্যাপন হতে পারে, কিন্তু সেখানে পর্দার ছিদ্রের ব্যাস অণুর ব্যাসের চেয়ে বড়ো হতে হবে।

11. **তাপমাত্রা ও চাপ** (Temperature and pressure)— মাধ্যমের তাপমাত্রা ও চাপ বেশি হলে ব্যাপনকারী পদার্থের অণুর গতিশক্তি বেড়ে যায় ফলে ব্যাপনের হার বেশি হয়।

● **সহায়ক ব্যাপন (Facilitated diffusion) ঃ যে প্রক্রিয়ায় প্রোটিন বাহকের সহায়তায় শক্তির ব্যবহার ছাড়া দ্রাবের অণু ''ফ্যাট দ্রাব যৌগ'' গঠনের মাধ্যমে বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে যায় তাকে সহায়ক ব্যাপন বলে।**

✪ 3.2. অভিস্রবণ (Osmosis) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ দুটি সমপ্রকৃতির কিন্তু ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে লঘু ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবকের অণু অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে গাঢ় দ্রবণে যায় তাকে অভিস্রবণ বলে।** এক্ষেত্রে সর্বগ্রাহ্য দ্রাবক হল জল এবং কোশপর্দা হল অর্ধভেদ্য বা বাছাই করার ক্ষমতাসম্পন্ন পর্দা।

◘ (b) **অভিস্রবণের প্রকারভেদ (Types of Osmosis)** ঃ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোশের মধ্যে জল ঢুকতে পারে আবার কোশ থেকে জল বেরিয়ে যেতেও পারে। এই বৈশিষ্ট্য বিচারে অভিস্রবণ দু'প্রকারের, যেমন—

1. **অন্তঃঅভিস্রবণ (Endosmosis)**— কোশের কোশপর্দা দিয়ে কোশের বহিঃপরিবেশের লঘুসারক দ্রবণ থেকে যখন জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোশের ভিতর অতিসারক দ্রবণে যায় তখন সেই অভিস্রবণকে **অন্তঃঅভিস্রবণ** (Endosmosis) বলে। এক্ষেত্রে কোশের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

2. **বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis)**— কোশের কোশপর্দা দিয়ে কোশের ভিতরের লঘুসারক দ্রবণের জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় যখন বহিঃপরিবেশের অতিসারক দ্রবণে যায় তখন তাকে **বহিঃঅভিস্রবণ** (Exosmosis) বলে। এখানে কোশের সাইটোপ্লাজম সংকুচিত হয় এবং আয়তন কমে যায়।

● **আলু-অসমোস্কোপের সাহায্যে কোশান্তর অভিস্রবণ পরীক্ষা (Experiment on cell-to-cell osmosis by potato Osmoscope) ঃ**

(i) **উপকরণ ঃ** একটি বড়ো আলু, চিনির দ্রবণ, পেট্রিডিস, জল, ইওসিন, আলপিন ও ছুরি।

(ii) **পরীক্ষা ঃ** একটি গোল আলুর খোসা ছাড়িয়ে চৌকো করে কেটে নেওয়া হল। এই চৌকো আলুর মাঝে ছুরি দিয়ে কেটে একটি গর্ত করা হল এবং এই গর্ত চিনির দ্রবণ দিয়ে ভরতি করা হল। একটি আলপিন গেঁথে দ্রবণের উর্ধ্বসীমাতল চিহ্নিত করা হল। এবারে আলুর এই চৌকাকার খণ্ডটিকে একটি পেট্রিডিসে নেওয়া ইওসিন মেশানো লাল জলে (লঘুসারক তরল) বসানো হল যাতে আলুর চৌকাকার খণ্ডটি ডুবে না যায়।

চিত্র 3.2 ঃ অভিস্রবণের পরীক্ষা।

(iii) **পর্যবেক্ষণ ঃ** কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে আলুর গর্তে দ্রবণের উচ্চতা আলপিন চিহ্নিত তল ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে এবং আলুর ভিতরে দ্রবণটির রং লাল হয়েছে।

(iv) **সিদ্ধান্ত ঃ** পেট্রিডিসে জলের ব্যাপন চাপ আলুর ব্লকে উপস্থিত দ্রবণে জলের ব্যাপনচাপের থেকে বেশি। তাই পেট্রিডিস থেকে জল আলুর কোশগুলির পারস্পরিক অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলুর ভিতরের প্রকোষ্ঠে চলে আসে। এর ফলে আলুর ভিতরে দ্রবণটির রং লাল হয়েছে। আলুর একটি কোশ থেকে পার্শ্ববর্তী কোশগুলিতে ক্রমান্বয়ে এইরূপ অভিস্রবণকে **কোশান্তর অভিস্রবণ** (Cell to cell osmosis) বলে।

▲ বিভিন্ন প্রকার পর্দা (Different types of Membranes)

ভেদ্যতার প্রকার অনুযায়ী সমস্ত কোশপর্দাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; এগুলি হল— **ভেদ্য পর্দা, অভেদ্য পর্দা, অর্ধভেদ্য পর্দা বা নির্বাচিত বা পছন্দমাফিক বা বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দা।**

1. **ভেদ্য পর্দা (Permeable membrane) :** যে পর্দার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দ্রাব ও দ্রাবকের অণু চলাচল করতে পারে তাকে **ভেদ্য পর্দা** বলে। **উদাহরণ**—উদ্ভিদকোশের কোশপ্রাচীর স্তর।

2. **অভেদ্য পর্দা (Impermeable membrane) :** যে পর্দার মধ্য দিয়ে গ্যাসীয় অণু ছাড়া অন্য কোনো কঠিন বা তরল অণু যেতে পারে না, তাকে **অভেদ্য পর্দা** বলে। **উদাহরণ**—মাছের অনিষিক্ত ডিম্বাণুর প্লাজমা পর্দা।

3. **অর্ধভেদ্য পর্দা বা নির্বাচিত বা পছন্দমাফিক বা বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দা (Semipermeable or Selectively or Differentially permeable membrane) :** যেসব পর্দার মধ্য দিয়ে পছন্দমাফিক আয়ন ও ক্ষুদ্র অণু চলাচল করে তাদের বিভেদমূলক পর্দা বলে। **উদাহরণ**— প্রাণীকোশের কোশপর্দা।

▲ প্লাজমোলাইসিস ও ডিপ্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis and Deplasmolysis)

1. প্লাজমোলাইসিস্ (Plasmolysis)— একটি সজীব উদ্ভিদকোশ অতিসারক দ্রবণে (দ্রবণের গাঢ়ত্ব কোশরসের গাঢ়ত্বের চেয়ে বেশি) রাখলে কোশরস থেকে জল বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোশপর্দা দিয়ে কোশের বাইরে চলে আসে। উদ্ভিদকোশ থেকে জল নির্গমনের ফলে কোশের প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়, কোশপর্দা কোশপ্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং শেষে প্রোটোপ্লাজম কোশপ্রাচীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গোলাকার বস্তুরূপে অবস্থান করে।

চিত্র 3.3 : প্লাজমোলাইসিস ও ডিপ্লাজমোলাইসিস প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ।

❖ **সংজ্ঞা : বহিঃঅভিস্রবণ পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদকোশের প্রোটোপ্লাজমের যে সংকোচন ঘটে তাকে প্লাজমোলাইসিস্ (Plasmolysis) বলে এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত এইপ্রকার উদ্ভিদকোশকে প্লাজমোলাইজড্ (Plasmolysed) কোশ বলে।**

● **প্রারম্ভিক প্লাজমোলাইসিস্ (Incipient Plasmolysis) :** এটি প্লাজমোলাইসিসের প্রারম্ভিক দশা। একটি সজীব উদ্ভিদকোশ অতিসারক দ্রবণে রাখলে কোশরস থেকে জল বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোশপর্দা দিয়ে কোশের বাইরে চলে আসে কিন্তু প্রোটোপ্লাজম কোশপ্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, প্লাজমোলাইসিসের এই প্রাথমিক পর্যায় বা এই ঘটনাকে **প্রারম্ভিক প্লাজমোলাইসিস্** (Incipient Plasmolysis) বলে।

2. ডিপ্লাজমোলাইসিস্ (Deplasmolysis)— প্লাজমোলাইসিস হয়েছে এমন উদ্ভিদ কোশকে লঘুসারক দ্রবণে রাখলে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোশে জল প্রবেশ করে। এর ফলে কোশের কেন্দ্রীয় গহ্বরটি ধীরে ধীরে জলপূর্ণ হয় এবং কোশটি রসস্ফীত হয়ে ফেঁপে যায় এবং প্রোটোপ্লাজম কোশপর্দা সংলগ্ন হয়ে অবস্থান করে।

❖ **সংজ্ঞা : প্লাজমোলাইজড্ কোশে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জল গ্রহণ করে রসস্ফীত হওয়ার পদ্ধতিকে ডিপ্লাজমোলাইসিস্ (Deplasmolysis) এবং এই কোশটিকে ডিপ্লাজমোলাইজড্ কোশ (Deplasmolysed cell) বলে।**

● **প্লাজমোলাইসিস ও ডিপ্লাজমোলাইসিসের পার্থক্য (Difference between Plasmolysis and Deplasmolysis) :**

প্লাজমোলাইসিস	ডিপ্লাজমোলাইসিস
1. বাহ্যিক পরিবেশের অতিসারক দ্রবণের প্রভাবে হয়।	1. বাহ্যিক পরিবেশের লঘুসারক দ্রবণের প্রভাবে ঘটে।
2. কোশের প্রোটোপ্লাজমের সংকোচন হয়।	2. কোশের প্রোটোপ্লাজমের প্রসারণ হয়।
3. কোশ থেকে জল বেরিয়ে যায়।	3. কোশের ভিতরে জল প্রবেশ করে।
4. বহিঃঅভিস্রবণের প্রভাবে ঘটে।	4. অন্তঃঅভিস্রবণের প্রভাবে ঘটে।
5. কোশে প্রোটোপ্লাজম শুকিয়ে যায় ফলে কোশের মৃত্যু হতে পারে।	5. কোশে প্রোটোপ্লাজমের রসস্ফীতি ঘটে এবং কোশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

▲ অভিস্রবণের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Importance or significance of Osmosis) ঃ

1. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দিয়ে মাটি থেকে জল শোষণ করে এবং জলজ উদ্ভিদ সারা দেহ দিয়ে জল শোষণ করে। 2. এই প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় ও সব কোশের বিশেষ করে ভাজক কলার কোশের বৃদ্ধি ঘটে। 3. অভিস্রবণের ফলে কোশের রসস্ফীতি ঘটে যার ফলে বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ ঋজুভাবে থাকতে পারে। 4. অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণের নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধ হওয়া, লজ্জাবতী পাতার চলন বা সিসমোন্যাষ্টি, ফুলের দলমণ্ডলের বিকাশ ইত্যাদি প্রক্রিয়া চলে। 5. ফল বিদারণের সময় অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করে। 6. অন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় তরলের ভিতর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া চলে, ফলে কোশের ভিতরে ও বাইরে জলের ভারসাম্য বজায় থাকে। 7. এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রক্ত থেকে কলায় জলের আদান-প্রদান ঘটে। যেমন— অন্ত্র থেকে রক্তে জল শোষিত হয়। 8. বৃক্কের নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান করপাসল বিশেষ পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া মূত্র (পরিস্রুত) উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

● ব্যাপন ও অভিস্রবণের পার্থক্য (Difference between Diffusion and Osmosis) ঃ

ব্যাপন	অভিস্রবণ
1. মুক্ত অবস্থায় হতে পারে অথবা পর্দার মাধ্যমেও ঘটতে পারে, তবে পর্দার উপস্থিতি আবশ্যিক নয়।	1. এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অর্ধভেদ্য পর্দার উপস্থিতিতে ঘটে, মুক্ত অবস্থায় হয় না।
2. এই প্রক্রিয়া তরলে-তরলে, গ্যাসে-গ্যাসে, তরলে-গ্যাসে, কঠিনে-গ্যাসে, কঠিনে-তরলে ঘটতে পারে।	2. এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তরলে-তরলে ঘটে।
3. এই প্রক্রিয়ায় যে-কোনো পদার্থের অণু তাদের বেশি ঘনত্বের দিক থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবমান হয়। দ্রাব ও দ্রাবক উভয় অণুই এক সঙ্গে ব্যাপিত হয়।	3. এই প্রক্রিয়ায় শুধু দ্রাবকের অণু দ্রাবকের বেশি ঘনত্বের দিক থেকে দ্রাবকের কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
4. বিষম প্রকৃতির দ্রবণের মধ্যে ব্যাপন ঘটতে পারে।	4. কেবল সমপ্রকৃতির দ্রবণের ভিতর ঘটে।

✪ 3.3. শোষণ (Absorption) ✪

❖ (a) **শোষণের সংজ্ঞা (Definition of Absorption) ঃ কোশ তার কোশপর্দার সাহায্যে জল ও জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন পদার্থ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে তাকে সাধারণভাবে শোষণ বা বিশোষণ বলে।**

◻ (b) **শোষণের প্রকারভেদ (Types of absorption)** ঃ কোশপর্দা দিয়ে পদার্থের শোষণ দুটি উপায়ে হতে পারে। একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি এবং অপরটি সক্রিয় পদ্ধতি।

◆ A. নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption) ঃ

❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলি তাদের বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থান (অর্থাৎ কোশের বাইরে) থেকে তাদের কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে (অর্থাৎ কোশের ভিতরে) কোনো বিপাকীয় শক্তি-ব্যয় ছাড়া যেতে পারে অর্থাৎ শোষিত হয় সেই পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption) বলে।**

এই প্রকার শোষণ অভিস্রবণ এবং ব্যাপন দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটতে পারে। নিষ্ক্রিয় শোষণ কোশপর্দার ভেদ্যতার উপর নির্ভর করে। এই কোশপর্দার ভেদ্যতা আবার কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল, যেমন—(i) কোশপর্দার ছিদ্রের আকার, (ii) পদার্থের অণুর বা আয়নের আকার, (iii) বাহকের উপস্থিতি, (iv) তাপমাত্রা (v) তড়িৎ আধান ইত্যাদি।

◆ B. সক্রিয় শোষণ (Active absorption) ঃ

❖ **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলি বিপাকজাত শক্তি ব্যয় করে তাদের কম ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে তাদের বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থানে বাহকের মাধ্যমে প্রেরিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় শোষণ (Active absorption) বলে।**

সাধারণত উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়ন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে শোষিত হয়।

◎ বিভিন্ন পদার্থের শোষণ প্রক্রিয়া (Process of absorption of different substances) :

▲ A. জল শোষণ (Absorption of water) :
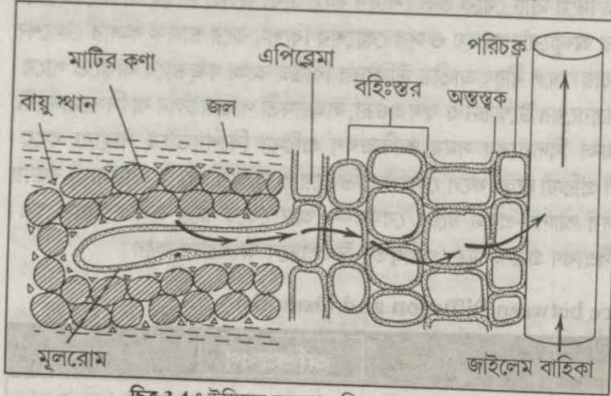
চিত্র 3.4 : উদ্ভিদের মূলরোম দিয়ে জল শোষণ।

❖ **জল শোষণের সংজ্ঞা**—যে পদ্ধতিতে বাহ্যিক পরিবেশ থেকে কোশের ভিতরে জল পরিবাহিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে জল শোষণ (Water absorption) বলে।

এই পদ্ধতিতে জলের অণুগুলি তাদের বেশি ঘনত্বের স্থান অর্থাৎ কম গাঢ় দ্রবণ থেকে জলের কম ঘনত্বের স্থান অর্থাৎ বেশি গাঢ় দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয়। এক্ষেত্রে জলের অণুর পরিমাপ (ব্যাস = 0·3 nm) কোশপর্দার ছিদ্রের মাপের (ব্যাস = 0·8 nm) চেয়ে ছোটো হওয়ায় কোনো শক্তির ব্যয় ছাড়াই নিষ্ক্রিয় ভাবে জলের অণুগুলি কোশের মধ্যে চলে যায়।

▲ B. আয়ন শোষণ (Absorption of ion) :

❖ **আয়ন শোষণের সংজ্ঞা** : যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলি আয়নীত অবস্থায় বা আয়ন হিসাবে কোশের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আয়ন শোষণ (Absorption of ion) বলে।

তড়িৎযুক্ত পরমাণুকে আয়ন বলে যেমন, Na^+, K^+, Cl^- ইত্যাদি খনিজ লবণ জলে বিশ্লেষিত হয়ে আয়নীত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ধনাত্মক আয়ন (Positively charged ion)-কে ক্যাটায়ন (Cation) এবং ঋণাত্মক আয়ন (Negatively charged ion)-কে অ্যানায়ন (Anion) বলে। জীবদেহের কোশে আয়ন শোষণ দু'ভাবে হতে পারে— 1. নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ এবং 2. সক্রিয় আয়ন শোষণ।

◆ 1. নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ (Passive absorption of ion) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— যে পদ্ধতিতে আয়নগুলি বিপাকীয় শক্তি খরচ ব্যতিরেকে কোশপর্দার ছিদ্রপথে সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ার সাহায্যে উচ্চ ঘনত্বযুক্ত বহিঃকোশীয় পরিবেশ বা স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বযুক্ত কোশের ভিতরে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে তাকে নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ (Passive absorption of ion) বলে।**

জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায় শক্তির ব্যবহার ছাড়া গড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই আয়নগুলি গাঢ়ত্বের অনুকূলে সাধারণ ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

(b) **নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণের কয়েকটি শর্ত**— (i) আয়ন এবং কোশপর্দার ছিদ্রের পরিমাপ। (ii) কোশপর্দার রন্ধ্রের এবং আয়নের তড়িৎধর্ম। রন্ধ্রের তড়িৎধর্ম ধনাত্মক হলে ঋনাত্মক আয়ন (বা অ্যানায়ন, যেমন Cl^-) ওই রন্ধ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। (iii) আয়নের গাঢ়ত্বের তফাত যতই বেশি হবে আয়ন শোষণ ততই বেশি হবে।

◆ 2. সক্রিয় আয়ন শোষণ (Active absorption of ion) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— যে পদ্ধতিতে পদার্থের আয়নগুলি পরিবেশ বা বহিঃকোশীয় মাধ্যমের কম ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কোশের মধ্যে বেশি ঘনত্বযুক্ত স্থানে বিপাকীয় শক্তি খরচের বিনিময়ে শোষিত হয় তাকে সক্রিয় আয়ন শোষণ (Active absorption of ion) বলে।**

চিত্র 3.5 : সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্প।

(b) **প্রক্রিয়া (The Process)**— সক্রিয় আয়ন শোষণ প্রক্রিয়াতে দুটি সমতড়িৎধর্মী আয়নের বিপরীতমুখী পরিবহন হতে পারে। যেমন— Na^+ এবং K^+ দুটি ধনাত্মক আয়নের পরিবহন। Na^+
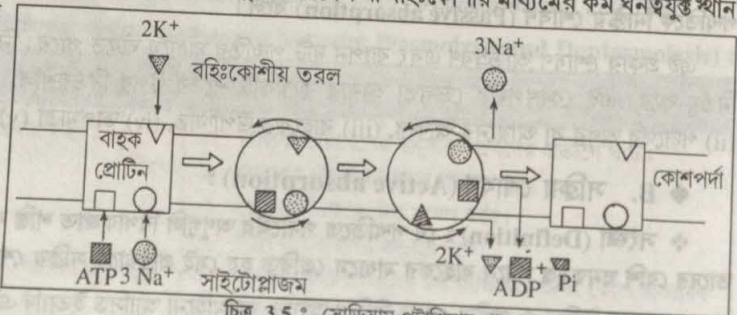
কোশের সাইটোপ্লাজম থেকে বহিঃকোশীয় তরলে আসে এবং K^+ বহিঃকোশীয় তরল থেকে কোশের সাইটোপ্লাজমে পরিবাহিত হয়। এই দুটি প্রক্রিয়া আয়নের গাঢ়ত্বের বিপরীত দিকে ঘটে— তাই এখানে শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি ATP থেকে আসে।

3.4. স্বাদুজল ও লবণাক্ত জলে বসবাসকারী প্রাণীদের অসমোরেগুলেশন (Osmoregulation in Fresh water and Marine animals)

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে। এর মধ্যে জলজ পরিবেশের প্রকারভেদ এবং সেখানে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জলজ পরিবেশ প্রধানত তিন প্রকার, যেমন—নদীতে বা পুকুরের স্বাদুজল, সামান্য লবণাক্ত নদী-মোহানার জল এবং অতিরিক্ত লবণাক্ত সমুদ্রের জল। এই সব জলজ পরিবেশে প্রাণীরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সুস্থভাবে জীবন যাপন করে। আবার জৈবিক প্রয়োজনে এক জলজ পরিবেশ থেকে অন্য জলজ পরিবেশে গমন করে এবং বিভিন্ন উপায়ে পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখে।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যেসব প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো জীব তাদের দেহে জল ও বিভিন্ন আয়নের স্থিরাবস্থা বজায় রাখতে চেষ্টা করে সেই পদ্ধতিগুলিকে একত্রে অসমোরেগুলেশন বলে।**

বেশিরভাগ প্রাণী তাদের রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসমোরেগুলেশন করে। এই সব কাজগুলি হল— দেহ থেকে জল বের করা অথবা দেহে জল ধরে রাখা এবং নাইট্রোজেন ঘটিত বিপাক পদার্থ দেহ থেকে মুক্ত করা, ইত্যাদি।

◘ (b) **প্রকারভেদ (Types) :** অসমোরেগুলেশনের ধর্ম অনুযায়ী প্রাণীদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়, এগুলি নিম্নরূপ—

1. **ভিন্ন অসমোটিক পরিবেশে বাঁচার ভিত্তিতে প্রাণীদের গোষ্ঠী (Animal groups based on ability to survive in different osmotic environments) :**

(i) **স্টেনোহ্যালাইন** (Stenohaline : Gr. *stenos* = narrow ; *hals* = sea) : যে সমস্ত প্রাণী পরিবেশে বিভিন্ন লবণ ও আয়নের পরিবর্তন সামান্য সহ্য করতে পারে তাদের স্টেনোহ্যালাইন বলে।

(ii) **ইউরিহ্যালাইন** (Euryhaline : Gr. *eurys* = wide; *hals* = sea) : যে সমস্ত প্রাণী পরিবেশে লবণ ও আয়নের পরিবর্তন সহ্য করার ক্ষমতা প্রচুর তাদের ইউরিহ্যালাইন বলে।

2. **অসমোরেগুলেশন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রাণীদের গোষ্ঠী (Groups of animals on the basis of Osmoregulatory property) :**

(i) **অসমোকনফরমার (Osmoconformers) :** যেসব প্রাণীর পরিবেশের অসমোটিক অর্থাৎ অভিস্রবণ ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের দেহের অভিস্রবণ বা অসমোটিক পরিবর্তন ঘটে তাদের অসমোকনফরমার বলে।

(ii) **অসমোরেগুলেটর (Osmoregulator) :** যেসব প্রাণী পরিবেশের অসমোটিক (অভিস্রবণ) পরিবর্তন হলে ও নিজেদের দেহের অসমোটিক (অভিস্রবণ) পরিবেশ পরিবর্তন করে না তাদের অসমোরেগুলেটর বলে। অসমোরেগুলেটর দু'প্রকারের, যেমন—

(a) **হাইপার অসমোরেগুলেটর** (Hyperosmoregulator)— যেসব প্রাণীর দেহে অসমোটিক ঘনত্বের পরিমাণ বাইরের পরিবেশের তুলনায় বেশি হয়, তাদের **হাইপারঅসমোরেগুলেটর** বলে।

(b) **হাইপোঅসমোরেগুলেটর** (Hypoosmoregulator)— যেসব প্রাণীর দেহে অসমোটিক ঘনত্বের পরিমাণ বাইরের পরিবেশের তুলনায় কম হয়, তাদের **হাইপোঅসমোরেগুলেটর** বলে।

▲ স্বাদুজলের এবং সামুদ্রিক প্রাণীদের অসমোরেগুলেশন (Osmoregulation in fresh water and Marine Animals) :

◆ A. স্বাদুজলের প্রাণীদের অসমোরেগুলেশন (Osmoregulation in Fresh water animals) :

চিত্র 3.6 : স্বাদু জলের টিলিয়স্ট মাছের অসমোরেগুলেশন।

1. **স্বাদুজলের টিলিয়স্ট জাতীয় মাছের অসমোরেগুলেশন** (Osmoregulation in fresh water teleost fish) :

(i) **সমস্যা** (Problems)—স্বাদুজলের মাছের দেহের

অসমোটিক চাপ কম এবং পরিবেশের অভিস্রবণ চাপ তুলনায় বেশি। এর ফলে মাছের দেহে জল প্রবেশ করবে এবং দেহ থেকে মূত্রের মাধ্যমে দেহের লবণ বেরিয়ে যেতে থাকবে।

(ii) **সমাধান** (Solution) — উপরের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য মাছের দীর্ঘ ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রচুর পরিমাণে লঘু মূত্র প্রস্তুত করে। এছাড়া বৃক্ক নালিকা ও ফুলকায় উপস্থিত বিশেষ কোশ সক্রিয় পদ্ধতিতে লবণ শোষণ করে।

2. **স্বাদুজলের উভচর এবং সরীসৃপ** জাতীয় প্রাণীরা প্রচুর পরিমাণে লঘু মূত্র (Dilute urine) তৈরি করে। এছাড়া এই প্রাণীরা ত্বক, বৃক্ক এবং আন্ত্রিক শ্লেষ্মা ঝিল্লির মাধ্যমে সক্রিয় পদ্ধতিতে Na^+, Cl^- এবং K^+ শোষণ করে।

◆ **B. সামুদ্রিক প্রাণীদের অসমোরেগুলেশন (Osmoregulation in Marine animals) ঃ**

1. **সামুদ্রিক টিলিয়স্ট জাতীয় মাছের অসমোরেগুলেশন** (Osmoregulation in Marine Teleost fish) ঃ
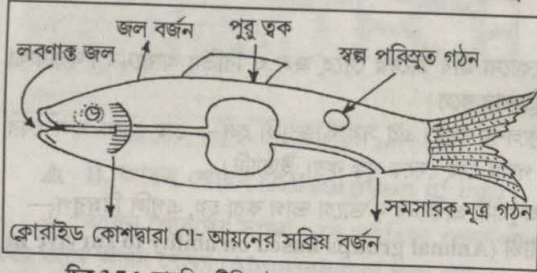
চিত্র 3.7 ঃ সামুদ্রিক টিলিয়স্ট মাছের অসমোরেগুলেশন।

(i) **সমস্যা** (Problems) — সামুদ্রিক টিলিয়স্ট মাছের দেহ থেকে ফুলকা, অন্ত্র ও ত্বকের মাধ্যমে জল বেরিয়ে যায়। এছাড়া ফুলকা ও গলবিলীয় পর্দার মাধ্যমে বিভিন্ন আয়ন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে।

(ii) **সমাধান** (Solution)—উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানে সামুদ্রিক মাছের ত্বক পুরু হয় এবং ত্বকের উপরে আঁশ ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি দেহ থেকে জলের বহির্গমনকে রোধ করে। এইসব মাছের ফুলকায় **ক্লোরাইড কোশ** (Chloride cell) অতিরিক্ত Cl^- এবং Na^+ আয়ন সক্রিয় পদ্ধতিতে দেহ থেকে মুক্ত করে।

2. **সামুদ্রিক তরুণাস্থিযুক্ত মাছের অসমোরেগুলেশন** (Osmoregulation in marine Elasmobranch fish) ঃ

(i) **সমস্যা** (Problems)—সামুদ্রিক তরুণাস্থিযুক্ত মাছের রক্তের মধ্যে ইউরিয়া ও ট্রাইমিথাইল অ্যামাইনো অক্সাইড (TMAO) প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে যার ফলে এদের কলারসের সামগ্রিক আয়নের ঘনত্ব সমুদ্র জলের থেকে কিছু বেশি হয়। এর ফলে সমুদ্র থেকে সামান্য পরিমাণ জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে।
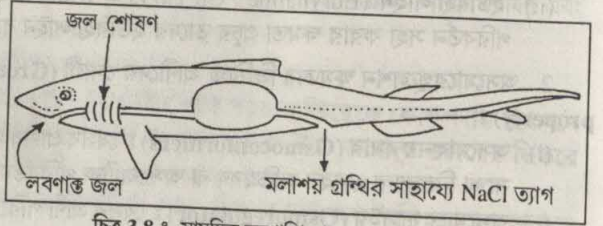
চিত্র 3.8 ঃ সামুদ্রিক তরুণাস্থি মাছের অসমোরেগুলেশন।

(ii) **সমাধান** (Solution) — তরুণাস্থিযুক্ত মাছের ফুলকা ও গলবিলীয় পর্দার মাধ্যমে দেহে জল প্রবেশ করে। এইসব মাছের মলাশয়ে উপস্থিত **মলাশয় গ্রন্থি** বা **রেকটাল গ্রন্থির** (Rectal gland) সাহায্যে NaCl নিঃসরণ করে।

3. **সামুদ্রিক উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী** (Marine amphibians, reptiles, birds and mammals) ঃ এইসব প্রাণীরা দীর্ঘ অন্ননালি এবং মূত্রাশয়ের মাধ্যমে জল শোষণ করে। এই প্রাণীরা বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে অতিরিক্ত লবণ দেহ থেকে বের করে, যেমন—(i) উভচর প্রাণী ত্বকের মাধ্যমে লবণ সক্রিয় পদ্ধতিতে বের করে। (ii) সরীসৃপ প্রাণীরা লবণ গ্রন্থি বা নাসিকা গ্রন্থির সাহায্যে লবণ পরিত্যাগ করে। (iii) পাখি তার নাসিকায় উপস্থিত লবণ গ্রন্থি বা সুপ্রাঅরবিটাল গ্রন্থির সাহায্যে ঘনীভূত লবণ পরিত্যাগ করে। (iv) স্তন্যপায়ী প্রাণীরা অধিক ঘন মূত্রের মাধ্যমে লবণ পরিত্যাগ করে।

● **যাযাবর মাছের শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptations in migratory fish) ঃ**

জৈবিক কারণে মাছ স্বাদু জলের নদী থেকে সমুদ্রের জলে অথবা সমুদ্র থেকে নদীতে পরিযান (Migration) করে। নদী ও সমুদ্রের জলে লবণের ঘনত্বের পার্থক্য অনেক বেশি হওয়ায় এইসব যাযাবর মাছ বিভিন্ন উপায়ে শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন ঘটিয়ে জলের লবণের পার্থক্য থেকে নিজেদের দেহকে রক্ষা করে।

মাছের যাযাবর ধর্মের উপর নির্ভর করে দু'প্রকার মাছ পাওয়া যায়, যেমন—**অ্যানাড্রমাস মাছ** (Anadromous fish) এবং **ক্যাটাড্রমাস মাছ** (Catadromous fish)। এই দু'প্রকার মাছের শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন এখানে বর্ণনা করা হল।

I. অ্যানাড্রমাস মাছ [Anadromous = Gr. *ana* = up (উপরে) *dromos* = a run (যাওয়া)] ঃ যেসব মাছ সমুদ্র থেকে নদীতে জৈবিক কারণে যায় তাদের অ্যানাড্রমাস মাছ বলে। **উদাহরণ**—ইলিশ, স্যামন, ঈল মাছ ইত্যাদি।

অভিযোজন (Adaptations) ঃ 1. ফুলকার আবরণী কোশের পরিবর্তন হয়, ফলে জল ঢুকতে পারে না। 2. এইসব মাছ নদীর জল থেকে NaCl শোষণ করে এবং সমুদ্রজলে NaCl বর্জন করে। 3. ফুলকায় অবস্থিত ক্লোরাইড কোশের সংখ্যা ও গঠনের পরিবর্তন হয়।

II. ক্যাটাড্রমাস মাছ [Catadromous = Gr. *cata* = down (নীচে), *dromos* = a run (যাওয়া)] ঃ যেসব মাছ নদী থেকে সমুদ্রে জৈবিক কারণে যায়, তাদের ক্যাটাড্রমাস মাছ বলে। **উদাহরণ**—ভেটকি মাছ।

অভিযোজন (Adaptations) ঃ 1. Na^+-এর সক্রিয় শোষণ ঘটে। 2. ফুলকায় ক্লোরাইড কোশের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 3. ফুলকা বেশি পরিমাণ লবণ নিঃসৃত করে।

○ অ নু শী ল নী ○

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) ঃ

1. (a) ব্যাপনের সংজ্ঞা দাও। (b) একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাপন প্রক্রিয়া আলোচনা করো। 2. ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহের বিবরণ দাও। 3. (a) আন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ বলতে কী বোঝো ? (b) ভেদ্যতার প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পর্দার বিবরণ দাও। 4. প্লাজমোলাইসিস্ ও ডিপ্লাজমোলাইসিস্ প্রক্রিয়াগুলি চিত্রসহ বর্ণনা করো। 5. নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় আয়ন শোষণ উদাহরণসহ বর্ণনা করো। 7. সামুদ্রিক প্রাণীদের অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) ঃ

1. ব্যাপন কাকে বলে ? 2. সহায়ক ব্যাপন বলতে কী বোঝো ? 3. অভিস্রবণের সংজ্ঞা দাও। 4. ভেদ্যপর্দা, অভেদ্য পর্দা ও অর্ধভেদ্য পর্দা বলতে কী বোঝো ? 5. প্রারম্ভিক প্লাজমোলাইসিস্ বলতে কী বোঝো ? 6. শোষণের সংজ্ঞা দাও। 7. সক্রিয় আয়ন শোষণ কখন ঘটে ? 8. অসমোরেগুলেশনের সংজ্ঞা দাও। 9. সামুদ্রিক টিলিয়স্ট জাতীয় মাছের লবণাক্ত মাধ্যমে বাঁচার জন্য কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) ঃ

1. বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলে অণুর গমনকে কী বলে ? 2. ব্যাপন মাধ্যমের বেশি হলে ব্যাপনের হার কী বাড়বে ? 3. প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে যে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে তাকে কী বলে ? 4. কোশ থেকে জল বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে কী বলে ? 5. সক্রিয় পরিবহন পদ্ধতিতে কোন্ উপাদান প্রয়োজন ? 6. স্বাদুজলের টিলিয়স্ট মাছ কোন্ ধরনের মূত্র প্রস্তুত করে ? 7. রেকটাল গ্রন্থি কোন্ মাছে পাওয়া যায় ? 8. ক্লোরাইড কোশ কোন্ মাছে পাওয়া যায় ?

D. টীকা লেখো (Write short notes) ঃ

1. ব্যাপন, 2. সহায়ক ব্যাপন, 3. অভিস্রবণ, 4. ডিপ্লাজমোলাইসিস্, 5. সক্রিয় শোষণ, 6. অসমোরেগুলেশন
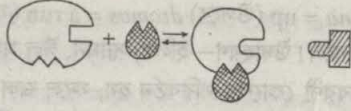
উৎসেচক

[ENZYME]

➧ **ভূমিকা (Introduction) :** সজীব কোশে বিভিন্ন জৈববস্তুর গঠন, ভাঙন, রূপান্তর ইত্যাদি বিপাক প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে ঘটে এবং প্রতিটি ধাপে একটি জৈববস্তু অণুঘটক হিসাবে কাজ করে। অণুঘটন ধর্মযুক্ত এই জৈববস্তুই **উৎসেচক** হল।

◎ 4.1.A. উৎসেচকের সংজ্ঞা, রাসায়নিক প্রকৃতি ও সাধারণ বিভাগ ◎ (Definition, Chemical nature and General division of Enzyme)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : প্রোটিন জাতীয় কলোয়েড প্রকৃতির যে জৈব অনুঘটক জীবকোশে উৎপন্ন হয়ে কোশের ভিতরে বা বাইরে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে সেই জৈব বস্তুকে উৎসেচক (Enzyme) বলে।**

◘ (b) **উৎসেচকের রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical nature of Enzyme) :** উৎসেচকের রাসায়নিক প্রকৃতি হল **প্রোটিন (গ্লোবিউলার প্রোটিন)**, তাই এগুলি কোলয়েড ধর্মী (ব্যতিক্রম—কিছু rRNA বিশেষ বিক্রিয়ায় উৎসেচকের ধর্ম দেখায় এবং এদের **রাইবোজাইম** (Ribozyme) বলে)। প্রোটিনজাতীয় হওয়ার ফলে সমস্ত উৎসেচক নির্দিষ্ট DNA কোড (Code) থেকে সৃষ্টি হয়। উৎসেচকের উপরিতলে **সক্রিয়মূলক** (Active radicle) বা **ক্রিয়াকেন্দ্র** থাকে। এই ক্রিয়াকেন্দ্র বিভিন্ন উৎসেচকে একই রকমের হয় না। যেমন—লাইপেজ, রেনিন, ফসফাটেজের সালফাইড্রিল মূলক (– SH group) এবং পেপসিনের হাইড্রোক্সিল মূলক (– OH group) উৎসেচকের ক্রিয়াকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

◘ (c) **উৎসেচকের সাধারণ বিভাগ (General divisions of Enzymes) :** রাসায়নিকভাবে উৎসেচকগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(i) **সরল প্রোটিন উৎসেচক** (Simple protein enzymes) এবং (ii) **জটিল প্রোটিন উৎসেচক** (Complex protein enzymes) বা **সংযুক্ত উৎসেচক** (Conjugated enzymes)। সংযুক্ত উৎসেচকের প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** (Apoenzyme) এবং প্রোটিনবিহীন অংশকে **প্রসথেটিক গ্রুপ** (Prosthetic group) বা **সহ-এনজাইম** (Co-enzyme) বলে। অ্যাপোএনজাইম এবং সহ-উৎসেচক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত থাকে। অ্যাপোএনজাইম ও সহ-উৎসেচক একত্রে যুক্ত হলে তাকে **হলোএনজাইম** (Holoenzyme) বলে।

◎ 4.1.B. উৎসেচকের ধর্ম (Properties of Enzyme) ◎

1. **সুনির্দিষ্টতা** (Specificity) : নির্দিষ্ট উৎসেচক শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিক্রিয়কের (Substrate) উপর কাজ করে। উদাহরণ—প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক অর্থাৎ প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক শুধু প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটায়, অন্য কোনো যৌগের যথা—কার্বোহাইড্রেট, লিপিড বা ফ্যাটের উপর ক্রিয়া করে না। তেমনই লাইপেজ লিপিডের উপর কাজ করে। অ্যামাইলেজ অ্যামাইলো বা শ্বেতসারের উপর কাজ করে।

2. **অনুঘটকোচিত ক্রিয়া** (Catalytic action) : উৎসেচক একধরনের জৈব অনুঘটক। এটি কোনো রকমের বিক্রিয়াকে শুরু করায় না, শুধুমাত্র বিক্রিয়ার হারকে বাড়ায় ও নিজে বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে।

3. **উষ্ণতা** (Temperature) : প্রতিটি উৎসেচকের সক্রিয়তা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বাধিক হয়, একে অনুকূল উষ্ণতা বলে। এই উষ্ণতা সাধারণত দেহের তাপমাত্রার (37°C) সমান হয়। প্রাণীর দেহে অনুকূল উষ্ণতা 30°-50° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

4. **অনুকূল pH** (Optimum pH) : কোশে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন হলে উৎসেচকের সক্রিয়তার পরিবর্তন হয়। একটি নির্দিষ্ট pH-এর সীমার মধ্যে একটি উৎসেচক সবথেকে বেশি সক্রিয় হয়, এবং এই pH-কে অনুকূল pH বলে। উদাহরণ—পাকস্থলির পাচক রসে পেপসিনের সক্রিয়তার pH-2 (অম্লিক pH) আবার অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিনের সক্রিয়তার pH-8·3 (ক্ষারীয় pH)।

5. **উভমুখীত্ব** (Reversibility) ঃ উৎসেচক বিক্রিয়ককে যেসব সরল বস্তুতে ভেঙে ফেলে সেইসব বস্তুগুলি একই উৎসেচক বিপরীতমুখে মূল বিক্রিয়ক উৎপাদন করে। উৎসেচকের এই ক্রিয়াকে **অ্যাম্ফিবোলিক বিক্রিয়া** (Amphibolic reaction) বলে। কোশের মধ্যে বিক্রিয়কের ঘনত্ব উৎসেচক ক্রিয়ার দিক নির্ধারণ করে।

6. **রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর ভূমিকা** (Role on chemical reaction) ঃ উৎসেচক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আরম্ভ করতে পারে না। রাসায়নিক পদ্ধতির মধ্যবর্তী বিক্রিয়াগুলিকে বা রাসায়নিক ধাপগুলিকে উদ্দীপিত অথবা প্রতিরোধ করে।

7. **উৎসেচকের ক্রিয়াশীলতা** (Activating action of enzyme) ঃ অল্প পরিমাণ উৎসেচক প্রচুর পরিমাণ বিক্রিয়কের উপর কাজ করে বিক্রিয়কের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তনগুলি কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল, যেমন—বিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া, অনুকূল অবস্থা বজায় রাখা, বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থকে বিক্রিয়ার স্থান থেকে অপসারিত করা ইত্যাদি।

8. **বিক্রিয়কের ঘনত্ব** (Substrate concentration) ঃ উৎসেচকের অনুঘটন বিক্রিয়া বিক্রিয়কের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। বিক্রিয়কের ঘনত্ব বেশি হলে একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত উৎসেচকের বিক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

9. **বিক্রিয়ালব্ধ উৎপাদিত পদার্থের ঘনত্ব** (Product Concentration) ঃ বিক্রিয়া স্থানে বিক্রিয়ালব্ধ সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হলে উৎসেচকের অনুঘটন বিক্রিয়া কমে যায়। একে **ফিড্ ব্যাক্ ইনহিবিশন** (Feed back Inhibition) বা **প্রোডাক্ট ইনহিবিশন** (Product Inhibition) বলে।

10. **প্রতিরোধকের উপস্থিতি** (Presence of Inhibitor) ঃ কোনো বিশেষ পদার্থের উপস্থিতিতে উৎসেচকের অনুঘটন বিক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই পদার্থকে **প্রতিরোধক** (Inhibitor) বলে।

4.2. উৎসেচকের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিন্যাস (Types or Classification of Enzymes)

1. **অক্সিডো-রিডাক্টেজ** (Oxido-reductases) ঃ **যেসব উৎসেচক একটি যৌগের জারণ ও অপর একটি যৌগের বিজারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের অক্সিডো-রিডাক্টেজ বা জারণ-বিজারণধর্মী উৎসেচক বলে।** এই প্রকার উৎসেচক একটি যৌগ থেকে হাইড্রোজেন (বা ইলেকট্রন) অপসারিত করে এবং অপর একটি যৌগের সঙ্গে সেই হাইড্রোজেন যুক্ত করে।

উদাহরণ—সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ প্রভৃতি।

বিক্রিয়া— (i) বিজারিত সাইটোক্রোম $+ \frac{1}{2} O_2 \xrightarrow[\text{অক্সিডেজ}]{\text{সাইটোক্রোম}}$ জারিত সাইটোক্রোম $+ H_2O$

(ii) পাইরুভিক অ্যাসিড $+ NADH + H^+ \xrightarrow[\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}]{\text{ল্যাকটিক}}$ ল্যাকটিক অ্যাসিড $+ NAD$
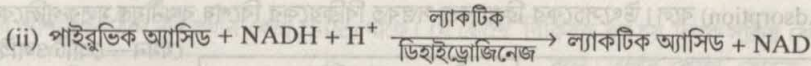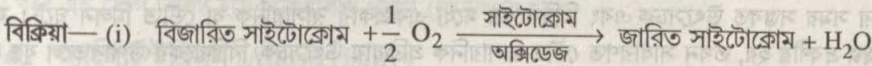
2. **হাইড্রোলেজ** (Hydrolase) ঃ **যেসব উৎসেচক জলের উপস্থিতিতে একযোজী বন্ধনীকে ভাঙতে সাহায্য করে তাদের হাইড্রোলেজ বা আর্দ্রবিশ্লেষণকারী উৎসেচক বলে।** হাইড্রোলেজ উৎসেচক এস্টার বন্ধনী, গ্লুকোসাইডিক বন্ধনী, পেপটাইড বন্ধনী, C-N বন্ধনী, C-C বন্ধনী, P-N বন্ধনীকে ভাঙতে সাহায্য করে।

উদাহরণ—প্রোটিয়েজ, লাইপেজ, সুক্রেজ, ফসফাটেজ ইত্যাদি।

বিক্রিয়া— (i) সুক্রোজ $+H_2O \xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ।

(ii) প্রোটিন $+H_2O \xrightarrow{\text{প্রোটিয়েজ}}$ পলিপেপটাইড
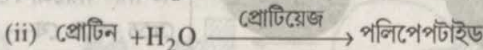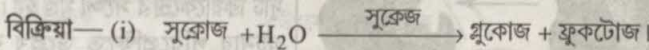
3. **লাইয়েজ** (Lyase) ঃ **যেসব উৎসেচক আর্দ্রবিশ্লেষণ ব্যতীত একটি যৌগের** (Substrate) **একটি কোভলেন্ট অর্থাৎ দ্বিবন্ধনীকে অটুট রেখে অন্য মূলক** (Group) **স্থানান্তরিত করে তাকে লাইয়েজ বা অনার্দ্র-বিশ্লেষণকারী উৎসেচক বলে।**

উদাহরণ—অ্যালডোলেজ, ফিউম্যারেজ ইত্যাদি।

বিক্রিয়া— ম্যালিক অ্যাসিড $\xrightarrow{\text{ফিউম্যারেজ}}$ ফিউম্যারিক অ্যাসিড $+ H_2O$।
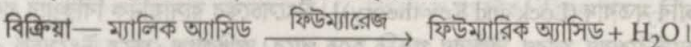
4. **ট্রান্সফারেজ** (Transferases) ঃ **যেসব উৎসেচক একটি যৌগ থেকে অন্য যৌগে বিভিন্ন রাসায়নিক মূলক (গ্রুপ), যেমন—অ্যামাইনোমূলক, কিটোমূলক, ফসফেট মূলক, অ্যালডিহাইড মূলক ইত্যাদিকে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করে তাদের ট্রান্সফারেজ উৎসেচক বলে।**

উদাহরণ—হেক্সোকাইনেজ, ফসফোরাইলেজ প্রভৃতি এই শ্রেণির উৎসেচক।

বিক্রিয়া— (i) হেক্সোজ + ATP —হেক্সোকাইনেজ→ হেক্সোকাইনেজ 6-ফসফেট + ADP।

(ii) গ্লুটামিক অ্যাসিড + অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড —ট্রান্স-অ্যামাইলেজ→ আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

5. **আইসোম্যারেজ (Isomerases) ঃ যেসব উৎসেচক একই বিক্রিয়ক পরমাণুর সজ্জাবিন্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য যৌগ উৎপাদনে অংশ নেয় তাকে আইসোম্যারেজ বলে।**

উদাহরণ—রেটিনিন আইসোম্যারেজ, ট্রায়োজ ফসফেট আইসোম্যারেজ ইত্যাদি।

বিক্রিয়া—গ্লুকোজ 6-ফসফেট —ফসফোহেক্সোজ আইসোম্যারেজ→ ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট

6. **লাইগেজ (Ligases or Synthetase) ঃ যেসব উৎসেচক দুটি যৌগ বা বিক্রিয়কের মধ্যে বন্ধন (Linkage) সৃষ্টি করে একটি নতুন যৌগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাকে লাইগেজ বা সিন্থেটেজ (সংশ্লেষণকারী) উৎসেচক বলে।**

উদাহরণ—সাক্সিনিক থায়োকাইনেজ, গ্লুটামিন সিন্থেটেজ প্রভৃতি।

বিক্রিয়া—সাক্সিনিক অ্যাসিড + কো-এনজাইম-এ + GTP —সাকসিনিক থায়োকাইনেজ→ সাকসিনিল কো-এনজাইম + GDP+Pi

✪ 4.3. উৎসেচকের কার্য পদ্ধতি ✪ (Mechanism of Action of Enzyme)

উৎসেচকের ক্রিয়া আলো, বাতাস, বিক্রিয়ার মাধ্যমের ক্ষারত্ব বা অম্লতা, উৎসেচকের ঘনত্ব, যৌগকের (সাবস্ট্রেটের) ঘনত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব পদার্থের উপর **উৎসেচক** কাজ করে তাকে **বিক্রিয়ক** (Substrate) বলে অর্থাৎ বিক্রিয়ক হল একটি প্রধান রাসায়নিক যৌগ যা উৎসেচকের প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়। বিক্রিয়ার ফলে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সরল বা জটিল **বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ** (Product) উৎপন্ন হয়।

উৎসেচকের ক্রিয়ার সময় সম্ভবত উৎসেচক এবং বিক্রিয়কের মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক বা ভৌত মিলন ঘটে। যখন বিক্রিয়ক অদ্রবণীয় বা স্বল্প দ্রবণীয় হয়, তখন সাধারণত ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎসেচক বিক্রিয়কের উপরিতলে যুক্ত হয়। একে পৃষ্ঠলগ্নতা (Adsorption) বলে। উৎসেচকের ক্রিয়াকেন্দ্র সম্ভবত বিক্রিয়কের বিশেষ বন্ধনীযুক্ত মূলকগুলিকে আক্রমণ করে, যেমন—প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক (প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচক) প্রোটিন অণুর পেপটাইট বন্ধনীকে বিশ্লিষ্ট করে।
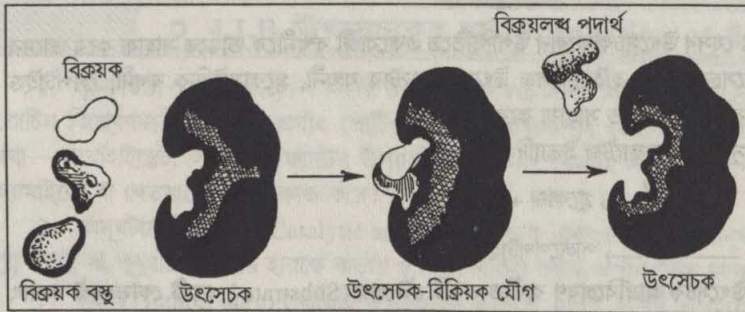
চিত্র 4.1 ঃ উৎসেচকের কার্য পদ্ধতির চিত্ররূপ।

অনেক বিক্রিয়ক উৎসেচকের দুটি ক্রিয়াকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে— উৎসেচক এবং বিক্রিয়কের মধ্যে ভৌত(পৃষ্ঠলগ্নতা) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রিয়া হয়, যেমন—**তালার** (Lock) মধ্যে **চাবি** (Key) প্রবেশ করে দেওয়ার মতো [**তালা-চাবি মতবাদ** (Lock and Key theory)]। উৎসেচকের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি বা প্রণালী সবক্ষেত্রে এক নয়। এই বিক্রিয়া আর্দ্রবিশ্লেষণ, জারণ, বিজারণ প্রভৃতি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসেচক একা ক্রিয়া করতে পারে না, তারা সহ-উৎসেচক (Co-enzyme), সক্রিয়কারক (Activator) ইত্যাদির সাহায্যে কাজ করে।

- **মাইকেলিস (Michaelis)** এবং **মেনটেন (Menten) মতবাদ**—এই মতবাদের উপর প্রধানত ভিত্তি করে উৎসেচক

ক্রিয়ার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী—উৎসেচক বিক্রিয়ক যৌগ **(Enzyme-substrate complex—ES)** তৈরির মাধ্যমে উৎসেচকের বিক্রিয়া ঘটে। দেখা গেছে যে, **বিক্রিয়ক (Substrate—S)** উৎসেচকের **(Enzyme—E)** সঙ্গে যুক্ত হয়ে **উৎসেচক-বিক্রিয়ক যৌগ** (Enzyme-substrate complex—ES) গঠন করে। এর পর এই অন্তর্বর্তী যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (Product—P) উৎপন্ন করে এবং উৎসেচক মুক্ত হয়।

$$E + S \rightleftharpoons ES\ ;\ ES \rightarrow P + E$$
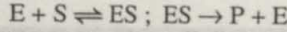
উৎসেচক ও বিক্রিয়কের বিক্রিয়ায় অনেক সময় একটি অন্তর্বর্তী যৌগ তৈরি না হয়ে পর পর একাধিক অন্তর্বর্তী যৌগ গঠিত হতে পারে যেমন— $E + S \rightleftharpoons ES_1 \rightleftharpoons ES_2 \rightleftharpoons ES_3 \cdots\cdots \rightarrow EP \rightarrow E + P$

উৎসেচকের আকৃতি বিক্রিয়কের আয়তনের তুলনায় অনেক গুণ বড়ো (প্রায় 500 গুণ) হয়। এই কারণে বিক্রিয়ক উৎসেচকের উপরিতলে খুব সীমিত স্থান দখল করে।

বিক্রিয়কের ঘনত্ব বাড়লে উৎসেচকের অনুঘটন ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পরে বেশি বিক্রিয়কের উপস্থিতিতেও উৎসেচকের ক্রিয়া বাড়ে না।

● **উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি**—উৎসেচক কীভাবে কাজ করে সেই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

1. **তালা-চাবি মতবাদ** (Lock and Key theory) ঃ বিজ্ঞানী **ফিসার** (Fischer—1894)-এর মতে প্রতিটি তালার জন্য যেমন নির্দিষ্ট চাবি থাকে তেমনি প্রতিটি **বিক্রিয়ক**(S)-এর জন্য নির্দিষ্ট **উৎসেচক** (E) আছে। চাবি দিয়ে বন্ধ তালা খোলার সময় যেমন চাবি এঁটে বসে তেমনি বিক্রিয়ার সময় উৎসেচকের একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া কেন্দ্র (Active centre)-এর সঙ্গে বিক্রিয়ক দখল করে ফলে একটি শিথিল অস্থায়ী **উৎসেচক-বিক্রিয়ক যৌগ** (Enzyme-Substrate complex—ES complex) গঠন করে। পরে এই যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে **বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ** (P) উৎপন্ন হয়।

চিত্র 4.2 ঃ তালা-চাবি মতবাদের চিত্ররূপ।

▲ অ্যালোস্টেরিজম্ (Allosterism) ঃ

উৎসেচকের আণবিক গঠনে দুটি প্রধান কেন্দ্র (Site) থাকে। যে কেন্দ্রে বিক্রিয়ক যুক্ত হয়, তাকে **সক্রিয় কেন্দ্র** (Active site) বলে। অপর কেন্দ্রে কোনো যৌগ বা এফেক্টর অণু (Effector molecule) যেমন— কো-ফ্যাক্টর (Co-factor), আবিষ্টক (Inducer), প্রতিরোধক (Inhibitor) বা বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ (Product) যুক্ত হতে পারে এবং এই কেন্দ্রকে **অ্যালোস্টেরিক** (Allosteric) বা **নিয়ন্ত্রক** (Regulatory) কেন্দ্র বলে। অ্যালোস্টেরিক কেন্দ্রে কোনো যৌগের অণু যুক্ত হলে উৎসেচকের সক্রিয় কেন্দ্রের গঠনের পরিবর্তন হয় যা উৎসেচক বিক্রিয়ার অনুকূলে (Positively) বা প্রতিকূলে (Negatively) যেতে পারে। উৎসেচকের সঙ্গে যে যৌগের সংযুক্তির ফলে উৎসেচক বিক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে **প্রতিরোধক** (Inhibitor) বলে। অপর দিকে যে যৌগের সংযুক্তির ফলে উৎসেচকের বিক্রিয়া আবিষ্ট হয়, তাকে **আবিষ্টক** (Inducer) বলে।
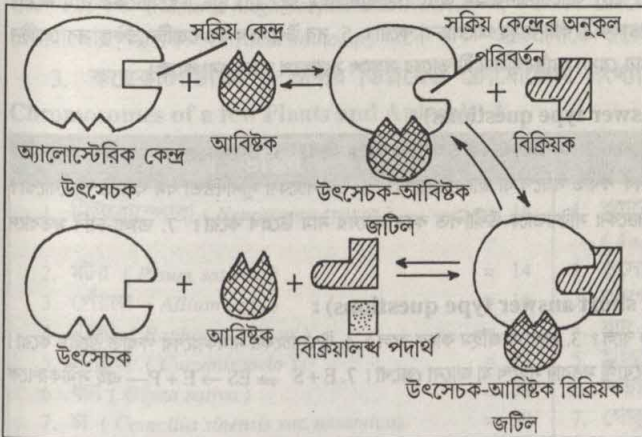
চিত্র 4.3 ঃ ধনাত্মক অ্যালোস্টেরিজম।

❖ (a) **অ্যালোস্টেরিজম্-এর সংজ্ঞা (Definition of Allosterism)** : উৎসেচকের যে ধর্মের ফলে উৎসেচকের এফেক্টর কেন্দ্রে কোনো পদার্থের অণু সংযুক্ত হলে উৎসেচকের সক্রিয় কেন্দ্রের (Active site) গঠন পরিবর্তিত হয়, ফলে উৎসেচক-অনুঘটন-বিক্রিয়া (Enzyme-catalyze-reaction) বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা আবিষ্ট হয়, তাকে অ্যালোস্টেরিজম্ (Allosterism) বলে।

(b) **অ্যালোস্টেরিজমের প্রকারভেদ (Types of allosterism)** : অ্যালোস্টেরিক কেন্দ্রে বিশেষ যৌগ (Effector) অণুর সংযুক্তির ফলে একটি নিষ্ক্রিয় উৎসেচক সক্রিয় হতে পারে, আবার একটি সক্রিয় উৎসেচক নিষ্ক্রিয় হতে পারে। এই ধর্ম অনুযায়ী উৎসেচকের দুই ধরনের অ্যালোস্টেরিজম দেখা যায়, যেমন—**পজিটিভ অ্যালোস্টেরিজম্ ও নেগেটিভ অ্যালোস্টেরিজম্।**

চিত্র 4.4 : ঋণাত্মকঅ্যালোস্টেরিজম।
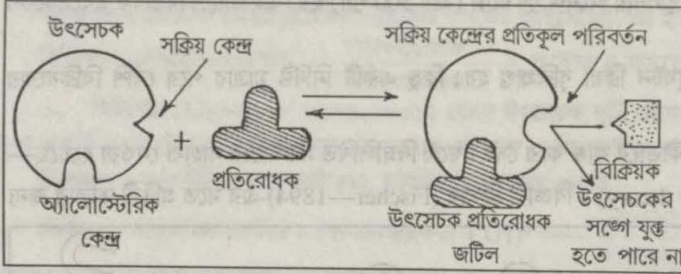
1. **ধনাত্মক (পজিটিভ অ্যালোস্টেরিজম্** (Positive allosterism) : যখন উৎসেচকের অ্যালোস্টেরিক সাইটে এফেক্টর অণুর সংযুক্তির ফলে যখন সক্রিয় (Active) কেন্দ্র বা ক্যাটালাইটিক্ (catalytic) কেন্দ্রের গঠন পরিবর্তিত হয়ে বিক্রিয়ক সংযুক্তির অনুকূলে হয়, তখন উৎসেচকের সেই প্রকার অ্যালোস্টেরিক ধর্মকে পজিটিভ অ্যালোস্টেরিজম্ বলে। এক্ষেত্রে এফেক্টর অণুটিকে **আবিষ্টক** (Inducer) বলে।

2. **ঋণাত্মক (নেগেটিভ) অ্যালোস্টেরিজম্** (Negative allosterism) : উৎসেচকের অ্যালোস্টেরিক সাইটে এফেক্টর অণুর সংযুক্তির ফলে যখন অ্যাক্টিভ কেন্দ্র বা ক্যাটালাইটিক্ কেন্দ্রের গঠন পরিবর্তিত হয় এবং সেখানে বিক্রিয়ক সংযুক্ত হতে পারে না, তখন উৎসেচকের সেই প্রকার অ্যালোস্টেরিক ধর্মকে নেগেটিভ অ্যালোস্টেরিজম্ বলে। এক্ষেত্রে এফেক্টর অণুটিকে প্রতিরোধক (Inhibitor) বলে।

○ অ নু শী ল নী ○

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. (a) উৎসেচক কী? (b) উৎসেচকের নামকরণ কীভাবে হয়? (c) একটি প্রোটিওলাইটিক এবং একটি লাইপোলাইটিক উৎসেচকের নাম লেখো। 2. (a) উৎসেচকের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান কী? (b) অ্যাপো-এনজাইম এবং কো-এনজাইম কী? (c) দুটি উৎসেচকের নাম করো। 3. উৎসেচকের বিভিন্ন ধর্মের বিবরণ দাও। 4. উৎসেচকের প্রভাবকারী কারণসমূহ আলোচনা করো। 5. সব উৎসেচক হল প্রোটিন, কিন্তু সব প্রোটিন উৎসেচক নয়—এর যথার্থতা উল্লেখ করো। 6. উৎসেচক ক্রিয়ায় যেসব ফ্যাক্টরগুলি দায়ী তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. উৎসেচকের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো। 2. অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক কাকে বলে? 3. উৎসেচকের প্রস্থেটিক মূলক কী? 4. মাইকেলিস এবং মেনটনের মতবাদ অনুযায়ী উৎসেচকের কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 5. উৎসেচকের সুনির্দিষ্টতা ধর্ম বলতে কী বোঝো? 6. Mg^{++}, Mn^{++}, Ca^{++} এবং Cl^{-} আয়নগুলি যেসব উৎসেচকের সক্রিয়তাকে উদ্দীপিত করে তাদের নাম উল্লেখ করো। 7. তালা-চাবি মতবাদে উৎসেচকের কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখো।

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. অ্যাপোএনজাইম কাকে বলে? 2. কো-ফ্যাক্টর কাকে বলে? 3. হলোএনজাইম কাকে বলে? 4. উৎসেচকের নামকরণের পদ্ধতি উল্লেখ করো। 5. হাইড্রোলেজ উৎসেচক কী? 6. উৎসেচক ক্রিয়ার আবিষ্ট-উপযোগী মতবাদ সম্বন্ধে যা জানো লেখো। 7. $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$— এই সমীকরণকে ব্যাখ্যা করো।

D. টীকা লেখো (Write notes on) :

1. কো-এনজাইম। 2. অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক। 3. হাইড্রোলেজ উৎসেচক। 4. ট্রান্সফারেজ। 5. মাইকেলিস ও মেনটেন মতবাদ।

ক্রোমোজোম
[CHROMOSOME]

○ ক্রোমোজোম (CHROMOSOME) ○

ভূমিকা (Introduction) : ক্রোমোজোম (Chromosome) শব্দটি গ্রিক ভাষার দুটি শব্দ থেকে এসেছে, যেমন — *Chroma* = রং এবং *soma* = দেহ বা বস্তু। অর্থাৎ কোশের মধ্যে এবং বিশেষ করে **নিউক্লিয়াসের** ভিতরে যে বস্তু গাঢ় রং ধারণ করে তাকেই ক্রোমোজোম বলে। বিজ্ঞানী **ওয়াল্ডেয়ার** (Waldeyer) 1888 খ্রিস্টাব্দে এই বস্তুকে ক্রোমোজোম নাম দেন। ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশগতির একক বা জিন এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়। এই কারণে **ক্রোমোজোমকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।**

❖ ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা (Definition of Chromosome) : **কোশের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত, সুতো বা রডের মতো দেখতে, নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি যে বস্তু জীবের বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিন ধারণ করে এবং এই জিন পরবর্তী বংশগুলিতে বহন করে সেই জৈব বস্তুকে ক্রোমোজোম বলে।**

1. **ক্রোমোজোম সংখ্যা (Chromosome number) :** ক্রোমোজোম একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিতে নির্দিষ্ট **সংখ্যায়** (Constant) থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা বিভিন্ন হয় এবং প্রতিটি জীবে ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে, কখনও তার তারতম্য হয় না। দেহকোশে প্রতিটি ক্রোমোজোমের দুটি সেট থাকে, তাই এগুলি **ডিপ্লয়েড (2n)** কোশ। অপরদিকে জননকোশ বা গ্যামেটে প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি সেট থাকে, তাই এগুলি **হ্যাপ্লয়েড (n)**। বীজের শস্য নিউক্লিয়াসে তিন সেট ক্রোমোজোম অর্থাৎ **ট্রিপ্লয়েড (3n)** সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। **হ্যাপ্লয়েড (n) অবস্থায় ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে জিনোম (Genome) বলে।**

2. **সবচেয়ে কম ও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত জীব (Organisms with Lowest and Highest number of Chromosomes) :**

(a) **উদ্ভিদ**— উদ্ভিদে সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া যায় রুটির ছাতা, *মিউকর হিমালিস* (*Mucor heimalis*)-এ, এখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 2n = 2। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রোমোজোম ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ—*অফিওগ্লসাম রেটিকিউলাটাম* (*Ophioglossum reticulatum*)-এ, 2n = 1260।

(b) **প্রাণী**—প্রাণীদেহে সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে ঘোড়ার গোলকৃমি *অ্যাসকারিস মেগালোসেফালা ইউনিভ্যালেন্স* (*Ascaris megalocephala univalens*)-এ, এখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 2n = 2। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রোমোজোম *আলকান্থা* (*Aulacantha sp*) নামে এক আদ্যপ্রাণীতে থাকে। এখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 2n = 1600।

3. **কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যার তালিকা (Chart for number of Diploid Chromosomes of a few Plants and Animals) :**

উদ্ভিদ		প্রাণী	
1. নিউরোস্পোরা (*Neurospora crassa*)	= 14	1. অ্যানোফিলিস বা কিউলেক্স মশা (*Anopheles maculatus or Culex fatigans*)	= 6
2. মটর (*Pisum sativum*)	= 14	2. ড্রসোফিলা (*Drosophila melanogaster*)	= 8
3. পেঁয়াজ (*Allium cepa*)	= 16	3. বাসগৃহের মাছি (*Musca nebulo*)	= 12
4. মুলো (*Raphanus sativus*)	= 18	4. ব্যাং (*Bufo melanostictus*)	= 22
5. তরমুজ (*Cucumis melo*)	= 22	5. হাইড্রা (*Hydra vulgaris*)	= 32
6. ধান (*Oryza sativa*)	= 24	6. বিড়াল (*Felis domesticus*)	= 38
7. চা (*Camellia sinensis var. assamica*)	= 30	7. গোরু (*Bos indicus*)	= 38
8. আপেল (*Malus sylvestris*)	= 34	8. বানর (*Macaca mulatta*)	= 42
9. গম (*Triticum aestivum*)	= 42	9. মানুষ (*Homo sapiens*)	= 46
10. আলু (*Solanum tuberosum*)	= 48	10. গাধা (*Equus caballus*)	= 62

5.1. ক্রোমোজোমের বহির্গঠন (Morphology of Chromosome)

ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের সুস্পষ্ট বহির্গঠন শুধুমাত্র কোশ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় যেমন— প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশায় দেখা যায়, ইন্টারফেজ দশায় দেখা যায় না। এর কারণ, ক্রোমোজোমের গাঠনিক তন্তু বিভাজন দশায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে ফলে ক্রোমোজোম মোটা ও ছোটো হয়; কিন্তু ইন্টারফেজ দশায় অকুণ্ডলী অবস্থায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে।
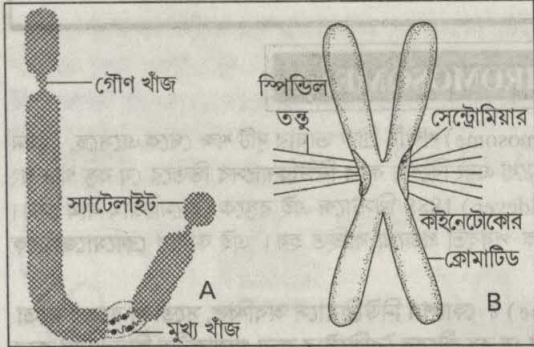
চিত্র 5.1 : A-ক্রোমোজোমের বহির্গঠন এবং B-একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোম।

1. **প্রাক প্রোফেজ দশায়** প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি **ক্রোমোনিমা** কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় দেখা যায়। ক্রোমোনিমার কুণ্ডলী দুরকমের হয়, যেমন—(a) **প্যারানেমিক কুণ্ডলী** (Paranemic coil)—এই কুণ্ডলীর তন্তুগুলি সহজেই পরস্পর থেকে পৃথক করা যায়; (b) **প্লেকটোনেমিক কুণ্ডলী** (Plectonemic coil)—এই কুণ্ডলীর তন্তুগুলিকে সহজে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না।

2. মিয়োসিস বিভাজনের প্রথম প্রোফেজ দশায় ক্রোমোনিমার তন্তুগুলি ঘনীভূত হয়ে ছোটো ছোটো দানার আকারে দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে **ক্রোমোমিয়ার** বলে। ক্রোমোমিয়ারগুলি একত্রিত হয়ে পলিটিন ক্রোমোজোমে ব্যান্ড গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোনিমার DNA ভাঁজ হয়ে আঁটসাট (Tight) অবস্থায় ক্রোমোমিয়ার গঠন করে।

চিত্র 5.2 : প্যারানেমিক ও প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী।

3. **মেটাফেজ দশায়** প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি সমআকৃতির ও সমজিনযুক্ত অংশ নিয়ে গঠিত হয় তাদের ক্রোমাটিড বলে। একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিডকে **সিস্টার ক্রোমাটিড** বলে।

4. ক্রোমোজোমের উভয় প্রান্তভাগকে **টেলোমিয়ার** (Telomere) বলে।

5. একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের সিস্টার ক্রোমাটিড দুটি যে স্থানে যুক্ত থাকে তাকে **প্রাথমিক বা মুখ্য খাঁজ** (Primary constriction) বা **সেন্ট্রোমিয়ার** (Centromere) বলে। সাধারণত একটি ক্রোমোজোমে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এবং একে **মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Monocentric chromosome) বলে। অস্বাভাবিক অবস্থায় দুটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার সহ কিছু অংশ যুক্ত হয়ে **ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Dicentric chromosome) গঠন করে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি ডিফিউজড় (Diffused) সেন্ট্রোমিয়ার পাওয়া যায় এবং এই ক্রোমোজোমকে **পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Polycentric chromosome) বলে। কোনো কারণে ক্রোমোজোম আড়াআড়িভাবে খণ্ডিত হয়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিহীন ক্রোমোজোমের যে অংশ সৃষ্টি হয় তাকে **আসেন্ট্রিক খণ্ড** (Acentric fragment) বলে। সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন আসেন্ট্রিক খণ্ড খুবই অস্থায়ী এবং শীঘ্রই এটি বিনষ্ট হয়।

6. সেন্ট্রোমিয়ারের দুদিকে ক্রোমোজোমের অংশকে **বাহু** (Arm) বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ওপর ক্রোমোজোমের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মাঝখানে অবস্থান করলে বাহু দুটি সম পরিমাপের হয় এবং এই ক্রোমোজোমকে **মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Metacentric chromosome বলে। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মধ্যস্থলের কাছাকাছি অবস্থান করলে ক্রোমোজোমের বাহু দুটির দৈর্ঘ্য সামান্য অসমান হয় এবং এই প্রকার ক্রোমোজোমকে **সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Submetacentric chromosome) বলে। সেন্ট্রোমিয়ার যখন ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগ অর্থাৎ টেলোমিয়ারের কাছে থাকে, সেই ক্রোমোজোমকে **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Acrocentric chromosome) বলে। এই ক্রোমোজোমের একটি বাহু লম্বা এবং অপর বাহুটি খুবই ছোটো। পরিশেষে সেন্ট্রোমিয়ার
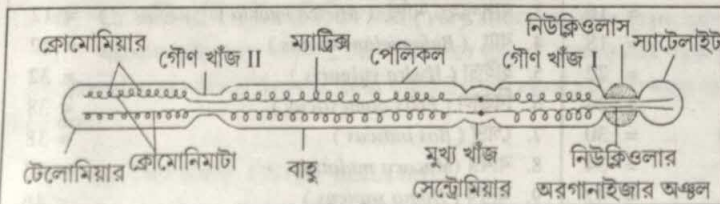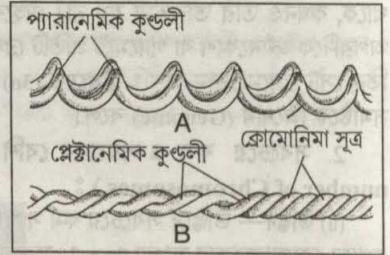
চিত্র 5.3 : পেলিকলসহ একটি ক্রোমোজোম।

ক্রোমোজোমের একেবারে প্রান্তদেশ বা টেলোমিয়ারে অবস্থান করলে সেই ক্রোমোজোমকে **টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Telocentric chromosome) বলে। এই ক্রোমোজোমের একটিমাত্র বাহু থাকে।

7. সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে গঠিত যে বিশেষ প্রোটিনজাতীয় তন্তুময় অংশ কোশ বিভাজনের সময় বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে **কাইনেটোকোর** (Kinetochore) বলে।

8. মুখ্য খাঁজ ছাড়া একটি দ্বিতীয় খাঁজ কোনো কোনো ক্রোমোজোমে পাওয়া যায়। এই খাঁজকে **গৌণ খাঁজ** (Secondary constriction) বলে। কোনো কোনো গৌণখাঁজ অঞ্চলকে **নিউক্লিওলার অরগানাইজার** (Nucleolar organizer) বলে। এই অঞ্চলে rRNA তৈরির জিন থাকে এবং এটি নিউক্লিওলাস গঠনে সহায়তা করে।

9. গৌণ খাঁজের পরে ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশে বালবের মতো বা বেলুনের মতো গোলাকার ক্রোমোজোমের যে অংশ পাওয়া যায় তাকে **স্যাটেলাইট** (Satellite) বা **স্যাট্ ক্রোমোজোম** (Sat chromosome) বলে। (মানুষের 13, 14, 15, 21, ও 22 তম ক্রোমোজোমে নিউক্লিওলার অরগানাইজার অঞ্চল পাওয়া যায় এবং এই ক্রোমোজোমগুলিতে স্যাটেলাইট অঞ্চল থাকে।)

10. বর্তমানে বিজ্ঞানী **টি. সুমনার** (T. Sumner, 2001) দেখান যে প্রতিটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমে একপ্রকার বহিঃস্তর থাকে। এই বহিঃস্তরটি প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয় এবং এটি ক্রোমোজোমকে সুরক্ষিত করে।

● প্রাথমিক খাঁজ ও গৌণ খাঁজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Primary constriction and Secondary constriction) :

প্রাথমিক খাঁজ	গৌণ খাঁজ
1. একটি ক্রোমোজোমের দু'টি ক্রোমাটিড যেখানে সংযুক্ত থাকে তাকেই মুখ্য খাঁজ বলে।	1. মুখ্য খাঁজ ছাড়া ক্রোমোজোমের অন্য খাঁজকে গৌণ খাঁজ বলে।
2. প্রাথমিক খাঁজকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে এবং এখানে কাইনেটোকোর থাকে।	2. গৌণ খাঁজে কাইনেটোকোর নেই।
3. অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমাটিড পৃথকীকরণের সময় সেন্ট্রোমিয়ার প্রথমে মেরুর দিকে যায়।	3. গৌণ খাঁজ অঞ্চল অ্যানাফেজ দশায় মেরুর দিকে প্রথমে যায় না।

● ক্রোমাটিড ও ক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Chromatid and Chromatin) :

ক্রোমাটিড	ক্রোমাটিন
1. কোশ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিড দেখা যায়।	1. ইন্টারফেজ দশায় ক্রোমাটিন দেখা যায়।
2. একটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দু'টি দণ্ডাকার বা সূত্রাকার ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে।	2. সূক্ষ্ম সূত্রাকার ক্রোমাটিন জালকাকারে নিউক্লিয়াসে ছড়িয়ে থাকে।
3. কোশ বিভাজনকালে ক্রোমাটিড সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।	3. বিভাজন দশায় ক্রোমাটিন ঘনীভূত হয়ে ক্রোমাটিড গঠন করে।

● সেন্ট্রোমিয়ার ও ক্রোমোমিয়ারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Centromere and Chromomere) :

সেন্ট্রোমিয়ার	ক্রোমোমিয়ার
1. ক্রোমোজোমের মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক সংকোচকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে।	1. ক্রোমোনিমার যে অংশ ঘনীভূত বা কুণ্ডলীকৃত হয়ে দানার আকার ধারণ করে তাকে ক্রোমোমিয়ার বলে।
2. ক্রোমোজোমে থাকে।	2. ক্রোমোনিমায় থাকে।
3. একটি ক্রোমোজোমে সাধারণত একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।	3. এগুলি অসংখ্য।
4. ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের স্থান নির্দিষ্ট।	4. ক্রোমোজোমে ক্রোমোনিমার দৈর্ঘ্য বরাবর বিভিন্ন স্থানে অনির্দিষ্টভাবে অবস্থান করে।
5. ক্রোমোজোমের নিষ্ক্রিয় স্থান অর্থাৎ কোনো জিন বহন করে না।	5. ক্রোমোজোমের সক্রিয় স্থান অর্থাৎ জিন বহন করে।
6. কোশ বিভাজনের সব দশাতেই সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।	6. মিয়োসিসের প্রথম প্রোফেজ দশায় ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় এবং পরে এগুলি অদৃশ্য হয়।

● **সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোজোমের গঠনগত প্রকারভেদ (Types of Chromosome according to the number of Centromere) :**
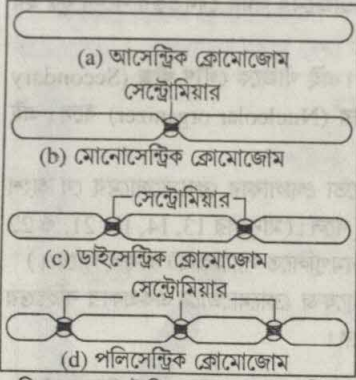
চিত্র 5.4 : সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোম।

(i) **আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Acentric Chromosome)**—যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না তাকে **আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** বলে। কোনো কারণে ক্রোমোজোম খণ্ডিত হলে আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তৈরি হয়। এই ক্রোমোজোম খুবই অস্থায়ী এবং শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(ii) **মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Monocentric Chromosome)**— একটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোজোমকে **মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** বলে।

(iii) **ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Dicentric Chromosome)**—যে ক্রোমোজোমে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে **ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** বলে। অস্বাভাবিক অবস্থায় দুটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারসহ কিছু অংশ যুক্ত হয়ে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম সৃষ্টি করে।

(iv) **পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Polycentric Chromosome)**—যে বিশেষ ক্রোমোজোমে অনেকগুলি ডিফিউজড (Diffused) সেন্ট্রোমিয়ার সমস্ত ক্রোমোজোম বরাবর ছড়িয়ে থাকে তাকে **পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম** বলে।

● **সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ (Types of Chromosome according to the Location of Centromere) :** সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং এর ফলে বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়, যেমন—

(a) **মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Metacentric Chromosome)**— এক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মাঝখানে অবস্থান করে। অ্যানাফেজ দশায় এই ক্রোমোজোম 'V' আকৃতির দেখায় এবং এর দুটি বাহু সমান হয়।

চিত্র 5.5 : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের গঠনের চিত্ররূপ।

(b) **সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Submetacentric Chromosome)**—এক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মধ্যস্থলের কাছে যে-কোনো একটি বাহুর দিকে সামান্য সরানো থাকে। এর ফলে ক্রোমোজোমের বাহুদুটির দৈর্ঘ্য অসমান হয় এবং অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলি 'L' বা 'J' আকারের হয়।

(c) **অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Acrocentric Chromosome)**—এই ধরনের ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশ অর্থাৎ টেলোমিয়ারের কাছে থাকে। এখানে ক্রোমোজোমের দুটি অসমান বাহু সৃষ্টি হয়; একটি বাহু লম্বা এবং অপর বাহুটি খুবই ছোটো। ক্রোমোজোমটি অ্যানাফেজ দশায় 'I'-এর মতো হয়।

(d) **টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম (Telocentric Chromosome)**—এই জাতীয় ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোজোমের একেবারে টেলোমেয়ার প্রান্তদেশে থাকে। এখানে একটিমাত্র বাহু পাওয়া যায় এবং অ্যানাফেজ দশায় এই ক্রোমোজোমকে দণ্ডের আকারে দেখা যায়।

✪ 5.2. জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরালতা ✪ (Parallelism between gene and chromosome)

মেন্ডেল (1865) মটর গাছের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বংশগতির বহু পরীক্ষানিরীক্ষা করেন; যেমন—মটর গাছের উচ্চতা, মটর বীজের রং, বীজের আকৃতি ইত্যাদি। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে মেন্ডেল বংশগতির কয়েকটি সূত্র উপস্থাপন করেন।

মেন্ডেলের মতানুযায়ী প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া ফ্যাক্টরের আন্তঃক্রিয়ার ফলে প্রকাশিত হয়। মেন্ডেল বর্ণিত এই ফ্যাক্টরকে এখন **জিন** বলে। একটি জিন (বা অ্যালিল) একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী এবং পিতা ও মাতার কাছ থেকে একটি করে জিন সন্তানের মধ্যে যায়। জিন বা অ্যালিলগুলি সাধারণত দুটি রূপে পাওয়া যায়, যেমন—**প্রকট জিন** (Dominant gene) এবং **প্রচ্ছন্ন জিন** (Recessive gene)। জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন জিনের আন্তঃক্রিয়ার ফলে প্রকাশ পায়।

মেন্ডেলের গবেষণার প্রায় 35 বৎসর পরে মেন্ডেল তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন হয় এবং বিজ্ঞানীরা দেখান যে বিভিন্ন ক্রোমোজোম জিনগুলি বহন করে এবং এক বংশ থেকে পরের বংশে ক্রোমোজোমের স্থানান্তকরণের মাধ্যমে জিনগুলির সঞ্চারণ ঘটে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরীক্ষা, তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, ক্রোমোজোমের সঙ্গে জিন বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং এর সাহায্যে জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরলতা দেখান।

চিত্র 5.6 : ক্রোমোজোমের সঙ্গে T ও t জিনের সঞ্চারণ।

● **জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরালতার প্রমাণ (Evidences of parallelism between Gene and Chromosome) :** নিম্নলিখিতকয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরলতা প্রমাণ করা যায়।

1. **মেন্ডেলীয় তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ** (Evidences from Mendelian Principles) : বিজ্ঞানী উইলিয়াম সাট্‌ন গ্যামেট গঠন ও নিষেকের সময় ক্রোমোজোম ও জিনের একই প্রকার বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ দেখেন এবং নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ভিত্তিতে ক্রোমোজোম ও জিনের সমান্তরালতা প্রমাণ করেন।

সাদা চোখযুক্ত স্ত্রী × স্বাভাবিক পুরুষ
(XX) (XY)
স্বাভাবিক ♀ সাদা চোখযুক্ত ♂
w = সাদা চোখের জিন
w^+ = স্বাভাবিক চোখের জিন

চিত্র 5.7 : X ক্রোমোজোমের সঙ্গে w ও w^+ জিনের সঞ্চারণ।

(i) জীবের ডিপ্লয়েড কোশে একজোড়া সমসংস্থ (Homologous) ক্রোমোজোম থাকে এবং এই ক্রোমোজোমগুলি কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি জিন (যেমন T ও t) পৃথকভাবে বহন করে।

(ii) মিয়োসিস্ কোশ বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটির পৃথকীকরণ ঘটে এবং একইভাবে জনন কোশ বা গ্যামেট গঠনের সময় দুটি জিন (যেমন T ও t) দুটি পৃথক গ্যামেটে অন্তর্ভুক্ত হয় (চিত্র 5.6)।

(iii) প্রতিটি গ্যামেটে সমসংস্থ যুগ্ম ক্রোমোজোমের একটি উপস্থিত থাকে এবং একইভাবে প্রতিটি গ্যামেটে যুগ্ম জিনের একটি বিন্যস্ত হয়।

(iv) নিষেকের সময় মাতৃজনু থেকে একটি এবং পিতৃজনু থেকে একটি ক্রোমোজোম জাইগোটে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটের পুনরাবির্ভাব ঘটে। একইভাবে জিনগুলি মাতৃজনু ও পিতৃজনু থেকে একটি করে গ্যামেটের মাধ্যমে এসে জাইগোটে মিলিত হয়ে যুগ্ম জিন সেট গঠন করে।

উপরে আলোচিত তথ্যের ভিত্তিতে **সাট্‌ন ও বোভেরি** (Sutton and Boveri) **"বংশগতির ক্রোমোজোমীয় তত্ত্ব"** (Chromosome theory of inheritance) প্রকাশ করেন।

তত্ত্বটি এইরূপ—ক্রোমোজোমগুলি মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টর বা জিন বহন করে এবং জিনগুলি ক্রোমোজোমের সঙ্গে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

2. **লিঙ্গ সংযোজিত বংশগতির সাহায্যে প্রমাণ (Evidence from sexlinked inheritance) :** বিজ্ঞানী মরগ্যান (Morgan) ড্রসোফিলা মাছির সাদা চোখের জন্য দায়ী জিন নিয়ে গবেষণা করেন এবং দেখান যে, এই জিনটি X ক্রোমোজোমে থাকে। মরগ্যান প্রমাণ করেন যে, ড্রসোফিলার সাদা চোখের জিনটি X ক্রোমোজোমের মাধ্যমে অপত্যজনুতে সঞ্চারিত হয়।

বিভিন্ন ক্রশের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, পুরুষ মাছির X ক্রোমোজোম সমস্ত জিন সহ পরবর্তী প্রজন্মে শুধু স্ত্রীমাছিতে সঞ্চারিত হয়, পুরুষ মাছিতে নয় (চিত্র 5.7)। এই তথ্যের সাহায্যে জিন ও ক্রোমোজোমের ভিতর সমান্তরালতা প্রমাণিত হয়।
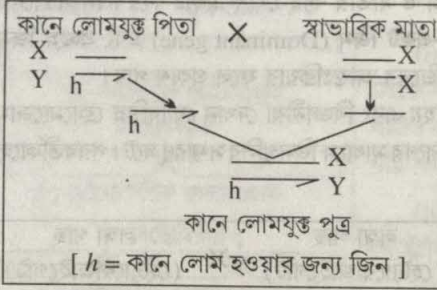
চিত্র 5.8 : মানুষের Y ক্রোমোজোমের সঙ্গে h জিনের সঞ্চারণ।

3. **Y-ক্রোমোজোম সংযোজিত জিনের বংশগতির সাহায্যে প্রমাণ (Evidence from the inheritance of Y-linked genes) :** মানুষের Y ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলিকে **হোলানড্রিক** (Holandric) জিন বলে। Y ক্রোমোজোম শুধুমাত্র পুরুষদের থাকে, তাই হোলানড্রিক জিনগুলি এক প্রজন্মের পুরুষ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের পুরুষে সঞ্চারিত হয়। যেমন— বহিঃকর্ণে লোম (Hairy pinna) বৈশিষ্ট্যটি একটি হোলানড্রিক জিন বহন করে। বাবার কানে লোম থাকলে, Y ক্রোমোজোমের মাধ্যমে এই জিন ছেলের কাছে যায় এবং ছেলের কানে লোম হয় (চিত্র 5.8)। জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরালতার প্রমাণে এটি একটি উপযুক্ত প্রমাণ।

5.3. ক্রোমোজোমের রাসায়নিক ধর্ম (Chemical properties of Chromosome)

প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোশের ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদানগুলি ভিন্ন ধরনের। মূল উপাদান জেনেটিক বস্তু হিসাবে দ্বিতন্ত্রী DNA উভয় গোষ্ঠীতে দেখা যায়।

(a) **প্রোক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের রাসায়নিক ধর্ম (Chemistry of Prokaryotic Chromosome) :** প্রোক্যারিওটিক কোশে যে ক্রোমোজোম থাকে তাকে **প্রোক্যারিওটিক ক্রোমোজোম** বলে। এইপ্রকার ক্রোমোজোম একটি চক্রাকার দ্বিতন্ত্রী DNA অণু নিয়ে গঠিত হয়। এই DNA অণুতে সব জিনগুলি সারিবন্ধভাবে অবস্থান করে। প্রোক্যারিওটিক কোশে মাত্র একসেট জিন উপস্থিত থাকে, তাই প্রোক্যারিওটকে **মোনোপ্লয়েড** (Monoploid) বলে। প্রোক্যারিওট ক্রোমোজোমে শুধুমাত্র DNA থাকে, কোনো ক্রোমোজোমীয় প্রোটিন থাকে না—তাই প্রোক্যারিওটের DNA-কে **নগ্ন DNA** (Naked DNA) বলা হয়।

(b) **ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের রাসায়নিক ধর্ম (Chemistry of Eukaryotic Chromosome) :** ইউক্যারিওটিক কোশে ক্রোমোজোমগুলি যে পদার্থ বা বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তাকে **ক্রোমাটিন** (Chromatin) বলে। ক্রোমাটিন যে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় তাকে **নিউক্লীয় প্রোটিন** (Nucleoprotein) বলে। নিউক্লীয় প্রোটিনে **নিউক্লিক অ্যাসিড**, (যেমন— DNA ও RNA) এবং **প্রোটিন** থাকে।

নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকারভেদ (Types of Nucleic Acid)

▲ নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid) :

❖ **নিউক্লিক অ্যাসিডের সংজ্ঞা (Definition of Nucleic acid) : যে দীর্ঘ, পলিমার জৈব যৌগ প্রধানত নিউক্লিয়াসে ও সাইটোপ্লাজমে থাকে এবং যে যৌগ নিউক্লিওটাইড একক দিয়ে গঠিত হয় তাকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলে।**

নিউক্লিক অ্যাসিড (1) ফসফোরিক অ্যাসিড, (2) পেন্টোজ শর্করা ও (3) নাইট্রোজেন বেস বা ক্ষার দিয়ে তৈরি হয়। দুই প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, যেমন—(a) ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA (b) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA

1. **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic Acid—DNA) :**

❖ **DNA-এর সংজ্ঞা (Definition of DNA) : স্বপ্রজননশীল, পরিব্যক্তিক্ষম যে দীর্ঘ দ্বিতন্ত্রী জৈব অণু সজীব কোশের সমস্ত জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, জীবের বংশগত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহকের কাজ করে এবং যা নাইট্রোজেন বেস**

[অ্যাডেনিন (A), থায়ামিন (T), গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C)] ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা ও ফসফোরিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত হয় তাকে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA বলে।

2. রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic Acid—RNA) :

❖ **RNA-র সংজ্ঞা (Definition of RNA) :** যে নিউক্লিক অ্যাসিড একতন্ত্রী ও রাইবোজ শর্করা দিয়ে গঠিত হয় এবং যেখানে নাইট্রোজেন বেস হিসাবে অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও ইউরাসিল (U) উপস্থিত থাকে তাকে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA বলে।

● **DNA এবং RNA-র মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য (Major differences between DNA and RNA) :**

DNA	RNA
1. DNA অণু দ্বিতন্ত্রী অর্থাৎ দুটি রজ্জুর মতো অংশ নিয়ে তৈরি।	1. RNA অণু প্রধানত একতন্ত্রী অর্থাৎ একটি রজ্জুর মতো অংশ নিয়ে তৈরি।
2. DNA অণু সর্পিলাকারে বিন্যস্ত থাকে।	2. RNA অণু সাধারণত রেখাকারভাবে বিন্যস্ত থাকে।
3. কোশের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে বেশি পরিমাণে থাকে।	3. কোশের সাইটোপ্লাজমে বেশি পরিমাণে থাকে।
4. পাঁচ-কার্বনযুক্ত ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা থাকে।	4. পাঁচ-কার্বনযুক্ত রাইবোজ শর্করা থাকে।
5. অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থায়ামিন নামে চারটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক থাকে।	5. অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল নামে চারটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক থাকে।
6. DNA সর্বদাই বংশগতির ধারক ও বাহক।	6. RNA প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটায় এবং যেখানে DNA থাকে না (যেমন—তামাক পাতার ভাইরাস) সেখানে RNA বংশগতির ধারক ও বাহকের কাজ করে।

✪ 5.4.A. DNA-এর ভৌত গঠন (Physical structure of DNA) ✪

◘ DNA-এর ভৌত গঠন : ওয়াটসন ও ক্রিকের মডেল (Watson and Crick Model) :

1. DNA অণুর X-রে ডিফ্রাক্‌শন্ (X-ray diffraction)-এর চিত্র পর্যালোচনা করে ওয়াটসন ও ক্রিক 1953 খ্রিস্টাব্দে **DNA অণুর ভৌত গঠন** সম্পর্কে যে মডেল উপস্থাপন করেন তাকে **ওয়াটসন ও ক্রিকের মডেল** বলে।

2. এই মডেল অনুযায়ী প্রতিটি DNA অণু দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল দিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি শৃঙ্খল দক্ষিণমুখী আবর্তনের সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি দ্বিতন্ত্রী গঠন সৃষ্টি করে।

চিত্র 5.9 : জে. ডি. ওয়াটসন   এফ্. এইচ. সি. ক্রিক

3. একটি DNA অণুর শৃঙ্খল বা হেলিক্স (Helix) দুটি পরস্পরের **বিপরীত-সমান্তরাল (Anti-parallel)** ভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ শৃঙ্খল দুটি পরস্পরের সমান্তরাল কিন্তু তাদের $5' \rightarrow 3'$ (5 প্রাইম $\rightarrow$ 3 প্রাইম) মেরুত্ব বিপরীতমুখী।

4. এই DNA শৃঙ্খল বা হেলিক্সের মূল কাঠামো শর্করা-ফসফেট গঠন করে যার সঙ্গে N-বেসগুলি সমকোণে যুক্ত হয়। একটি শৃঙ্খলের N-বেস অপর শৃঙ্খলের N-বেসের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনীর (Bond) সাহায্যে যুক্ত থাকে।

5. একটি শৃঙ্খলের পিরিমিডিন বেস, অপর শৃঙ্খলের পিউরিন বেসের সঙ্গে যুক্ত হয়, যেমন—পিরিমিডিন বেস থায়ামিন

(T), পিউরিন বেস অ্যাডেনিনের (A) সঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে যুক্ত হয় (A = T)। অপর পিরিমিডিন বেস সাইটোসিন (C), পিউরিন বেস গুয়ানিনের (G) সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে যুক্ত হয় (C ≡ G)।

6. একটি DNA শৃঙ্খলের পরপর দুটি N-বেসের দূরত্ব 3·4Å হয়। দ্বিতন্ত্রী DNA কুন্ডলীর ব্যাস 20Å হয়। DNA-এর দুটি শৃঙ্খল পেঁচিয়ে থাকার ফলে একটি মুখ্য খাঁজ (Major groove) ও একটি গৌণ খাঁজের (Minor groove) সৃষ্টি হয় সেগুলি একান্তর ভাবে (Alternately) DNA শৃঙ্খলে থাকে।

7. দুটি মুখ্য খাঁজের মধ্যে দূরত্বে প্রায় 10 জোড়া N-বেস থাকে এবং এর পরিমাপ প্রায় 34 Å হয়।

একটি হেলিক্সের বেসগুলি যদি 5′ ACTGGTTAA 3′ হয় তবে অপর পরিপূরক DNA হেলিক্সের বেসগুলি হবে 3′TGACCAA TT5′ অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দ্বিতন্ত্রী DNA-টি নিম্নরূপ হবে।

চিত্র 5.10 : (A) দ্বিতন্ত্রী DNA-এর হেলিক্যাল নক্সা চিত্র, (B) নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সজ্জা বিন্যাস, (C) DNA-এর রাসায়নিক গঠন।

```
5′  A  C  T   G  G  T  T  A  A  3′
    ‖  ‖‖ ‖   ‖‖ ‖‖ ‖  ‖  ‖  ‖
3′  T  G  A   C  C  A  A  T  T  5′
```
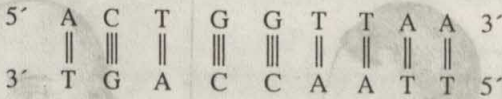
◘ DNA-এর কাজ (Functions of DNA) : 1. প্রতিলিপি গঠনের (Replication) মাধ্যমে DNA বংশগতির বৈশিষ্ট্য মাতৃকোশ থেকে অপত্যকোশে বা এক বংশ থেকে পরের বংশে সঞ্চারিত করে।

2. প্রথমে RNA ও পরে পলিপেপটাইড সংশ্লেষের মাধ্যমে DNA-তে নিহিত জৈব তথ্য (Biological information) প্রকাশিত হয়।

✪ 5.4.B. DNA-এর প্রতিলিপি গঠন (Replication of DNA) ✪

কোশ চক্রের একটি নির্দিষ্ট দশায় কোশ বিভাজন ঘটে। কিন্তু কোশ বিভাজনের পূর্বেই মাতৃ-কোশের DNA বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য DNA অণু গঠিত হয়। এই অপত্য DNA অণু দুটির গঠন ও ধর্ম একই প্রকার এবং এগুলি মাতৃ DNA অণুর ও সমান ধর্মের হয়। জীবের সব জেনেটিক বার্তা DNA বহন করে। সুতরাং কোশ বিভাজনের সময় DNA অণুর গঠনগত স্থিরতা একান্তই আবশ্যক। এর ফলে মাতৃকোশের সব ধর্ম অপত্য কোশে বর্তায়। DNA অণুর যে ধর্মের ফলে

মাতৃ DNA অণু বিভাজিত হয়ে দুটি একই প্রকার অপত্য DNA অণু গঠিত হয়, তাকে **স্বঅনুঘটন ধর্ম** (Autocatalytic property) বলে।

সাধারণত DNA অণু দ্বিতন্ত্রী অবস্থায় থাকে (ব্যতিক্রম—ব্যাকটিরিওফাজ $\phi \times$ 174-এ DNA অণু একতন্ত্রী)। একটি DNA অণুর দুটি তন্ত্রী (Strand) বা হেলিক্স (Helix) সমান্তরালভাবে ও বিপরীতমুখী অবস্থায় দেখা যায়। অর্থাৎ একটি DNA হেলিক্সের 3´ (3 প্রাইম) ও 5´ (5 প্রাইম) প্রান্ত অপর DNA হেলিক্সের বিপরীত। DNA অণুর দুটি হেলিক্স পরস্পরের সঙ্গে পরিপূরক নাইট্রোজেন বেসের সাহায্যে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে একটি হেলিক্সের পিউরিন বেস অপর হেলিক্সের পিরিমিডিন বেসের সঙ্গে দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে যুক্ত হয়। যেমন পিউরিন বেস অ্যাডেনিন (A) ও গুয়ানিন (G) যথাক্রমে থায়ামিন (T) ও সাইটোসিন (C) নামের পিরিমিডিন বেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। DNA অণুর উপরিলিখিত ধর্মগুলি DNA-র প্রতিলিপি গঠনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চিত্র 5.11 : টেমপ্লেটতন্ত্র অনুসরণ করে নতুন DNA সংশ্লেষ।

❖ (a) **DNA-এর প্রতিলিপি গঠনের সংজ্ঞা (Definition of DNA Replication) : যে পদ্ধতির সাহায্যে মাতৃ DNA অণুর হেলিক্স দুটি টেমপ্লেট (Template) বা ছাঁচের কাজ করে এবং প্রতিটি টেমপ্লেটকে অনুসরণ করে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড (Deoxyribonucleotide)-গুলির পরিপূরক বেস পেয়ারিং (Complementary base pairing)-এর মাধ্যমে দুটি অপত্য DNA অণু গঠিত হয়, সেই পদ্ধতিকে DNA-এর প্রতিলিপি গঠন বলে।**

◘ (b) **DNA প্রতিলিপি গঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General feature of DNA replication) :**

1. **DNA-র প্রতিলিপি গঠন দ্বিমুখী অর্থাৎ উভয় মুখে ঘটে**— DNA-র প্রতিলিপি গঠন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে শুরু হয়; একে প্রারম্ভিক বিন্দু বা Origin বলে। এই স্থান থেকে DNA-অণুর দু'দিকে DNA সংশ্লেষ ঘটে।

2. **DNA প্রতিলিপি গঠন 5´ → 3´ অভিমুখে ঘটে**— DNA অণুর 3´ প্রান্তে – OH মূলক থাকে; তাই এই প্রান্তে নতুন নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং DNA সংশ্লেষ 5´ → 3´ অভিমুখে ঘটে।

3. **মাতৃ DNA অণুর দুটি তন্ত্র বা হেলিক্স টেমপ্লেট বা ছাঁচ হিসাবে কাজ করে**— মাতৃ DNA-র দুটি হেলিক্স বা তন্ত্রী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একতন্ত্রী টেমপ্লেট গঠন করে। এই টেমপ্লেট DNA-কে অনুসরণ করে পরিপূরক বেস পেয়ারিং (Complementary base pairing)-এর সাহায্যে নতুন ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড সংযোজিত হয়।

4. **DNA প্রতিলিপি গঠনের একককে রেপ্লিকন (Replicon) বলে**— DNA অণুর যে একক অংশে একটি নির্দিষ্ট প্রতিলিপি গঠনের প্রক্রিয়া ঘটে তাকে **রেপ্লিকন** বলে। প্রতিটি রেপ্লিকনে একটি প্রারম্ভিক বিন্দু (origin) এবং দুটি টারমিনাস (Terminus) থাকে। প্রোক্যারিওটে একটিমাত্র রেপ্লিকন কিন্তু ইউক্যারিওটে বহু রেপ্লিকন থাকে।

5. **DNA প্রতিলিপি গঠন সেমিকনজারভেটিভ (Semiconservative) পদ্ধতিতে ঘটে**— মাতৃ DNA অণুর দুটি তন্ত্রী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং প্রতিটি তন্ত্রীকে অনুসরণ করে নতুন DNA তন্ত্রী গঠিত হয়। এর ফলে প্রতিটি অপত্য দ্বিতন্ত্রী DNA অণুর একটি তন্ত্রী মাতৃ DNA অণু থেকে আসে এবং অপর তন্ত্রীটি নতুন করে সংশ্লেষিত হয়। এইরূপ DNA বিভাজনের পদ্ধতিকে **সেমিকনজারভেটিভ্ রেপ্লিকেশন** বলে।

6. **DNA প্রতিলিপি গঠন অর্ধবিচ্ছিন্ন বা সেমিডিসকনটিন্যুয়াস্ (Semidiscontinuous) পদ্ধতিতে ঘটে**— DNA সংশ্লেষের সময় একটি তন্ত্রীতে ধারাবাহিক বা অবিচ্ছিন্নভাবে (Continuously) এবং অপর তন্ত্রীতে বিচ্ছিন্নভাবে (Discontinuously) অর্থাৎ ছোটো ছোটো খণ্ডে প্রতিলিপি গঠিত হয়। সুতরাং মাতৃ DNA অণুর দুটি তন্ত্রী থেকে DNA সংশ্লেষ পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে **অর্ধবিচ্ছিন্ন** প্রকৃতির সংশ্লেষ বলা যায়।

7. **DNA প্রতিলিপি গঠনের জন্য RNA প্রাইমার (Primer) গঠন আবশ্যিক**—DNA সংশ্লেষের প্রারম্ভিক পর্যায়ে টেমপ্লেট তন্ত্রীকে অনুসরণ করে যে ক্ষুদ্র RNA অণুর সংশ্লেষ ঘটে, তাকে **RNA প্রাইমার** বলে।

(c) DNA প্রতিলিপি গঠনের প্রক্রিয়া (Mechanism of DNA synthesis) ঃ প্রোক্যারিওট কোশে এবং ইউক্যারিওট কোশে DNA সংশ্লেষের মূল প্রক্রিয়া একই রকম। এই দুটি তন্ত্রে উৎসেচকজনিত কিছু পার্থক্য বর্তমান। এছাড়া প্রোক্যারিওটে একটিমাত্র স্থানে প্রতিলিপি গঠন শুরু হয় কিন্তু ইউক্যারিওটে একসঙ্গে বহুস্থানে প্রতিলিপি গঠন শুরু হয়। DNA-এর প্রতিলিপি গঠন তিনটি ধাপে সমাপ্ত হয়, যেমন—**প্রারম্ভিক পর্যায়, শৃঙ্খল সম্প্রসারণ** এবং **শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ**। প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ ঃ
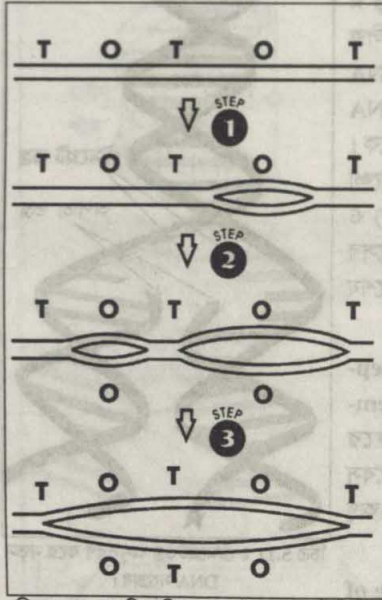
চিত্র 5.12 ঃ দুটি রেপ্লিকনে DNA-এর প্রতিলিপি গঠন— (1) প্রারম্ভিক পর্যায়, (2) শৃঙ্খল সম্প্রসারণ, (3) শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ। O = প্রারম্ভিক বিন্দু, T = টারমিনাস।

● **I. প্রারম্ভিক পর্যায় (Initiation)** ঃ 1. DNA সংশ্লেষের সূচনাতে দুটি ঘটনা ঘটে। (i) **গাইরেজ** (Gyrase) উৎসেচকের সহায়তায় অতিকুণ্ডলীকৃত (Supercoiled) DNA অণুর অকুণ্ডলীকরণ (Uncoiling) ঘটে, (ii) **হেলিকেজ** (Helicase) উৎসেচকের সহায়তায় DNA অণুর দুটি তন্ত্রীর মাঝে হাইড্রোজেন বন্ধনী বিনষ্ট হয় এবং DNA-র দুটি তন্ত্রী পৃথক হয়ে প্রতিলিপি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় টেমপ্লেট (Template) গঠন করে যা ছাঁচ হিসাবে কাজ করে।

2. মাতৃ DNA অণুর টেমপ্লেট তন্ত্রী দুটিকে অনুসরণ করে পরিপূরক বেস পেয়ারিং পদ্ধতির সাহায্যে নতুন নিউক্লিওটাইড সংযোজিত হয়।

3. প্রথমে একটি 8-9 নিউক্লিওটাইড যুক্ত RNA খণ্ড সৃষ্টি হয় এবং একে **RNA প্রাইমার** (RNA primer) বলে। **প্রাইমেজ** (Primase) উৎসেচক ও কয়েকটি প্রোটিনযুক্ত প্রাইমোজোম (Primosome) নামে এক জটিল বস্তুর সহায়তায় RNA প্রাইমার গঠিত হয়। **SSB** (Single strand binding) **প্রোটিন** একতন্ত্রী টেমপ্লেট DNAকে সুরক্ষিত করে।

● **II. শৃঙ্খল সম্প্রসারণ (Chain Elongation)** ঃ 1. RNA প্রাইমারের 3′– OH প্রান্তে পরিপূরক ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিওটাইডগুলি **ফসফোডাইএস্টার** (Phosphodiester) **বন্ডের সাহায্যে DNA পলিমারেজ** (DNA polymerase III in *E. coli.*) উৎসেচকের মধ্যস্থতায় একে একে যুক্ত হয়।

2. একটি রেপ্লিকনের মধ্যবিন্দুতে DNA সংশ্লেষ শুরু হয় এবং বর্ধনশীল শৃঙ্খলের 5′ → 3′ অভিমুখে নতুন ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড সংযোজনের মাধ্যমে শৃঙ্খলের সম্প্রসারণ ঘটে।

3. এই সময় রেপ্লিকনটি দেখতে **বাব্‌ল** (Bubble) বা **চোখের** (Eye) আকার ধারণ করে এবং একটি বাব্‌লের অর্ধাংশ **ফর্কের** (Fork) মতো দেখতে হয়। ফর্কের একদিকে DNA সংশ্লেষ বিচ্ছিন্নভাবে এবং অপরদিকে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। নতুন যে DNA শৃঙ্খলটি ফর্কের গোড়ার দিকে 5′ → 3′ অভিমুখে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্প্রসারিত হয় তাকে **লিডিং তন্ত্রী** (Leading strand) বলে।

4. ফর্কের অপর বাহুতে টেমপ্লেট তন্ত্রী অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। DNA পলিমারেজ উৎসেচক শুধুমাত্র 5′ → 3′ অভিমুখে পলিমার গঠনে সক্ষম হওয়ায় এই DNA তন্ত্রীটি বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ডে খণ্ডে গঠিত হয় বলে এই DNA তন্ত্রটিকে **ল্যাগিং তন্ত্রী** (Lagging strand) বলে। ল্যাগিং তন্ত্রীর ছোটো ছোটো DNA খণ্ডগুলিকে **ওকাজাকি খণ্ড** (Okazaki fragment) বলে। বিজ্ঞানী ওকাজাকি এই খণ্ডগুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

5. ল্যাগিং তন্ত্রীতেDNA সংশ্লেষ অনেকগুলি ওকাজাকি খণ্ড গঠনের মাধ্যমে ঘটে। প্রতিটি ওকাজাকি খণ্ড গঠনের জন্য একটি RNA প্রাইমার প্রয়োজন হয় এবং একটি DNA পলিমারেজ উৎসেচক লাগে। অপরদিকে, লিডিংতন্ত্রী গঠনের জন্য একটিমাত্র RNA প্রাইমার ও একটি DNA পলিমারেজ প্রয়োজন।

চিত্র 5.13 ঃ DNA সংশ্লেষের সময় বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়া।

6. পরবর্তী পর্যায়ে একটি বিশেষ ধরনের DNA পলিমারেজ (DNA Polymerase-I in E. *coli.*) উৎসেচকের সহায়তায় RNA প্রাইমারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এই স্থানে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড সংশ্লেষিত হয়।

III. শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ (Chain termination) :

1. বিভিন্ন রেপ্লিকনের বর্ধনশীল ফর্ক (Growing fork)-গুলি যখন মিলিত হয় তখনই DNA সংশ্লেষের সমাপ্তিকরণ ঘটে।

2. দুটি ওকাজাকি খণ্ডের মাঝের ভগ্ন স্থানটি **লাইগেজ** (Ligase) উৎসেচকের সহায়তায় সংযুক্ত হয়। এর ফলে অবিচ্ছিন্ন DNA তন্ত্রী সৃষ্টি হয়।

3. এইরূপে নতুন DNA অণুর সংশ্লেষ সমাপ্ত হয়। একটি অপত্য DNA অণুর দুটি তন্ত্রীর একটি মাতৃ DNA অণু থেকে আসে এবং অপর তন্ত্রীটি নতুনভাবে সংশ্লেষিত হয় বলে এইভাবে DNA-র প্রতিলিপি গঠনকে **সেমিকনজারভেটিভ** (Semiconservative) পদ্ধতি বলে।

4. অপরদিকে এই DNA সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় লিডিং তন্ত্রীতে DNA সংশ্লেষ অবিচ্ছিন্নভাবে এবং ল্যাগিং তন্ত্রীতে DNA সংশ্লেষ বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে বলে সামগ্রিকভাবে এইরূপ প্রতিলিপি গঠনকে **সেমিডিসকনটিন্যুয়াস** (Semidiscontinuous) বা **অর্ধবিচ্ছিন্ন** প্রক্রিয়া বলে।

5.5. A. RNA-এর প্রকারভেদ (Types of RNA)

প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওট উভয় প্রকার কোশে তিন ধরনের RNA পাওয়া যায়, এগুলি হল—**মেসেঞ্জার RNA** (mRNA), **রাইবোজোম্যাল RNA** (rRNA) এবং **ট্রান্সফার RNA** (tRNA) বা **সল্যুব্‌ল RNA** (Soluble RNA বা sRNA)।

▲ A. মেসেঞ্জার RNA (Messenger RNA বা mRNA) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে RNA অণু সাধারণত গঠনগত জিন (Structural gene) থেকে সৃষ্টি হয়, যা গঠনগত জিনের বার্তা বহন করে এবং যে RNA টেমপ্লেট (Template) হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে পলিপেপটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে তাকে মেসেঞ্জার RNA বলে।**

মেসেঞ্জার RNA-কে **বার্তাবাহী RNA** বলে; কারণ এই RNA অণু পলিপেপটাইডে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রমের বার্তা বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, mRNA অণু পলিপেপটাইড গঠনের টেমপ্লেট (বা ছাঁচ) গঠন করে যাকে অনুসরণ করে এবং যার উপর পলিপেপটাইড গঠিত হয়। mRNA-র বেসগুলি কোডন গঠন করে এবং কোডনগুলি একটি পলিপেপটাইডে উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম নির্দেশ করে।

DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে যে RNA তৈরি হয় তাকে **ট্রান্সক্রিপ্ট** (Transcript) বলে। প্রোক্যারিওটিক কোশে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে যে RNA সৃষ্টি হয় সেই RNA-কেই mRNA বলে। কিন্তু ইউক্যারিওটিক কোশে প্রথমে প্রি-mRNA (Pre-mRNA) সৃষ্টি হয় যার কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ যায় এবং পরিশেষে পরিণত mRNA তৈরি হয়।

◘ (b) **mRNA-র কাজ (Functions of mRNA) :** mRNA অণুতে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি নিউক্লিওটাইড বেস একটি **কোডন** (Codon) গঠন করে। একটি কোডন একটিমাত্র অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সূচিত করে বা একটি নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডকে পলিপেপটাইড গঠনে নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ mRNA-র বিভিন্ন কোডনের ক্রম অনুযায়ী পলিপেপটাইডে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম গঠিত হয়। mRNA-র 5′ প্রান্তে একটি **প্রারম্ভিক কোডনের** (Inititation codon) সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু হয় এবং mRNA-র 3′ প্রান্তে একটি **সমাপ্তিকরণ কোডনের** (Termination codon) সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষ শেষ হয়। সর্বমোট 64টি কোডনের মধ্যে তিনটি সমাপ্তিকরণ কোডন ছাড়া বাকি 61টি বিভিন্ন কোডনের সাহায্যে 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়।

▲ B. রাইবোজোম্যাল RNA (Ribosomal RNA বা rRNA) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে RNA অণু রাইবোজোমের অংশ হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রোটিন সংশ্লেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাকে রাইবোজোম্যাল RNA বা rRNA বলে।**

প্রোক্যারিওট কোশের 50S অধঃএককে 23S ও 5S rRNA অণু থাকে এবং 30S অধঃএককে 16S rRNA অণু থাকে। ইউক্যারিওটিক রাইবোজোমের 60S অধঃএককের মধ্যে 28S, 5·8S ও 5S rRNA অণুগুলি থাকে এবং 40S অধঃএককের মধ্যে 18S rRNA অণু থাকে। (S = অধঃক্ষেপন গুণাঙ্ক বা Svedberg একক)

◘ (b) **rRNA-র কাজ (Functions of rRNA) :** rRNA অণুগুলি রাইবোজোমের গঠনগত ও কার্যগত উপাদান হিসাবে রাইবোজোমে উপস্থিত থাকে। রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান প্রদান করে। রাইবোজোমের ক্ষুদ্র অধঃএককের 16S rRNA-তে নাইট্রোজেন বেসের একটি বিশেষ সজ্জাক্রম থাকে। এই সজ্জাক্রমের পরিপূরক বেসগুলি একটি mRNA-এর 5´ প্রান্তে অবস্থান করে। rRNA ও mRNA-এর এই অংশে পরিপূরক বেস পেয়ারিং (Complementary base pairing) হয় এবং এর ফলে প্রোটিন সংশ্লেষের সূচনা ঘটে। mRNA-এর 5´ প্রান্তে অবস্থিত এই বিশেষ রাইবোনিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রমকে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে **সাইন-ডালগারনো (Shine-Dalgarno) সজ্জাক্রম** বলে।

▲ C. ট্রান্সফার RNA বা সল্যুবল RNA (Transfer RNA (tRNA) or soluble RNA (sRNA) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে RNA অণুতে অ্যান্টিকোডন সাইট** (Anti-codon site) **ও অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাটাচ্‌মেন্ট সাইট (Aminoacid attachment site) থাকে এবং যে RNA অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে, সেই RNA-কে ট্রান্সফার RNA (tRNA) বলে।**
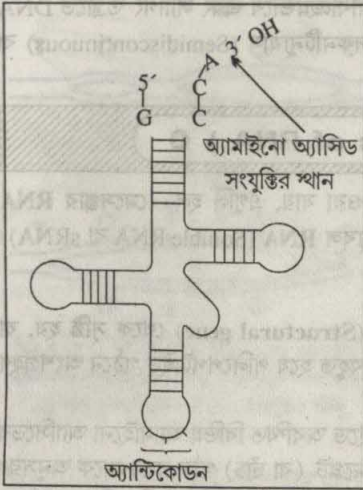
চিত্র 5.14 : একটি tRNA-র গঠন।

সাধারণত tRNA অণুগুলি 70-90 নিউক্লিওটাইডযুক্ত এবং 4S পরিমাপের হয়। এই RNA অণুগুলি ক্ষুদ্র, 4S পরিমাপের হওয়ার জন্য এগুলিকে **সল্যুবল RNA** (Soluble RNA) বা sRNA বলে। tRNA অণুর বেসগুলি নিজেদের মধ্যে বেস **পেয়ারিং** (Base pairing) ঘটায়; এর ফলে tRNA-কে একটি **ক্লোভার পাতার** মতো দেখায়। একটি tRNA অণুতে দুটি প্রধান সাইট থাকে, যেমন—(i) **অ্যান্টিকোডন সাইট** (Anticodon site)—তিনটি বেসের সমন্বয়ে এই সাইট গঠিত হয় এবং এই সাইটে mRNA-এর কোডনের পরিপূরক নিউক্লিওটাইড বেস থাকে; (ii) **অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাটাচমেন্ট সাইট** (Amino acid attachment site)— এই সাইট tRNA-এর 3´– OH প্রান্তে অবস্থান করে যেখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসিডযুক্ত tRNA-কে অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA (amino-acyl tRNA) বলে।

◘ (b) **কাজ (Functions) :** tRNA অণুগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে প্রোটিন সংশ্লেষ স্থলে বহন করে নিয়ে যায়। tRNA অণুর অ্যান্টিকোডনগুলি mRNA-এর কোডনগুলির সঙ্গে পরিপূরক বেস পেয়ারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয় এবং এরপর tRNA অণু অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিন সংশ্লেষ স্থলে ত্যাগ করে। একটি নির্দিষ্ট tRNA নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে।

✪ 5.5. B. ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি(Mode of Transcription) ✪

❖ (a) **ট্রান্সক্রিপশনের সংজ্ঞা (Definition of Transcription) : যে পদ্ধতিতে DNA অণুর টেমপ্লেট তন্ত্রীতে উপস্থিত বার্তা অনুলিপি গঠনের সাহায্যে এবং পরিপূরক বেস পেয়ারিং প্রক্রিয়ায় একতন্ত্রী RNA অণুর সংশ্লেষ ঘটে তাকে ট্রান্সক্রিপশন বা RNA সংশ্লেষ বলে।**

DNA টেমপ্লেট তন্ত্রীর পরিপূরক বেস সজ্জাযুক্ত যে RNA তন্ত্রী গঠিত হয় তাকে **ট্রান্সক্রিপ্ট** (Transcript) বলে।

◘ (b) **RNA-র ধর্ম (Properties of RNA) :**

1. RNA অণু প্রধানত একতন্ত্রী। 2. RNA অণুতে রাইবোজ শর্করা থাকে। 3. RNA অণুর রাইবোনিউক্লিওটাইড বেসগুলি হল—অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও ইউরাসিল (U)।

◘ (c) **ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General features of Transcription) :**

1. RNA সংশ্লেষের জন্য চারটি রাইবোনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেটগুলি হল—(i) অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP), (ii) গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট (GTP), (iii) সাইটিডিন ট্রাইফসফেট (CTP) এবং (iv) ইউরিডিন ট্রাইফসফেট (UTP)। 2. কোনো

একটি অঞ্চলে DNA-র একটি টেমপ্লেট তন্ত্রী থেকে পরিপূক বেসযুক্ত RNA সংশ্লেষিত হয়। 3. DNA অণুর যে-কোনো একটি তন্ত্র সমস্ত জিনের ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় টেমপ্লেট তন্ত্রী হিসাবে গণ্য না হতে পারে। 4. RNA সংশ্লেষের জন্য পূর্বে গঠিত কোনো প্রাইমার তন্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। 5. RNA সংশ্লেষ 5´ → 3´ অভিমুখে চলে এবং রাইবোনিউক্লিওটাইড একক যুক্ত হয়ে ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় RNA পলিমারেজ (RNA polymerase) উৎসেচক অংশগ্রহণ করে। 6. প্রথমে RNA পলিমারেজ DNA তন্ত্রীর নির্দিষ্ট **প্রমোটার** (Promoter) অঞ্চলে যুক্ত হয়। 7. সংশ্লেষিত RNA যদি mRNA হয়, তবে তাকে RNA-এর **কোডিং তন্ত্রী** (Coding strand of RNA) বলে; কারণ এই RNA তন্ত্রী প্রোটিন সংশ্লেষের কোড গঠন করে। এই mRNA-কে আবার RNA-এর **সেন্স তন্ত্রী** (Sense strand of RNA) বলে; কারণ এই mRNA প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সেন্স (Sense) বা অর্থ প্রদান করে। mRNA অণুর পরিপূরক RNA অণুকে **অ্যান্টিসেন্স RNA** (antisense RNA) বলে।

STEP 1 RNA শৃঙ্খল প্রারম্ভিক পর্যায়
RNA পলিমারেজ
DNA:
STEP 2 RNA শৃঙ্খল সম্প্রসারণ
DNA:
RNA-এর 5´ প্রান্ত
দীর্ঘায়িত RNA শৃঙ্খল
STEP 3 RNA শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ
DNA:
নবগঠিত RNA অণু

চিত্র 5.15 ঃ ট্রান্সক্রিপসনের তিনটি পর্যায়ের চিত্ররূপ।

■ (d) **ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া (Mechanism of Transcription)** ঃ সমগ্র ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি তিনটি দশায় ঘটে। যেমন— প্রারম্ভিক পর্যায় (Initiation), শৃঙ্খল সম্প্রসারণ (Chain elongation) এবং শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ (Chain termination)।

◆ I. প্রারম্ভিক পর্যায় (Initiation) ঃ

ট্রান্সক্রিপশনের প্রারম্ভিক পর্য্যায় তিনটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়, যেমন—

1. (i) প্রথম ধাপে RNA পলিমারেজ হল এনজাইম (RNA Polymerase holoenzyme) DNA তন্ত্রীর প্রমোটার (Promoter) অঞ্চলে যুক্ত হয়। সর্বদাই ট্রান্সক্রিপশন শুরুর আগে DNA অণুতে প্রমোটার অঞ্চল থাকে।

(ii) DNA তন্ত্রীর যে স্থানে ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় তাকে **ইনিশিয়েশন সাইট** (Initiation site) বলে। ইনিশিয়েশন সাইটের পূর্বে বাঁদিকে অর্থাৎ DNA-এর 5´ প্রান্তের দিকের নিউক্লিওটাইডগুলিকে **আপস্ট্রিম সিকোয়েন্স** (Upstream sequence) বলে। আপস্ট্রিম সিকোয়েন্সে বেসগুলির স্থান সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় এবং সংখ্যাগুলির পূর্বে একটি '-' চিহ্ন দেওয়া হয়।

(iii) ইনিশিয়েশন সাইটের পরে ডানদিকে অর্থাৎ 3´ প্রান্তমুখী নিউক্লিওটাইডগুলিকে **ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স** (Downstream sequence) বলে। ডাউনস্ট্রিম সিকোয়েন্স বেসগুলির স্থান সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় এবং সংখ্যাগুলির পূর্বে '+' চিহ্ন দেওয়া হয়।

(iv) যেমন প্রোক্যারিওট *Escherichia coli*-তে দুটি প্রমোটারের মধ্য বিন্দু **'– 10'** এবং **'– 35'** আপস্ট্রিম অঞ্চলে থাকে। ননটেমপ্লেট DNA তন্ত্রীতে (Nontemplate DNA strand) '– 10' সিকোয়েন্সটি হল, **5´-TATAAT-3´** and '– 35' সিকোয়েন্সটি হল, **5´-TT GACA-3´**. এখানে '–10' সিকোয়েন্সকে **প্রিবনো বক্স** (Pribnow box) এবং '– 35' সিকোয়েন্সকে **রেকগনিশন সিকোয়েন্স** (Recognition sequence) বলে।

(v) ইউক্যারিওটে দুটি প্রধান প্রমোটার হল **'TATA' বক্স** (TATA box) এবং **'CAAT' বক্স** (CAAT box); এগুলি যথাক্রমে **'– 30'** এবং **'– 80'** আপস্ট্রিম অংশে থাকে। DNA-এর ননটেমপ্লেট তন্ত্রে TATA বক্সের সিকোয়েন্সটি হল **5´-TATAAAA-3´** এবং 'CAAT' বক্সের সিকোয়েন্স, **5´-GGCCAATCT-3´**।

2. প্রমোটার অঞ্চলে RNA পলিমারেজ যুক্ত হওয়ার পরে DNA তন্ত্রী অকুণ্ডলীকৃত হয় এবং বেসগুলির ভিতর হাইড্রোজেন বন্ধনী বিনষ্ট হওয়ার ফলে দুটি একতন্ত্রী DNA অণুতে পরিণত হয়।

3. DNA অণুর যে-কোনো স্থানে মুক্ত হওয়া একতন্ত্রী দুটি শৃঙ্খলের একটি টেমপ্লেট হিসাবে কাজ করে। এই টেমপ্লেট তন্ত্রে পরিপূরক রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি বেস পেয়ারিং (Base pairing) প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় এবং RNA পলিমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে ফসফোডাইএসটার বন্ড গঠনের সাহায্যে পলিমার RNA তন্ত্র সৃষ্টি হয়।
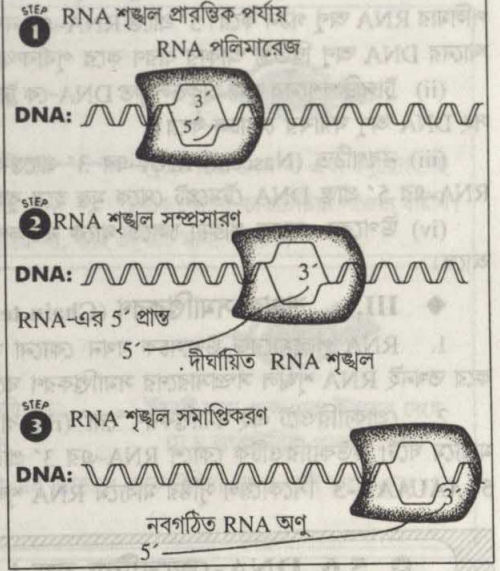
◆ **II. শৃঙ্খল সম্প্রসারণ (Chain elongation) :**

(i) এই ধাপে RNA পলিমারেজ উৎসেচক DNA-এর ডাউনস্ট্রিম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়কালে উৎসেচকটি DNA-অণুকে ক্রমাগত অকুণ্ডলীকৃত করে এবং টেমপ্লেট তন্ত্রে আগত রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলিকে যুক্ত করে পলিমার RNA অণু গঠন করে। 5′ প্রান্তে RNA-এর নবগঠিত অংশ DNA টেমপ্লেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে থাকে এবং ওই স্থানের DNA অণু দ্বিতন্ত্রী আকার ধারণ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

(ii) ট্রান্সক্রিপশনের জন্য অকুণ্ডলীকৃত DNA-কে **ট্রান্সক্রিপশন্ বাব্‌ল** (Transcription bubble) বলে, যা RNA পলিমারেজ সহ DNA অণু বরাবর চলাচল করে।

(iii) নবগঠিত (Nascent) RNA-এর 3′ প্রান্তের দিকে অর্থাৎ 5′ → 3′ অক্ষ বরাবর শৃঙ্খল সম্প্রসারণ ঘটে এবং RNA-এর 5′ প্রান্ত DNA টেমপ্লেট থেকে মুক্ত হয়ে ঝুলতে থাকে কিন্তু 3′ প্রান্তটি টেমপ্লেট অংশে যুক্ত থাকে।

(iv) উপরের সমস্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না একটি সমাপ্তিকরণ সংকেত RNA-এর 3′ প্রবর্ধনশীল অঞ্চলে আসে।

◆ **III. শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ (Chain termination) :**

1. RNA পলিমারেজ উৎসেচক যখন কোনো **সমাপ্তিকরণ সিগন্যালের** (Termination signal) সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করে তখনই RNA শৃঙ্খল সম্প্রসারণের সমাপ্তিকরণ ঘটে।

2. প্রোক্যারিওটে এই সমাপ্তিকরণ 'রো' (rho বা ρ) প্রোটিনের সহায়তায় বা **হেয়ারপিন লুপ** (Hairpin loop) সৃষ্টির মাধ্যমে ঘটে। ইউক্যারিওটিক কোশে RNA-এর 3′ প্রান্তে একটি **পলিঅ্যাডেনাইলেশন** (Polyadenylation) **সিকোয়েন্স** বা **5′-AAUAAA-3′** সিকোয়েন্স সৃষ্টির মাধ্যমে RNA শৃঙ্খল সমাপ্তিকরণ ঘটে।

✪ 5.6. DNA-জেনেটিক বস্তু (DNA as the Genetic material) ✪

❖ (a) **জেনেটিক বস্তুর সংজ্ঞা (Definition of Genetic Material) : কোশের মধ্যে অবস্থানকারী যে জটিল জৈব বস্তু জিন বহন করে অর্থাৎ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ পরম্পরায় বহন করে তাকেই জেনেটিক বস্তু বলে।**

DNA বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডকে জীবের প্রধান জেনেটিক বস্তু বলা হয়। তবে কয়েকটি উদ্ভিদ-ভাইরাসে, যেমন—তামাক পাতার মোজাইক্ ভাইরাসে (Tobacco Mosaic Virus বা TMV) DNA থাকে না। এক্ষেত্রে জেনেটিক বস্তুর কাজ RNA পালন করে। এই RNA-কে **জেনেটিক** (Genetic RNA) বলে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন ও ভাইরাসের ট্রান্সডাকশন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে DNA-ই জেনেটিক বস্তু। পরীক্ষাগুলি এইরূপ—

▲ A. ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা (Experiments on Bacterial Transformation) :

ফ্রেডারিক গ্রিফিথ (Frederick Griffith) 1928 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তর আবিষ্কার করেন। এই পরীক্ষার সাহায্যে গ্রিফিথ দেখান যে ব্যাকটেরিয়ার একটি স্ট্রেন (strain) অন্য একটি স্ট্রেনে রূপান্তরিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে গ্রিফিথ ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তর বলে আখ্যা দেন।

নিউমোনিয়া (Pneumonia) রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া নিউমোকক্কাস, (বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Streptococcus pneumoniae*) নিয়ে গ্রিফিথ ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা করেন। সাধারণ অবস্থায় এই ব্যাকটেরিয়া পলিস্যাকারাইড নির্মিত কোশ-প্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে এবং এটি নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ **ক্ষতিকারক** (Virulent)। এই ব্যাকটেরিয়া **মসৃণ** (Smooth) কলোনি গঠন করে বলে একে **'S'** টাইপ ব্যাকটেরিয়া বলে। এই ব্যাকটেরিয়ার পরিব্যক্তির (Mutation) ফলে ব্যাকটেরিয়ার কোশ প্রাচীর গঠিত হয় না। এই অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে না; অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াটি ক্ষতিকারক নয় (Avirulent) এবং এই ব্যাকটেরিয়া **অমসৃণ** (Rough) কলোনি গঠন করে বলে একে **'R'** টাইপ ব্যাকটেরিয়া বলে। যে-কোনো ব্যাকটেরিয়াকে অধিক তাপে ক্রিয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়ার বিভাজিত হওয়ার ক্ষমতা লোপ পায় এবং একে **তাপে মৃত** (Heat killed) ব্যাকটেরিয়া বলে। একই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন স্ট্রেনের (Strain) হয়; যেমন—II, III, IV ইত্যাদি। বিভিন্ন স্ট্রেনের ব্যাকটেরিয়াগুলি বংশ পরম্পরায় তাদের সত্তা বা ধর্ম বজায় রাখে।

● **1. গ্রিফিথের পরীক্ষা (Experiment of Griffith) ঃ ইন-ভিভো পরীক্ষা** (In-vivo Experiment) — বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গ্রিফিথ ইঁদুরের দেহে পরীক্ষা করেন বলে এইসব পরীক্ষাকে ইন-ভিভো (In-vivo) পরীক্ষা বলে। সর্বমোট চারটি পরীক্ষা বিজ্ঞানী গ্রিফিথ করেন; এগুলি নিম্নরূপ ঃ
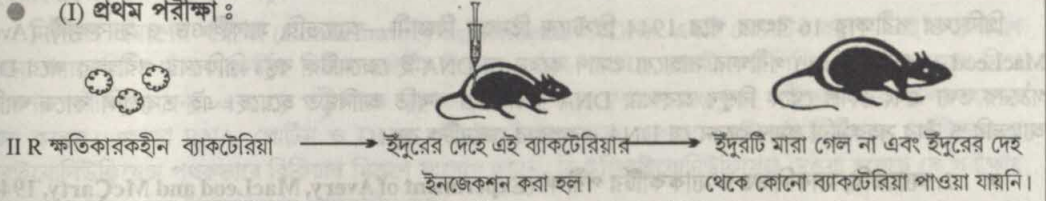
○ **সিদ্ধান্ত ঃ** II R ব্যাকটেরিয়া নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, তাই ইঁদুরটি মারা যায়নি।

○ **সিদ্ধান্ত ঃ** III S ব্যাকটেরিয়াটি ক্ষতিকারক, তাই ইঁদুরের দেহে এই জাতের ব্যাকটেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ইঁদুরটি মারা গেল।

○ **সিদ্ধান্ত ঃ** তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়ার বিভাজন ক্ষমতা না থাকার ফলে ইঁদুরের দেহে এই ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না এবং কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না।

○ **সিদ্ধান্ত ঃ** II R ব্যাকটেরিয়া ও তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়া পৃথকভাবে ইঁদুরের দেহে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না; কিন্তু উভয় উপাদানের মিশ্রণ ইঁদুরের দেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং III S ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মৃতদেহে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে II R ব্যাকটেরিয়া III S ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রিফিথ এই ঘটনাকে ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন (Transformation) বা রূপান্তর বলে বর্ণনা করেন। ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশনের ফলে এই ব্যাকটেরিয়ার একটি স্ট্রেন (Strain) অন্য একটি স্ট্রেন-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

চিত্র 5.16 ঃ গ্রিফিথের ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও তার সিদ্ধান্ত।

● **গ্রিফিথের বক্তব্য**—গ্রিফিথের মতানুসারে চতুর্থ পরীক্ষায় II R ব্যাকটেরিয়া III S ব্যাকটেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে।

গ্রিফিথ অনুমান করেন, তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়া থেকে নির্গত কোনো **সক্রিয় পদার্থ** (Active substance) II R ব্যাকটেরিয়াকে III S ব্যাকটেরিয়াতে রূপান্তরিত করে। এই সক্রিয় পদার্থটি প্রকৃতপক্ষে কী এবং এর রাসায়নিক ধর্ম কী—গ্রিফিথ তা বলতে পারেননি।

গ্রিফিথের পরীক্ষার 16 বৎসর পরে 1944 খ্রিস্টাব্দে তিনজন বিজ্ঞানী—অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টি (Avery, MacLeod and McCarty) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে DNA-ই জেনেটিক বস্তু। গ্রিফিথের পরীক্ষার পরে DNA গঠনের তথ্য এবং কোশ থেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় DNA নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে অ্যাভেরি ও তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করেন যে DNA একপ্রকার জেনেটিক বস্তু।

● **2. অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টির পরীক্ষা (Experiment of Avery, MacLeod and McCarty, 1944) ঃ**

অ্যাভেরি ও তাঁর সহকর্মীরা যে পরীক্ষা করেন, তার নাম হল ইন-ভিট্রো পরীক্ষা (In-vitro Experiment) কারণ, এই পরীক্ষাটি ইঁদুর বা অন্য কোনো জীবদেহে করা হয় না, পরীক্ষাগারে টেস্ট টিউব বা পেট্রিডিশে কৃত্রিম উপায়ে কালচার মিডিয়ামে (Culture medium) এই পরীক্ষা করা হয়।

● **প্রথম পরীক্ষা ঃ**

II R কোশ

পেট্রিডিশে
কালচার করা হল

II R কলোনি
পাওয়া গেল

○ **সিদ্ধান্ত ঃ** II R কোশ ক্ষতিকারক নয় এবং এই কোশ কালচার মাধ্যমে রাখার ফলে II R কলোনি সৃষ্টি হল।

● **দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ**

তাপে মৃত III S
কোশের DNA

পেট্রিডিশে
কালচার করা হল

কোনো কলোনি
গঠিত হয়নি

○ **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রথমে তাপে মৃত III S কোশ থেকে DNA পৃথক করা হয়েছে এবং এই DNA-কে কালচার মাধ্যমে রাখলে কোনো কলোনি দেখা যায় না। এর কারণ তাপে মৃত DNA-র বিভাজন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোনো নতুন কোশ সৃষ্টি হয় না।

● **তৃতীয় পরীক্ষা ঃ**

\+

\+ সিরাম

পেট্রিডিশে
কালচার করা হল

III S কলোনি
পাওয়া গেল
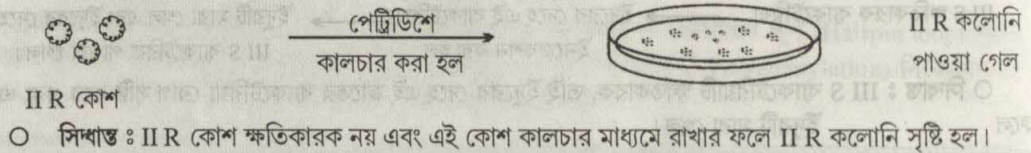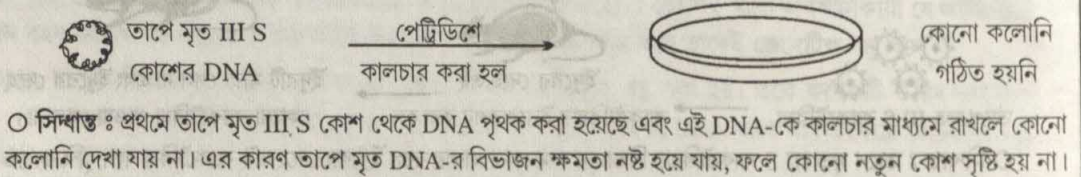
তাপে মৃত
II R কোশ   III S কোশের DNA
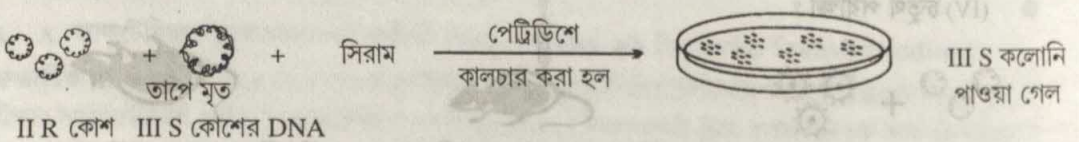
○ **সিদ্ধান্ত ঃ** এই পরীক্ষাটি গ্রিফিথের চতুর্থ পরীক্ষার অনুরূপ। এই পরীক্ষায় তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়ার DNA ব্যবহার করা হয়েছে এবং জীবদেহের মধ্যে পরীক্ষাটি না করে টেস্ট টিউবে কালচার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। উপাদানগুলি যাতে ভালোভাবে বিক্রিয়া করতে পারে তার জন্য কালচার মাধ্যমে একটি সিরাম যোগ করা হয়েছে। অ্যাভেরি ও তাঁর সহকর্মীরা তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়ার DNA ব্যবহার করে গ্রিফিথের মতো ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষার ফল পান অর্থাৎ II R ব্যাকটেরিয়া III S-এ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং গ্রিফিথ বর্ণিত ট্রান্সফরমেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয় পদার্থ (Active substance) III S (তাপে মৃত) কোশের DNA ছাড়া আর কিছুই নয়।
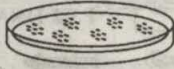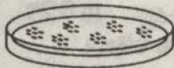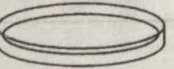
চিত্র 5.17 ঃ অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টির পরীক্ষা।

এক্ষেত্রে তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়ার DNA, II R কোশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং II R কোশটিকে III S কোশে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে III S (তাপে মৃত) ব্যাকটেরিয়ার DNA II R ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে এবং এই এককগুলিকে কাজে লাগিয়ে III S DNA তৈরি করে এবং পরিশেষে III S ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়ার

ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষার মাধ্যমে III S ব্যাকটেরিয়ার DNA প্রতিলিপি গঠনের সাহায্যে বিভক্ত হয় এবং এখানে DNA-র স্বঅনুঘটন প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। স্বঅনুঘটন (Autocatalysis) প্রক্রিয়া জেনেটিক বস্তুর ধর্ম এবং যেহেতু DNA স্বঅনুঘটন ধর্ম প্রকাশ করে, সুতরাং DNA হল জেনেটিক বস্তু।

● **নিশ্চিত প্রমাণের পরীক্ষা (Confirmatory experiment) :** "DNA একটি জেনেটিক বস্তু"—এই তথ্য প্রমাণ করার জন্য অ্যাভেরি ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন কোশীয় উপাদান যেমন—RNA, প্রোটিন বা লিপিড ইত্যাদির নমুনা দিয়ে ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা করেন; এবং যে পরীক্ষাতে শুধুমাত্র DNA ব্যবহার করা হয়েছে, সেই পরীক্ষায় তাঁরা ট্রান্সফরমেশন পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া RNA, প্রোটিন ও DNA, বিনষ্টকারী উৎসেচক, যথাক্রমে রাইবোনিউক্লিয়েজ, প্রোটিয়েজ ও ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ পৃথকভাবে বিক্রিয়ার মিশ্রণে সংযোগ করেন। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ দেওয়া হয়েছে যে পরীক্ষায় সেটি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশন পরিলক্ষিত হয়।

DNA-ই জেনেটিক পদার্থ তার নিশ্চিত প্রমাণের পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ—

○ **সিদ্ধান্ত :** উপরোক্ত তৃতীয় পরীক্ষায় ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক তাপে মৃত III S ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে বিনষ্ট করে। এর জন্য এই পরীক্ষায় ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন পরিলক্ষিত হয় না। অপরদিকে, প্রথম পরীক্ষায় রাইবোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক RNA-কে বিনষ্ট করে এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রোটিয়েজ উৎসেচক প্রোটিন বিনষ্ট করে; কিন্তু তা স্বত্তেও উভয়ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ট্রান্সফরমেশনের জন্য DNA-এর প্রয়োজন হয়, RNA বা প্রোটিনের প্রয়োজন হয় না। অতএব, গ্রিফিথ বর্ণিত ট্রান্সফরমেশনের সক্রিয় পদার্থটি হল DNA এবং তাই DNA-কে জেনেটিক পদার্থ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

▲ B. জেনেটিক বস্তু হিসাবে DNA— ভাইরাসের ট্রান্সডাকশন পরীক্ষা (DNA as genetic material— Experiment on viral transduction) :

1952 খ্রিস্টাব্দে অপর একটি পরীক্ষার সাহায্যে জেনেটিক বস্তু হিসাবে DNA-র অস্তিত্বের প্রমাণ করেন **আলফ্রেড হারসে** (Alfred Hershey) ও **মারথা চেজ** (Martha Chase)। এই গবেষণার জন্য **হারসে** 1969 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার জয় করেন। এই দু'জন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিওফাজ T_2-র প্রতিলিপি গঠনের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণ করে যে এই ফাজ ভাইরাসের জেনেটিক বার্তা শুধুমাত্র DNA-র মধ্যে নিহিত আছে।

● **1. হারসে ও চেজের পরীক্ষা (Experiment of Harshey and Chase) :** ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফাজ বা ফাজ ভাইরাস বলে। দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে ব্যাকটেরিওফাজের দেহ গঠিত হয়। এদের বহিরাবরণকে ক্যাপস্যুল (capsule) বলে এবং ক্যাপস্যুলের ভিতরে DNA উপস্থিত থাকে। **হারসে ও চেজ** T_2 ব্যাকটিরিওফাজকে এসচেরিচিয়া কোলাই (*Escherichia coli*) ব্যাকটেরিয়ার উপর সংক্রমণের সাহায্যে **ট্রান্সডাকশন** (Transduction) পরীক্ষা করেন।

❖ **ট্রান্সডাকশনের সংজ্ঞা (Definition of Transduction) : যে পদ্ধতিতে একটি ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বস্তু ফাজ ভাইরাস বাহকের সাহায্যে অপর একটি ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে ট্রান্সডাকশন (Transduction) বলে।**

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে T_2 ব্যাকটেরিওফাজ এসচেরিচিয়া কোলাই (*Escherichia coli*) ব্যাকটেরিয়াকে সংক্রমণ করতে পারে, ফলে এই ব্যাকটেরিয়া কোশের ভিতরে অসংখ্য T_2 ফাজ ভাইরাস সৃষ্টি হয়। ফাজ ভাইরাসের ক্যাপস্যুলে সালফার

থাকে কিন্তু ফসফরাস থাকে না। অপরদিকে এই ভাইরাসের DNA-তে ফসফরাস থাকে, কিন্তু সালফার থাকে না। উপরোক্ত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে হারসে এবং চেজ কিছু ভাইরাসের ক্যাপস্যুলকে তেজস্ক্রিয় সালফার, ^{35}**S** (স্বাভাবিক সালফার ^{32}S) দিয়ে লেবেল (Label) করেন এবং কিছু ভাইরাসের DNA-কে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, ^{32}**P** (স্বাভাবিক ফসফরাস ^{31}P) দিয়ে লেবেল (Label) করেন।
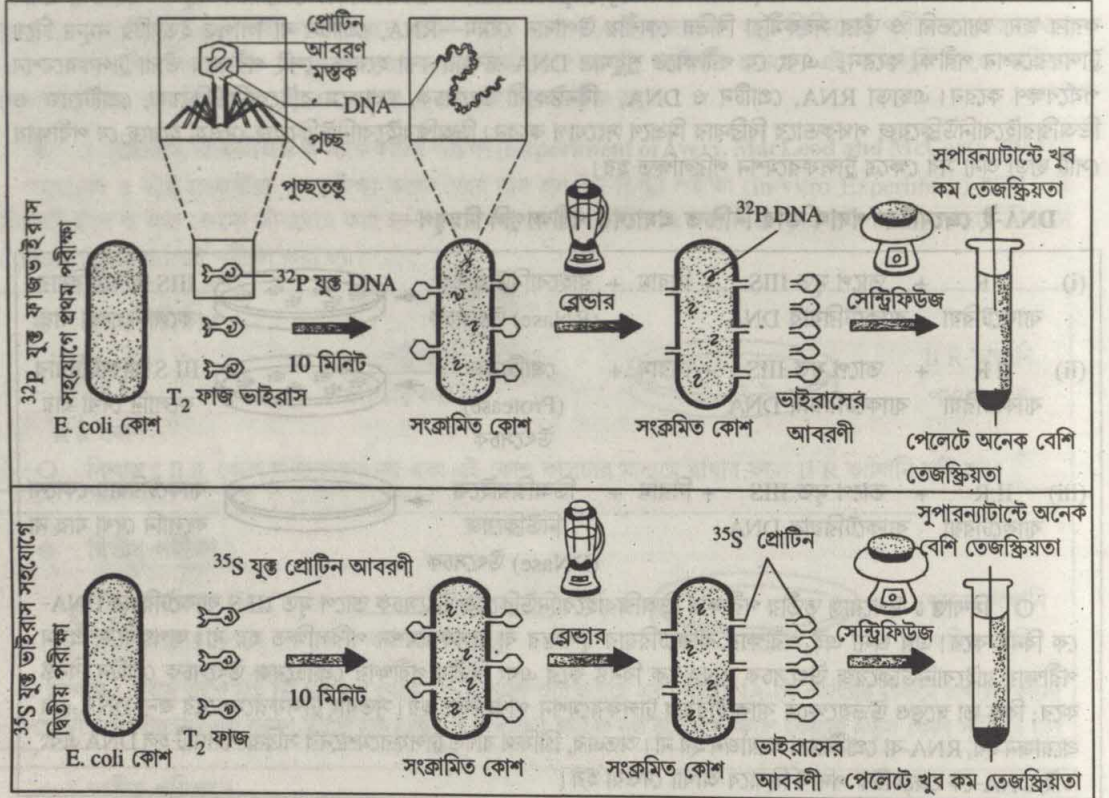
চিত্র 5.18 : হারসে ও চেজের ট্রান্সডাকশন পরীক্ষা।

হারসে ও চেজ তাঁদের পরীক্ষায় ^{32}P যুক্ত T_2 ফাজ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া (*E. coli*) কোশ প্রায় দশ মিনিট ধরে মিশ্রিত করেন বা সংক্রামিত করেন। এর পর একটি ওয়ারিং ব্লেন্ডার (Waring blender)-এর সাহায্যে ব্যাকটেরিওফাজের ক্যাপস্যুলগুলিকে ব্যাকটেরিয়ার আবরণী থেকে মুক্ত করেন। সবশেষে কালচার মিশ্রণকে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের মাধ্যমে ঘুরিয়ে সেন্ট্রিফিউজ নলের তলায় পেলেট (Pellet) ও উপরে সুপারন্যাটান্ট (Supernatant) পৃথক করে উভয় মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করেন। উপরে বর্ণিত একই পরীক্ষা ^{35}S যুক্ত T_2 ব্যাকটেরিওফাজের ক্ষেত্রে করা হয়। পরীক্ষাগুলির চিত্ররূপ (চিত্র 5.18) দেওয়া হয়েছে।

● **2. হারসে ও চেজের পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ :** (i) হারসে ও চেজের প্রথম পরীক্ষায় যখন ^{32}P যুক্ত T_2 ফাজভাইরাস ব্যবহার করা হয় সুপারন্যাটান্টে খুব সামান্য তেজস্ক্রিয়তা এবং পেলেটে অনেক বেশি পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। এর কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে T_2 ফাজভাইরাসের ^{32}P যুক্ত তেজস্ক্রিয় DNA ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে, তাই পেলেটে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার কোশে তেজস্ক্রিয়তা খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। অপরদিকে T_2 ফাজভাইরাসের প্রোটিন আবরণী তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত নয় বলে সুপারন্যাটান্টে তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। তবে কিছু ফাজভাইরাসের DNA ব্যাকটেরিয়া কোশে স্থানান্তরিত হয় না এবং এগুলি সুপারন্যাটান্টে থাকার ফলে সেখানে খুব সামান্য তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

(ii) **হারসে ও চেজের** দ্বিতীয় পরীক্ষায় যখন ^{35}S যুক্ত T_2 ফাজভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়, সুপারন্যাটেন্টে প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা এবং পেলেটে খুব সামান্য তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা হয়। এর কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন

যে, ^{35}S যুক্ত ফাজভাইরাসের প্রোটিন আবরণ ব্যাকটেরিয়ার কোশে প্রবেশ করেনি এবং এগুলি সুপারন্যাটান্টে থাকায় এখানে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়। অপরদিকে ফাজভাইরাসের আবরণীর কিছু অংশ ব্যাকটেরিয়া কোশপ্রাচীরে যুক্ত থাকার ফলে পেলেটে সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

● **2. হারসে ও চেজের সিদ্ধান্ত :** পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে হারসে ও চেজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, T_2 ব্যাকটেরিওফাজের দেহ থেকে শুধুমাত্র DNA ব্যাকটেরিয়ার কোশে স্থানান্তরিত হয় এবং ব্যাকটেরিয়ার কোশে অনেকগুলি T_2 ফাজভাইরাস উৎপন্ন করে, কিন্তু প্রোটিন কখনও ব্যাকটেরিয়ার কোশে প্রবেশ করে না এবং প্রোটিন ফাজভাইরাসের জননে সহায়তা করে না। সুতরাং DNA অণু ফাজভাইরাসের জেনেটিক বস্তু হিসাবে এক বংশ থেকে পরের বংশে স্থানান্তরিত হয়।

◎ 5.7.A. ইউক্রোমাটিন ও হেট্যারোক্রোমাটিন ◎
(Euchromatin and Heterochromatin)

ক্রোমোজোমে ক্রোমাটিন বস্তু বা পদার্থ দু'প্রকারের হয়, যেমন—ইউক্রোমাটিন ও হেট্যারোক্রোমাটিন।

1. ইউক্রোমাটিন (Euchromatin) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition)—ক্রোমাটিনের যে অংশ ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে অকুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে, ফলে ঘনীভূত অবস্থায় থাকে না, যা ক্রোমাটিনের সক্রিয় অংশ, অর্থাৎ জীবের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিন বহন করে এবং যে ক্রোমাটিনের DNA থেকে RNA সংশ্লেষ হয়, তাকে ইউক্রোমাটিন বলে।**

চিত্র 5.19 : ইউক্রোমাটিন (হালকা অংশ) ও হেট্যারোক্রোমাটিনের (ঘনীভূত অংশ) অবস্থানের চিত্ররূপ।

ইন্টারফেজ দশায় ইউক্রোমাটিন অঞ্চল খুবই অকুণ্ডলীকৃত এবং অঘনীভূত অবস্থায় সূক্ষ্ম সুতোর মতো ছড়িয়ে থাকে। তাই রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রঞ্জিত করালেও এই অঞ্চলের ক্রোমাটিন স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। ইন্টারফেজ দশায় ইউক্রোমাটিনের DNA বিভিন্ন ক্রোমোজোমীয় বস্তুর সংশ্লেষের কাজে নিযুক্ত থাকে। তাই এই অঞ্চলটি এত খোলা অবস্থায় থাকে। কিন্তু বিভাজন দশায় ইউক্রোমাটিন অঞ্চল কুণ্ডলীকৃত হয়ে পেঁচিয়ে ঘনীভূত হয়, ফলে এই সময় রঞ্জক পদার্থে ক্রোমোজোম রং নেয় এবং স্পষ্ট দেখা যায়।

2. হেট্যারোক্রোমাটিন (Heterochromatin) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—ক্রোমাটিনের যে অংশ ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে এবং কোশ বিভাজন দশায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে ফলে ঘনীভূত দেখায় এবং যা ক্রোমাটিনের নিষ্ক্রিয় অংশ অর্থাৎ জীবের কোনো জিন বহন করে না এবং যে ক্রোমাটিনের DNA থেকে কখনও RNA সংশ্লেষ হয় না তাকে হেট্যারোক্রোমাটিন বলে।**

হেট্যারোক্রোমাটিনে অবস্থিত DNA অনেক দেরিতে বিভাজিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন (Replication) করে।

◘ (b) **হেট্যারোক্রোমাটিনের প্রকারভেদ (Types of heterochromatin) :** হেট্যারোক্রোমাটিন সাধারণত দু'প্রকারের হয় যেমন—**কনস্টিটিউটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন** এবং **ফ্যাকালটেটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন।**

(i) **কনস্টিটিউটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন** (Constitutive heterochromatin)— সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে যে হেট্যারোক্রোমাটিন থাকে, যেখানে রিপিটিটিভ DNA সজ্জা (Repetitive DNA sequence) পাওয়া যায় এবং যে হেট্যারোক্রোমাটিনের DNA দেরিতে বিভাজিত হয় তাকে কন্‌স্টিটিউটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন বলে। সব ধরনের কোশে ক্রোমাটিনের এই অংশ স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে।
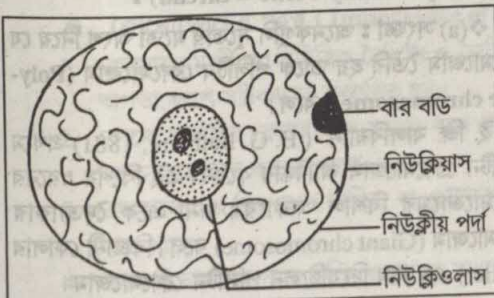
চিত্র 5.20 : নিউক্লিয়াসের ভিতরে বার বডি গঠন।

(ii) **ফ্যাকালটেটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন** (Facultative heterochromatin)—এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমোজোম সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক রূপে হেট্যারোক্রোমাটিনে পরিণত হলে তাকে ফ্যাকালটেটিভ হেট্যারোক্রোমাটিন বলে। **উদাহরণ**—স্ত্রী স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহকোশে ইন্টারফেজ দশায় দুটি X ক্রোমোজোমের

একটি সক্রিয় বা ইউক্রোমাটিন রূপে থাকে এবং অপর X নিষ্ক্রিয় হয়ে হেট্যারোক্রোমাটিন রূপে থাকে। এই নিষ্ক্রিয় X ক্রোমোজোমটি নিউক্লিয়াসের ভিতর গাঢ় বিন্দুর মতো **সেক্স ক্রোমাটিন** (Sex chromatin) বা **বার বডি** (Barr Body) হিসাবে দেখা যায়।

● **বার বডি (Barr body) ঃ স্তন্যপায়ীর স্ত্রী প্রাণীদের দুটি X ক্রোমোজোমের মধ্যে যে X ক্রোমোজোমটি ইন্টারফেজ দশায় ঘনীভূত হয়ে হেট্যারোক্রোমাটিন রূপে নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটি গাঢ় বস্তু বা বিন্দু হিসাবে থাকে তাকে বার বডি বলে।**

যেহেতু বার বডি একটি নিষ্ক্রিয় X ক্রোমোজোম ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই বার বডিকে **সেক্সক্রোমাটিন বডি** বলে। বিজ্ঞানী **মুরে বার** (Murray Barr, 1949) সর্বপ্রথম এই বস্তুটি বর্ণনা করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এর নাম বার বডি দেওয়া হয়েছে।

● **ইউক্রোমাটিন ও হেট্যারোক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Euchromatin and Heterochromatin) ঃ**

ইউক্রোমাটিন	হেট্যারোক্রোমাটিন
1. ইন্টারফেজ দশায় অকুণ্ডলীকৃত ও প্রসারিত অবস্থায় এবং বিভাজন দশায় কুণ্ডলীকৃত, ঘনীভূত ও প্যাঁচানো থাকে।	1. ইন্টারফেজ দশায় এবং বিভাজন দশায় কুণ্ডলীকৃত হয়ে ঘনীভূত অবস্থায় থাকে।
2. ইন্টারফেজ দশায় হালকাভাবে এবং বিভাজন দশায় গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়।	2. ইন্টারফেজ ও বিভাজন দশা উভয় ক্ষেত্রেই গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়।
3. সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া ক্রোমাটিনের অন্য সব অংশের বেশিরভাগ হল ইউক্রোমাটিন।	3. প্রধানত সেন্ট্রোমিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং সামান্য পরিমাণে ক্রোমাটিনের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থানে স্থানে হেট্যারোক্রোমাটিন থাকে।
4. এটি ক্রোমাটিনের সক্রিয় অংশ এবং এখানে জীবের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিন অবস্থান করে।	4. এটি ক্রোমাটিনের নিষ্ক্রিয় অংশ এবং এখানে জীবের কোনো প্রয়োজনীয় জিন থাকে না।
5. এই অংশের DNA থেকে RNA সংশ্লেষ হয়।	5. এই অংশের DNA থেকে কখনও RNA সংশ্লেষ হয় না।
6. এই অংশের DNA সঠিক সময়ে (ইন্টারফেজের 'S' দশায়) বিভাজিত হয় ও প্রতিলিপি গঠন (Replication) করে।	6. এই অংশের DNA অনেক দেরিতে (ইন্টারফেজের 'S' দশার শেষের দিকে) বিভাজিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন (Replication) করে।
7. মিয়োসিস বিভাজনের সময় এই অংশে ক্রশিং ওভার (Crossing over) ঘটে।	7. এই অংশের DNA-এতে কখনও ক্রশিং ওভার (Crossing over) ঘটে না।

✪ 5.7.B. পলিটিন এবং ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের সংক্ষিপ্ত ধারণা ✪
(Brief idea of Polytene and Lampbrush Chromosome)

◘ **বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম (Special types of Chromosomes) ঃ** স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের আকার-আকৃতি ছাড়া জীবকোশে যেসব ক্রোমোজোমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাদের বিশেষ ক্রোমোজোম বলে, যেমন —

◆ **1. পলিটিন ক্রোমোজোম (Polytene chromosome) : (*Poly* = many + *tene* = thread) ঃ**

চিত্র 5.21 ঃ পলিটিন ক্রোমোজোমের গঠন।

❖(a) **সংজ্ঞা ঃ অনেকগুলি সুতোর মতো অংশ নিয়ে যে ক্রোমোজোম তৈরি হয় তাকে পলিটিন ক্রোমোজোম (Polytene chromosome) বলে।**

ই. জি. বালবিয়ানি (E. G. Balbiani, 1881) প্রথমে পলিটিন ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। এই বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোমের বিশাল আকারের জন্য একে **দৈত্যাকার ক্রোমোজোম** (Giant chromosome) বলে। বিজ্ঞানী কোলার (Koller) এর নাম দিয়েছিলেন **পলিটিন ক্রোমোজোম**।

◘ (b) **অবস্থান**—পতঙ্গ শ্রেণির ডিপটেরা

(Diptera) বর্গের অন্তর্গত প্রাণীদের লার্ভার লালাগ্রন্থি, ট্রাকিয়া ও মালপিজিয়ান নালিকার কোশে ইন্টারফেজ দশার নিউক্লিয়াসে এই ক্রোমোজোম থাকে।

■ (c) **গঠন**—দৈত্যাকার পলিটিন ক্রোমোজোমে অনেকগুলি ক্রোমোজোম সূত্র পাশাপাশি লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে, ফলে ক্রোমোজোমটি অনেক মোটা বা চওড়া হয় অর্থাৎ পলিটিন গঠনযুক্ত হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোম নয় থেকে দশবার বিভাজিত হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় না। এই ধরনের ক্রোমোজোম বা DNA বিভাজনকে **এন্ডোমাইটোসিস** (Endomitosis) বা **এন্ডোরেপ্লিকেশন** (Endoreplication) বলে। একটি ক্রোমোজোম ন'টি চক্র বিভাজনের ফলে 512টি ক্রোমোজোম তন্তু গঠন করে, কিন্তু নিউক্লিয়াস ও সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় না। সব ক্রোমোজোম তন্তুগুলি পাশাপাশি লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে এবং এভাবে পলিটিন ক্রোমোজোম গঠিত হয়।

পলিটিন ক্রোমোজোমের প্রধান তিনটি অংশ হল— (i) **ব্যান্ড** (Band)— এটি ঘনীভূত গাঢ় রঙে রঞ্জিত অংশ। (ii) **ইন্টারব্যান্ড**(Interband) — দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ইন্টারব্যান্ড বলে। (iii) **পাফ** (Puff)— স্থানে স্থানে ক্রোমাটিন বিশেষ কাজের জন্য প্রসারিত হয়ে ফোলানো পাফের আকার ধারণ করে। এই অংশে RNA সংশ্লেষ হয় এবং এই পাফ্গুলিকে **বালবিয়ানি রিং** (Balbiani Ring) বলে।

পলিটিন ক্রোমোজোমে সব সেন্ট্রোমিয়ার একত্রিত হয়ে একটিমাত্র **ক্রোমোসেন্টার** (Chromocentre) গঠন করে।

◆ 2. ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম (Lampbrush chromosome) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ যে বিশেষ ধরনের বৃহদাকৃতির ক্রোমোজোম দেখতে চিমনি পরিষ্কার করা ব্রাশের মতো তাকে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম বলে।**

চিত্র 5.22 ঃ A-সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম, B-একটি লুপের বিবর্ধিত চিত্ররূপ।

এই ক্রোমোজোম **ফ্লেমিং** (Flemming, 1882) উভচর প্রাণীর উসাইট (Oocyte) কোশে আবিষ্কার করেন। **রুকার্ট** (Ruckert) 1892 খিস্টাব্দে হাঙর মাছের উসাইটে এই ক্রোমোজোম দেখেন এবং এটিকে ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম নামকরণ করেন —কারণ এই ক্রোমোজোম দেখতে লন্ঠনের চিমনি পরিষ্কার করা ব্রাশের মতো।

■ (b) **অবস্থান** — ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম বেশির ভাগ মেরুদণ্ডী প্রাণীর উসাইটে মিয়োসিসের প্রথম প্রোফেজের ডিপ্লোটিন দশায় পাওয়া যায়। এছাড়া বহু প্রাণীর স্পারমাটোসাইটে এবং এককোশী ছত্রাক অ্যাসিটেবিউলেরিয়া (Acetabularia)-র দৈত্যাকার নিউক্লিয়াসে এদের দেখা যায়।

■ (c)**গঠন**—এই ক্রোমোজোমের একটি প্রধান অক্ষ আছে যা দুটি বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমের চারটি ক্রোমাটিড নিয়ে তৈরি। অক্ষ থেকে ক্রোমোনিমাগুলি দু'পাশে অসংখ্য লুপের আকারে সজ্জিত থাকে ফলে ক্রোমোজোমটি একটি ব্রাশের আকার ধারণ করে। প্রতি ক্রোমোজোমে প্রায় 10,000 লুপ থাকে। প্রতি লুপে একটি অক্ষ থাকে যা একটি DNA অণু দিয়ে তৈরি এবং এখানে RNA সংশ্লেষ হয়।

● ক্রোমোজোমের গুরুত্ব (Importance of Chromosome) ঃ

1. ক্রোমোজোম জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জৈবিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিন বহন করে, যেগুলি এক বংশ থেকে অপত্য বংশে সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয়।
2. কোনো প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশ পরম্পরায় নির্দিষ্ট বা ধ্রুবক থাকে, ফলে জীব তার নিজস্ব সত্তা বা পরিচয় বংশানুক্রমে বহন করতে পারে।
3. ক্রোমোজোমের কিছু অংশ নিষ্ক্রিয় বা হেট্যারোক্রোমাটিন হিসাবে থাকলেও বিবর্তনের দিক থেকে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।
4. কোশ বিভাজনের সময় ক্রশিং ওভারের মাধ্যমে ক্রোমোজোমের গুণগত পরিবর্তন হয় যা অভিব্যক্তির সময় প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে কাজে লাগে।

○ অ নু শী ল নী ○

● A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. ক্রোমোজোমের বহির্গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 2. জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরালতা বিষয়টি আলোচনা করো। 3. ওয়াটসন্ ও ক্রিকের প্রস্তাবিত DNA-এর ভৌত গঠনের মডেল চিত্রসহ বর্ণনা করো। 4. DNA-এর প্রতিলিপি গঠনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করো। 5. বিভিন্ন প্রকার RNA ও তাদের কাজ বর্ণনা করো। 6. ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো। 6. গ্রিফিথ ও অ্যাভেরির পরীক্ষাগুলির সাহায্যে কীভাবে প্রমাণ করবে যে " DNA একপ্রকার জেনেটিক বস্তু "। 7. ট্রান্সডাকশন (Transduction) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো যে " DNA একটি জেনেটিক বস্তু"।

● B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. ক্রোমোজোম কাকে বলে ? 2. জিন ও ক্রোমোজোমের সমান্তরালতা বলতে কী বোঝো ? 3. নিউক্লিক অ্যাসিড কাকে বলে ? 4. DNA-এর প্রধান ধর্মগুলি লেখো। 5. RNA-এর প্রধান ধর্মগুলি লেখো। 6. ওয়াটসন ও ক্রিকের প্রস্তাবিত DNA-এর ভৌত গঠনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লেখো। 7. DNA প্রতিলিপি গঠনের সংজ্ঞা দাও। 8. রেপ্লিকন কাকে বলে ? 9. DNA প্রতিলিপি গঠনের প্রধান উপাদানগুলি কী কী ? 10. গাইরেজ ও হেলিকেজ উৎসেচকের কাজ লেখো। 11. SSB প্রোটিন কী ? এদের কাজ লেখো। 12. প্রাইমোজোম কী ? এর কাজ লেখো। 13. রেপ্লিজোম কী ? এর কাজ লেখো। 14. লিডিং তন্ত্রী ও ল্যাগিং তন্ত্রী কাদের বলে ? 15. ওকজাকি খণ্ড কী ? 16. DNA প্রতিলিপি গঠনকে "সেমিকনজারভেটিভ" পদ্ধতি বলে কেন ? 17. DNA প্রতিলিপি গঠনের সেমিডিসকনটিন্যুয়াস্ বা অর্ধবিচ্ছিন্ন বলে কেন ? 18. ফসফোডাইএস্টার বন্ড কোথায় গঠিত হয় ? 19. পরিপূরক বেস পেয়ারিং বলতে কী বোঝো ? 20. লাইগেজ উৎসেচকের কাজ কী ? 21. m RNA, t RNA ও r RNA-এর কাজ লেখো। 22. ট্রান্সক্রিপশনের সংজ্ঞা দাও। 23. ট্রান্সক্রিপশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাদানগুলি কী কী ? 24. প্রোমোটার সজ্জাক্রম কাকে বলে ? এর কাজ উল্লেখ করো। 25. DNA তন্ত্রের আপস্ট্রিম ও ডাউনস্ট্রিম কাকে বলে ? সংখ্যার সাহায্যে এগুলিকে কীভাবে প্রকাশ করা যায় ? 26. ট্রান্সক্রিপশনের টেমপ্লেট ও ননটেমপ্লেট তন্ত্র কাকে বলে ? 27. ট্রান্সক্রিপ্ট কাকে বলে ? তৈরি হওয়ার পরে এর ভবিষ্যৎ কী হয় ? 28. জেনেটিক বস্তু কাকে বলে ? 29. জেনেটিক বস্তু হিসাবে DNA-এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। 30. ট্রান্সফরমেশনের সংজ্ঞা দাও।

● C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. কাইনেটোকোর কোথায় থাকে ? 2. ক্রোমোজোমে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে সেই ক্রোমোজোমকে কী বলে ? 3. মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় থাকে ? 4. গুয়ানিন বেস কয়টি হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে সাইটোসিন বেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে ? 5. DNA প্রতিলিপি গঠনের একক কাকে বলে ? 6. দুটি নিউক্লিওটাইড কোন্ প্রকার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে ? 7. t RNA-কে কার মতো দেখতে হয় ? 8. RNA পলিমারেজ DNA-এর কোন্ অঞ্চলে প্রথম যুক্ত থাকে 9. গ্রিফিথের ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষায় ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়ারটির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো। 10. কোন উৎসেচক DNA-কে ধ্বংস করতে পারে ? 11. ট্রান্সডাকশন পরীক্ষা কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী করেন ? 12. কোন্ বিজ্ঞানী পলিটিন ক্রোমোজোম প্রথম আবিষ্কার করেন? 13. ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম কোথায় পাওয়া যায় ? 14. সেন্ট্রোমিয়ারের প্রান্তভাগকে কী বলে? 15. ক্রোমোজোমের কোন্ অংশের সঙ্গে কোশবিভাজনের সময় বেমতন্তু যুক্ত হয়? 16. গৌণ খাঁজের পর ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগকে কী বলে? 17. মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম অ্যানাফেজ দশায় কেমন দেখায়? 18. বংশগতির ক্রোমোজোমীয় তত্ত্বের প্রবক্তা কে? 19. ক্রোমাটিন কোন্ রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়? 20. প্রোক্যারিওটের ক্রোমোজোম-আকৃতি কেমন হয়? 21. DNA-এর কোন্ বেস RNA-তে থাকে না? 22. RNA-এর কোন্ বেস DNA-তে থাকে না? 23. DNA অণুর নিউক্লিওটাইডগুলিকে কী বলে? 24. একটি DNA শৃঙ্খলে পরপর দুটি N-বেসের মধ্যে দূরত্ব কত? 25. কোন্ এনজাইম দ্বিতন্ত্রী DNA-কে একতন্ত্রী DNA-তে রূপান্তরিত করে? 26. DNA-এর যে তন্ত্রী অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লেষিত হয় তাকে কী বলে?

● D. টীকা লেখো (Write notes on) :

1. অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, 2. নিউক্লিক অ্যাসিড, 3. সেমিকন্‌জারভেটিভ রেপ্লিকেশন, 4. ওকাজাকি খণ্ড, 5. প্রমোটার, 6. হেট্যারোক্রোমাটিন, 7. বার বডি, 8. পলিটিন ক্রোমোজোম, 9. ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম, 10. সেন্ট্রোমিয়ার, 11. টেমপ্লেট তন্ত্রী, 12. হেলিকেজ, 13. RNA প্রাইমার, 14. অর্ধবিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি গঠন, 15. লিডিং তন্ত্রী, 16. tRNA, 17. ট্রান্সফরমেশন, 18. ক্রোমোজোমের গুরুত্ব।

● E. পার্থক্য নির্দেশ করো (Difference between the following) :

1. মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ও অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। 2. DNA ও RNA, 3. লিডিং ও ল্যাগিং তন্ত্রী 4. কোডন ও অ্যান্টিকোডন, 5. ইনভিট্রো ও ইনভিভো পরীক্ষা, 6. ইউক্রোমাটিন ও হেট্যারোক্রোমাটিন, 7. প্রাথমিক খাঁজ ও গৌণ খাঁজ, 8. আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ও পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, 9. রেপ্লিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশন, 10. হেলিকেজ ও গাইরেজ, 11. mRNA ও tRNA, 12. ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশন, 13. মসৃণ ও অমসৃণ ব্যাকটেরিয়া।
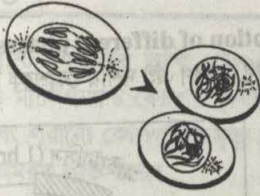
কোশবিভাজন
[CELL DIVISION]

➧ **সূচনা (Introduction) :** বিভাজনের সাহায্যে কোশ তার অস্তিত্ব রক্ষা করে। কোনো কোশই অমর হয় না। একটি নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত করার পরে কোশের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাকে অ্যাপোপ্‌টোসিস্ (**Apoptosis** বা **Programmed Cell Death**) বলে। নতুন কোশ সৃষ্টি হয়ে এই ধ্বংসকারী ঘটনাকে সামাল দেয়। অন্যদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যৌন জনন, অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন, পুনরুৎপাদন, দেহাংশের ক্ষয়পূরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে কোশবিভাজন নির্ভরশীল।

❖ **1. কোশবিভাজনের সংজ্ঞা (Definition of Cell Division) : যে পদ্ধতিতে একটি মাতৃকোশ বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোশ উৎপন্ন করে তাকে কোশ বিভাজন (Cell division) বলে।**

✪ 6.1. কোশচক্র (Cell cycle) ✪

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : কোশের জীবনকালে একটি কোশ বিভাজনের পরে পরবর্তী কোশ বিভাজন পর্যন্ত কোশের মধ্যে যেসব পরিবর্তন ও ঘটনাবলি চক্রাকারে পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে এককথায় কোশচক্র (Cell cycle) বলে।**

একটি কোশ সৃষ্টি হওয়া থেকে আরম্ভ করে বিভাজন শেষ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সব ঘটনাবলি ও পরিবর্তনকে কোশচক্র বলে। বিভিন্ন জীবে ও বিভিন্ন কোশে কোশচক্রের সময় ভিন্ন হয়। কোশচক্রকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন— **ইন্টারফেজ** (Interphase) বা **অবিভাজন দশা** এবং **বিভাজন দশা** অর্থাৎ **মাইটোটিক দশা** (Dividing phase : Mitotic phase)।

◘ **(b) কোশচক্রের বিভিন্ন দশা (Different phases in cell cycle) : হাওয়ার্ড ও পেল্ক (Howard and Pelc)** 1953 খ্রিস্টাব্দে কোশচক্রকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলি হল G_1, S, G_2 ও M (মাইটোসিস) দশা। এরমধ্যে G_1, S ও G_2 ইন্টারফেজ দশার অন্তর্গত। S, G_2 ও M দশাকাল মোটামুটি স্থির থাকলেও G_1 দশার সময়কাল বিভিন্ন কোশে বিভিন্ন হয়।
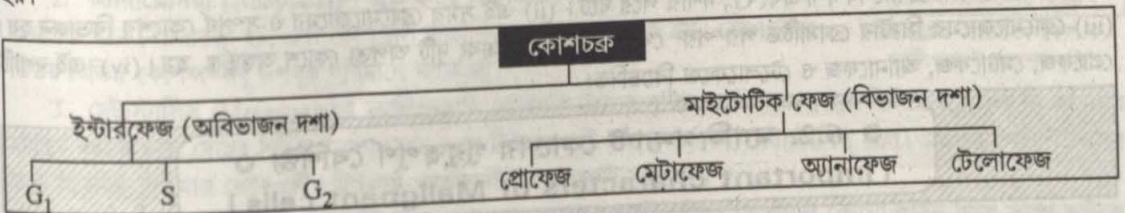
▲ I. ইন্টারফেজ (Interphase) :

❖ **(a) ইন্টারফেজের সংজ্ঞা (Definition of Interphase) : দুটি বিভাজন দশার অন্তর্বর্তী দশাকে ইন্টারফেজ বলে।**

কোশচক্রের বেশিরভাগ সময় কোশ ইন্টারফেজ দশায় কাটায়। পূর্বে এই দশাকে **বিশ্রামকালীন দশা** (Resting phase) বলা হত। কারণ এই সময় কোশের কোনো সক্রিয়তা বা পরিবর্তন আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময় কোশের যাবতীয় সংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে, কোশের ক্রোমোজোমের উপাদান দ্বিগুণ হয় এবং কোশের সামগ্রিক আয়তন বেড়েও প্রায় দ্বিগুণ হয় কিন্তু কোশ বিভাজন ঘটে না। এজন্য এই দশাকে বিশ্রামকালীন দশা আজকাল বলা হয় না।

কোশ বিভাজনের সব উপাদান, উপকরণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইন্টারফেজ দশায় তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ অদৃশ্যভাবে কোশ বিভাজন ইন্টারফেজ দশায় সংঘটিত হয়। বিভাজন দশায় এই সব উপাদান পৃথক হয়ে দুটি কোশে অন্তর্ভুক্ত হয়।

◘ **(b) ইন্টারফেজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Interphase) :** 1. কোশের আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। 2. বিভাজনে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চিত হয়। 3. নিউক্লীয় আবরণী অক্ষত থাকে। 4. ক্রোমোজোমগুলি লম্বা পাকানো ক্রোমাটিন তন্তু হিসাবে অবস্থান করে। 5. DNA, RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

(c) ইন্টারফেজের বিভিন্ন দশার বিবরণ (Description of different phases of Interphase) :

1. **G_1 বা গ্যাপ 1 (Gap 1)**— (i) এই দশাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দশায় কোশকে স্থির করতে হয় কোশটি একটি নতুন কোশচক্র শুরু করবে না কোশটি দীর্ঘ সময় ইন্টারফেজ দশায় বন্দি থাকবে। (ii) এটি মাইটোসিসের পরে এবং DNA সংশ্লেষের আগের দশা। (iii) এই দশায় স্বাভাবিক বিপাক চলে এবং কোশ অঙ্গাণুগুলি দ্বিগুণ সংখ্যায় সৃষ্টি হয়। (iv) এই দশায় RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। (v) এই দশার সময়কাল বিভিন্ন কোশের বেলায় বিভিন্ন এবং এটি কোশের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপরও নির্ভর করে। (vi) G_1 দশার যে বিশেষ বিন্দুতে কোশচক্র স্তব্ধ হয় বা বন্দি দশায় থাকে তাকে G_o দশা বলে।

চিত্র 6.1 : স্তন্যপায়ী প্রাণীর টিসু কালচার থেকে পাওয়া কোশচক্রের বিভিন্ন দশার স্থায়িত্ব কাল। G_o = গ্যাপ '0', G_1 = গ্যাপ 1, G_2 = গ্যাপ 2, S = সংশ্লেষ দশা।

● **G_O দশা বা গ্যাপ O (Gap O phase)**—G_O দশাকে প্রকৃতপক্ষে কোশের ঘুমন্ত দশা বা অবিভাজন দশা বলা যায়, কারণ **এই দশায় কোশের কোনো বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটে না এবং কোশচক্রের এই নির্দিষ্ট স্থানে কোশটি স্থির হয়ে থাকে।** শারীরবৃত্তীয় অবস্থার পরিবর্তন অনুকূলে হলে কোশটি আবার G_1 দশায় প্রবেশ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্নায়ুকোশ চিরকাল G_o দশায় থাকে বলে এই কোশের বিভাজন হয় না।

2. **S দশা বা সংশ্লেষ দশা (S or Synthetic phase) :** (i) এই দশায় ক্রোমোজোমের উপাদান হিসাবে DNA প্রতিলিপি গঠনের (Replication) সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত হয় অর্থাৎ ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন ঘটে। (ii) এই দশাটি না ঘটলে কোশের বিভাজন সম্ভব হয় না।

3. **G_2 বা গ্যাপ 2 দশা (G_2 phase) :** (i) এই দশায় কোশের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি ঘটে। (ii) এই সময় RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয় এবং কোশটি বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

▲ II. M-ফেজ বা মাইটোটিক ফেজ (Mitotic phase) :

(i) এটি কোশচক্রের শেষ দশা এবং G_2 দশার পরে ঘটে। (ii) এই সময় ক্রোমোজোমের ও সম্পূর্ণ কোশের বিভাজন হয়। (iii) ক্রোমোজোমের সিস্টার ক্রোমাটিড পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং দুটি অপত্য কোশে অন্তর্ভুক্ত হয়। (iv) এই দশাটি প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজে বিভেদিত।

6.2. ম্যালিগন্যান্ট কোশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Important characters of Malignant cells)

ক্যানসার হল বিভিন্ন রোগের সমাহার, যার ফলে কোশের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ও বিভাজন ঘটে।

❖ (a) **ক্যানসারের সংজ্ঞা—বংশগত যে রোগের ফলে কোশের বৃদ্ধি বা বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং যার ফলে ম্যালিগন্যান্ট (Malignant) ও আক্রমণমূলক (Invasive) টিউমার (Tumor) সৃষ্টি হয় তাকে ক্যানসার বলে।**

স্বাভাবিক কোশ কোনো উদ্দীপকের প্রভাবে অথবা কোনো জীবাণুর সংক্রমণের ফলে ক্যানসার কোশ (Cancer cell) বা ম্যালিগন্যান্ট কোশে (Malignant cell) রূপান্তরিত হয়। ম্যালিগন্যান্ট কোশের বিভাজন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয় এবং কোশটি দ্রুত বিভাজিত হতে থাকে, ফলে একগুচ্ছ কোশ একটি উপবৃদ্ধি সৃষ্টি করে। সুতরাং কোশের স্বাভাবিক বিভাজন হারের তুলনায় অনেক বেশি হারে কোশগুলি বিভাজিত হয়ে যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি করে তাকে **টিউমার** (Tumor) বলে। একটি টিউমার সৃষ্টির পরে টিউমারের কোশ বিভাজন বন্ধ হতে পারে; এই ধরনের টিউমারকে **বিনাইন** (Benign) **টিউমার** বলে। আবার টিউমার সৃষ্টির পরে টিউমারের কোশ জীবের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে গিয়ে সেইসব জায়গায় নতুন করে টিউমার গঠন করলে সেই টিউমারকে **ম্যালিগন্যান্ট টিউমার** বলে। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের কোশগুলিকেই **ম্যালিগন্যান্ট কোশ** বলে।

◘ (b) ম্যালিগন্যান্ট কোশের বৃদ্ধি (Growth of Malignant cell) : টিসু কালচার বা কলা পালন কৌশলের মাধ্যমে স্বাভাবিক কোশ ও ম্যালিগন্যান্ট কোশের বৃদ্ধির পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্বাভাবিক কোশ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বা নিয়ন্ত্রণে বিভাজিত হয় এবং পুরানো কোশগুলির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট কোশের বিভাজন অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে এবং কোশগুলির মৃত্যু হয় না, অমরত্ব লাভ করে।

● কোশ বৃদ্ধির বিভিন্ন দশা (Phases of Growth of Malignant cells) :

(i) **ল্যাগ দশা** (Lag phase)— এই দশায় কোশ বৃদ্ধি আপাতভাবে খুব কম হারে ঘটে। (ii) **লগ বা এক্সপোনেনশিয়াল দশা** (Log or Exponential phase)— এই দশায় কোশগুলি অতিদ্রুতহারে বিভাজিত হতে থাকে। (iii) **স্থির দশা** (Stationary phase)— এই দশায় কোশের বিভাজন ও বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ কোশগুলির সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। (iv) **মৃত্যু দশা** (Death phase)— এই দশায় কোশের মৃত্যু ঘটে এবং কোশের সংখ্যা হ্রাস পায়।
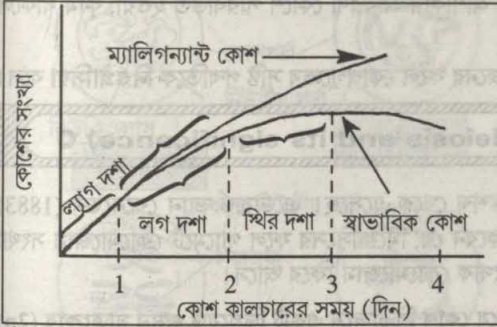
চিত্র 6.2 : স্বাভাবিক কোশ ও ম্যালিগন্যান্ট কোশের বৃদ্ধির লেখচিত্র

স্বাভাবিক কোশের বৃদ্ধিতে বা বিভাজনে চারটি দশা দেখা যায়। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট কোশের লগ দশা (Log phase) অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলে, ফলে কোশের সংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কোশগুলি অমরত্ব (Immortality) লাভ করে।

চিত্র 6.3 : স্বাভাবিক কোশ ও ম্যালিগন্যান্ট কোশের বৃদ্ধি

◘ (c) ম্যালিগন্যান্ট কোশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Important characters of Malignant cells) :

1. **ম্যালিগন্যান্সি** (Malignancy)—কোশ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে কোশগুলি দ্রুত বিভাজিত হতে থাকে যতদিন পোষকটি জীবিত থাকে। পোষক জীবের মৃত্যু ঘটলে ম্যালিগন্যান্ট কোশের মৃত্যু ঘটে।

2. **অ্যানাপ্লেসিয়া** (Anaplasia)—দ্রুত হারে বিভাজনের ফলে ম্যালিগন্যান্ট কোশের সামগ্রিক গঠন নিম্নমানের হয়, এবং কোশগুলি স্বাভাবিক কাজের অনুপযুক্ত হয়। কোশগুলির ভিতর বিভিন্ন কোশঅঙ্গাণু উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না।

3. **মেটাস্টাসিস্** (Metastasis) : ম্যালিগন্যান্ট কোশগুলি তাদের সৃষ্টির আদি স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে নতুন করে টিউমার সৃষ্টি করার ধর্মকেই **মেটাস্টাসিস্** বলে। এভাবে মেটাস্টাসিসের ফলে প্রাথমিক টিউমার থেকে গৌণ টিউমার, প্রগৌণ টিউমার ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

4. **সংযুক্ত থাকার ক্ষমতার অবলুপ্তি** (Loss of adhesion) : ম্যালিগন্যান্ট কোশগুলি কোনো কঠিন বস্তুর সঙ্গে আটকে থাকার ক্ষমতা হারায় অথবা কোশগুলি নিজেদের মধ্যে আটকে থাকে না এবং তাদের গতিশীলতা বেড়ে যায়।

5. **কনট্যাক্ট ইনহিবিশন ক্ষমতার অবলুপ্তি** (Loss of contact inhibition) : ম্যালিগন্যান্ট কোশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে এলে কোশ বিভাজন বন্ধ হয় না এবং স্বাভাবিকভাবে কোশ বিভাজন চলতে থাকে। নতুন কোশগুলি পুরানো কোশস্তরের উপরে অবস্থান করে এবং বহুকোশস্তরযুক্ত স্থান গঠন করে।

6. **নতুন অ্যান্টিজেন সৃষ্টি** (Production of new antigen) : ম্যালিগন্যান্ট কোশগুলি নতুন অ্যান্টিজেন তৈরি করে, যেমন— কারসিনো-এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন (CEA), α-ফেটো প্রোটিন ইত্যাদি।

● বিভিন্ন প্রকার অনিয়ন্ত্রিত কোশ বৃদ্ধি (Different types of uncontrolled Cell growth) :

কোশ বিভাজন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যা জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে জীবদেহের গঠন, কোশের প্রতিস্থাপন সুষ্ঠুভাবে ঘটে। তবে কখনো-কখনো কোশ এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, ফলে বিভাজন অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটতে থাকে। কোশের এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি কোশের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ঘটতে পারে অথবা কোশের বিভাজনের ফলেও ঘটতে পারে, যেমন—

1. **হাইপারপ্লাসিয়া (Hyperplasia)**— বিপাক ক্রিয়া বাড়লে বা হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে হঠাৎই কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোশ দ্রুত বিভাজিত হয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়, এই ধরনের কোশের সংখ্যার বৃদ্ধিকে **হাইপারপ্লাসিয়া** বলে। উদাহরণ— গর্ভাবস্থায় মহিলাদের স্তনের বৃদ্ধি, বেশি বয়সে মহিলাদের আন্তজরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের স্তরের বৃদ্ধি।

2. **হাইপারট্রফি (Hypertrophy)**— বিপাক বৃদ্ধির জন্য বা সংক্রমণের জন্য কোশের আয়তন বাড়লে তাকে **হাইপারট্রফি** বলে। টিনিয়া বা এ্যান্টামিবার সংক্রমণে পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণী কোশের স্ফীতি, প্লাজমোডিয়ামের অবস্থানে লোহিত কণিকার স্ফীতি, বয়ঃসন্ধিকালে পেশি কোশের স্ফীতি।

3. **মেটাপ্লাসিয়া (Metaplasia)**— কোনো কারণে পরিণত কোশের গঠন ও আয়তনগত পরিবর্তনকে **মেটাপ্লাসিয়া** বলে। বেশি ধূমপানের জন্য ক্লোমশাখার স্তম্ভাকৃতি অন্তরাবরণী কোশ আঁশাকার আবরণী কোশে পরিবর্তিত হওয়া, কৃমি থাকলে বায়ুস্থলীর অন্তরাবরণী কোশ ফাইব্রোব্লাস্ট কোশে পরিণত হয়।

4. **নিওপ্লাসিয়া (Neoplasia)**— অনিয়ন্ত্রিত কোশ বিভাজনের ফলে কোশগুচ্ছের সৃষ্টি পদ্ধতিকে **নিওপ্লাসিয়া** বলে।

6.3. মিয়োসিস এবং তার তাৎপর্য্য (Meiosis and its significance)

মিয়োসিস কথাটি গ্রিক *Meion* (=diminution বা হ্রাস হওয়া) শব্দ থেকে এসেছে। এডোয়ার্ড ভ্যান বেনেডেন (1883) সর্বপ্রথম গোলকৃমির ডিমে মিয়োসিস প্রক্রিয়া দেখেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, মিয়োসিসের ফলে গ্যামেটে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n) হয় এবং নিষেকের ফলে জাইগোটে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম ফিরে আসে।

❖ (a) **মিয়োসিসের সংজ্ঞা (Definition of Meiosis) : যে কোশ বিভাজনে একটি ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ (2n) দুবার বিভাজিত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য জনন কোশ (n) সৃষ্টি করে এবং ক্রশিংওভারের ফলে জিনের রিকম্বিনেশন ঘটে তাকে মিয়োসিস বলে।**

মিয়োসিস বিভাজনে কোশ ও তার নিউক্লিয়াস দুবার বিভাজিত হয় কিন্তু ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণ মাত্র একবার ঘটে।

◘ (b) **মিয়োসিসের স্থান (Site of Meiosis) :** (i) **উদ্ভিদদেহে**— পরাগধানী, ডিম্বক, জাইগোস্পোর বা স্পোরানজিয়াম নামে দেহাংশে ঘটে। (ii) **প্রাণীদেহে**— শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে যথাক্রমে স্পারমাটোসাইট ও উসাইটে ঘটে।

● **মিয়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলার কারণ—মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোশ বিভাজনের ফলে যে অপত্যকোশ সৃষ্টি হয় তাতে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোশের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয় বলে একে হ্রাসবিভাজন** (Reduction division) **বলে।**

◘ (c) **মিয়োসিসের বিভিন্ন দশা ও উপদশা (Different Phases and Subphases of Meiosis) :**
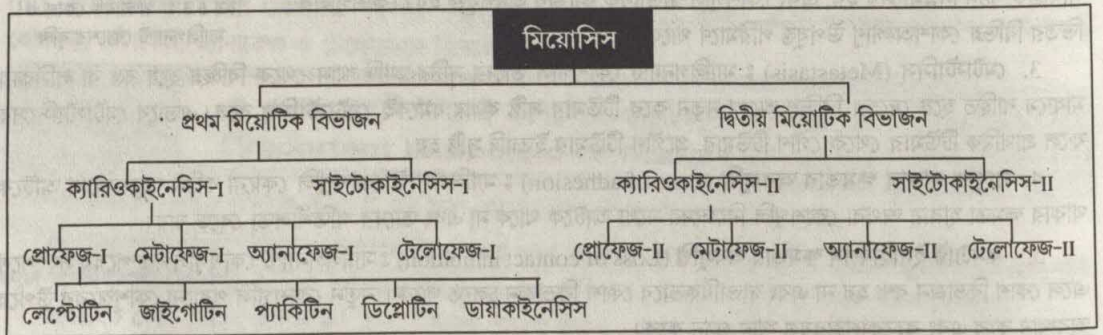
◘ (d) **মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দশার বর্ণনা (Description of different phases of Meiosis) :**

● **ইন্টারফেজ :** মিয়োসিস বিভাজনের পূর্ববর্তী কোশীয় অবস্থাকে **ইন্টারফেজ** (Interphase) **দশা বা বিশ্রাম দশা** বলে। অর্থাৎ এই দশার অব্যবহিত পরে মিয়োসিস শুরু হয়। মাইটোসিসের ইন্টারফেজের সঙ্গে মিয়োসিসের ইন্টারফেজের খুব বেশি পার্থক্য নেই। এই ক্ষেত্রে DNA-এর দ্বিত্বকরণও ‘S’ উপদশায় ঘটে কিন্তু ‘G_2’ উপদশায় এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যার ফলে কোশ মাইটোসিস বিভাজনের পরিবর্তে মিয়োসিস কোশ বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

মিয়োসিস বিভাজন পদ্ধতি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের মিয়োসিস বিভাজনে একটি কোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম

সংখ্যার হ্রাস ঘটে এবং অর্ধেক হয়। একে **হ্রাস বিভাজন বা হেট্যারোটাইপিক** (Heterotypic) **বিভাজন বা প্রথম মিয়োটিক বিভাজন** বলে। এর ফলে অর্ধেক ক্রোমোজোমযুক্ত দুটি অপত্য কোশ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের মিয়োসিস বিভাজনে একটি কোশ বিভক্ত হয়ে দুটি কোশ উৎপন্ন করে, কিন্তু ক্রোমোজোম বিভাজিত হয় না, ফলে নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। একে **সমবিভাজন বা হোমোটাইপিক** (Homotypic) **বিভাজন বা দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন** বলে।
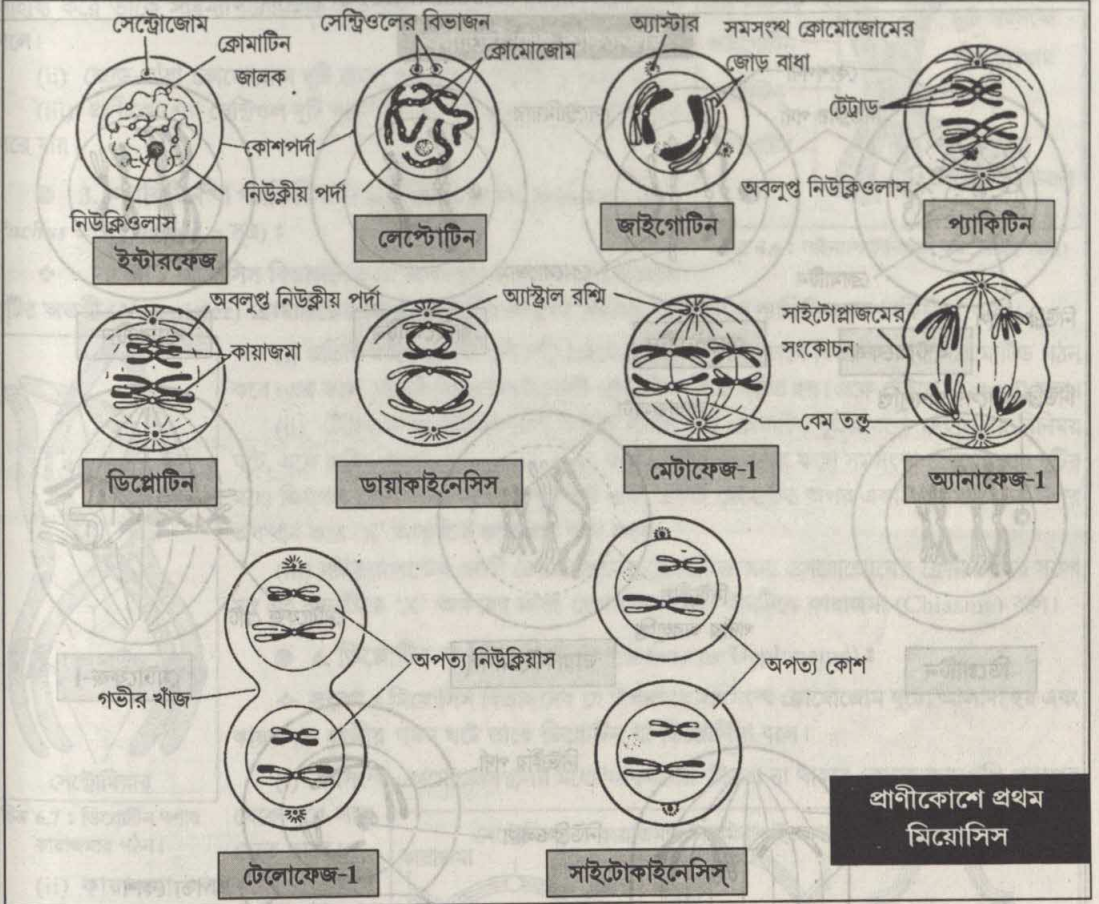
চিত্র 6.4 : প্রাণীকোশে প্রথম মিয়োসিসের বিভিন্ন দশার চিত্ররূপ।

অতএব মিয়োটিক বিভাজনের শেষে মিয়োসিস-I-এ একটি কোশ থেকে **দুটি কোশ,** আবার মিয়োসিস-II-প্রক্রিয়ায় দুটি কোশ পুনরায় বিভাজিত হয়ে **চারটি কোশ** উৎপাদিত হয়।

▲ A. প্রথম মিয়োটিক বিভাজন (First Meiotic division) :

➤ **I. প্রোফেজ-I (Prophase-I) :** প্রথম প্রোফেজ দশায় কোশের নিউক্লিয়াসের আকার বৃদ্ধি হয়। এই দশাটি অন্য সব দশার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী ও পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত। যেমন—লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস।

● **1. লেপ্টোটিন বা লেপ্টোনিমা (Leptotene or Leptonema— Gr, *Lepto* = সরু, *nema* = সূত্র) :**

❖ **সংজ্ঞা :** প্রথম মিয়োসিস কোশবিভাজনের যে উপদশায় ক্রোমোজোমের জালকগুলি খুলে যায় এবং একটি ক্রোমাটিডযুক্ত সরু ক্রোমোজোমগুলিতে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় তাকে লেপ্টোটিন বা লেপ্টোনিমা বলে।

(i) লেপ্টোটিন প্রোফেজের প্রথম দশা। এই দশায় নিউক্লিয়াসের আকার বড়ো হয়।
(ii) নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোমগুলি সুতোর মতো দেখা যায় ও ক্রোমাটিডযুক্ত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকে।
(iii) এই দশার শেষের দিকে ক্রোমোজোমগুলি নিউক্লিয়াসের একপ্রান্তে সরে গিয়ে ফুলের তোড়ার আকার ধারণ করে। এই কারণে এই দশাকে **বোকে স্টেজ** (Bouquet stage) বলে।
(iv) ক্রোমোজোমের মধ্যে পুঁতির দানার মতো **ক্রোমোমিয়ার** (Chromomere) দেখা যায়।
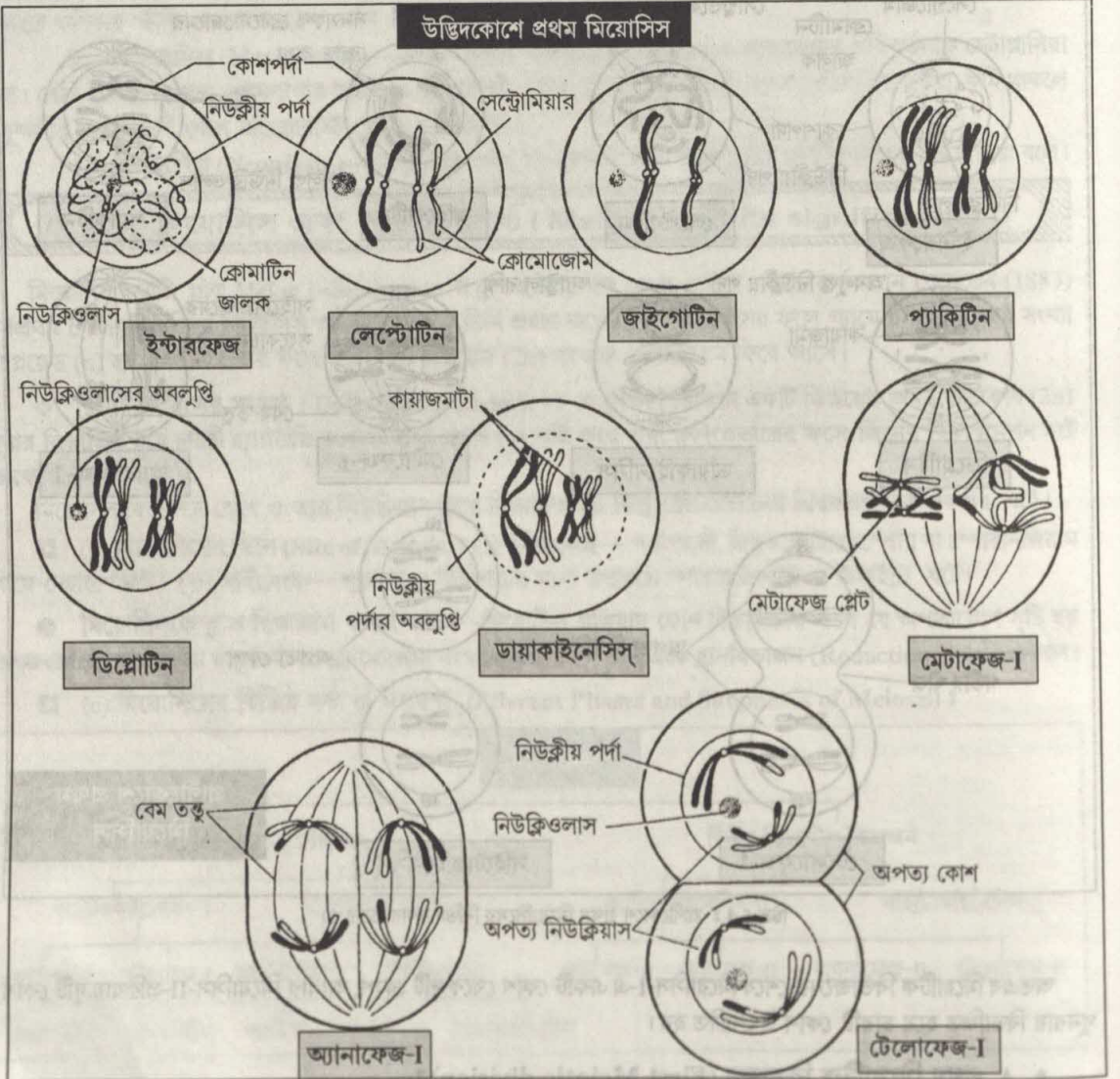
চিত্র 6.5 : উদ্ভিদকোশে প্রথম মিয়োসিসের বিভিন্ন দশার চিত্ররূপ।

(v) এই দশার শেষ দিকে ক্রোমোজোমগুলি অত্যধিক প্যাঁচানো থাকে বলে এদের ছোটো ছোটো মোটা সুতোর মতো দেখতে হয়।

● **2. জাইগোটিন বা জাইগোনিমা (Zygotene or Zygonema—Gr, zygon = সংযুক্তি করণ, *nema* = সূত্র) :**

❖ **সংজ্ঞা :** প্রথম মিয়োসিস কোশবিভাজনের যে উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর কাছাকাছি চলে এসে জোড় বাঁধে তাকে জাইগোটিন দশা বলে।

(i) জাইগোটিন উপদশায় **সমসংস্থ** (Homologous) ক্রোমোজোমগুলি পাশাপাশি সাজানো থাকে। **সমসংস্থ ক্রোমোজোম** জোড়ার মধ্যে আকর্ষণ তীব্র হয়। দুটি হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম পাশাপাশি আসাকে **সাইন্যাপসিস্** (Synapsis) বলা হয় এবং পাশাপাশি অবস্থিত যুগ্ম ক্রোমোজোমকে **বাইভ্যালেন্ট** (Bivalent) বলে। সাইন্যাপসিসের সময় দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মাঝে যে প্রোটিন যৌগ দুটি ক্রোমোজোমকে জোড় বাঁধতে সাহায্য করে তাকে **সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স** (Synaptonemal complex) বলে।

(ii) জোড়-বাঁধা ক্রোমোজোম দুটি ক্রমশ পাক খেয়ে ছোটো ও মোটা হয়।

(iii) প্রাণীকোশের সেন্ট্রিওল দুটি অ্যাস্টারসহ পরস্পরের কাছে থেকে দূরে সরে যায়।

চিত্র 6.6 : সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্সের গঠন।

● **3. প্যাকিটিন বা প্যাকিনিমা (Pachytene or Pachynema—Gr, *Pachus* = পুরু, *nema* = সূত্র) :**

❖ **সংজ্ঞা : মিয়োসিস বিভাজনের যে উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটির অভগ্নী (Non-sister) ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রোমাটিড অংশের বিনিময় ঘটে তাকে প্যাকিটিন বা প্যাকিনিমা বলে।**

চিত্র 6.7 : ডিপ্লোটিন দশায় কায়াজমার গঠন।

(i) প্রতিটি বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টিকারী ক্রোমোজোম লম্বালম্বি ভাবে বিভাজিত হয়ে ক্রোমাটিড গঠন করে। এর ফলে প্রতিটি বাইভ্যালেন্ট চারটি ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত হয়। একে **টেট্রাড** (Tetrad) বলে।

(ii) টেট্রাড দশায় সাইন্যাপসিস্ অঞ্চলে ননসিস্টার ক্রোমাটিড দুটির মধ্যে দেহাংশের বিনিময় ঘটে, একে **ক্রসিং ওভার** (Crossing over) বলে। ক্রসিং ওভারের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটির মধ্যে জিনগত বৈশিষ্ট্যের আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি ক্রোমাটিড অপর একটি ক্রোমাটিডের উপর অবস্থান করে 'X' আকৃতির **কায়াজমা** গঠন করে।

(iii) বাইভ্যালেন্টের একটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড অন্য ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের সঙ্গে যুক্ত এই স্থানটিকে 'X' অক্ষরের মতো দেখায় এবং এই স্থানটিকে **কায়াজমা** (Chiasma) বলে।

● **4. ডিপ্লোটিন বা ডিপ্লোনিমা (Deplotene or Deplonema) :**

❖ **সংজ্ঞা : মিয়োসিস বিভাজনের যে উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটো আলাদা হয় এবং কায়জমার প্রান্তীয় গমন ঘটে তাকে ডিপ্লোটিন বা ডিপ্লোনিমা বলে।**

(i) সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে আকর্ষণের তীব্রতা না থাকায় ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

চিত্র 6.8 : টারমিনালাইজেশন প্রক্রিয়া (ক্রসিংওভারের পরে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের বিকর্ষণ)।

(ii) কায়াজমা গঠনকারী অংশগুলি সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় দিকে এবং ক্রোমোজোম দুটি দু'প্রান্তে সরে যায়। ক্রোমোজোমের প্রান্তে কায়াজমার চলে যাওয়ার এই ঘটনাকে **প্রান্তীয়করণ বা টারমিনালাইজেশন** (Terminalization) বলে।

● **5. ডায়াকাইনেসিস (Diakinesis) :**

❖ **সংজ্ঞা : মিয়োসিস বিভাজনের যে দশায় কায়জমার সংখ্যা কমতে থাকে তাকে ডায়াকাইনেসিস বলে।**

(i) সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি আকারে ছোটো ও মোটা হয়। (ii) কায়াজমা ক্রোমোজোমের একেবারে শেষপ্রান্তে সরে যায়। (iii) এই দশায় প্রথমে নিউক্লিওলাস এবং শেষে নিউক্লীয় পর্দা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

➤ **II. মেটাফেজ-I (Metaphase-I) :** (i) নিউক্লীয় পর্দার অবলুপ্তি ঘটে। (ii) ক্রোমোজোমগুলি আরও সংকুচিত হয়ে সুস্পষ্ট হয় ও দুটি মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে। (iii) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে ক্রোমোজোম্যাল

তন্তু (বেমতন্তু) যুক্ত থাকে। অন্য তন্তুগুলিকে কন্টিন্যুয়াস তন্তু বলে কারণ তন্তুগুলি সরাসরি এক মেরু থেকে অন্য মেরুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রোমোজোম্যাল তন্তুর আকর্ষণে ক্রোমোজোম দুই মেরুর দিকে সরে যেতে শুরু করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না।

➤ **III. অ্যানাফেজ-I (Anaphase-I) :** (i) ক্রোমোজোম মাকু বা স্পিন্ডিল তন্তুর আকর্ষণে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে দুটি মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। (ii) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার প্রথমে মেরুর দিকে যায় ফলে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন আকৃতি দেখা যায়। যেমন—V, J অথবা I। (iii) এই দশায় ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে না তবে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটি পরস্পরের বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হয়, ফলে অপত্যকোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃ কোশের অর্ধেক হয়।

➤ **IV. টেলোফেজ–I (Telophase-I) :** (i) ক্রোমোজোম মেরুর দিকে চলে আসে এবং এর চারিদিকে নিউক্লীয় আবরণী সৃষ্টি হয়। (ii) ক্রোমোজোমগুলি গুচ্ছিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে। (iii) নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয়।

● **সাইটোকাইনেসিস–I (Cytokinesis-I)** টেলোফেজ-1-এর সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজম দুভাগে বিভাজিত হয় এবং দুটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুটি অপত্যকোশ গঠন করে।

○ **ইন্টারফেজ (Interphase) : প্রথম মিয়োসিস এবং দ্বিতীয় মিয়োসিস কোশ বিভাজনের অন্তর্বর্তী দশাকে ইন্টারফেজ বলে। প্রথম বিভাজনের পর কোশ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইন্টারফেজ বা অন্তর্বর্তী দশায় প্রবেশ করে। এই দশায় ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণ (Duplication) ঘটে না, কারণ প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত হয়।**

▲ B. দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (Second Meiotic division) :

এই বিভাজন দশা মাইটোসিস বিভাজন বা ইকুয়েশনাল বিভাজনের মতো এর ফলে প্রথম মিয়োটিক বিভাজনে যে হ্যাপ্লয়েড কোশ উৎপন্ন হয়, তা এই দশায় বিভাজিত হয়ে দুটি করে সমসংখ্যক অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) কোশ গঠন করে। এই কারণে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোশ সৃষ্টি হয়।
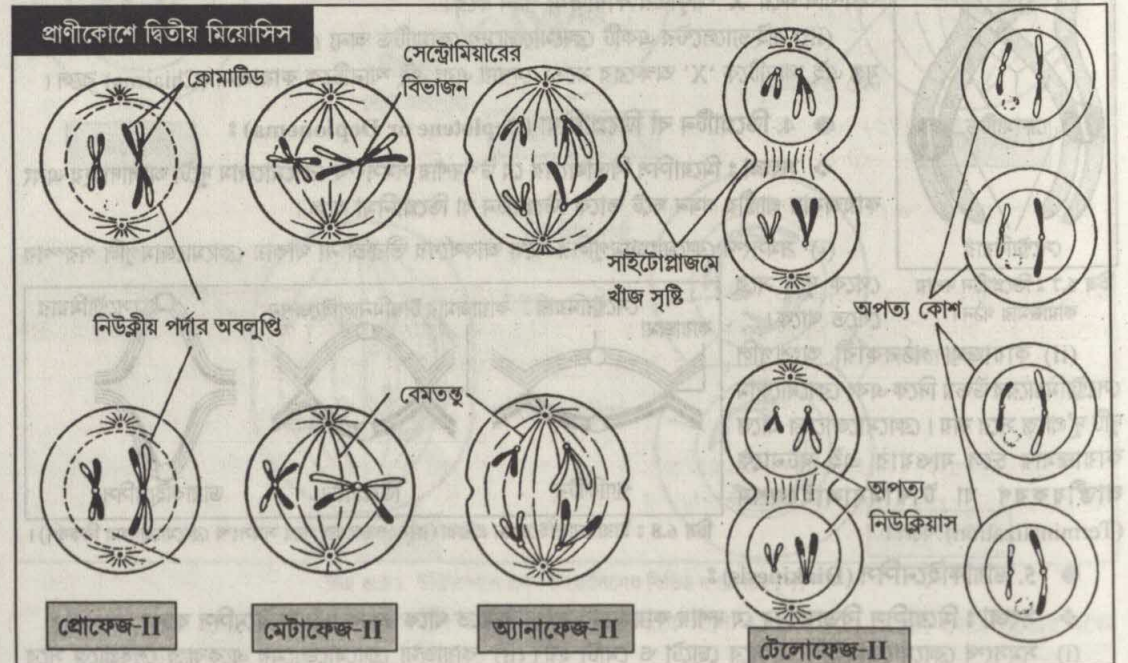
চিত্র 6.9 : প্রাণীকোশে দ্বিতীয় মিয়োসিসের চিত্ররূপ।

➤ **1. প্রোফেজ-II (Prophase-II) :** (i) খুবই সংক্ষিপ্ত ও সরল দশা। (ii) ক্রোমাটিন সংকুচিত ও কুণ্ডলীকৃত হওয়ার ফলে ক্রোমোজোম স্পষ্ট হয়। (iii) নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয়। (iv) প্রাণীকোশে সেন্ট্রিওল বিভাজিত হয়।

➤ **2. মেটাফেজ-II (Metaphase-II) ঃ** (i) স্পিন্ডিল তন্তু বা বেমতন্তু গঠিত হয়। (ii) ক্রোমোজোমগুলি বিষুব অঞ্চলে মেটাফেজ প্লেটে অবস্থান করে। (iii) প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিড দিয়ে গঠিত হয়।

➤ **3. অ্যানাফেজ-II (Anaphase-II) ঃ** (i) প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় এবং সিস্টার ক্রোমাটিডগুলি তার সেন্ট্রোমিয়ারসহ দুটি মেরুর দিকে যায়। (ii) ক্রোমাটিডগুলি V, J অথবা I আকৃতির হয়।

➤ **4. টেলোফেজ-II (Telophase-II) ঃ** (i) মেরুতে পৌঁছানো ক্রোমোজোমগুলির চারিদিকে নিউক্লীয় আবরণী গঠিত হয়। (ii) নিউক্লিওলাস পুনরায় তৈরি হয়।

● **সাইটোকাইনেসিস-II (Cytokinesis-II) ঃ** নিউক্লিয়াস বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে দুটি অংশে দুটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুটি সম্পূর্ণ অপত্যকোশ সৃষ্টি করে।
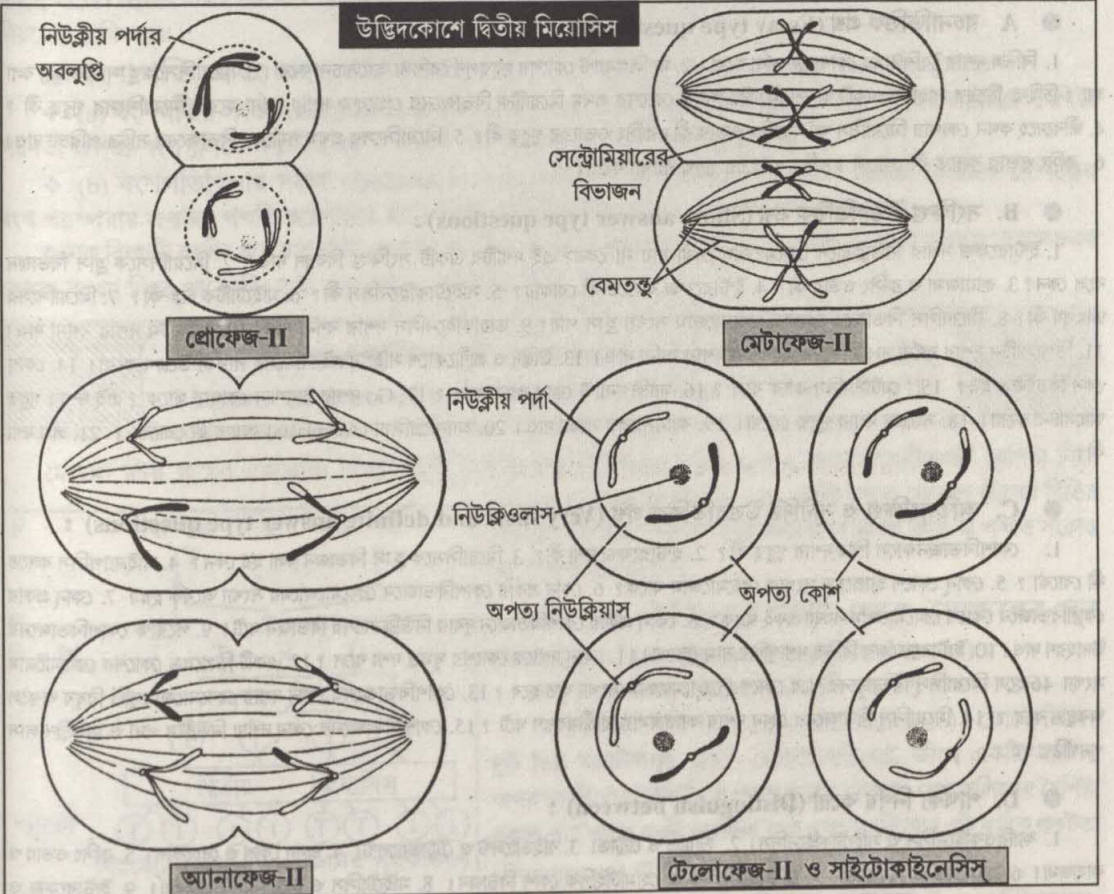
চিত্র 6.10 ঃ উদ্ভিদকোশে দ্বিতীয় মিয়োসিসের চিত্ররূপ।

◘ (e) মিয়োসিসের তাৎপর্য (Significance of Meiosis) ঃ

1. জীবের যৌন জননের জন্য মিয়োসিস প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। যৌন জননকারী জীবের জনন কোশ বা গ্যামেট গঠনের সময় জননমাতৃকোশ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে গ্যামেট গঠন করে। দুটি বিপরীত গ্যামেটের মিলনের সাহায্যে যৌন জনন সম্পাদিত হয়। সুতরাং, যৌন জননে মিয়োসিসের তাৎপর্য অপরিসীম।

2. জীবকোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট বা ধ্রুবক থাকে। মিয়োসিসের ফলে অপত্যকোশ অর্থাৎ জনন কোশ বা গ্যামেটে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক বা হ্যাপ্লয়েড (n) হয়ে যায়। যৌন জননকারী জীবের এই হ্রাস বিভাজন অবশ্যম্ভাবী, কারণ দুটি বিপরীত গ্যামেটের মিলনে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় সেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা $n + n = 2n$ হয়, অর্থাৎ জীবের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনঃস্থাপিত হয়।

3. মিয়োসিস বিভাজনে ক্রশিং ওভারের ফলে ননসিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে খণ্ডবিনিময় ঘটে এবং জিনগুলির পুনঃসংযোগ বা রিকম্বিনেশন ঘটে। এর ফলে ক্রোমোজোমের জিনগত প্রকারভেদ হয় এবং সাধারণভাবে জীবের প্রকরণ দেখা যায়। এই প্রকরণ জীবের অভিযোজন ও বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

০ অনুশীলনী ০

A রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) ঃ

1. বিভিন্ন দশার বৈশিষ্ট্যসহ কোশচক্র বর্ণনা করো। 2. ম্যালিগন্যান্ট কোশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। 3. মিয়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় ? চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশের প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের প্রোফেজ দশার বর্ণনা করো। মিয়োসিসের গুরুত্ব কী ? 4. জীবদেহে কখন কোথায় মিয়োসিস ঘটে? ক্রসিং ওভার কী? ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব কী? 5. মিয়োসিসের প্রথম পর্যায়ের বিভাজনের সচিত্র পরিচয় দাও। 6. ক্রসিং ওভার বলতে কী বোঝো ? ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) ঃ

1. ইন্টারফেজ দশার নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম দেখা যায় না কেন? এই দশাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 2. মিয়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলে কেন? 3. কায়াজমা ও ক্রসিং ওভার কী? 4. ইন্টারফেজ বলিতে কী বোঝায়? 5. সাইটোকাইনেসিস কী? 6. মাইটোটিক চক্র কী? 7. মিয়োসিসের তাৎপর্য কী? 8. মিয়োসিস বিভাজনে কোথায় ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায়? 9. ডায়াকাইনেসিস দশার বর্ণনা দাও। 10. প্যাকটিন দশার বর্ণনা দাও। 11. ডিপলোটিন দশার বর্ণনা দাও। 12. জাইগোটিন দশার বর্ণনা দাও। 13. উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশে সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য উল্লেখ করো। 14. কোশ কেন বিভাজিত হয়? 15. মেটাস্টাসিস কাকে বলে ? 16. ম্যালিগন্যান্ট কোশ কাকে বলে ? 17. Go দশার অবস্থান কোথায় থাকে ? এই দশার গুরুত্ব আলোচনা করো। 18. সংশ্লেষ দশার গুরুত্ব লেখো। 19. ক্যানসারের সংজ্ঞা দাও। 20. অ্যানাপ্লেসিয়া (Anaplasia) বলতে কী বোঝো ? 21. লগ দশা কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short and definite answer type questions) ঃ

1. কোশবিভাজনকালে স্থির দশার গুরুত্ব কী? 2. ইন্টারফেজ দশা কী? 3. মিয়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় কেন? 4. সাইন্যাপসিস বলতে কী বোঝো ? 5. কোন্ কোশে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে? 6. কোন্ প্রকার কোশবিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়? 7. কোন্ প্রকার কোশবিভাজনে কোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে? 8. কোন্ প্রকার কোশবিভাজনে দুবার নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে? 9. পরোক্ষ কোশবিভাজনের উদাহরণ দাও। 10. ইন্টারফেজের বিভিন্ন দশাগুলির নাম লেখো। 11. কোন্ দশাকে কোশের ঘুমন্ত দশা বলে ? 12. একটি ডিপ্লয়েড কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা 46 হলে মিয়োসিস্ বিভাজনের পরে কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে ? 13. কোশবিভাজনের কোন্ দশায় ক্রোমোজোমগুলি বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে ? 14. মিয়োসিস্ বিভাজনের কোন্ দশায় কায়াজমার প্রান্তীয়করণ ঘটে ? 15. কোশবিভাজনের কোন্ দশায় নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয় ?

D. পার্থক্য নির্ণয় করো (Distinguish between) ঃ

1. ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস। 2. ডায়াড ও টেট্রাড। 3. বাইভ্যালেন্ট ও টেট্রাভ্যালেন্ট। 4. জনন কোশ ও দেহকোশ। 5. ক্রসিং ওভার ও কায়াজমা। 6. হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড। 7. হেটেরোটাইপিক ও হোমোটাইপিক কোশ বিভাজন। 8. মাইটোসিস ও মিয়োসিসের তাৎপর্য। 9. ইন্টারফেজ ও মাইটোটিক ফেজ। 10. বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। 11. ল্যাগ দশা ও লগ দশা। 12. প্যাকিটিন দশা ও ডায়াকাইনেসিস্ দশা। 13. প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োসিস্ বিভাজন। 14. সমবিভাজন ও হ্রাসবিভাজন।

E. টীকা লেখো (Write short notes) ঃ

1. ইন্টারফেজ 2. মাইটোটিক চক্র 3. সাইন্যাপসিস 4. লেপ্টোটিন 5. জাইগোটিন 6. প্যাকটিন 7. ডিপ্লোটিন 8. ডায়াকাইনেসিস 9. বাইভ্যালেন্ট 10. ক্যারিওকাইনেসিস 11. সাইটোকাইনেসিস 12. সমসংস্থ ক্রোমোজোম 13. ক্রসিং ওভার 14. কায়াজমা 15. অ্যামাইটোসিস 16. টারমিনালাইজেশন 17. সাইন্যাপসিস 18. মেটাস্টাসিস 19. সাইন্যাপটোনিম্যাল কমপ্লেক্স।

বংশগতিবিদ্যা [GENETICS]

ভূমিকা (Introduction) : সমগ্র জীবজগত প্রজননের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তার ফলে আমের বীজ থেকে আমগাছ, মটরের বীজ থেকে মটর গাছ, মানুষ থেকে মানুষের সন্তান, সিংহ থেকে সিংহের শাবক, ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক জীব বা প্রজাতি প্রকৃতি ও চরিত্রগত দিক থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ একটি প্রজাতির সমস্ত জীবের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক বহু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেগুলি অপরিবর্তিতভাবে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এর ফলে প্রত্যেক প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। আবার একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবের অনেক বৈসাদৃশ্য থাকে। এই বৈসাদৃশ্যগুলি নির্দিষ্ট জীবের বংশে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চারিত হয়।

▲ বংশগতি এবং বংশগতিবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Heredity and Genetics) :

❖ (a) **বংশগতির সংজ্ঞা (Definition of Heredity) : যে নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী অপত্য বংশগুলিতে সঞ্চারিত হয় ও প্রকাশ পায় তাকেই বংশগতি (Heredity) বলে।**

❖ (b) **বংশগতিবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Genetics) : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বংশ পরম্পরায় সঞ্চারণ পদ্ধতি আলোচিত হয় তাকেই জেনেটিক্স (Genetics) বা বংশগতিবিদ্যা বলে।**

অনেক বিজ্ঞানী বহুদিন ধরে বংশগতির সঞ্চারণ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই মেন্ডেলের আগে সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তাই মেন্ডেলকে **বংশগতির জনক** বলে।

⚙ 7.1. বংশগতির সূত্র (মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র) ⚙ [Laws of heredity (Mendel's Laws of Heredity)]

মেন্ডেল মটর গাছের একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে একসংকর জনন এবং দু'জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে দ্বিসংকর জননের ক্রশ করেন এবং এগুলি থেকে মেন্ডেল জীবের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারণের নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতি সংক্রান্ত সূত্র উপস্থাপন করেন।

P লম্বা গাছ × বেঁটে গাছ
TT tt
T t
F_1 Tt সব গাছ লম্বা
$F_1 \times F_1$ . . . Tt × Tt
প্রথম মিয়োসিস
T t T t
দ্বিতীয় মিয়োসিস
গ্যামেট T T t t T T t t
গ্যামেটের মধ্যে T ও t জিনের পৃথকীকরণ

F_2	T	t	
	TT লম্বা	Tt লম্বা	T
	Tt লম্বা	tt বেঁটে	t

F_2 অনুপাত = 3টি লম্বা : 1টি বেঁটে

একসংকর ক্রশ

▲ A. একসংকর জনন থেকে মেন্ডেলের সূত্র (Mendel's Law from Monohybrid cross) :

একসংকর জনন থেকে মেন্ডেল দুটি সূত্র উপস্থাপন করেন।

1. **প্রকটতার নীতি** (Principle of Dominance) : কোনো জিনের দুটি ভিন্ন অ্যালিলযুক্ত একটি হেট্যারোজাইগোট জীবে একটি অ্যালিল অপর অ্যালিলের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে দেয় না। যে অ্যালিলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে **প্রকট অ্যালিল** বলে এবং অ্যালিলের এই ধর্মকে **প্রকটতা** (Dominance) বলে।

2. **পৃথকীকরণ সূত্র—মেন্ডেলের প্রথম সূত্র** (Law of Segregation—Mendel's 1st Law) : একসংকর জননে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের ক্রশ করানোর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে (F_1 জনুতে বা প্রথম অপত্য জনুতে) শুধুমাত্র প্রকট গুণটি প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রচ্ছন্ন গুণটি নষ্ট হয়ে যায় না বা হারিয়ে যায় না। F_1 জনুতে ওটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। F_1 জনুর গ্যামেট গঠনের সময় বিপরীতধর্মী ফ্যাক্টর বা অ্যালিলগুলি পৃথক হয়ে যায় এবং পৃথক পৃথক গ্যামেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রচ্ছন্ন অ্যালিলযুক্ত গ্যামেট দুটির মিলনে F_2 জনুতে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের পুনরাবির্ভাব ঘটে।
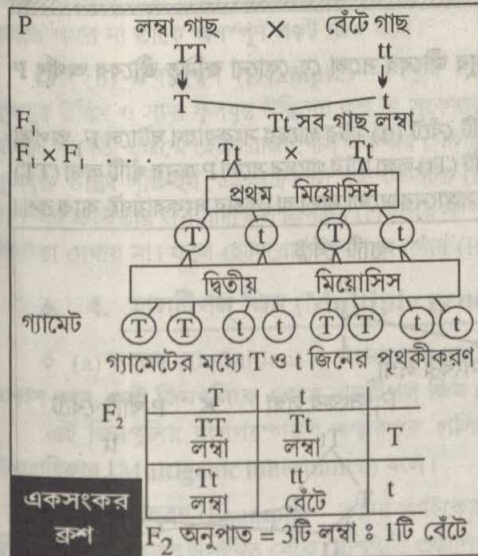
▲ B. দ্বিসংকর ক্রশ থেকে মেন্ডেলের সূত্র (Mendel's Law from Dihybrid Cross) :

● **স্বাধীন বিন্যাস সূত্র—মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (Law of Independent Assortment—Mendel's 2nd Law) :** দুই বা তার বেশি যুগ্ম অ্যালিলগুলি সংকরায়ণ পদ্ধতির মাধ্যমে একত্রে যখন এক জনু থেকে পরের জনুতে সঞ্চারিত হয়, প্রতিটি যুগ্ম অ্যালিল স্বাধীনভাবে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় গ্যামেট গঠন করে। অর্থাৎ, একটি জিনের কোনো অ্যালিল অপর জিনের যে-কোনো অ্যালিলের সঙ্গে কোনো প্রভাব ব্যাতিরেকে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে গ্যামেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে সম অনুপাতে সকল প্রকার সম্ভাব্য গ্যামেট সৃষ্টি হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মে বা অনুপাতে জাইগোট গঠনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি হয়।

▲ C. মেন্ডেলের সূত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা (Modern Explanation of Mendelism) :

মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষায় যে উপাদান ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেছেন এবং তাতে তিনি যে সূত্র বা নীতি উপস্থাপন করেছেন সেগুলি নির্ভুল ছিল। যেমন—1. **পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation) :** আধুনিক বিজ্ঞানীরা মিয়োসিস বিভাজনের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং দেখেছেন যে গ্যামেট গঠনের সময় মিয়োসিস বিভাজন হয়। প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের দ্বারা জিনগুলি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোশে পৃথক হয়ে যায়।

2. **স্বাধীনবিন্যাস সূত্র (Law of Independent Assortment) :** দু'জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমে দু'জোড়া ভিন্ন জিন যখন থাকে গ্যামেট গঠনের সময় জিনগুলি পৃথক হয়ে যায় এবং জিনগুলি স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়। এই ঘটনাটি মুদ্রা টসের দ্বারা বোঝানো যায়। দুটি ভিন্ন মুদ্রা একসঙ্গে টস করলে একটি মুদ্রার হেড অন্য মুদ্রার হেড (Head) বা টেলের (Tail) সঙ্গে স্বাধীনভাবে পড়বে এবং এভাবে মোট চার রকমের বিন্যাস সম অনুপাতে অর্থাৎ 1 : 1 : 1 : 1 হিসাবে পাওয়া যাবে।
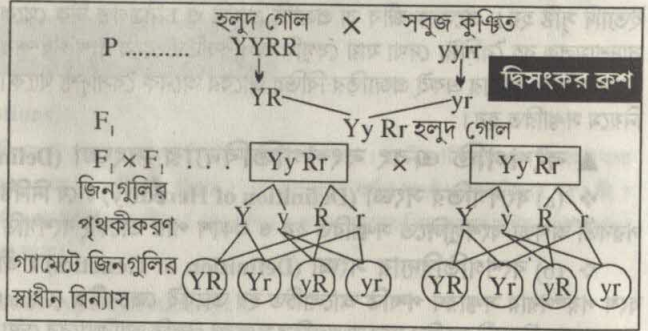
⚙ 7.2. (i) ব্যাক ক্রশ, টেস্ট ক্রশ, অসম্পূর্ণ প্রকটতা মালটিপল্ জিন, লিংকেজ, ক্রশিং ওভার (Back cross, Test cross, Incomplete Dominance, Multiple gene, Linkage, Crossing over) ⚙

▲ 1. ব্যাক ক্রশ (Back cross) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)—প্রথম অপত্য জনুর অর্থাৎ F_1 জনুর জীবের সঙ্গে যে-কোনো জনিতৃ জীবের অর্থাৎ P জনুর জীবের সংকরায়ণ ঘটানোকে ব্যাক ক্রশ বলে।**

◘ (b) **উদাহরণ (Example)**— P জনুর খাঁটি লম্বা (TT) এবং খাঁটি বেঁটে (tt) মটর গাছের সংকরায়ণ ঘটালে F_1 অপত্য জনুতে হেট্যারোজাইগোট (Tt) লম্বা মটর গাছ সৃষ্টি হয়। F_1 হেট্যারোজাইগোট (Tt) লম্বা মটর গাছের সঙ্গে P জনুর খাঁটি লম্বা (TT) অথবা খাঁটি বেঁটে (tt) মটর গাছের ক্রশই হল **ব্যাক ক্রশ**। অর্থাৎ পুত্র বা কন্যা সন্তানের সঙ্গে মাতা বা পিতার সংকরায়ণই ব্যাক ক্রশ।
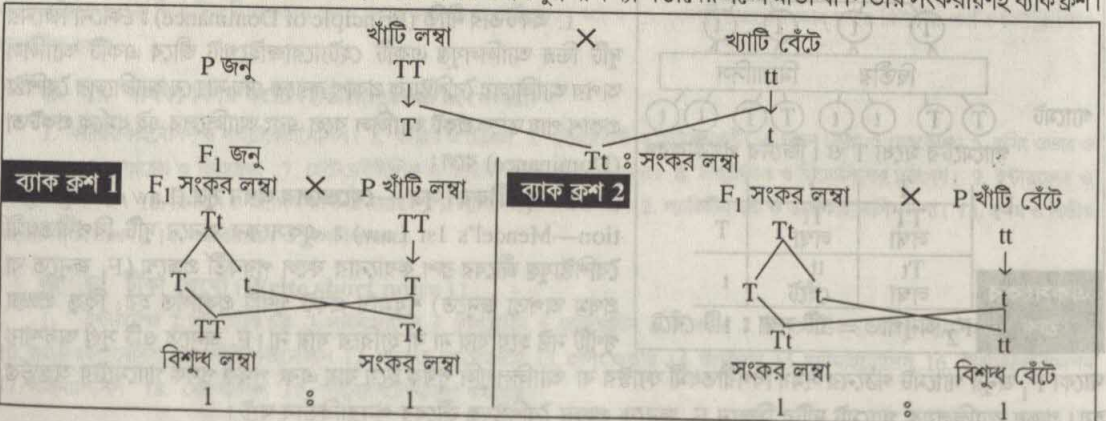
▲ 2. টেস্ট ক্রশ বা অজানা জিনোটাইপ নির্ণয়ের জন্য ক্রশ (Test Cross or Cross to find out unknown Genotype) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**— কোনো জীবের কোনো বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ নির্ণয়ের জন্য যে ক্রশে এই জীবের সঙ্গে ওই বৈশিষ্ট্যের হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জিনোটাইপযুক্ত জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হয় সেই ক্রশকে **টেস্ট ক্রশ** (Test cross) বলে।

◘ (b) **উদাহরণ (Example)**— একটি লম্বা গাছের জিনোটাইপ TT অথবা Tt হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি তা জানতে হলে এই লম্বা গাছের সঙ্গে বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জিনোটাইপযুক্ত গাছ অর্থাৎ খর্ব (tt) গাছের ক্রশই হল টেস্ট ক্রশ। এই ক্রশের ফলে যদি সবই লম্বা গাছ সৃষ্টি হয় (টেস্ট ক্রশ-1) তবে প্রথম জনুর লম্বা গাছের জিনোটাইপ হবে TT (হোমোজাইগাস) এবং ফলাফলে যদি 1 ঃ 1 অনুপাতে লম্বা ও বেঁটে গাছ সৃষ্টি হয় (টেস্ট ক্রশ-2) তবে প্রথম জনুর লম্বাগাছের জিনোটাইপ হবে Tt (হেট্যারোজাইগাস)।
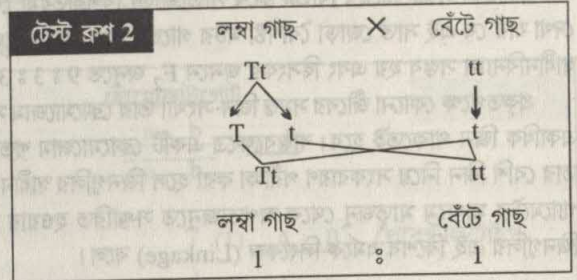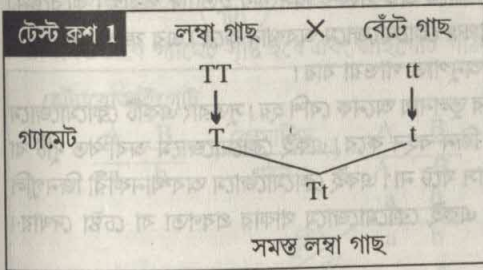
▲ 3. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**— একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন জিন বহনকারী হেট্যারোজাইগোট জীবে প্রকট জিনটি যখন তার প্রকট ফিনোটাইপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না ফলে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যবর্তী একটি মিশ্র বৈশিষ্ট্যের ফিনোটাইপ দেখা যায়, প্রকট জিনের সেই ধর্মকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

যে প্রকট জিন হেট্যারোজাইগাস অবস্থায় একটি প্রচ্ছন্ন জিনের উপস্থিতিতে প্রকট ফিনোটাইপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না তাকে **অসম্পূর্ণ প্রকট জিন** বলে।

◘ (b) **উদাহরণ (Example)**—বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদ ও সাদা ফুলযুক্ত উদ্ভিদের ক্রশ বা সংকরায়ণ ঘটালে পরবর্তী প্রজন্মে হেট্যারোজাইগাস্ অবস্থায় গোলাপি ফুলযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে লাল ফুল জিনটির (R) অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন সাদা ফুল জিনটির (r) উপর সম্পূর্ণ প্রকটতা দেখায় না। ফলে হেট্যারোজাইগাস অবস্থায় (Rr) লাল ও সাদার মধ্যবর্তী গোলাপি ফুলের সৃষ্টি হয়েছে।
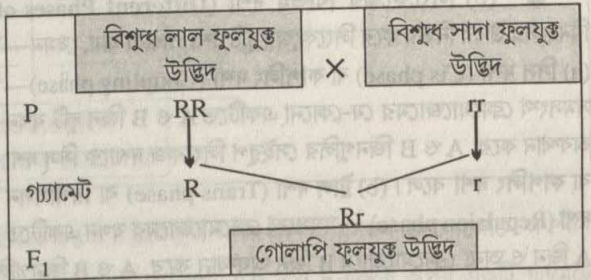
▲ 4. মালটিপল্ জিন (Multiple gene) বা পলিজিন (Polygene) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)**— অনেকগুলি অ্যালিলীয় জিন বিভিন্ন লোকাসে উপস্থিত থেকে যখন একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, সেই জিনগুলিকে একত্রে **মালটিপল্ জিন (Multiple gene)** বা **পলিজিন (Polygene)** বলে ।

এই জিনগুলির বংশপরম্পরায় সঞ্চারণকে **পলিজেনিক উত্তরাধিকার (Polygenic inheritance)** বা **মালটিজেনিক উত্তরাধিকার (Multigenic inheritance)** বলে।

◘ (b) **উদাহরণ (Example)**— ভুট্টার স্পাইকের দৈর্ঘ্য, মানুষের উচ্চতা, ওজন, ত্বকের রং ইত্যাদি প্রতিক্ষেত্রেই অনেকগুলি জিন বিভিন্ন লোকাসে উপস্থিত থেকে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত করে। এখানে জিনের সংখ্যা যত বেশি হয় জিনোটাইপের সংখ্যা ততই বেড়ে যায় এবং ফিনোটাপইও সেইমতো নানাপ্রকারের হয়। এর ফলে দুটি প্রান্তীয় চরম ফিনোটাইপের মাঝে অনেকগুলি অন্তর্বর্তী ফিনোটাইপ অবিচ্ছিন্নভাবে বা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কোনো বৈশিষ্ট্যের এই ধরনের প্রকরণকে **অবিচ্ছিন্ন** বা

ধারাবাহিক প্রকরণ (Continuous variation) বলে। জিনের পরিমাণের উপর এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নির্ভর করে বলে বংশপরম্পরায় জিনগুলির এই ধরনের সঞ্চারণকে **পরিমাণবাচক উত্তরাধিকার বা কোয়ানটিটেটিভ উত্তরাধিকার** (Quantitative inheritance) বলে।

ভুট্টার স্পাইকের দৈর্ঘ্য তিনজোড়া জিন নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন— Aa, Bb ও Cc। ভুট্টাগাছের জিনোটাইপ যখন AABBCC হয় স্পাইক সবথেকে লম্বা হয় এবং জিনোটাইপ aabbcc হলে স্পাইক সবথেকে ছোটো হয়। সমস্ত জিনগুলি মোট 27টি জিনোটাইপ গঠন করে এবং এর থেকে সর্বমোট 7টি ফিনোটাইপ প্রকাশলাভ করে। সুতরাং ভুট্টার স্পাইকের সাতরকমের দৈর্ঘ্য অবিচ্ছিন্নভাবে বা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

▲ 5. লিংকেজ (Linkage) ঃ

মেন্ডেল মটর গাছের বিভিন্ন ক্রশে সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক সংকর দ্বিসংকর ইত্যাদি পরীক্ষা করেছেন। দেখা যায় যে এই সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য মটর গাছের সাত জোড়া পৃথক পৃথক ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। এর ফলে জিনগুলির স্বাধীনবিন্যাস সম্ভব হয় এবং দ্বিসংকর জননে F_2 জনুতে 9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1 অনুপাত পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে কোনো জীবের সমস্ত জিন-সংখ্যা তার ক্রোমোজোম সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি হয়। সুতরাং একটি ক্রোমোজোমে একাধিক জিন থাকতেই হবে। বাস্তবক্ষেত্রে একটি ক্রোমোজোম শতাধিক জিন বহন করে। একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত দুটি বা তার বেশি জিন নিয়ে সংকরায়ণ পরীক্ষা করা হলে জিনগুলির স্বাধীন বিন্যাস ঘটে না। একই ক্রোমোজোমে অবস্থানকারী জিনগুলি গ্যামেটের মাধ্যমে মাতৃজনু থেকে অপত্যজনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একই ক্রোমোজোমে থাকার প্রবণতা বা চেষ্টা দেখায়। জিনগুলির এই বিশেষ ধর্মকে লিংকেজ (Linkage) বলে।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— দুই বা তার বেশি জিন একটি ক্রোমোজোমে অবস্থান করলে মাতৃ জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারণের সময় জিনগুলির সেই একই ক্রোমোজোমে থাকার চেষ্টা বা প্রবণতাকে লিংকেজ (Linkage) বলে।**

জিনের এই ধর্ম মেন্ডেল বর্ণিত স্বাধীনবিন্যাসের বিপরীত। ক্রোমোজোমে অবস্থিত ওই জিনগুলিকে লিংকড্ জিন (Linked gene) বলে। একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত সমস্ত জিনগুলিকে একত্রে একটি **লিংকেজ গ্রুপ** (Linkage group) বলে।

◘ (b) **লিংকেজের বিভিন্ন দশা (Different Phases of Linkage)** ঃ লিংকড্ জিনগুলি সমসংস্থ ক্রোমোজোমে বিন্যাসের উপর নির্ভর করে লিংকেজের দুটি দশা পাওয়া যায়, যেমন—

(a) **সিস দশা** (Cis phase) বা **কাপলিং দশা** (Coupling phase)— সমসংস্থ ক্রোমোজোমের যে-কোনো একটিতে A ও B জিন দুটি যখন অবস্থান করে, A ও B জিনগুলির সেইরূপ লিংকেজ দশাকে **সিস্ দশা** বা **কাপলিং দশা** বলে। (b) **ট্রান্স দশা** (Trans phase) বা **রিপালসন দশা** (Repulsion phase)— সমসংস্থ ক্রোমোজোমের যখন একটিতে A জিন ও অন্য ক্রোমোজোমে B জিন অবস্থান করে, A ও B জিনগুলির এই লিংকেজ দশাকে **ট্রান্স দশা বা রিপালশন দশা** বলে।

$\dfrac{A \quad B}{a \quad b}$	$\dfrac{A \quad b}{a \quad B}$
A ও B জিনের সিস বা কাপলিং দশা	A ও B জিনের ট্রান্স বা রিপালসন দশা

◘ (c) **লিংকেজের প্রকারভেদ**— লিংকেজ দুই প্রকারের —(i) সম্পূর্ণ লিংকেজ ও (ii) অসম্পূর্ণ লিকেজ।
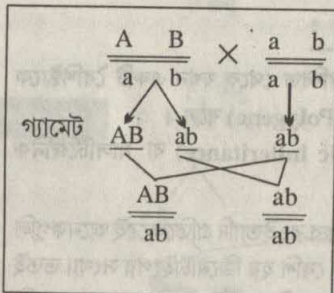
(i) **সম্পূর্ণ লিংকেজ (Complete Linkage)** ঃ ❖ **সংজ্ঞা— দুই বা তার বেশি জিন একই ক্রোমোজোমে উপস্থিত থেকে মাতৃজনু থেকে জিনগুলি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে (শতকরা একশভাগ ক্ষেত্রে) একটি একক হিসাবে যখন অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হয়, জিনগুলির একই ক্রোমোজোমে সম্পূর্ণভাবে একসঙ্গে থাকার এই প্রবণতাকে সম্পূর্ণ লিংকেজ (Complete Linkage) বলে।**

উদাহরণ— ধরা যাক দু'জোড়া জিন Aa ও Bb একটি সমসংস্থ যুগ্ম ক্রোমোজোমে উপস্থিত আছে। এই জিনগুলির হেট্যারোজাইগোটকে টেস্ট ক্রশ করলে $\left(\dfrac{AB}{a \quad b} \times \dfrac{ab}{ab}\right)$ সম্পূর্ণ লিংকেজের শর্ত অনুযায়ী অপত্য জনু সৃষ্টি হবে।

এখানে $\frac{AB}{}$ ও $\frac{ab}{}$ জিনগুলি লিংকড জিন। মাতৃজনু থেকে জনন কোশ বা গ্যামেট গঠনের সময় মাতৃজনুর অনুরূপ জিনগোষ্ঠী বা পেরেন্ট্যাল (Parental) জিনগোষ্ঠী গ্যামেটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানে ক্রশিং ওভার হয় না, ফলে 100% গ্যামেট পেরেন্টাল (Parental) ধরনের হয়।

(ii) **অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete Linkage) ঃ ❖ সংজ্ঞা — দুই বা তার বেশি জিন যখন একই ক্রোমোজোমে উপস্থিত থাকে, মাতৃজনু থেকে অপত্যজনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় জিনগুলির ভিতরে ক্রশিংওভার হওয়ার ফলে তাদের একসঙ্গে একই ক্রোমোজোমে থাকার প্রবণতা সম্পূর্ণ হয় না। নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের জিনগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং জিনের পুনঃসংযুক্তি (Recombination) ঘটে। জিনগুলির এই প্রকার লিংকেজকে অসম্পূর্ণ লিংকেজ বলে।**

উদাহরণ— ধরা যাক Aa এবং Bb দু'জোড়া জিন একটি ক্রোমোজোমে দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত। এই জিন দুটির হেট্যারোজাইগোটকে $\left(\frac{AB}{ab}\right)$ প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগোটের $\left(\frac{ab}{ab}\right)$ সঙ্গে টেস্ট ক্রশ করলে অসম্পূর্ণ লিংকেজের ধর্ম অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে গ্যামেট সৃষ্টি হবে এবং জাইগোট গঠিত হবে।
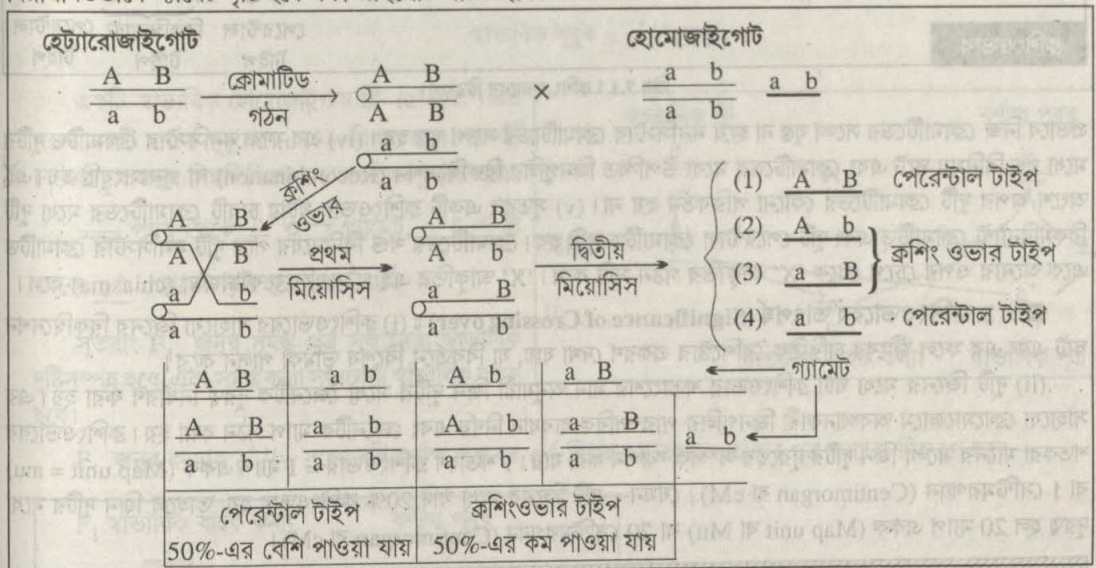
$\frac{AB}{ab}$ মাতৃজনুতে A ও B জিনগুলি একই ক্রোমোজোমে এবং a ও b জিনগুলি অপর একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। লিংকেজের ধর্ম অনুযায়ী গ্যামেট গঠনকালে A ও B একত্রে একটি গ্যামেটে এবং a ও b একত্রে অপর একটি গ্যামেটে থাকার প্রবণতা দেখায়। এর ফলে $\underline{AB}$ ও $\underline{ab}$ পেরেন্টাল টাইপের গ্যামেটগুলি 50%-এর বেশি পাওয়া যায়। জিনগুলির অসম্পূর্ণ লিংকেজের ফলে তাদের মধ্যে ক্রশিং ওভার হয় এবং জিনের পুনঃসংযুক্তি (Recombination) ঘটে। এর ফলে $\underline{Ab}$ ও $\underline{aB}$ ক্রশিং ওভার টাইপের গ্যামেট সৃষ্টি হয় এবং এগুলি 50%-এর কম পাওয়া যায়।

▲ 6. ক্রশিং ওভার (Crossing over) ঃ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, একটি ক্রোমোজোমে অনেকগুলি জিন সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে। তাঁরা আরও প্রমাণ করেছেন যে, এই ধরনের যে-কোনো দুটি জিনের মধ্যে ক্রশিং ওভার হতে পারে এবং তার ফলে জিনের পুনঃসংযুক্তি বা রিকম্বিনেশন ঘটে।

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition)— যে পদ্ধতিতে মিয়োসিস বিভাজনের প্রথম দশায় ও প্রথম প্রোফেজের প্যাকিটিন উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুটি ননসিস্টার (Non-sister) ক্রোমাটিডের মধ্যে খণ্ড বিনিময় ঘটে ফলে কায়াজমা সৃষ্টি হয় ও জিনের পুনঃসংযুক্তি (Recombination) ঘটে সেই পদ্ধতিকে ক্রশিং ওভার বলে।**

■ **2. ক্রশিং ওভার পদ্ধতি(Process of Crossing over)**—(i) সাধারণত মাতৃজননকোশ মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে গ্যামেট বা জননকোশ গঠনের সময় ক্রশিং ওভার হয়। (ii) প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ দশার অন্তর্গত প্যাকিটিন উপদশায় যখন একজোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের চারটি ক্রোমাটিড একত্রিত হয়ে **টেট্রাড্** (Tetrad) গঠন করে, যে-কোনো দুটি নন্‌সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে খন্ড বিনিময় ঘটে। (iii) টেট্রাডের কোনো একটি অংশে দুটি ক্রোমাটিড, এন্ডোনিউক্লিয়েজ (Endonuclease) উৎসেচকের প্রভাবে ভেঙে যায় ও বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়া ক্রোমাটিডের অংশদুটি লাইগেজ (Ligase) উৎসেচকের
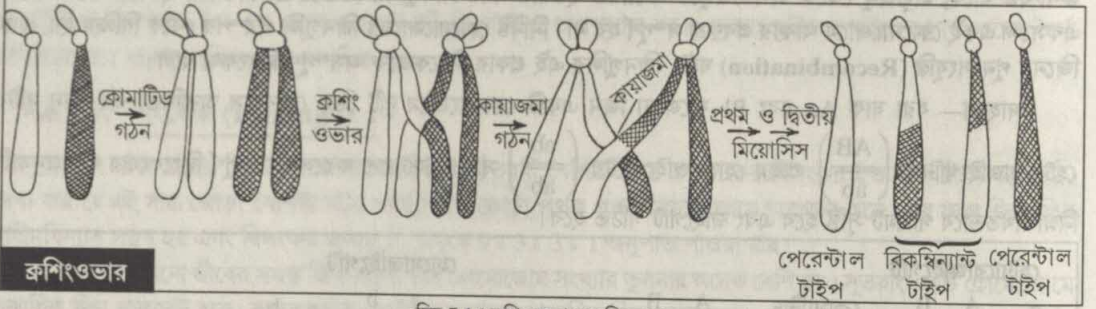
চিত্র 7.1 ঃ ক্রশিং ওভারের চিত্ররূপ।

প্রভাবে নিজ ক্রোমাটিডের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে নন্‌সিস্টার ক্রোমাটিডের সঙ্গে যুক্ত হয়। (iv) এর ফলে ননসিস্টার ক্রোমাটিড দুটির মধ্যে খণ্ড বিনিময় ঘটে এবং ক্রোমাটিডের মধ্যে উপস্থিত জিনগুলির **রিকম্বিনেশন** (Recombination) বা পুনঃসংযুক্তি হয়। এই অংশে অপর দুটি ক্রোমাটিডের কোনো পরিবর্তন হয় না। (v) সুতরাং একটি ক্রশিংওভার ঘটায় চারটি ক্রোমাটিডের মধ্যে দুটি রিকম্‌বিন্যান্ট ক্রোমাটিড্ এবং দুটি পেরেন্টাল ক্রোমাটিড সৃষ্টি হয়। ক্রোমাটিডের খণ্ড বিনিময়ের পরে দুটি ননসিস্টার ক্রোমাটিড একে অন্যের ওপর চেপে থেকে 'X' আকৃতির গঠন সৃষ্টি করে। 'X' আকৃতির এই গঠনগুলিকে **কায়াজমা** (chiasma) বলে।

■ **3. ক্রশিংওভারের তাৎপর্য (Significance of Crossing over)** ঃ (i) ক্রশিংওভারের সাহায্যে জিনের রিকম্বিনেশন ঘটে এবং এর ফলে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ দেখা যায়, যা বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(ii) দুটি জিনের মধ্যে ঘটা ক্রশিংওভার শতাংশের মান অনুযায়ী জিন দুটির মধ্যে জেনেটিক দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। এর সাহায্যে ক্রোমোজোমে অবস্থানকারী জিনগুলির পারস্পরিক ব্যবধান নির্ণয় এবং জেনেটিক ম্যাপ গঠন করা হয়। ক্রশিংওভারের শতকরা মানের সঙ্গে জিন দুটির দূরত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। 1 শতাংশ ক্রশিংওভার = 1 ম্যাপ একক (Map unit = mu) বা 1 সেন্টিমরগ্যান (Centimorgan বা cM)। যেমন—দুটি জিনের মধ্যে যদি 20% ক্রশিংওভার হয়, তাহলে জিন দুটির মধ্যে দূরত্ব হল 20 ম্যাপ একক (Map unit বা Mu) বা 20 সেন্টিমরগ্যান (Centimorgan বা cM)।

◎ 7.2.(ii) লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকার বা সেক্স লিংকড্ উত্তরাধিকার—বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়া ◎ (Sex linked Inheritance—Colour blindness and Haemophilia)

❖ **1. সংজ্ঞা (Definition)— যে প্রক্রিয়ায় X ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাকে লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকার বা সেক্স লিংকড্ উত্তরাধিকার (Sex linked inheritance) বলে।**

■ **2. লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকার মেন্ডেলীয় তত্ত্বের ব্যতিক্রমী, কারণ**— X ক্রোমোজোমে অবস্থিত সেক্স লিংকড্ জিনগুলি পিতা-মাতার কাছ থেকে অপত্য বংশে পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় না, বিশেষ একটি লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব (Sex biasness) দেখায়। যেমন—পিতার সেক্স লিংকড্ জিনগুলি শুধুমাত্র কন্যারা পায়, পুত্ররা পায় না। আবার, পুত্র সন্তানরা শুধু মায়ের কাছ থেকে সেক্স লিংকড্ জিনগুলি পায়, বাবার কাছ থেকে নয়। এইরূপ লিঙ্গ পক্ষপাত (Sex biased) যুক্ত উত্তরাধিকার অনেক শর্তসাপেক্ষ এবং একে **ক্রিশ ক্রশ উত্তরাধিকার** (Criss-cross inheritance) বলে। এখানে মেন্ডেলের তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না।

■ **3. লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকারের উদাহরণ**— বর্ণান্ধতা (Colour blindness) ও হিমোফিলিয়া (Haemophilia)।

▲ 1. বর্ণান্ধতা (Colour blindness) ঃ

❖ 1. **সংজ্ঞা ঃ যে বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশে কোনো মানুষ বিভিন্ন রং বা বর্ণের প্রভেদ করতে পারে না, অথবা রং চিনতে ভুল করে, মানুষের সেইরূপ অস্বাভাবিকতাকে বর্ণান্ধতা বলে।**

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা একপ্রকার অস্বাভাবিক বর্ণান্ধতার বহিঃপ্রকাশ। লাল-সবুজ বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত বা বর্ণান্ধ মানুষ লাল ও সবুজ বর্ণের বিভেদ করতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের জিনটি X ক্রোমোজোমে অবস্থান করে এবং এটি একটি প্রচ্ছন্ন জিন। নিম্নে বর্ণিত ক্রশের সাহায্যে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার উত্তরাধিকার বোঝানো হল।

2. **ক্রশ (Cross) ঃ** ধরা যাক বর্ণান্ধ জিনটি = c (প্রচ্ছন্ন) এবং স্বাভাবিক দৃষ্টির জিন = c^+ (প্রকট)। বর্ণান্ধ ও স্বাভাবিক দৃষ্টির স্ত্রী ও পুরুষের জিনোটাইপ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়—

বর্ণান্ধ স্ত্রী = c// c (XX) — স্বাভাবিক (হোমোজাইগাস) স্ত্রী = c^+ // c^+ (XX)

বর্ণান্ধ পুরুষ = c//\c (XY) — স্বাভাবিক (হেট্যারোজাইগাস) স্ত্রী = c^+//\c (XX)

স্বাভাবিক পুরুষ = c^+//\(XY)

একটি স্বাভাবিক হোমোজাইগাস স্ত্রী ($c^+ \| c^+$) এর সঙ্গে একটি বর্ণান্ধ পুরুষের (c | ↾) বিবাহ হলে পরবর্তী F_1 ও F_2 প্রজন্মে নিম্নলিখিতভাবে অপত্যজনু সৃষ্টি হবে।

c ⇀ পুরুষ থেকে c ও ⇀ গ্যামেট, $c^+ \| c^+$ স্ত্রী থেকে c^+ গ্যামেট সৃষ্টি হবে এবং যেমন—

সুতরাং F_1 জনুর সমস্ত পুত্র সন্তানেরা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, এবং সমস্ত কন্যা সন্তানেরা স্বাভাবিক বাহক হবে।

F_1 জনুর কন্যার c^+// c সঙ্গে যদি বর্ণান্ধ পুরুষের c//\ বিবাহ হয় তাহলে তাদের পুত্র-কন্যারা নিম্নরূপ হবে—
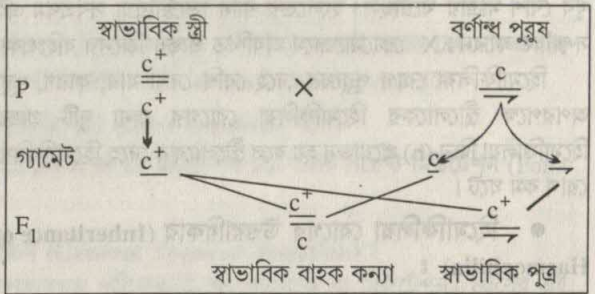
F_1 স্বাভাবিক বাহক কন্যা c/c^+ × বর্ণান্ধ পুরুষ c/⇀		
	c	⇀
c^+	c^+/c স্বাভাবিক বাহক ♀	c^+/⇀ স্বাভাবিক ♂
c	c/c বর্ণান্ধ ♀	c/⇀ বর্ণান্ধ ♂

F_2 ফলাফল ঃ এই F_2 জনুতে সকল প্রকার পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। যেমন—

কন্যা	পুত্র
(1) স্বাভাবিক = 50%	(1) স্বাভাবিক =50%
(2) বর্ণান্ধ = 50%	(2) বর্ণান্ধ = 50%

▲ 2. হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা রক্তক্ষরণ রোগ (Bleeder's disease) ঃ

হিমোফিলিয়া হল মানুষের একটি বংশগত রোগ। এই রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের কোনো ক্ষত বা কাটা স্থানে রক্ত- তঞ্চন যথাযথভাবে হয় না। এর ফলে সামান্য ক্ষত থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে ও মানুষের মৃত্যু হয়। হিমোফিলিয়া রোগের জিন মানুষের X ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। স্ত্রী লোকেরা সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হয় না, তবে এরা এই রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

❖ **1. সংজ্ঞা (Definition)— মানুষের যে বংশগত রোগের ফলস্বরূপ দেহের কোনো ক্ষত বা কাটা স্থানে রক্ততঞ্চন বিলম্বিত হওয়ার ফলে বা না হওয়ার জন্য অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে, সেই রোগকে হিমোফিলিয়া বলে।**

2. হিমোফিলিয়ার প্রকারভেদ (Types of Haemophilia)— হিমোফিলিয়া দুই প্রকারের, যেমন—

(a) **হিমোফিলিয়া A বা ক্লাসিক্যাল হিমোফিলিয়া** (Classical Haemophilia) বা **রয়্যাল হিমোফিলিয়া** (Royal Haemophilia)— এইরূপ হিমোফিলিয়া রক্তের প্লাজমার **অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর** (Antihemophilic factor) বা **ফ্যাক্টর VIII** (Factor VIII)-এর অভাবের জন্য ঘটে। এই ফ্যাক্টরটি **'HEM-A'** জিনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়। প্রায় 80% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়।

(b) **হিমোফিলিয়া B বা খ্রিস্টমাস রোগ** (Christmas disease)— স্টিফেন খ্রিস্টমাস নামে একজন রোগীর দেহে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে বলে একে খ্রিস্টমাস রোগও বলে। এইরূপ হিমোফিলিয়া মানুষের রক্তে **প্লাজমা থ্রোম্বোপ্লাসটিন** (Plasma thromboplastin) বা **ফ্যাক্টর IX** (Factor IX)-এর অভাবে ঘটে। এই ফ্যাক্টরটি **"HEM-B"** জিনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়। প্রায় 20% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়।

মানুষের X ক্রোমোজোমে HEM-A ও HEM-B জিন দুটি বেশ খানিকটা দূরত্বে অবস্থান করে।

হিমোফিলিয়া-A রাজকীয় হিমোফিলিয়া (Royal Haemophilia) নামেও পরিচিত। কারণ, এই রোগ ইউরোপের রাজপরিবারে খুব বেশি মাত্রায় ঘটেছিল। ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়া সর্বপ্রথম এই রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটি ধারণ করেন ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করেন। X ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের বহিঃপ্রকাশে এই রোগ ঘটে।

হিমোফিলিয়া রোগ পুরুষের দেহে বেশি দেখা যায়, কারণ, পুরুষের একটি হিমোফিলিয়া জিন থাকলেই এই রোগ ঘটে। অপরপক্ষে স্ত্রীলোকের হিমোফিলিয়া রোগের জন্য দুটি প্রচ্ছন্ন হিমোফিলিয়া জিন (h) প্রয়োজন হয় বলে স্ত্রীলোকের দেহে হিমোফিলিয়া রোগ কম ঘটে।

● **হিমোফিলিয়া রোগের উত্তরাধিকার (Inheritance of Haemophilia) :**

ধরা যাক্, হিমোফিলিয়া রোগের প্রচ্ছন্ন জিন = h

এবং স্বাভাবিক রক্ততঞ্চনের প্রকট জিন = h^+

রানি ভিক্টোরিয়া বাহক, তাই তাঁর জিনোটাইপ ছিল = h / h^+

ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের স্বাভাবিক জিনোটাইপ = h^+ / Y

	রানি ভিক্টোরিয়া	×	যুবরাজ অ্যালবার্ট
P	$\frac{h}{h^+}$ (X)(X)		$\frac{h^+}{\rightarrow}$ (X)(Y)
গ্যামেট	h	h^+	
F_1	$\frac{h}{h^+}$ স্বাভাবিক (বাহক) কন্যা	$\frac{h^+}{h^+}$ স্বাভাবিক কন্যা	h^+
	$\frac{h}{\rightarrow}$ হিমোফিলিক পুত্র	$\frac{h^+}{\rightarrow}$ স্বাভাবিক পুত্র	$\rightarrow$

এখানে F_1 প্রজন্মে দেখা যায় যে, একটি কন্যা স্বাভাবিক কিন্তু বাহক, অপর কন্যাটি স্বাভাবিক এবং দুটি পুত্রের মধ্যে একটি পুত্র হিমোফিলিক ও একটি পুত্র স্বাভাবিক। সুতরাং শতকরা 50 ভাগ পুত্রের হিমোফিলিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই কারণেই রানি ভিক্টোরিয়ার পুত্ররা হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত ছিল। হিমোফিলিয়া জিনটি (h) রানি তাঁর বাহক কন্যাদের মারফত রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজপরিবারে সঞ্চারিত করেন।
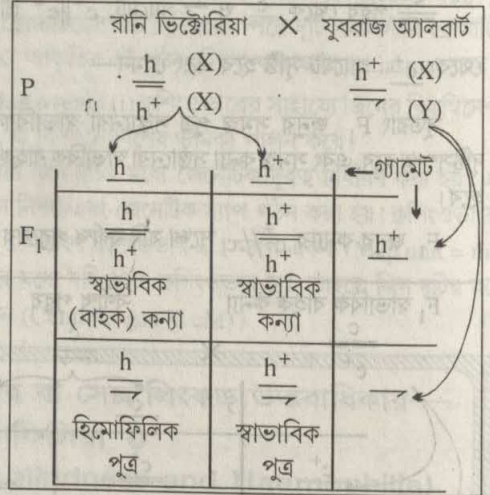
❂ 7.3. পরিব্যক্তি (Mutation) ❂

জীবের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা বাহিত হয় ও প্রকাশিত হয়। সাধারণত জিনের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং জিন সুস্থির অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় জিনের উপাদানগত পরিবর্তন হয়, ফলে জিনের কাজের পরিবর্তন ঘটে। জিনের এইরূপ পরিবর্তনকেই **পরিব্যক্তি বা মিউটেশন** (Mutation) বলে।

❖ **1. পরিব্যক্তির সংজ্ঞা (Definition of Mutation) : জিনের উপাদানগত যে পরিবর্তন বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, যার ফলে জিনের একটি পরিবর্তিত কাজ সংগঠিত হয় এবং ভিন্ন ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, জিনের সেই পরিবর্তনকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলে।**

মিউটেশনের ফলে স্বাভাবিক জিনটি পরিবর্তিত হয়ে **মিউট্যান্ট জিনে** (Mutant gene) পরিণত হয়। এইভাবে স্বাভাবিক জিনের নতুন অ্যালিল সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে মিউট্যান্ট জিনগুলি **প্রকট** (Dominant) অথবা **প্রচ্ছন্ন** (Recessive) হতে পারে।

- **সোমাটিক মিউটেশন ও জার্মপ্লাজম মিউটেশন** (Somatic mutation and Germplasm mutation)— উৎসগত দিক থেকে মিউটেশন দুই প্রকার। জীবের দেহকোশে ঘটা মিউটেশনকে **সোমাটিক মিউটেশন** (somatic mutation) এবং জনন মাতৃকোশে ঘটা মিউটেশনকে **জার্মপ্লাজম মিউটেশন** (Germplasm mutation) বলে। সোমাটিক মিউটেশন বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না, অপরদিকে জার্মপ্লাজম মিউটেশন গ্যামেটের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

- **স্বতঃস্ফূর্ত ও আবিষ্ট মিউটেশন** (Spontaneous and Induced mutations)— প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যে মিউটেশন ঘটে তাকে **স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন** (Spontaneous mutation) বলে। কৃত্রিমভাবে ভৌত অথবা রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে যে মিউটেশন ঘটে তাকে **আবিষ্ট মিউটেশন** (Induced mutation) বলে। আবিষ্ট মিউটেশন সৃষ্টিকারী পদার্থগুলিকে **মিউটাজেন** (Mutagen) বলে। যেমন— X-রশ্মি, UV-রশ্মি, নাইট্রাস অ্যাসিড, 5-ব্রোমো ইউরাসিল ইত্যাদি।

- **বিভিন্ন স্তরে মিউটেশন (Mutations at different levels)** ঃ ক্রোমোজোমের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন জিন অবস্থান করে। সুতরাং ক্রোমোজোমের পরিবর্তন হলে জিনের পরিবর্তন বা জিনের মিউটেশন ঘটে। মিউটেশন ক্রোমোজোম স্তরে অথবা জিন স্তরে হতে পারে। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

(a) ক্রোমোজোমের সংগঠনের (Organisation) পরিবর্তন বা বিচ্যুতির ফলে যে মিউটেশন ঘটে তাকে **ক্রোমোজোম্যাল মিউটেশন** (Chromosomal mutation) বা **ক্রোমোজোম্যাল অ্যাবারেশন** (Chromosomal aberration) বলে।

(b) শুধুমাত্র জিন স্তরে যে মিউটেশন ঘটে তাকে **জিন মিউটেশন** (Gene mutation) বলে।

(c) DNA অণুর একজোড়া নাইট্রোজেন বেসের পরিবর্তনের ফলে যে মিউটেশন ঘটে তাকে **পয়েন্ট মিউটেশন** (Point mutation) বলে।

◘ 2. পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের সাধারণ প্রকারভেদ (General Types of Mutation) ঃ

ক্রশিং ওভার ব্যতিরেকে জিনের পরিমাণ, গঠন ও উপাদানগত পরিবর্তনই হল পরিব্যক্তি বা মিউটেশন। জিনের এই পরিবর্তন ক্রোমোজোমে দৃশ্যমান হতে পারে, অথবা দৃশ্যমান না হতেও পারে। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিব্যক্তি বা মিউটেশনকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—(I) ক্রোমোজোমে দৃশ্যমান মিউটেশন, (II) ক্রোমোজোমে অদৃশ্যমান মিউটেশন।

▲ I. ক্রোমোজোমে দৃশ্যমান মিউটেশন (Chromosomally visible mutation) ঃ

এই ধরনের মিউটেশনের ফলে ক্রোমোজোমের দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটে এবং এগুলি দুই প্রকারের, যেমন— ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন এবং ক্রোমোজোম গঠনের পরিবর্তন।

1. ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন (Change in Number of Chromosome) ঃ

পলিপ্লয়ডি এবং অ্যানিউপ্লয়ডির সাহায্যে এই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

(a) **পলিপ্লয়ডি** (Polyploidy) ঃ একটি ডিপ্লয়েড জীবের দেহকোশে প্রতি ক্রোমোজোমের দুটি অর্থাৎ দু'সেট ক্রোমোজোম থাকে। ডিপ্লয়েড জীবের দেহকোশে যখন দুইয়ের বেশি সেট ক্রোমোজোম থাকে, ক্রোমোজোম সংখ্যার সেই পরিবর্তনকে **পলিপ্লয়ডি** বলে। পলিপ্লয়ডি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—

(i) **ট্রিপ্লয়েড** (Triploid)—কোনো জীবের দেহকোশে ক্রোমোজোমের তিনটি সেট (3n) উপস্থিত থাকলে সেই জীবটিকে **ট্রিপ্লয়েড** বলে। উদাহরণ—মানুষের ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোজোম সংখ্যা 46 হলে ট্রিপ্লয়েড (3n) ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে 69।

(ii) **টেট্রাপ্লয়েড** (Tetraploid)—কোনো জীবের দেহকোশে চারটি সেট (4n) ক্রোমোজোম থাকলে সেই জীবটিকে টেট্রাপ্লয়েড (4n) বলে। মানুষের টেট্রাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা $4n = 23 \times 4 = 92$।

একইভাবে পেন্টাপ্লয়েড (5n), হেক্সাপ্লয়েড (6n) ইত্যাদি পলিপ্লয়ডি গঠিত হয়।

(b) **অ্যানিউপ্লয়ডি** (Aneuploidy) ঃ সমগ্র ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যার পরিবর্তন না হয়ে যখন তার মধ্যে প্রধানত একটি বা কয়েকটি বিশেষ স্বতন্ত্র ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন হয় তাকে **অ্যানিউপ্লয়ডি** বলে। এক্ষেত্রে দেহ কোশের

স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সংখ্যা বা ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যার থেকে বেশি বা কম হয়। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অ্যানিউপ্লয়ডিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **হাইপোপ্লয়ডি** (Hypoploidy)— এখানে কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড সংখ্যা থেকে কম হয়, যেমন— মনোসোমিক (2n – 1), নালিসোমিক (2n – 2), ইত্যাদি।

(ii) **হাইপারপ্লয়ডি** (Hyperploidy)— এক্ষেত্রে কোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড সংখ্যা থেকে বেশি হয়, যেমন— ট্রাইসোমিক (2n + 1), টেট্রাসোমিক (2n + 2), পেন্টাসোমিক (2n + 3) ইত্যাদি।

2. ক্রোমোজোম গঠনের পরিবর্তন (Alteration of structure of Chromosome) বা ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা (Chromosomal aberration) :

একটি ক্রোমোজোমে বিভিন্ন জিন একটি নির্দিষ্ট সজ্জারীতিতে বিন্যস্ত থাকে। জিনগুলির এই ক্রমবিন্যাস বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। ক্রোমোজোমের গঠনের পরিবর্তন প্রধানত চার প্রকার, যেমন—

(a) **ডুপ্লিকেশন (Duplication)** : ক্রোমোজোমের কোনো অতিরিক্ত অংশ যখন স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ক্রোমোজোমের সেই পরিবর্তনকে **ডুপ্লিকেশন** বলে। ডুপ্লিকেশনের ফলে ক্রোমোজোমের কোনো অংশ দুবার উপস্থিত থাকে।
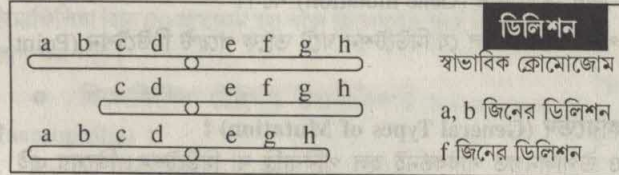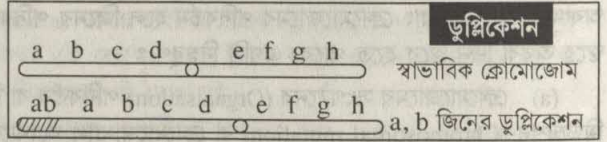
(b) **ডিলিশন** বা ডেফিসিয়েন্সি **(Deletion or Deficiency)** : ক্রোমোজোমের গঠনের যে পরিবর্তনে ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশ বা অন্তর্বর্তী কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে **ডিলিশন** বা **ডেফিসিয়েন্সি** বলে। ডিলিশনের ফলে ক্রোমোজোম থেকে এক বা একাধিক জিন বাদ পড়ে যায়।

(c) **ইন্‌ভারশন (Inversion)** : একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের কোনো অংশ কেটে গিয়ে একই স্থানে 180° ঘূর্ণনের পরে মূল ক্রোমোজোমের কাটা অংশে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোমের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে **ইন্‌ভারশন** (Inversion) বলে।

ইনভারশনে ক্রোমোজোম খণ্ডের ঘূর্ণনের ফলে ক্রোমোজোমে জিন সজ্জার পরিবর্তন ঘটে।

● **বিভিন্ন প্রকার ইনভারশন (Different types of Inversion)**— ইনভারশন দু'প্রকার হতে পারে, যেমন—

(i) **পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন** (Pericentric Inversion)— 180° ঘুরে যাওয়া খণ্ডিত ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হলে সেই ইনভারশনকে **পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন** বলে।
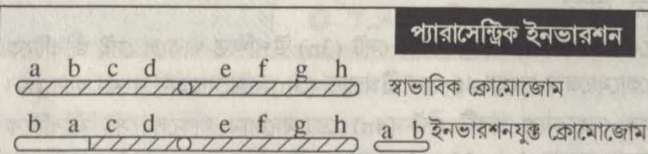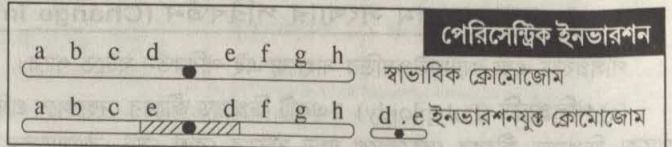
(ii) **প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন (Paracentric Inversion)**— 180° ঘুরে যাওয়া খণ্ডিত ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার বিহীন হলে সেই প্রকার ইনভারশনকে **প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন** বলে।

(d) **ট্রান্সলোকেশন বা ট্রান্সফার (Translocation or Transfer)** : একটি ক্রোমোজোমের কোনো অংশ ক্রোমোজোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর একটি অসমসংস্থ (Nonhomologous) ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত হলে ক্রোমোজোমের যে পরিবর্তন হয় তাকে **ট্রান্সলোকেশন** বলে।

● **বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সলোকেশন (Different types of Translocation)** ঃ ট্রান্সলোকেশনে অংশগ্রহণকারী ক্রোমোজোম খণ্ডের উৎপত্তি ও সংযোগ দুটি অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের বিভিন্ন স্থানে হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ট্রান্সলোকেশন তিন প্রকারের হয়—
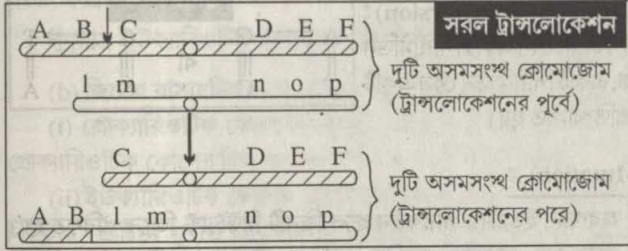
(i) **সরল ট্রান্সলোকেশন** (Simple Translocation)— যে ট্রান্সলোকেশনে কোনো ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশের একটি অংশ খণ্ডিত হয়ে একটি অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের প্রান্তে যুক্ত হয়, তাকে **সরল ট্রান্সলোকেশন** বলে।

(ii) **শিফট বা ইন্টারক্যালারি** (Shift or Intercalary)— যে ট্রান্সলোকেশনে কোনো ক্রোমোজোমের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর একটি অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যবর্তী অংশে যুক্ত হয় তাকে শিফট বা **ইন্টারক্যালারি** বলে।

(iii) **রেসিপ্রোক্যাল বা পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশন** (Reciprocal Translocation) ঃ যে ট্রান্সলোকেশনে দুটি অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে পারস্পরিক খণ্ড বিনিময় ঘটে তাকে রেসিপ্রোক্যাল বা পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশন বলে।
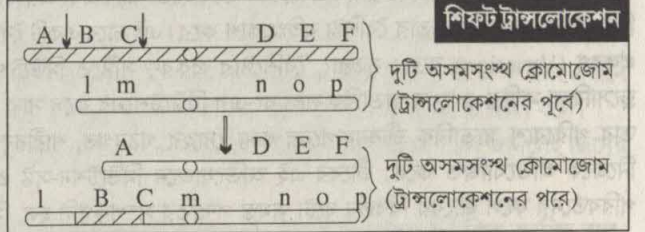
▲ **II. ক্রোমোজোমে অদৃশ্যমান মিউটেশন (Chromosomally invisible mutations)** ঃ

যে মিউটেশন জিনস্তরে ঘটে এবং যার ফলে ক্রোমোজোমের দৃশ্যগত কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না তাদের একত্রে এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন— জিন মিউটেশন ও পয়েন্ট মিউটেশন।

(a) **জিন মিউটেশন** (Gene Mutation)— যে মিউটেশনের ফলে কোনো জিনের নাইট্রোজেন ক্ষার মূলকের সজ্জা পরিবর্তিত হয় এবং নতুন ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে জিনের সেই মিউটেশনকে **জিন মিউটেশন** বলে। জিনের মধ্যে DNA-এর এক বা একাধিক জোড়া নাইট্রোজেন ক্ষারমূলকের প্রতিস্থাপন (Substitution), ডিলিশন (Deletion) বা সংযুক্তিকরণ (Addition) হলে জিন মিউটেশন ঘটে।
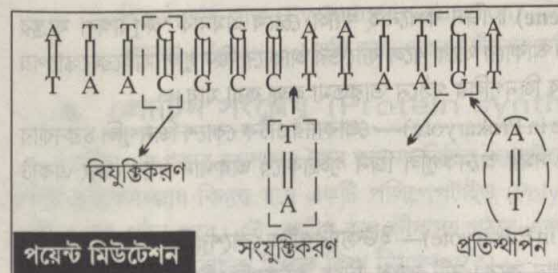
(b) **পয়েন্ট মিউটেশন** (Point Mutation) ঃ যে জিন মিউটেশনে শুধুমাত্র একজোড়া নাইট্রোজেন ক্ষার বা বেসের পরিবর্তন ঘটে তাকে পয়েন্ট মিউটেশন বলে। নাইট্রোজেন বেসের এই পরিবর্তন সংযুক্তিকরণ, বিযুক্তিকরণ অথবা পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে ঘটে।

পয়েন্ট মিউটেশন প্রধানত দু'প্রকারের, যেমন—

(i) **ট্রানজিশন (Transition)** ঃ এক্ষেত্রে একটি পিউরিন বেস অপর পিউরিন বেস দ্বারা অথবা একটি পিরিমিডিন বেস অপর একটি পিরিমিডিন বেস দ্বারা প্রতিস্থাপিত (Replaced) হয়।
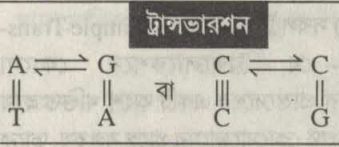
(ii) **ট্রান্সভারশন (Transversion)** ঃ এক্ষেত্রে একটি পিউরিন বেস একটি পিরিমিডিন বেস দ্বারা অথবা, একটি পিরিমিডিন বেস একটি পিউরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
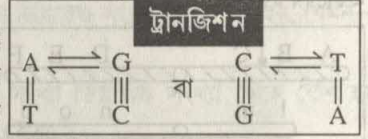
◻ মিউটেশনের গুরুত্ব (Importance of Mutation) ঃ

স্বাভাবিক জিনের উপাদান, পরিমাণ, ক্রোমোজোমে অবস্থান, ইত্যাদির পরিবর্তন হলে জিনটি মিউট্যান্ট জিনে পরিণত হয়। একটি নির্দিষ্ট জিনের এই মিউটেশন একাধিক স্থানে হতে পারে এবং এর ফলে একাধিক অ্যালিল সৃষ্টি হয়। প্রতিটি অ্যালিল নির্দিষ্ট ফিনোটাইপের সাহায্যে তার বৈশিষ্ট্য বহিঃপ্রকাশ করে। এইভাবে একটি বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন রূপ বা প্রকারভেদ সৃষ্টি হয় এবং একে **প্রকরণ** (Variation) বলে। সুতরাং, বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ সৃষ্টিতে মিউটেশন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যেমন— ড্রসোফিলা মাছির চোখের স্বাভাবিক লাল রং-এর মিউটেশনের ফলে সাদা ও লাল রঙের মধ্যবর্তী অনেক প্রকরণ সৃষ্টি হয়। জীব তার পরিবেশে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য দেহের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয়, আচরণগত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করে নিজেকে অভিযোজিত করে। জীবের এই অভিযোজনে মিউটেশন-সৃষ্ট প্রকরণ অংশগ্রহণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে জীবের বিবর্তন ঘটে। সমস্ত পদ্ধতির সম্পর্কগুলি হল, মিউটেশন → প্রকরণ → অভিযোজন → বিবর্তন।

অর্থাৎ এককথায় মিউটেশন জিনের প্রকরণ ঘটিয়ে জৈববিবর্তনের রসদ বা কাঁচামাল যোগান দেয়।

✪ 7.4. জিনের গঠন ও কাজ (Structure and function of Gene) ✪

মেন্ডেলের মতে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারণ নিয়ন্ত্রণকারী বস্তু হল ফ্যাক্টর (factor)। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে মেন্ডেল বর্ণিত ফ্যাক্টরগুলিকে জিন বলে। মেন্ডেল পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানীরা জিন নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং জিন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা উত্তরোত্তর পরিবর্তন হয়েছে। জিনের সংজ্ঞা এভাবে বিভিন্ন ধাপে দেওয়া যেতে পারে।

❖ 1. জিনের সংজ্ঞা (Definition of gene) ঃ

(i) ক্রোমোজোমের ভিতরে সারিবদ্ধভাবে থাকা যে জৈব বস্তু বংশগতির ধারক ও বাহক হিসাবে জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করে ও প্রকাশ করে তাকে জিন বলে।

(ii) আধুনিক সংজ্ঞা ঃ জীবদেহের একটি নির্দিষ্ট জৈবিক কাজের জন্য অথবা একটি বিশেষ ফিনোটাইপ প্রকাশের জন্য নিউক্লিক অ্যাসিডের (প্রধানত DNA; কিছু ভাইরাসে RNA) যে অংশটি দায়ী এবং যা একটি কার্যকরী পলিপেপটাইড গঠনের জন্য প্রয়োজন তাকে একটি জিন বলে।

এই মত অনুযায়ী— **একটি জিন ঃ একটি পলিপেপটাইড ঃ একটি জৈবিক কাজ ঃ একটি ফিনোটাইপ।**

◻ 2. জিনের গঠন (Structure of gene) ঃ

(a) **জিনের বাহ্যিক গঠন (External structure of gene) ঃ** জিন কখনোই খালি চোখে এমনকি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। তবে পলিটিন ক্রোমোজোমে জিন প্রবর্ধিত আকারে থাকে বলে ব্যান্ডের আকারে জিনগুলি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যেতে পারে। প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওট জীবে জিনগুলির গঠনে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

(i) **প্রোক্যারিওটিক কোশে জিনের গঠন** (Structure of gene in Prokaryote)— প্রোক্যারিওটিক কোশে জিনগুলি চক্রাকার DNA-এর বিভিন্ন অংশ হিসাবে অবস্থান করে। কোনো কোনো সময় অনেকগুলি জিন গুচ্ছাকারে অবস্থান করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) **ইউক্যারিওটিক কোশে জিনের গঠন** (Structure of gene in Eukaryote)— ইউক্যারিওটিক কোশের জিন ক্রোমোজোমের অংশ হিসাবে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর রৈখিকভাবে অবস্থান করে। দুটি অংশ নিয়ে ইউক্যারিওটিক জিন গঠিত হয়,

যেমন ইনট্রন ও এক্সন। জিনের যে অংশ থেকে জৈবিক বার্তা ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA-তে কোড্ (code) গঠন করে তাকে **এক্সন** (Exon) বলে; এবং যে অংশ থেকে কোনো জৈবিক বার্তা mRNA-তে কোনো কোড্ গঠন করে না, সেই ননকোডিং (Noncoding) অংশকে **ইনট্রন** (Intron) বা **ইন্টারভেনিং সিকোয়েন্স** (Intervening sequence) বলে। দুটি এক্সনের মাঝে একটি ইনট্রন থাকে।

শুধুমাত্র ইউক্যারিওটিক কোশের জিনে ইনট্রন থাকে প্রোক্যারিওটিক কোশের জিনে ইনট্রন থাকে না।

(b) **জিনের রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of gene) :**

(i) **প্রোক্যারিওটিক কোশে** নগ্ন DNA থাকে এবং এই DNA যাবতীয় জৈবিক বার্তা বংশ পরম্পরায় বহন করে। সুতরাং প্রোক্যারিওটিক কোশের জিন বলতে DNA-এর অংশকে বোঝায়।

(ii) **ইউক্যারিওটিক কোশের** ক্রোমোজোমে জিন থাকে এবং এখানে জিন বলতে নিউক্লীয় প্রোটিনের একটি অংশকে বোঝায়। নিউক্লীয় প্রোটিনে মুখ্যত DNA এবং হিস্টোন প্রোটিন থাকে, যার মধ্যে DNA জেনেটিক বস্তু হিসাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় বহন করে। সুতরাং ইউক্যারিওটিক কোশে জিন বলতে প্রকৃতপক্ষে DNA-এর অংশবিশেষকে বোঝায়।

অতএব, সমস্ত প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক উভয় জীবে DNA জিন বহন করে এবং DNA-এর গঠনই জিনের গঠন। এছাড়া কিছু উদ্ভিদ ভাইরাস যেমন তামাক পাতার ভাইরাসে (Tobacco Mosaic Virus বা TMV) DNA থাকে না এবং এখানে RNA জেনেটিক বস্তু হিসাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে এই RNA-কে জেনেটিক RNA (Genetic RNA) বলে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে DNA বা জেনেটিক RNA জিন বহন করে এবং এই দুটি নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন জানলেই জিনের আণবিক গঠন জানা যায়।

● **নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) :** যে বৃহৎ জৈব অণু প্রধানত নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় তাকে **নিউক্লিক অ্যাসিড** বলে। নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্ষুদ্র একককে **নিউক্লিওটাইড** বলে। একটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়, যেমন— **নাইট্রোজেন বেস, পেন্টোজ শর্করা ও ফসফোরিক অ্যাসিড।**
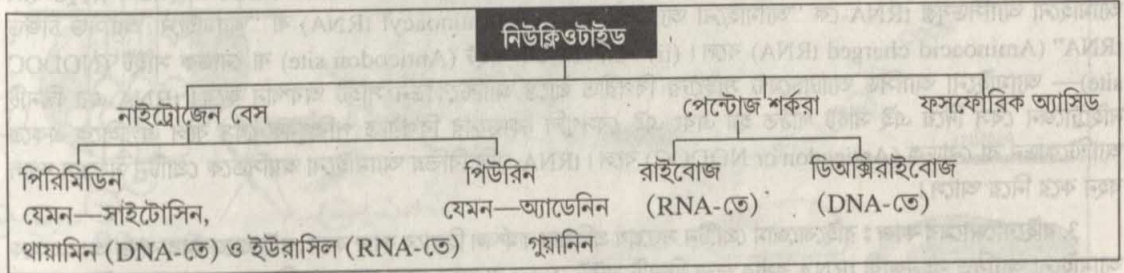
◘ **3. জিনের কাজ (Function of gene) :** জিনের প্রধান কাজ তিনটি, যেমন—

1. **জিনোটাইপগত কাজ** (Genotypic function)—জিন সমস্ত জৈবিক বার্তা ধারণ করে এবং বিভাজনের মাধ্যমে মাতৃজনু থেকে অপত্যজনুতে এই বার্তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সঞ্চারিত করে। প্রকৃতপক্ষে DNA বিভাজন বা রেপ্লিকেশনের (Replication) সাহায্যে এই কাজ সমাধা হয়।
2. **ফিনোটাইপগত কাজ** (Phenotypic function)—জীবের সমস্ত ফিনোটাইপ গঠন ও বহিঃপ্রকাশ জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এককোশী জাইগোট থেকে বহুকোশী জীবের গঠন জিন নিয়ন্ত্রণ করে।
3. **বিবর্তনগত কাজ** (Evolutionary function)—জিনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ (Variations) সৃষ্টি হয়। প্রকরণ জীবের অভিযোজনে সহায়তা করে, ফলে জীবের বিবর্তন ঘটে।

▲ প্রোটিন সংশ্লেষ (Protein synthesis) :

প্রোটিন একপ্রকার বৃহদাকার জৈব অণু যা বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত হয়। সর্বমোট 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্দিষ্ট ক্রমিকসজ্জায় বিন্যস্ত হয়ে একটি পলিপেপটাইড (Polypeptide) গঠন করে। এক বা একাধিক পলিপেপটাইড একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। এই প্রোটিন অণু জীবদেহ গঠনে এবং উৎসেচক ও হরমোন গঠনে অংশ গ্রহণ করে। হরমোন এবং উৎসেচক জীবদেহের বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রোটিন সংশ্লেষের মাধ্যমে জিনের মধ্যে নিহিত জৈব বার্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রথমে জিন বা DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতির সাহায্যে mRNA সংশ্লেষ হয়। mRNA-এর তিনটি বেস একটি **কোডন** গঠন করে এবং একটি কোডন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সূচিত করে। mRNA রাইবোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষের স্থান প্রদান করে। tRNA-গুলি অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে প্রোটিন সংশ্লেষের নির্দিষ্ট স্থানে বহন করে নিয়ে আসে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইড বন্ডের সাহায্যে যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড গঠন করে। সুতরাং প্রোটিন সংশ্লেষে তিনটি উপাদান যেমন mRNA, tRNA এবং রাইবোজোম অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন ফ্যাক্টর (Factor) বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় হয়ে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে।

◘ প্রোটিন সংশ্লেষে mRNA, tRNA ও রাইবোজোমের ভূমিকা (Role of mRNA, tRNA and ribosome in Protein synthesis) ঃ

1. **mRNA-র কাজ ঃ** mRNA-তে অবস্থিত পরপর তিনটি নাইট্রোজেন বেস একত্রে একটি একক হিসাবে যখন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ নির্দেশ করে, তাকে একটি **কোডন** (codon) বলে। কোডনগুলি mRNA-তে রৈখিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। সর্বমোট 64টি কোডন পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম কোডনটি হল 'AUG', যা মিথিওনিন (Methionine) অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজন হয় এবং এটিকে "ইনিশিয়েশন কোডন" (Initiation codon) বা "প্রারম্ভিক কোডন" বলে। এছাড়া তিনটি "টারমিনেশন কোডন" (Termination codon) বা "সমাপ্তিকরণ কোডন" বা "ননসেন্স কোডন" (Nonsence codon) বা "স্টপ কোডন" (Stop codon) পাওয়া যায়। এগুলি হল— UAA (ওকার বা Ochre), UAG (অ্যাম্বার বা Amber) এবং UGA (ওপাল বা Opal)। mRNA-এর 5′ প্রান্তে অবস্থিত ইনিশিয়েশন কোডন দিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু হয় এবং 3′ প্রান্তে অবস্থিত যে-কোনো একটি টারমিনেশন কোডন দিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষ শেষ হয়।

2. **tRNA-এর কাজ ঃ** tRNA অণুর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে পরিপূরক বেস পেয়ারিং (Complementary base pairing)-এর ফলে tRNA-টি একটি ক্লোভার পাতার আকার ধারণ করে। tRNA-এর দুটি প্রধান সাইট (site) বা স্থান দেখা যায়। এগুলি হল—(i) **অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাটাচ্‌মেন্ট সাইট** (Amino acid attachment site) বা **অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুক্তির স্থান**— এই সাইটটি (Site) tRNA-এর 3′-OH প্রান্তে অবস্থিত যেখানে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড tRNA-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডযুক্ত tRNA-কে "অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA" (Aminoacyl tRNA) বা "অ্যামাইনো অ্যাসিড চার্জড্ tRNA" (Aminoacid charged tRNA) বলে। (ii) **অ্যান্টিকোডন সাইট** (Anticodon site) বা **নোডক সাইট** (NODOC site)— অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাটাচমেন্ট সাইটের বিপরীত প্রান্তে অ্যান্টিকোডন সাইট অবস্থান করে। tRNA-এর তিনটি নাইট্রোজেন বেস দিয়ে এই সাইট গঠিত হয় এবং এই বেসগুলি কোডনের বিপরীত পরিপূরক বেস বলে এগুলিকে একত্রে অ্যান্টিকোডন বা নোডক (Anticodon or NODOC) বলে। tRNA-গুলি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিন সংশ্লেষ স্থলে বহন করে নিয়ে আসে।

3. **রাইবোজোমের কাজ ঃ** রাইবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার কর্মস্থল হিসাবে কাজ করে। রাইবোজোমের বড়ো অধঃএককে অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী tRNA বসার জন্য তিনটি সাইট (Site) বা স্থান দেখা যায়; এগুলি হল— (i) "E সাইট" (Exit site), (ii) "P সাইট" (Peptidyl site) এবং (iii) "A সাইট" (Aminoacyl site)। এই সাইটগুলিতে tRNA বসে এবং পর্যায়ক্রমে এদের স্থান বদলের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে। প্রথম tRNA-টি ফরমাইল-মিথিওনিন (Formyl-methionine) বহন করে এবং রাইবোজোমের 'P' সাইটে বসে; এবং বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী সমস্ত tRNA 'A' সাইটে ঢুকে 'P' সাইট ও 'E' সাইট অতিক্রম করে, অ্যামাইনো অ্যাসিড মুক্ত হয়ে রাইবোজোম থেকে বেরিয়ে যায়।

◘ প্রোটিন সংশ্লেষের পদ্ধতি (Mechanism of Protein synthesis) ঃ

সমস্ত প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে ঘটে; যেমন— (I) ইনিশিয়েশন (Initiation) বা প্রারম্ভিক পর্যায়, (II) পলিপেপটাইড শৃঙ্খল দীর্ঘায়িতকরণ (Chain elongation) এবং (III) সমাপ্তিকরণ (Termination)।

● I. ইনিশিয়েশন (Initiation) বা প্রারম্ভিক পর্যায় ঃ

একটি প্রোক্যারিওটিক কোশে 30S রাইবোজোম অধঃএকক (Subunit), mRNA-এর AUG কোডন এবং fmet·$tRNA^{fmet}$ (অর্থাৎ যে tRNA ফরমাইল গ্রুপ যুক্ত মিথিওনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে) সব উপাদানগুলি একত্রে একটি জটিল একক সৃষ্টি করে। এর পর রাইবোজোমের 50S অধঃএকক 30S অধঃএককের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণ প্রোটিন সংশ্লেষ যন্ত্র (Protein synthesising apparatus) গঠিত হয়। mRNA দুটি রাইবোজোম অধঃএককের মাঝে অবস্থান করে এবং প্রথম tRNA-টি রাইবোজোমের 'P' সাইটে ও mRNA-এর AUG কোডনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অপর একটি tRNA একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে রাইবোজোমের A সাইটে যুক্ত হয়। এরপর P সাইটের মিথিওনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ডের সাহায্যে A সাইটে অবস্থানকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়।
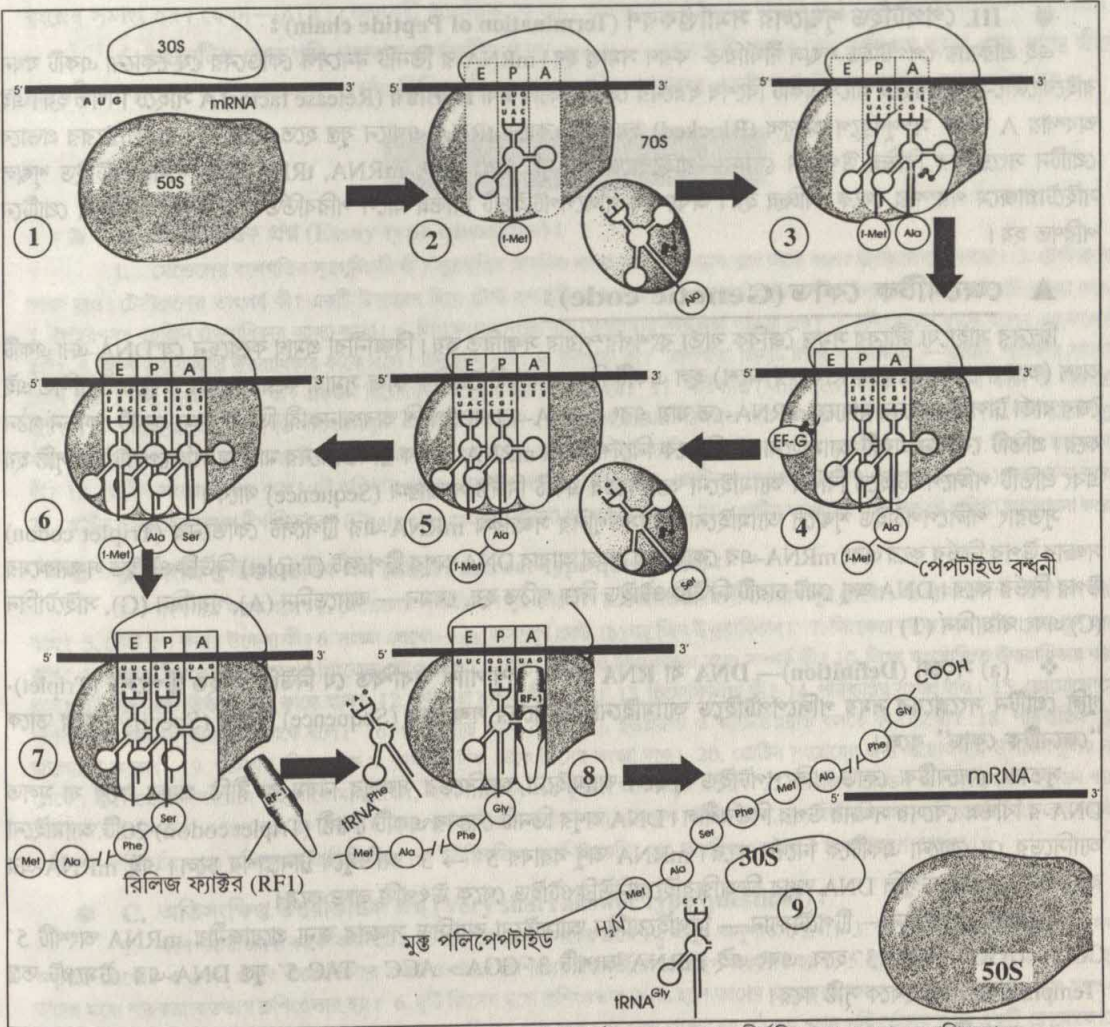
চিত্র 7.2 : প্রোটিন সংশ্লেষের বিভিন্ন পর্যায় : 1, 2, 3- প্রারম্ভিক পর্যায়, 4, 5, 6- শৃঙ্খল দীর্ঘায়িতকরণ, 7, 8, 9- সমাপ্তিকরণ।
(1) বিভিন্ন উপাদান একত্রীকরণ, (2) ইনিশিয়েশন কোডনে প্রথম tRNA-এর বন্ধন, (3) 'A' সাইটে দ্বিতীয় tRNA-এর সংযুক্তিকরণ, (4) প্রথম পেপটাইড বন্ড গঠন, (5) রাইবোজোম অধঃএককের ট্রান্সলোকেশন, (6) 'A' সাইটে তৃতীয় tRNA-এর প্রবেশ, (7) 'A' সাইটে ননসেন্স কোডনের উপস্থিতি, (8) 'A' সাইটে রিলিজ ফ্যাক্টরের ক্রিয়া, (9) পলিপেপটাইড সহ প্রোটিন সংশ্লেষের সমস্ত উপাদানের বিচ্ছিন্নতালাভ।

II. পলিপেপটাইড শৃঙ্খল দীর্ঘায়িতকরণ (Chain elongation) :

এই পর্যায়ে tRNA-গুলি এবং mRNA-কে স্থির রেখে রাইবোজোমের দুটি অধঃএকক mRNA বরাবর mRNA-এর 3′ প্রাইম প্রান্তের দিকে একটি কোডন দূরত্বের জন্য সরে যায় বা সঞ্চালিত হয়। রাইবোজোমের এই সঞ্চালনকে **ট্রান্সলোকেশন** (Translocation) বলে। ট্রান্সলোকেশনের ফলে P সাইটের tRNA E সাইটে এবং A সাইটের tRNA P সাইটে স্থানান্তরিত হয়। এখন A সাইটটি শূন্য হয় এবং A সাইটে অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী tRNA যুক্ত হয়। এর পর P সাইটে অবস্থিত পেপটাইড A সাইটে অবস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে পেপটাইড বন্ডের সাহায্যে যুক্ত হয় এবং পেপটাইড শৃঙ্খলটি P সাইটে

অবস্থিত tRNA থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পুনরায় ট্রান্সলোকেশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাইবোজোমে অবস্থিত tRNA-গুলির স্থান পরিবর্তন ঘটে এবং এইভাবে পেপটাইড শৃঙ্খলটি দীর্ঘায়িত হয়।

● **III. পেপটাইড শৃঙ্খলের সমাপ্তিকরণ (Termination of Peptide chain) ঃ**

এই প্রক্রিয়ায় পেপটাইড শৃঙ্খল দীর্ঘায়িত- করণ সমাপ্ত হয়। mRNA-র তিনটি ননসেন্স কোডনের যে-কোনো একটি যখন রাইবোজোমের A সাইটে আসে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন ফ্যাক্টর বা **R ফ্যাক্টর** (Release factor) A সাইটে নির্গত হয়। এই অবস্থায় A সাইট সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ (Blocked) হয় এবং কোনো tRNA এখানে যুক্ত হতে পারে না। R ফ্যাক্টরের প্রভাবে প্রোটিন সংশ্লেষের বিভিন্ন উপাদান যেমন—রাইবোজোমের দুটি অধঃএকক, mRNA, tRNA এবং পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সাইটোপ্লাজমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অবশেষে পলিপেপটাইডটি বিভিন্ন ধাপে পরিবর্তিত হয়ে একটি কার্যকরী প্রোটিনে পরিণত হয়।

▲ জেনেটিক কোড (Genetic code) ঃ

জিনের সাহায্যে জীবের সমস্ত জৈবিক বার্তা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে DNA-এর একটি অংশ (অথবা কোনো ক্ষেত্রে RNA-র অংশ) হল একটি জিন যা একটি জৈবিক কাজ সমাধা করে। DNA অণুতে উপস্থিত এই জৈব বার্তা ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA-তে যায় এবং mRNA-এর পাশাপাশি অবস্থানকারী তিনটি বেস একটি কোডন গঠন করে। প্রতিটি কোডন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে। mRNA থেকে ট্রানস্লেশনের মাধ্যমে পলিপেপটাইড সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি পলিপেপটাইডে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি নির্দিষ্ট সজ্জাক্রম (Sequence) থাকে।

সুতরাং পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম mRNA-এর ট্রিপলেট কোডনের (Triplet codon) সজ্জার উপর নির্ভর করে এবং mRNA-এর কোডনের সজ্জা আবার DNA অণুর ট্রিপলেট (Triplet) নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রমের উপর নির্ভর করে। DNA অণু মোট চারটি নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত হয়, যেমন— অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) এবং থায়ামিন (T)।

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)— DNA বা RNA অণুতে পাশাপাশি অবস্থিত যে নিউক্লিওটাইড ট্রিপলেট** (Triplet)-**গুলি প্রোটিন সংশ্লেষের সময় পলিপেপটাইডে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম** (Sequence) **নির্দেশ** (Specify) **করে তাকে "জেনেটিক কোড" বলে।**

সুতরাং জেনেটিক কোড পলিপেপটাইড শৃঙ্খলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জার নিয়ম বা রীতি প্রদান করে যা মূলত DNA-র বিভিন্ন বেসের সজ্জার উপর নির্ভরশীল। DNA অণুর তিনটি বেসের একটি গোষ্ঠী (Triplet codon) 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে-কোনো একটিকে নির্দেশ করে। mRNA অণু বরাবর $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে ট্রানস্লেশন চলে। এই mRNA-এর রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি DNA অণুর ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

উদাহরণ ঃ প্রোলিন— ট্রিপটোফ্যান— মিথাইয়োনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড সজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় mRNA অংশটি 5′ CCU - UGG - AUG 3′ হবে, এবং এই mRNA অংশটি 3′ GGA - ACC - TAC 5′ যুক্ত DNA-এর টেমপ্লেট তন্ত্র (Template strand) থেকে সৃষ্টি করে।

(b) **জেনেটিক কোডের ধর্ম (Properties of genetic code) ঃ**

1. **জেনেটিক কোড নিউক্লিওটাইড ট্রিপলেট দিয়ে গঠিত হয়—** mRNA অণুর তিনটি নিউক্লিওটাইড একটি কোডন গঠন করে এবং একটি কোডন পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সূচিত করে বা নির্দেশ করে।

2. **জেনেটিক কোডগুলি একে অন্যের উপর চাপাচাপি করে থাকে না—** mRNA অণুর একটি নিউক্লিওটাইড একটি মাত্র কোডনের অংশ হিসাবে থাকে। mRNA অণু একটি পলিপেপটাইড গঠনের জন্য একটিমাত্র রিডিং ফ্রেম (Reading frame) গঠন করে।

3. **জেনেটিক কোডে 'কমা' বা কোনো বিরতি থাকে না—** mRNA অণুর কোডনগুলিতে কোনোপ্রকার 'কমা' (Comma) বা কোনো বিরতি চিহ্ন থাকে না এবং mRNA থেকে কোনোপ্রকার বিরতি ছাড়াই পলিপেপটাইড গঠিত হয়।

4. **জেনেটিক কোডগুলি ডিজেনারেট** (Degenerate)— মিথিওনিন (Methionine) ও ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan) অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সংশ্লেষের জন্য mRNA-তে একাধিক কোডন থাকে। এর কারণ 20টি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষের জন্য কার্যকরী 61টি কোডন পাওয়া যায়।

5. **জেনেটিক কোডের মধ্যে প্রারম্ভিক (Initiation) কোডন এবং সমাপ্তিকরণ (Termination) কোডন থাকে** — বিশেষ একটি কোডনের সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষ আরম্ভ হয় এবং বিশেষ তিনটি কোডনের যে-কোনো একটির সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষ সমাপ্ত হয়। যেমন—AUG কোডনটি প্রারম্ভিক কোডন; অপরদিকে UAA, UAG ও UGA হল সমাপ্তিকরণ কোডন।

6. **জেনেটিক কোডগুলি প্রধানত সার্বজনীন (Universal)** — কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সমস্ত জীবে জেনেটিক কোডের অর্থ একপ্রকার; অর্থাৎ বিভিন্ন জীবে কোডনগুলির সাহায্যে একই অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়।

○ অনুশীলনী ○

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলি কী কী? সূত্রগুলির আধুনিক ব্যাখ্যা দাও। 2. ব্যাক ক্রশ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখো। 3. টেস্ট ক্রশের সংজ্ঞা দাও। টেস্টক্রশের তাৎপর্য কী? একটি উদাহরণ দিয়ে টেস্ট ক্রশ বুঝিয়ে বলো। 4. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কী? উদাহরণ দিয়ে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো। 5. উদাহরণসহ বহুজিন উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা করো। 6. লিংকেজের সংজ্ঞা দাও। কয়প্রকার লিংকেজ পাওয়া যায়? 7. ক্রশিংওভার কাকে বলে? এর ফলে কী ঘটে? 8. লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকার কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 9. বর্ণান্ধতা কী? "বর্ণান্ধতা জিনটি লিঙ্গ সংযোজিত"—উক্তিটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো। 10. হিমোফিলিয়া কী? একজন হিমোফিলিক্ পুরুষ কীভাবে সৃষ্টি হয়? 11. পরিব্যক্তি (Mutation) কাকে বলে ? এর ফলে কী পরিবর্তন ঘটে? 12. ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করো। 13. ক্রোমোজোমের গঠনগত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করো। 14. পরিব্যক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করো। 15. প্রোক্যারিওটিক জিনের গঠন আলোচনা করো। 16. ইউক্যারিওটিক জিনের গঠন আলোচনা করো। 17. জিনের প্রধান কাজ কী? 18. প্রোটিন সংশ্লেষ কাকে বলে? এই প্রক্রিয়ায় কোন্ কোন্ উপাদান প্রয়োজন? 19. প্রোটিন সংশ্লেষের প্রারম্ভিক পর্ব (Initiation) আলোচনা করো। 20. প্রোটিন সংশ্লেষের শৃঙ্খল দীর্ঘায়িতকরণ (Chain elongation) প্রক্রিয়া আলোচনা করো। 21. প্রোটিন সংশ্লেষের সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়া আলোচনা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. বংশগতি কাকে বলে? 2. মেন্ডেলের পৃথকীকরণ সূত্র লেখো। 3. মেন্ডেলের স্বাধীনবিন্যাস সূত্র লেখো। 4. ব্যাক ক্রশ ও টেস্ট ক্রশ কাকে বলে? 5. টেস্ট ক্রশ করার উদ্দেশ্য কী? 6. সংজ্ঞা লেখো— (a) অসম্পূর্ণ প্রকট, (b) বহু জিন উত্তরাধিকার। 7. লিংকেজ কাকে বলে? লিংকেজ গ্রুপ কাকে বলে? 8. সম্পূর্ণ লিংকেজ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজ কাকে বলে? 9. ক্রশিং ওভার ও লিংকেজের মধ্যে সম্পর্ক কী? 10. লিঙ্গ সংযোজিত উত্তরাধিকার কাকে বলে? 11. ক্রিশ-ক্রশ-উত্তরাধিকার কাকে বলে? 12. বর্ণান্ধতা বলতে কী বোঝো? 13. হিমোফিলিয়া কী? 14. পরিব্যক্তির সংজ্ঞা দাও। 15. ক্রোমোজোমের পরিবর্তন ও জিনের পরিবর্তন কাকে বলে? 16. পলিপ্লয়ডি কাকে বলে? 17. ইউপ্লয়ডি ও অ্যানিউপ্লয়ডি বলতে কী বোঝো? 18. পরিব্যক্তির গুরুত্ব আলোচনা করো। 19. গঠনগত দিক থেকে ও কার্যগত দিক থেকে জিনের সংজ্ঞা দাও। 20. প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির নাম লেখো। 21. প্রোটিন সংশ্লেষে রাইবোজোম, tRNA, এবং mRNA-এর ভূমিকা আলোচনা করো। 22. প্রারম্ভিক কোডন ও সমাপ্তিকরণ কোডন কাকে বলে? 23. জেনেটিক্ কোড বলতে কী বোঝো? 24. পার্থক্য উল্লেখ করো—(a) ব্যাকক্রশ ও টেস্টক্রশ, (b) স্বাধীনবিন্যাস ও লিংকেজ, (c) ক্রোমোজোম ও জিনের পরিবর্তন, (d) ডুপ্লিকেশন ও ডিলিশন, (e) ইউপ্লিয়ডি ও অ্যানিউপ্লয়ডি, (f) প্রারম্ভিক কোডন ও সমাপ্তিকরণ কোডন।

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. বংশগতির জনক কাকে বলা হয়? 2. মেন্ডেলের একসংকর ক্রশে F_2 জনুর অনুপাত লেখো। 3. মেন্ডেলের দ্বিসংকর ক্রশে F_2 জনুর অনুপাত লেখো। 4. কোন্ প্রকার উত্তরাধিকারে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ প্রকাশিত হয়? 5. দুটি জিনের মধ্যে দূরত্ব 10 cM হলে তাদের মধ্যে শতকরা কতভাগ ক্রশিংওভার হয়? 6. দুটি জিনের মধ্যে ক্রশিংওভার 20% হলে তাদের মধ্যে দূরত্ব কত? 7. কোন্ রোগের ফলে রক্ততঞ্চন সঠিকভাবে হয় না? 8. কোন্ রোগের ফলে মানুষ বস্তুর রং চিনতে ভুল করে? 9. ক্রোমোজোমের গঠনের কোন্ পরিবর্তনের ফলে একটি ক্রোমোজোমের কোনো অংশ অপর একটি ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়? 10. স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সেটের (2n) সঙ্গে আর একটি ক্রোমোজোম সেট জিনোমে বেশি থাকলে ক্রোমোজোমের কোন্ অস্বাভাবিকতা ঘটবে? 11. tRNA-এর যে প্রান্তে অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয় তার নাম কী? 12. mRNA-এর প্রারম্ভিক কোডনটি কী? 13. UAA, UGA ও UAG কোডনগুলির নাম কী? 14. কয়েকটি কোডন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত গ্রহণ করতে পারে? 15. জৈবতন্ত্রে কয়টি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. মেন্ডেলীয় মতবাদ 2. টেস্ট ক্রশ, 3. ব্যাক ক্রশ, 4. ডুপ্লিকেশন, 5. ডিলিশন, 6. ট্রান্সফার, 7. ইনসারশন, 8. মিউটেশন, 9. বর্ণান্ধতা, 10. জেনেটিক কোড, 11. মোনোসোমি, 12. অ্যালো টেট্রাপ্লয়েড, 13. লিংকেজ, 14. ননসেন্স কোডন, 15. সেক্স লিংকেজ।
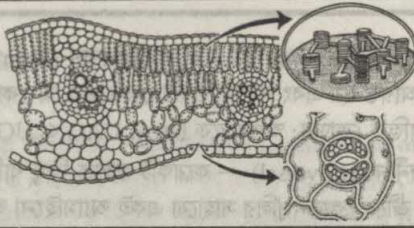
সালোকসংশ্লেষ
PHOTOSYNTHESIS

▶ **সূচনা (Introduction) ঃ** সবুজ উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া হল সালোক-সংশ্লেষ। পৃথিবীর সব জীবের অর্থাৎ এককোশী জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সবারই অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষের ওপর নির্ভরশীল। সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ ব্যাকটেরিয়া শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করার সময় একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসাবে খাদ্যবস্তুর মধ্যে সঞ্চিত রাখে। এই প্রক্রিয়া **সালোকসংশ্লেষ** নামে পরিচিত। জীবের বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া, যেমন— চলন, গমন, শ্বসন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্যই হল জীবদেহের শক্তির উৎস। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদকুল জীবজগতকে সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে শক্তি জোগায়।

1898 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **বার্নেস** (Barnes) প্রথম **সালোকসংশ্লেষ বা ফোটোসিন্থেসিস** (Photosynthesis) শব্দটি ব্যবহার করেন। দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে **Photosynthesis** শব্দটি গঠিত হয়েছে। এই শব্দ দুটি হল— **Photos** অর্থাৎ আলো এবং **Synthesis** অর্থাৎ সংশ্লেষ। আবার **সালোকসংশ্লেষ** কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় **'সালোক'** কথাটির অর্থ হল আলোকের উপস্থিতি এবং **সংশ্লেষ** কথাটির অর্থ কোনো কিছু উৎপাদিত হওয়া। এখানে আলোর সাহায্যে শর্করা সংশ্লেষিত হয় বলে, প্রক্রিয়াটি **সালোকসংশ্লেষ** নামে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

▲ সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা, সালোকসংশ্লেষকারী জীব এবং প্রক্রিয়ার স্থান (Definition of Photosynthesis, Photosynthetic organism and Site) ঃ

❖ **(a) সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞা (Definition of Photosynthesis) ঃ**

1. যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ ক্লোরোফিল সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ও ওই শক্তি জলের হাইড্রোজেনের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিজারণ ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে এবং অক্সিজেন উপজাত পদার্থ (By product) হিসাবে পরিবেশে নির্গত হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।

2. যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, সবুজ উদ্ভিদ কোশে, আলোর উপস্থিতিতে, পরিবেশ থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের বিক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় এবং গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন উন্মুক্ত হয়, তাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।

◘ **(b) সালোকসংশ্লেষকারী জীব (Photosynthetic organism) ঃ**

1. **সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদ** (Photosynthetic Plants) — কয়েক প্রকার ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ যাদের সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ থাকে, তারাই সালোকসংশ্লেষ করতে সক্ষম।

(i) **সালোকসংশ্লেষকারী মূল**— গুলঞ্চের আত্তীকরণ মূল, পটলের মূল, অর্কিডের বায়বীয় মূল। (ii) **সালোকসংশ্লেষকারী কাণ্ড** —ফণীমনসা, বাজবরণ ও অন্যান্য উদ্ভিদের সবুজ কাণ্ড।
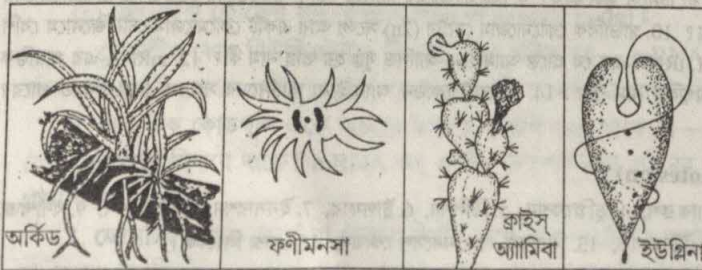
চিত্র 8.1 ঃ সালোকসংশ্লেষকারী কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী।

2. **সালোকসংশ্লেষকারী প্রাণী** (Photosynthetic Animals)—যদিও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সবুজ উদ্ভিদে ঘটে, তবুও কয়েকটি এককোশী প্রাণী ইউগ্লিনা (*Euglena*) এবং ক্রাইস্অ্যামিবা (*Crysamoeba*) প্রভৃতিতে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য তৈরি হয়।

● **সালোকসংশ্লেষে অক্ষম উদ্ভিদ** (Plants unable to photosynthesis) ঃ যেসব উদ্ভিদে ক্লোরোফিল থাকে না তারা

সালোকসংশ্লেষে অক্ষম। ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদে ক্লোরোফিল বা সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ না থাকার জন্য সালোকসংশ্লেষ ঘটে না। **উদাহরণ**— *মিউকর (Mucor)*, *ঈস্ট (Yeast)* প্রভৃতি।

(c) উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার স্থান (Site for Photosynthesis in Plants) :

উদ্ভিদের সব কোশে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঘটে না। সবুজ পাতার মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্ট হল সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান। উদ্ভিদের পাতা ছাড়া কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পুষ্পাক্ষ, পর্ণকাণ্ড ও সবুজ কাঁচা ফলের ত্বকেও সালোকসংশ্লেষ হয়। তা ছাড়া সবুজ ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে সব দেহকোশই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

8.1. প্রধান সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ (Major Photosynthetic Pigments)

উদ্ভিদে প্রধানত তিন রকমের রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেমন— **ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড, ফাইকোবিলিন ও অ্যান্থোসায়ানিন।** এর মধ্যে ক্লোরোফিল হল একমাত্র সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ। অবশিষ্টগুলি সহকারী রঞ্জক পদার্থ, কারণ শর্করা উৎপাদনে এদের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই।

চিত্র 8.2 : ক্লোরোপ্লাস্টের চিত্ররূপ।

1. **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) : উন্নত সবুজ উদ্ভিদকোশের ক্লোরোপ্লাস্টে সঞ্চিত ক্লোরোফিল হল সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ। 1818 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **পেলেসিয়ার** (Palletier) উদ্ভিদের সবুজ রঞ্জক পদার্থটির নাম দিয়েছিলেন ক্লোরোফিল। প্রধানত পাতার মেসোফিল কলার কোশে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে একধরনের অঙ্গাণু থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড পর্দার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি আকৃতির **কোয়ান্টাজোম** (Quantasome) থাকে। কোয়ান্টাজোম পর্দার লিপিড অংশে ক্লোরোফিল থাকে।

ক্লোরোফিল অণুর গঠন অনুসারে ক্লোরোফিল পাঁচ প্রকারের হয়। উন্নত সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—b, বাদামি শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—c, লাল শৈবালে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—d থাকে। জ্যান্থোফাইসিতে ক্লোরোফিল—a ও ক্লোরোফিল—e থাকে। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ায় ব্যাকটেরীয় ক্লোরোফিল, ব্যাকটেরীয় ভিরিডিন অর্থাৎ ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল থাকে।

রাসায়নিক গঠন অনুসারে ক্লোরোফিল কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H_2), অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2) ও ম্যাগনেশিয়াম (Mg) নিয়ে গঠিত। ক্লোরোফিলের রাসায়নিক গঠনে দেখা যায় এটি পরফাইরিন (Porphyrin) যৌগ। এই পরফাইরিনে চারটি পাইরল (Pyrrole) বলয় পরস্পর বৃত্তাকারে যুক্ত হয়। কেন্দ্রে একটি ম্যাগনেশিয়াম (Mg^{++}) আয়ন থাকে। একটি ফাইটল জাতীয় শৃঙ্খল চতুর্থ পাইরল বলয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

● সালোকসংশ্লেষকারী ও সাহায্যকারী রঞ্জকগুলির রাসায়নিক সংকেত ●
(Formula of Photosynthetic Pigments)

রঞ্জক	সংকেত
ক্লোরোফিল–*a*	$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$
ক্লোরোফিল–*b*	$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
ক্লোরোফিল–*c*	$C_{35}H_{32}O_5N_4Mg$
ক্লোরোফিল–*d*	$C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$
ক্যারোটিন	$C_{40}H_{56}$
জ্যান্থোফিল	$C_{40}H_{56}O_2$
ব্যাকটেরীয় ক্লোরোফিল	$C_{55}H_{74}O_6N_4Mg$
ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল	$C_{55}H_{72}O_6N_4Mg$
ফাইকোসায়ানিন	$C_{34}H_{44}O_8N_4$
ফাইকোএরিথ্রিন	$C_{34}H_{46}O_8N_4$

বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, আলোকের সাতটি বর্ণের মধ্যে ক্লোরোফিল-a এবং ক্লোরোফিল-b, নীল বেগুনি এবং লাল অংশগুলি বেশি মাত্রায় শোষণ করে। আলোকের সবুজ অংশ শোষিত হয় না। ক্লোরোফিল রঞ্জক বর্ণালির লাল (610-700 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এবং নীল (400-516 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য) অংশ বেশি শোষণ করে বলে এই দুই

অংশকে ক্লোরোফিল রঞ্জকের **শোষণ বর্ণালি** বলে। এ থেকে বোঝা যায় যে সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিল প্রধান রঞ্জক হিসাবে কাজ করে।

2. **ক্যারোটিনয়েড** (Carotenoid) ঃ ক্যারোটিনয়েড উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রঞ্জিত অংশে দেখা যায়। এদের দুভাবে বিভক্ত করা হয়, যেমন—কমলা রঙের **ক্যারোটিন** (Carotene) এবং হলুদ রঙের **জ্যান্থোফিল** (Xanthophyll)। ক্যারোটিনের রাসায়নিক সংকেত $C_{40}H_{56}$। ক্যারোটিন বিভিন্ন প্রকারের হয়। এদের মধ্যে α ক্যারোটিন ও β ক্যারোটিন হল প্রধান।

ক্যারোটিনয়েড দৃশ্যমান আলোকের 400nm এবং 500nm অংশ বেশি শোষণ করে। সালোকসংশ্লেষে ক্যারোটিনয়েড দুভাবে অংশগ্রহণ করে। আলোক ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্যারোটিনয়েড ক্লোরোফিলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ আলোক জারণ (Photo-oxidation) থেকে রক্ষা করে। তা ছাড়া ক্যারোটিনয়েড আলোক তরঙ্গ শোষণ করে ক্লোরোফিল-a অণুতে পাঠায়। জ্যান্থোফিলের রাসায়নিক সংকেত হল $C_{40}H_{56}O_2$। অক্সিজিনেটেড ক্যারোটিনকে **জ্যান্থোফিল** বলে। জ্যান্থোফিল অনেক রকমের হয়। **লিউটিন** নামে জ্যান্থোফিল সবুজ উদ্ভিদে বেশি পাওয়া যায়।

3. **ফাইকোবিলিন** (Phycobillin) ঃ নীলাভ সবুজ ও লোহিত শৈবালে ফাইকোবাইলিন থাকে। এটি সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ। নীল বর্ণের **ফাইকোসায়ানিন** (Phycocyanin) এবং লাল বর্ণের **ফাইকোএরিথ্রিন** (Phycoerythrin) একসঙ্গে ফাইকোবিলিন নামে পরিচিত। ফাইকোসায়ানিন ও ফাইকোএরিথ্রিনের রাসায়নিক সংকেত যথাক্রমে $C_{34}H_{44}O_8N_4$ এবং $C_{34}H_{46}O_8N_4$। ফাইকোবিলিন দৃশ্যমান আলোকের 550—615 nm অংশ শোষণ করে। এদের শোষিত আলোক সরাসরি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় না। ফাইকোবাইলিন দ্বারা শোষিত আলোক তরঙ্গ ক্লোরোফিল-a অণুতে পৌঁছায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য সব কয়টি রঞ্জক পদার্থ আলোক শোষণ করলেও ক্লোরোফিল-a প্রত্যক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের সঙ্গে জড়িত। তাই একে মুখ্য বা প্রধান **রঞ্জক কণা** (Primary pigment) বলা হয়। ক্লোরোফিল-b, ক্লোরোফিল-c, ক্লোরোফিল-d ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থগুলি সরাসরি সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে না। তাদের শোষিত আলোক তরঙ্গ ক্লোরোফিল-a অণুতে স্থানান্তরিত হয়। তাই এসব রঞ্জক পদার্থগুলিকে **সহকারী রঞ্জক পদার্থ** (Accessory pigment) বলে।

▲ সালোকসংশ্লেষের সমীকরণ, সমীকরণের ব্যাখ্যা, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও রঞ্জকতন্ত্র (Chemical equation, Explanation of Equation, Main Features and Pigment systems) ঃ

(a) সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation of Photosynthesis) ঃ

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} C_6H_{12}O_6 + 6\,H_2O + 6\,O_2$$
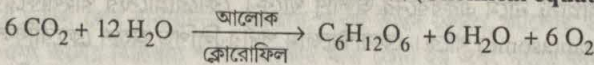
(b) সালোকসংশ্লেষের সমীকরণের ব্যাখ্যা (Explanation of the equation of Photosynthesis) ঃ

(i) 6 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড, 12 অণু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1 অণু শর্করা, 6 অণু অক্সিজেন গ্যাস এবং 6 অণু জল উৎপন্ন করে। কারণ শুধু জল থেকে অক্সিজেন নির্গত হয়। (ii) সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে। (iii) গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। (iv) সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি আলোক শক্তি ব্যবহার করে ঘটে। (v) সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিল সাহায্য করে। (vi) সালোকসংশ্লেষ-জাত পদার্থ হল সুক্রোজ (সাইটোপ্লাজমে) বা শ্বেতসার (স্ট্রোমায়) এবং উপজাত পদার্থ হল জল ও অক্সিজেন। (vii) পরিবেশের CO_2-এর কার্বন শর্করায় আবদ্ধ হয়।

(c) সালোকসংশ্লেষের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of Photosynthesis) ঃ

(i) সালোকসংশ্লেষ সবুজ উদ্ভিদ ও রঞ্জকযুক্ত ব্যাকটেরিয়াতে ঘটে। তা ছাড়া কয়েকটি এককোশী সবুজ প্রাণীতেও হয়। (ii) এটি একটি উপচিতিমূলক (Anabolic) জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া। (iii) ক্লোরোফিল সৌরশক্তিকে শোষণ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। (iv) এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) জলের (H_2O) হাইড্রোজেন (H^+) ও ATP দিয়ে বিজারিত হয়ে শর্করা তৈরি করে। (v) সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে শর্করার মধ্যে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়। (vi) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ এই অক্সিজেন পরিবেশে পরিত্যাগ করে।

সালোকসংশ্লেষের সমীকরণে দেখানো হয়েছে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে সালোকসংশ্লেষে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ গ্লুকোজ নয়। উৎপন্ন হয় শ্বেতসার (প্লাস্টিডের স্ট্রোমায়) অথবা সুক্রোজ (কোশের সাইটোপ্লাজমে) তবে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে গ্লুকোজ উৎপন্ন হতে পারে। প্রচলিত ধারণা সালোকসংশ্লেষে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ গ্লুকোজ। আলোচনার সুবিধার জন্য গ্লুকোজ লেখা হয়েছে।

● (d) **সালোকসংশ্লেষে রঞ্জকতন্ত্র (Pigment Systems in Photosynthesis) :**

যে সব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষে কার্যকর, তারা দুটি **রঞ্জকতন্ত্র** নিয়ে গঠিত, যেমন— (i) **প্রথম রঞ্জকতন্ত্র** (Pigment system–I) ও (ii) **দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র** (Pigment system–II)।

(i) **প্রথম রঞ্জকতন্ত্র** — প্রথম রঞ্জকতন্ত্রে প্রায় 300 – 400 টি অপ্রতিপ্রভ (Non-fluorescent) ক্লোরোফিল–a থাকে। এই ক্লোরোফিল–a-র সর্বাপেক্ষা বেশি আলোক শোষণের ক্ষমতা 700 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে হয়। এই ক্লোরোফিল P-700 নামে পরিচিত। এই রঞ্জকতন্ত্রে সাইটোক্রোম–b, ফেরিডক্সিন, প্লাস্টোসায়ানিন নামে ইলেকট্রন গ্রহীতাও থাকে। গ্রাণা পর্দার বাইরের দিকে এই রঞ্জকতন্ত্র থাকে।

(ii) **দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র**—দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র 100-টি প্রতিপ্রভ (Fluorescent) ক্লোরোফিল–a, ক্লোরোফিল-b, ও ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল প্রভৃতি সহকারী রঞ্জক পদার্থ নিয়ে গঠিত। অনেক সময় উদ্ভিদ অনুসারে ক্লোরোফিল–c, – d-ও থাকে। ক্লোরোফিল 680 nm আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে এই রঞ্জকতন্ত্রে সক্রিয় হয় এবং P680 নামে পরিচিত। এই রঞ্জকতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়। ক্লোরোফিল ও অন্যান্য সহকারী রঞ্জক পদার্থ ছাড়া প্লাস্টোকুইনন, প্লাস্টোসায়ানিন এবং সাইটোক্রোম–b_6 এর অন্তর্গত।
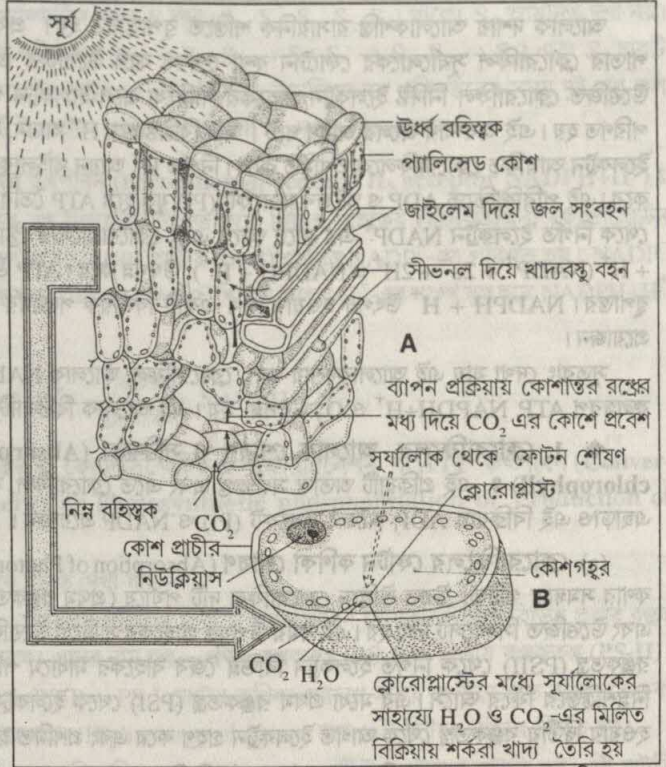
চিত্র 8.3 : সালোকসংশ্লেষের ঘটনাস্থল। A-পাতার প্রস্থচ্ছেদ, B-একটি প্যালিসেড কোশের বিবর্ধিত চিত্র।

✪ 8.2. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার আলোক ও অন্ধকার দশার প্রাথমিক ধারণা ✪ (Outline concept of Light and Dark reaction phases)

প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষ একটি জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে সালোকসংশ্লেষ সামগ্রিকভাবে **একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া** (Oxidation-reduction process)। **আলোক দশায় জল জারিত হওয়ার ফলে অক্সিজেন মুক্ত হয় এবং অন্ধকার দশায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারিত হওয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) উৎপন্ন হয়।** সামগ্রিক রাসায়নিক সমীকরণে জানা যায় যে ক্লোরোফিল আলোক শক্তি শোষণ করে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। যদি (12) অণু জল ও (6) অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাহলে মাত্র এক (1) অণু শর্করা (কার্বোহাইড্রেট), ছয় (6) অণু জল ও ছয় (6) অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে। ক্রমপর্যায়ে বহু উৎসেচকের (enzymes) সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার মধ্যবর্তী অস্থায়ী জৈবযৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই জটিল প্রক্রিয়াটি সমাধা হয়। প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল। ক্লোরোফিল শক্তি রূপান্তরের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শক্তি জোগায় সূর্যালোক।

◘ সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reactions) :

সালোকসংশ্লেষ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রিয়া ঘটলেও এটি প্রধানত দুটি প্রধান দশায় ঘটে। 1905 খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যান** (Blackman) এই দুটি বিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দেন। এ দুটি হল— **আলোক দশা** (Light phase) বা **লাইট রিঅ্যাকশন** (Light reaction) এবং **অন্ধকার দশা** (Dark phase) বা **ডার্ক রিঅ্যাকশন** (Dark reaction)। এই অন্ধকার দশাকে **কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন** (Chemical reaction) কিংবা বিজ্ঞানী **ব্ল্যাকম্যানের** নামানুসারে **ব্ল্যাকম্যান রিঅ্যাকশন** (Blackman's reaction) বলা হয়। অনেকে অন্ধকার দশাকে **আলোক নিরপেক্ষ** দশাও বলেন। আলোক দশাকে আবার **আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়াও** (Photochemical reaction) বলে।

▲ A. আলোক বিক্রিয়া দশা (Light reaction phase)

আলোক দশায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে দিনের বেলায় পাতার ওপর সূর্যালোক পড়লে পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোকের ফোটোন কণা শোষণ করে উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়। একে **ক্লোরোফিলের সক্রিয়তা** বলে। উত্তেজিত ক্লোরোফিল নির্দিষ্ট ইলেকট্রন গ্রাহকের সান্নিধ্যে এলে ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে আয়নিত হয় ও একটি তীব্র জারকে পরিণত হয়। এই অবস্থায় **জলের জারণ ঘটে**। জল বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ আয়ন, ইলেকট্রন (e^-) ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এই ইলেকট্রন আয়নিত ক্লোরোফিলকে প্রশমিত করে। নির্গত H^+ আয়ন থাইলাকয়েডের গহ্বরের ভিতরে এক ভোর্টোমোটিভ বল সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) যুক্ত হয়ে ATP তৈরি হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে ক্লোরোফিল থেকে নির্গত ইলেকট্রন $NADP^+$-এর কাছে আসে এবং ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অঞ্চলে বেশি ঘনত্বের H^+-এর সাহচর্যে NADP + H^+ ($NADP^+ + 2e^- + 2H^+ = NADPH + H^+$) উৎপন্ন করে। ATP উৎপন্ন হওয়ার অর্থ আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর। NADPH + H^+ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ একটি বিজারক পদার্থের সৃষ্টি হয় যা অন্ধকার দশায় বিক্রিয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যায় এই আলোকদশায় জল, ক্লোরোফিল, আলোক NADP, ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) প্রয়োজন এবং ফলস্বরূপ ATP, NAPDH+H^+ ও O_2 উৎপন্ন হয়। এই আলোক বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত কয়েকটি অন্তর্বর্তী ধাপে সম্পন্ন হয় ঃ

◆ **1. ক্লোরোফিলের আলোক শোষণ ও সক্রিয়তা (Absorption of light energy and Activation of chlorophyll) ঃ** এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এতে ক্লোরোফিল, জল ও আলোক অংশগ্রহণ করে এবং O_2 মুক্ত হয়। এছাড়াও এই বিক্রিয়ায় ADP, অজৈব ফসফেট (Pi) ও NADP প্রয়োজন।

(a) **ক্লোরোফিলের ফোটন কণিকা শোষণ** (Absorption of Photon by chlorophyll)—সূর্যালোক শক্তিবাহী ফোটোন কণার সমন্বয়ে গঠিত। উন্নত উদ্ভিদে ক্লোরোফিল দুটি পর্যায়ে (প্রথম রঞ্জকতন্ত্র ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র) ফোটোন কণা শোষণ করে এবং উত্তেজিত সিঙ্গলেট দশা হয়। এই সময় উপযুক্ত গ্রাহকের সান্নিধ্যে উত্তেজিত ক্লোরোফিল থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PSII) থেকে নির্গত ইলেকট্রন বিভিন্ন জৈব বাহকের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সময় কিছুটা শক্তি পরিত্যাগ করে নিম্নশক্তিস্তরে ফিরে আসে। এর মধ্যে প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PSI) থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার কারণে ওই ক্লোরোফিল আয়নিত হওয়ায় দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র থেকে আগত ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং প্রশমিত হয়।

(b) **জলের আলোক বিশ্লেষণ বা ফোটোলিসিস (Photolysis of water)**—দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রের (PSII) আয়নিত ক্লোরোফিল তীব্র জারকধর্মী। এই আয়নিত ক্লোরোফিলের ইলেকট্রন চাহিদা পূর্ণ করার তাগিদে জলের আলোক জারণ বিশ্লেষণ ঘটে। জল (H_2O) বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ আয়ন, ইলেকট্রন ও অক্সিজেন অণু সৃষ্টি করে।

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$$
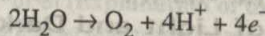
সূর্যালোকের সহায়তায় জলের এই বিশ্লেষণকে **ফোটোলিসিস** বলে। আলোক বিশ্লেষণে বা জারণে ম্যাঙ্গানিজ ও D_1 প্রোটিন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

◆ **2. উপজাত পদার্থ হিসাবে অক্সিজেন নির্গমন (Evolution of Oxygen as by products) ঃ** একটি আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী (S—State mechanism) জল থেকে অক্সিজেন নির্গমন পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল। এসময় দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রে থাকা OEC (Oxygen Evolving Complex) সক্রিয় হয়। অক্সিজেন নির্গমনের সরলীকৃত চিত্ররূপ পাশে দেওয়া হল।
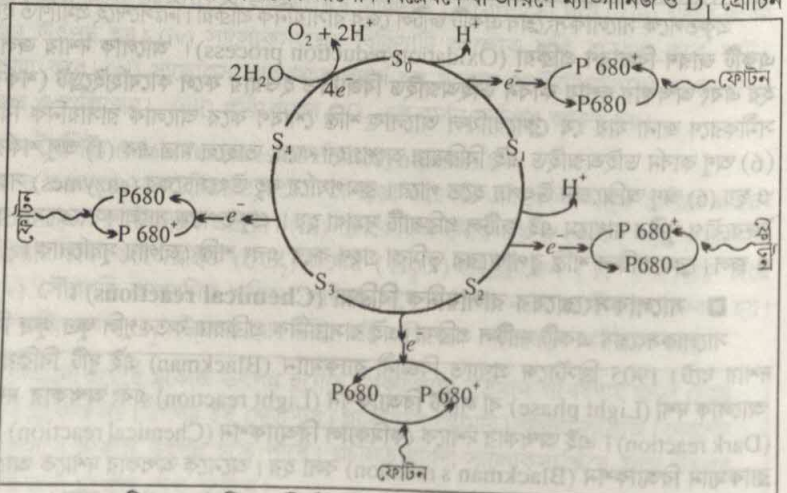
চিত্র 8.4 ঃ অক্সিজেন নির্গমন সংক্রান্ত বেসেলককের (1970) ঘড়ির চিত্ররূপ।

জলের আলোক জারণে

অক্সিজেন নির্গমন পদ্ধতি চারটি পর্যায়ে ঘটে। বেসেল কক এই পদ্ধতিকে S-দশা প্রণালী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অক্সিজেন ইভলভিং কমপ্লেক্সের মধ্যে (OEC) থাকা পাঁচটি ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ S দশা (S_0, S_1, S_2, S_3, S_4) থাকে। S_0 আয়নিত দশা নয়। কিন্তু প্রতিটি দশাভিত্তিক পরিবর্তনে ফোটোন কণা গৃহীত হয় ($S_0 \rightarrow S_1, S_1 \rightarrow S_2, S_2 \rightarrow S_3, S_3 \rightarrow S_4$) এবং S_4 চারটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়। প্রতিটি পরিবর্তনে একটি করে ইলেকট্রন (e^-) নির্গত হয়; সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের সময় দুই অণু জল জারিত হয়ে এক অণু O_2 উৎপন্ন করে এবং চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আবার S_0 দশায় ফিরে আসে।

◆ 3. বিজারিত গ্রাহক $NADPH+H^+$-এর উৎপাদন (Formation of reduced H_2 acceptor $NADPH+H^+$) ঃ

উত্তেজিত ক্লোরোফিল-a অণু থেকে উচ্চশক্তি যুক্ত ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন বাহকের (ফেরিডক্সিন, ফ্লেভোপ্রোটিন প্রভৃতি) মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। ওই ইলেকট্রন গ্রহণ করে NADP (প্রান্তীয় গ্রাহক) শক্তিযুক্ত $NADP^-$-তে পরিণত হয়। $NADP^-$ -এর মধ্যে আলোকশক্তি ইলেকট্রন শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়। এরপর $NADP^-$ বিশ্লিষ্ট জলের H^+-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে $NADPH+H^+$ গঠন করে।

সমীকরণ ঃ $NADP + 2e^- + 2(H^+) \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} NADPH + H^+$
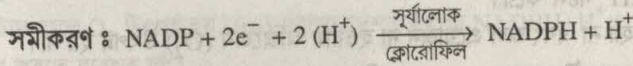
◆ 4. সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর বা ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন বা ATP উৎপাদন (Conversion of Solar energy to chemical energy or Photosynthetic phosphorylation or Production of ATP) ঃ

এই সব বিক্রিয়ার পর্যায়গুলি নিম্নলিখিতভাবে ঘটতে দেখা যায়—

হিল ও ব্যান্ডেল (Hill and Bandel, 1960) নানারকম পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে সবুজ উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে দুটি গোষ্ঠীতে সজ্জিত থাকে। এদের নাম হল—**প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS-I) ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-II)।**

(i) **প্রথম রঞ্জক তন্ত্র বা Pigment system I** (PS-I)— PS-I ফোটন কণিকা শোষণে সক্রিয় বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ক্লোরোফিল অণু থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন (High energy electron) কণা (e^-) ছিটকে বাইরে নির্গত হয়।

(ii) এই উচ্চশক্তিযুক্ত ইলেকট্রন কণাটি NADP-কে বিজারিত করে; ফলে PSI একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়। ওই ঘাটতি পূরণের জন্য **দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্র** বা **Pigment system II** (PS-II) ফোটন শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং এর থেকে একটি ইলেকট্রন ছিটকে (e^-) আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি জৈব ইলেকট্রন বাহকের (Carrier) মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত করে নিষ্ক্রিয় বা নিস্তেজ অবস্থায় আবার PS-I-এর ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে। জল বিশ্লিষ্ট হওয়ার পর ইলেকট্রন দিয়ে PS-II-এর ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে।

(iii) এই প্রক্রিয়া চলার সময় ইলেকট্রনগুলি শক্তি মুক্ত করে। এই শক্তি, কোশমধ্যস্থ ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট) এবং অজৈব ফসফেট (Pi) গ্রহণ করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP-তে (অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট) পরিণত হয়।

সমীকরণ ঃ $ADP + Pi \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলোক}} ATP$
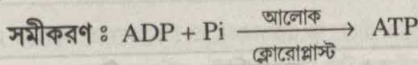
এর মাধ্যমে সূর্যের শক্তি সমন্বিত ইলেকট্রন শক্তি ATP অণুতে আবদ্ধ হয়। সুতরাং এই প্রকারে বিবর্তনের সময় শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে ATP অণুতে সঞ্চিত হয়।

❖ **ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশনের সংজ্ঞা— সৌরশক্তির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে ADP-র সঙ্গে ফসফোরাস সংযুক্তির সাহায্যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP যৌগের প্রস্তুতিকরণকে ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন বলা হয়।**

সুতরাং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শোষিত আলোকশক্তির প্রধান কাজ হল বিজারিত $NADPH+H^+$ ও ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ATP গঠন করা। **আরণন** (Arnon) প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত অনুসারে এই ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া দুভাবে ঘটে, যেমন— 1. **আবর্তক** ও 2. **অনাবর্তক**।

◻ 1. আবর্তকার ফটোফসফোরাইলেশন (Cyclic photophosphorylation) ঃ

❖ **সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল-a অণু PSI থেকে নির্গত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের সাহায্যে**

ATP সংশ্লেষিত করে নিস্তেজ হয়ে চক্রাকারে আবার ক্লোরোফিল-a-তে ফিরে আসে তাকে আবর্তাকার ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

এই প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক ক্লোরোফিল অণুর সাহায্যে শোষিত হয়ে (PS-I) উত্তেজিত হয় এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত করে। এই ইলেকট্রন কতকগুলি বাহকের (ফেরিডক্সিন, ফেরিডক্সিন—প্লাসটোকুইনোন অক্সিডোরিডাক্টেজ, প্লাসটোকুইনন, সাইটোক্রোম b_6-f যৌগ, প্লাস্টোসায়ানিন ইত্যাদি) মাধ্যমে বাহিত হয়ে চক্রাকারে আবার PS-I-এ (P_{700}) ফিরে আসে। ইলেকট্রন বাহিত শক্তি ক্রমশ কমে আসে এবং কেমিঅসমোটিক পদ্ধতিতে (প্রোটনমোটিভ বল) ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) যুক্ত হয়ে ATP গঠন করে। এই প্রক্রিয়ায় NADPH + H^+ তৈরি হয় না এবং জল প্রয়োজন না হওয়ায় অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন হয় না।
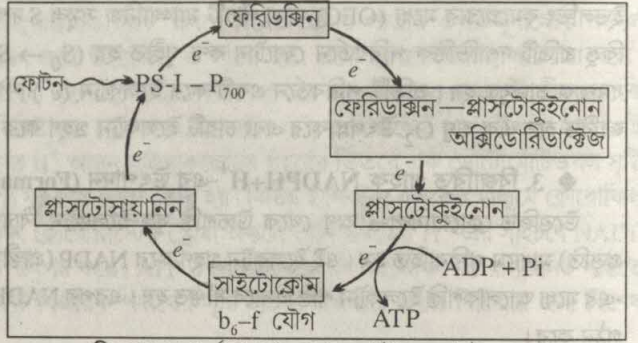
চিত্র 8.5 : আবর্তাকার বা চক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন।

◘ 2. অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন ও Z রেখাচিত্র (Non-cyclic Photophosphorylation and Z scheme) :

❖ সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ায় PS-I তন্ত্রের ক্লোরোফিল-a থেকে নির্গত উচ্চশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন জৈব বাহকের সাহায্যে প্রান্তগ্রাহক $NADP^+$-এর সঙ্গে মিলিত হয় এবং ক্লোরোফিল-a অণুর শূন্যস্থান PS-II তন্ত্রের ক্লোরোফিল থেকে নির্গত ইলেকট্রনের সাহায্যে পূর্ণ হয় এবং পথে ATP তৈরি হয় তাকে অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন বলে।
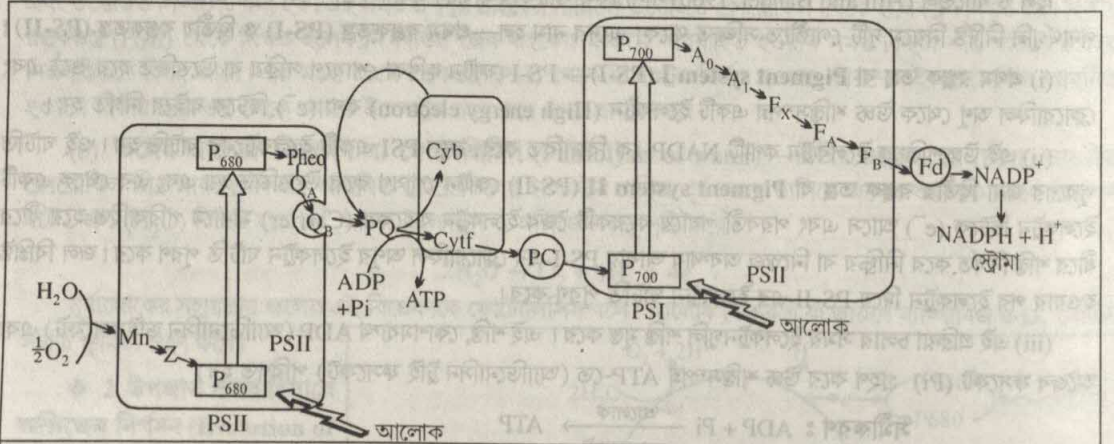
Pheo = ফিওফাইটিন
Q = কুইনন
PQ = প্লাস্টোকুইনন
Cytf = সাইটোক্রোম f
PC = প্লাস্টোসায়ানিন
A_0 = ক্লোরোফিল-a-র একটি রূপ
A_1 = ভিটামিন K জাত বস্তু
FX, FA/FB = ননহিম লৌহ গন্ধক যৌগ
Fd = ফেরিডক্সিন
NADP = নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিওক্লিওটাইড
Cytb = সাইটোক্রোম b

চিত্র 8.6 : অনাবর্ত বা অচক্রাকার ফোটোফসফোরাইলেশন (Z রেখাচিত্র)।

এই প্রক্রিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতত্র (PS-I এবং PS-II)—উভয়ের সাহায্যে ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন। প্রক্রিয়ার শেষে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP ও বিজারিত NADPH + H^+ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রের ক্লোরোফিল-a অণু সূর্যালোক শোষণ করায় ক্লোরোফিল অণু থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এই সময় জলের আলোক বিশ্লেষণ

ঘটে ও ইলেকট্রন নির্গত হয়। ওই ইলেকট্রন এসে ক্লোরোফিল (PS-II) অণুকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে ও সঙ্গে সঙ্গে OH^- মূলক গঠিত হয়। এদিকে ক্লোরোফিল অণু (PS-II) থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন প্লাস্টোকুইনন (Plastoquinon), সাইটোক্রোম b_6-f যৌগ ও প্লাস্টোসায়ানিন বাহক দিয়ে প্রথম রঞ্জকতন্ত্রের (PS-I) ক্লোরোফিলে যুক্ত হয়। ইলেকট্রন প্রবাহিত হবার সময় একটি ধাপে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP অণু গঠিত হয়।

এর পর প্রথম রঞ্জকতন্ত্রের (PS–I) ক্লোরোফিল থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনকে NADP গ্রহণ করে ও জল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে আসা H^+ আয়ন $NADP^+$ সঙ্গে যুক্ত হয়ে $NADPH+H^+$ গঠন করে।

আলোক দশার সামগ্রিক বিক্রিয়া— $2H_2O + 2NADP + 2ADP + 2Pi \longrightarrow 2\,ATP + 2NADPH+H^+ + O_2$
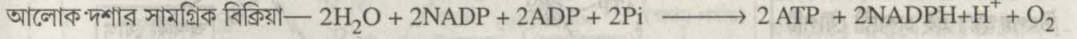
● **আলোক দশার তাৎপর্য (Significance of light phase) ঃ**

নিম্নলিখিতগুলি আলোক দশার তাৎপর্য, যেমন—

(i) আলোক শক্তি ক্লোরোফিল শোষণ করে এবং ওই আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (ii) এই দশায় আলোক জলের বিশ্লেষণ ঘটায়, ফলে O_2 উৎপন্ন হয়। (iii) আলোক দশায় উৎপন্ন $NADPH+H^+$ ও ATP অন্ধকার দশা আরম্ভ করতে ও CO_2-এর বিজারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

● **আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফটোফসফোরাইলেশনের পার্থক্য ঃ (Difference between Cyclic and Non-cyclic Photophosphorylations) ঃ**

আবর্তাকার ফটোফসফোরাইলেশন	অনাবর্তাকার ফটোফসফোরাইলেশন
1. প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS-I) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে।	1. প্রথম ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্র (PS-I ও PS-II) এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে।
2. জলের প্রয়োজন হয় না।	2. জল ছাড়া এই প্রক্রিয়া চলে না।
3. একবারের আবর্তক চক্রে দু' অণু ATP উৎপন্ন হয়।	3. অনাবর্তক চক্রে এক অণু ATP উৎপন্ন হয়।
4. ইলেকট্রন গ্রহীতা ও দাতা উভয় কাজ ক্লোরোফিল করে।	4. ইলেকট্রন দাতা ও গ্রহীতার কাজ আলাদা আলাদা বস্তু দিয়ে সম্পন্ন হয়।
5. NADP-র $NADPH+H^+$-তে বিজারণ ঘটে না।	5. NADP-র $NADPH+H^+$-তে বিজারণ ঘটে।
6. অক্সিজেন উৎপন্ন হয় না।	6. অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।
7. বৃহত্তর আলোক তরঙ্গ রশ্মি (700 nm) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	7. ক্ষুদ্রতর আলোক তরঙ্গ রশ্মি (680 nm) ও বৃহত্তর আলোক তরঙ্গ রশ্মি (700 nm) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

▲ B. অন্ধকার রাসায়নিক বিক্রিয়া দশা (Dark Reaction Phase)

এই প্রক্রিয়াটি দিনে ঘটলেও আলোকের প্রয়োজন হয় না। তাই একে **অন্ধকার দশা বা আলোক নিরপেক্ষ বিক্রিয়া** বলা হয়। অন্ধকার দশায় সবুজ কোশের ক্লোরোপ্লাস্টের **স্ট্রোমায়** কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ বা সংবন্ধন (Fixation) ও বিজারণ ঘটে ফলে শর্করা উৎপন্ন হয়। এই দশা কার্যকর করার জন্য আলোক দশায় উৎপন্ন ATP ও $NADPH+H^+$-এর প্রয়োজন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণের সময় 3-কার্বনযুক্ত যৌগ সংশ্লেষিত হওয়ায় বিক্রিয়া চক্র আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে 3-কার্বনযুক্ত প্রথম তৈরি যৌগ হল 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA)। তাই একে C_3 বিক্রিয়া পথ বলে যা চক্রাকারে সম্পন্ন হয়। একে **C_3 চক্র**ও বলা হয়। **কেলভিন ও তাঁর সহকর্মীরা** (1956) তেজস্ক্রিয় কার্বন (C^{14}) প্রয়োগ করে ক্লোরেলা (*Chloralla*) ও সিনেডেসমাস (*Scenedesmus*) নামে দুটি শৈবালের উপর পরীক্ষা করে অন্ধকার দশার সম্পূর্ণ চক্রাকার C_3 বিক্রিয়া পথটি বর্ণনা করেন। তাই বিজ্ঞানী কেলভিনের (Calvin) নাম অনুসারে একে **কেলভিন চক্র** (Calvin cycle) বলা হয়। এই দশার রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে নীচে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

◻ **1. নির্দিষ্ট গ্রহীতা দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংবন্ধন**—ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রহীতা রাইবিউলোজ মনোফসফেট (RuMP) প্রথমে আলোক দশায় উৎপন্ন ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে রাইবিউলোজ-1-5-বিস্ফসফেট

(RuBP) পরিণত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়। এই সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার মেসোফিল কোশে পত্ররন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে। এর পর সক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা রাইবিউলোজ বিস্ফস্ফেট কার্বক্সিলেজ—অক্সিজেনেজ (RUBISCO) উৎসেচকের সাহায্যে যুক্ত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংবন্ধনের পর একটি অস্থায়ী 6-কার্বনযুক্ত যৌগ **বিস্ফসফো কার্বক্সিঅ্যারাবিনিটল** (BPCA) উৎপন্ন হয়। এই অস্থায়ী যৌগটি জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড** সৃষ্টি করে। এই 3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড হল অন্ধকার দশায় উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ (First stable compound)।

◻ **2. সংবন্ধনে উৎপন্ন ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিডের বিজারণ**—3-ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড প্রথমে ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1, 3 বিস্ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড (1, 3 BPGA) উৎপন্ন করে। এই 1, 3 বিস্ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড আলোকদশায় উৎপন্ন NADPH+H$^+$ দিয়ে বিজারিত হয়। এর ফলে 3-ফসফোগ্লিসার‍্যাল-ডিহাইড (3-PGAlD) তৈরি হয়। এই বিক্রিয়ায় ট্রায়োজফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক কাজ করে।
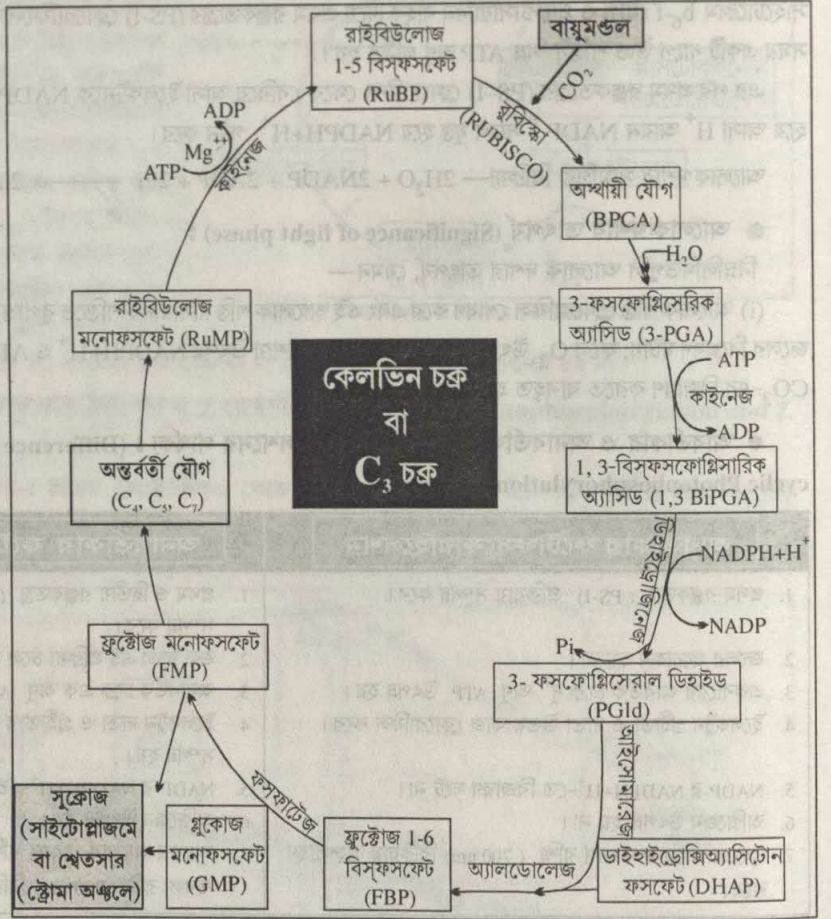
চিত্র 8.7 : কেলভিন চক্র।

❁ কেলভিন কে ছিলেন ? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার কেলভিনের অবদান ❁

কেলভিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক বিজ্ঞানী। তিনি প্রথমে প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষের শেষ দশাটি অর্থাৎ অন্ধকার দশায় বিক্রিয়াগুলি চক্রাকারে ঘটে। তাই একে **কেলভিন চক্র** বলে।

◻ **3. শর্করা সংশ্লেষ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতার পুনরুৎপাদন**—3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (PGAld) থেকে দুটি পথে বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। শুধুমাত্র একটি পথে 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড (PGAld) থেকে শর্করা উৎপন্ন হয়। ট্রায়োজফসফেট (3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড / ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট) স্ট্রোমায় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করলে শ্বেতসার উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টের পর্দা অতিক্রম করে সাইটোসলে নির্গত হলে সুক্রোজ উৎপাদিত হয়। সালোকসংশ্লেষে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয় না (আধুনিক মতবাদ)। 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ট্রায়োজফসফেট আইসোমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট (DHAP) রূপান্তরিত হয়। এর পর এক অণু ফসফোগ্লিসারেলডিহাইড ও এক অণু ডাইহাইড্রো অ্যাসিটোন ফসফেট যুক্ত হয়ে অ্যালডোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ 1-6 বিসফসফেটে উৎপন্ন হয়। এই ফ্রুক্টোজ 1-6 বিসফসফেট ফসফোটেজ উৎসেচক দ্বারা ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট উৎপন্ন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রুক্টোজ-6 ফসফেট থেকে ধাপে ধাপে গ্লুকোজ 6-ফসফেট ও

সুক্রোজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির অন্ধকার দশায় এই চক্রাকার পদ্ধতিতে শর্করা তৈরি করে। আবার অন্য পথে 3-কার্বনযুক্ত যৌগগুলি অবশেষে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগের (4 কার্বনযুক্ত এরিথ্রোজ 4 ফসফেট, 7 কার্বনযুক্ত সেডোহেপটুলোজ 1-7 ডাইফস্‌ফেট এবং 5 কার্বন বিশিষ্ট রাইবোজ ও রাইবিউলোজ 5-ফসফেট) মাধ্যমে রাইবিউলোজ 1-5 বিস-ফসফেট যৌগ পুনরুৎপাদিত করে। সুতরাং সমগ্র বিক্রিয়া চক্রাকারে সম্পন্ন হয়।
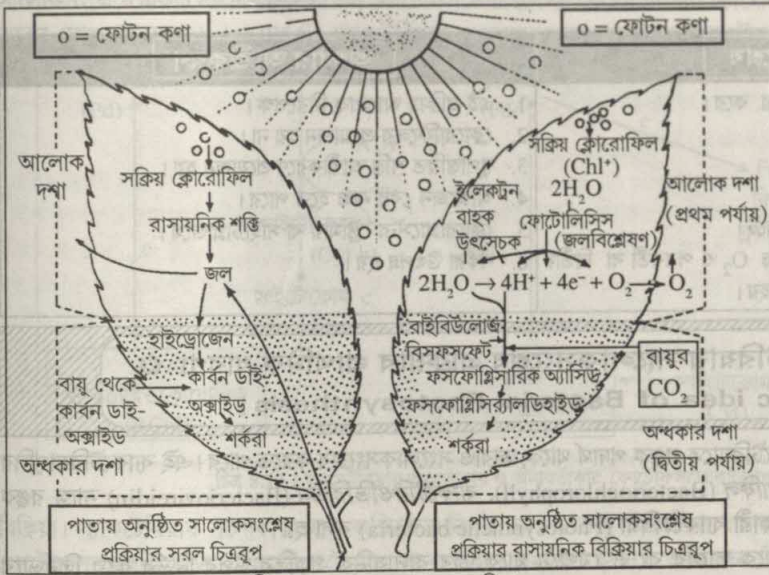
চিত্র 8.8 ঃ সালোকসংশ্লেষের প্রক্রিয়া।

● **আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়ার সম্পর্ক ঃ** এ পর্যন্ত জানা গেছে যে, প্রায় এক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বন্ধনের (fix) জন্য শক্তি হিসাবে মোট 3-অণু ATP ও 2-অণু বিজারিত NADP-র প্রয়োজন। আলোক বিক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়ে অস্থায়ীভাবে উপরোক্ত দুটি পদার্থে (NADPH ও ATP) সঞ্চিত থাকে এবং অন্ধকার বিক্রিয়ায় ওই অস্থায়ী রাসায়নিক শক্তির সাহায্যেই কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে জটিল কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়।

■ সালোকসংশ্লেষ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য ■

- সালোকসংশ্লেষীয় একক → কোয়ান্টাজোম
- সালোকসংশ্লেষীয় কার্যবর্ণালী → নীল (430 mμ—470 mμ) ও লাল (680 mμ—700 mμ)
- প্রধান রঞ্জক → ক্লোরোফিল (P_{680} ও P_{700})
- সহকারী রঞ্জক → ক্লোরোফিল b, c, d, e, ক্যারোটিনয়েডস, ফাইকোসায়ানিন, ফাইকোএরিথ্রিন ইত্যাদি
- উপজাত বস্তু → O_2, H_2O
- আলোক দশায় প্রাপ্ত → ATP, NADPH + H^+, O_2
- জৈব রাসায়নিক দশায় প্রাপ্ত → শর্করা (শ্বেতসার অথবা সুক্রোজ), RuBP পুনরুৎপাদন, ADP, $NADP^+$
- 6 অণু CO_2 গৃহীত হলে কেলভিন চক্রে প্রয়োজন ATP এবং NADPH + H^+-এর সংখ্যা → 18 অণু ATP; 12 অণু NADPH + H^+

● **আলোক বিক্রিয়া ও অন্ধকার বিক্রিয়ার পার্থক্য (Difference between Light reaction and Dark reaction) ঃ**

আলোক বিক্রিয়া	অন্ধকার বিক্রিয়া
1. সূর্যালোকের প্রয়োজন।	1. সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না।
2. অক্সিজেন নির্গত হয়।	2. CO_2 শোষিত হয়।
3. ATP উৎপন্ন হয়।	3. ATP-র প্রয়োজন হয় এবং শর্করা উৎপন্ন হয়।
4. NADP বিজারিত হয়।	4. বিজারিত NADP জারিত হয়।
5. জলের বিশ্লেষণ ঘটে।	5. এইরূপ ঘটে না।
6. এই বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণায় সম্পন্ন হয়।	6. এই বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় সম্পন্ন হয়।

● **সালোকসংশ্লেষ ও অঙ্গার আত্তীকরণের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Photosynthesis and Carbon Assimilation) :**

সালোকসংশ্লেষ	অঙ্গার আত্তীকরণ
1. এই প্রক্রিয়া আলোকের উপর নির্ভর করে।	1. এই প্রক্রিয়া আলোক নিরপেক্ষ।
2. ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয়।	2. ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় না।
3. শক্তির রূপান্তর ঘটে।	3. রূপান্তরিত শক্তি আত্তীকরণে প্রয়োজন হয়।
4. অক্সিজেন বের হয়।	4. অক্সিজেন বের নাও হতে পারে।
5. ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রাণা ও স্ট্রোমাতে ঘটে।	5. ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় বা সাইটোপ্লাজমে।
6. প্রথম ধাপে ATP, $NADPH+H^+$ ও O_2 ও পরবর্তী বা দ্বিতীয় ধাপে সুক্রোজ বা শ্বেতসার উৎপন্ন হয়।	6. শর্করা উৎপন্ন হয়।

◎ 8.3. ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধারণা ◎
(Basic idea of Bacterial Photosynthesis)

সবুজ উদ্ভিদ ছাড়াও যেসব ব্যাকটেরিয়াতে রঞ্জক পদার্থ থাকে, তারাও সংলোকসংশ্লেষ করতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলির দেহকোশের মধ্যে *ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল* (Bacteriochlorophyll), *ব্যাকটেরিওভিরিডিন* (Bacteriovireidin) নামে রঞ্জক পদার্থ থাকে। এদের **সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া** (Photosynthetic bacteria) বলা হয়।

সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়াকে তাদের রং ও যেখানে থাকে তার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(i) **সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া** (Green Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**— *ক্লোরোবিয়াম* (*Chlorobium*) ও *ক্লোরোসিউডোমোনাস* (*Chloroseudomonas*)।

(ii) **বেগুনি-লাল সালফার ব্যাকটেরিয়া** (Purple Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**— *ক্রোম্যাটিয়াম* (*Chromatium*) ও *থায়োস্পাইরিলাম* (*Thiospirillum*)।

(iii) **সালফারবিহীন ব্যাকটেরিয়া** (Non-Sulphur bacteria)। **উদাহরণ**— *রোডোস্পাইরিল্যাম* (*Rhodospirillum*) ও *রোডোসিউডোমোনাস* (*Rhodoseudomonas*)।

সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া ও বেগুনি-লাল সালফার ব্যাকটেরিয়ায় যথাক্রমে ব্যাকটেরিওভিরিডিন ও ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল-জাতীয় সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জকপদার্থ থাকে।

চিত্র 8.9 : সালোকসংশ্লেষীয় ব্যাকটেরিয়ার ইলেকট্রন স্থানান্তকরণের চিত্ররূপ।

ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কোশের ক্রোমাটোফোরের সাহায্যে অনুঘটিত (Catalyzed) ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাব্য পর্যায়ক্রম চিত্রে দেখানো হল (চিত্র 8.10)। ব্যাকটেরিও ক্লোরোফিল দিয়ে আলোকে ফোটোন কণা শোষিত হওয়ার পর ইলেকট্রন নির্গত হয়ে ফেরেডক্সিনে পৌঁছায়। ফেরেডক্সিন আবার একটি ফ্লাভোপ্রোটিনের (FMN) মাধ্যমে NADকে ইলেকট্রন দান করে এবং NAD-র আলোক বিজারণ ঘটায়। ফেরেডক্সিন ও ফ্ল্যাভোপ্রোটিন উভয়ে ইউবিকুইনোনে ইলেকট্রন সংযোগ করতে সক্ষম হয়। সাক্সিনেট বা ফিউমারেট (জৈব মাধ্যম) ইউবিকুইননকে ইলেকট্রন দান করতে পারে বা ইউবিকুইনোন জৈব মাধ্যমগুলিকে বিজারিত করে অথবা রোডোস্পাইরিলাম হিমি প্রোটিনে (RHP) ইলেকট্রন স্থানান্তরিত করে।
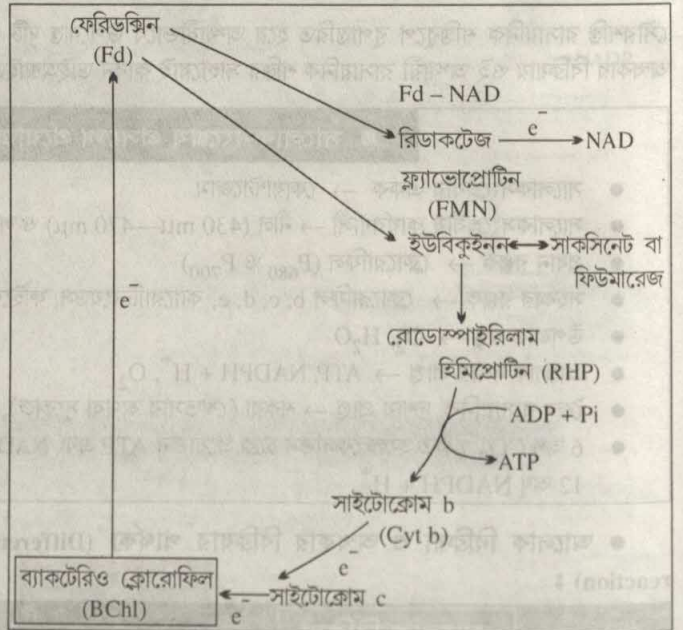
ইলেকট্রন স্থানান্তরিতকরণের পরবর্তী পর্যায়ে সাইটোক্রোম b ও c অংশগ্রহণ করে। ব্যাকটেরিয়া ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ফোটোফসফোরাইলেশন। ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোটোফোরে এই বিক্রিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন ফ্রেঙ্কেল (Frenkel—1954)। ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষে ফোটোফসফোরাইলেশনই হল প্রধান আলোক রাসায়নিক
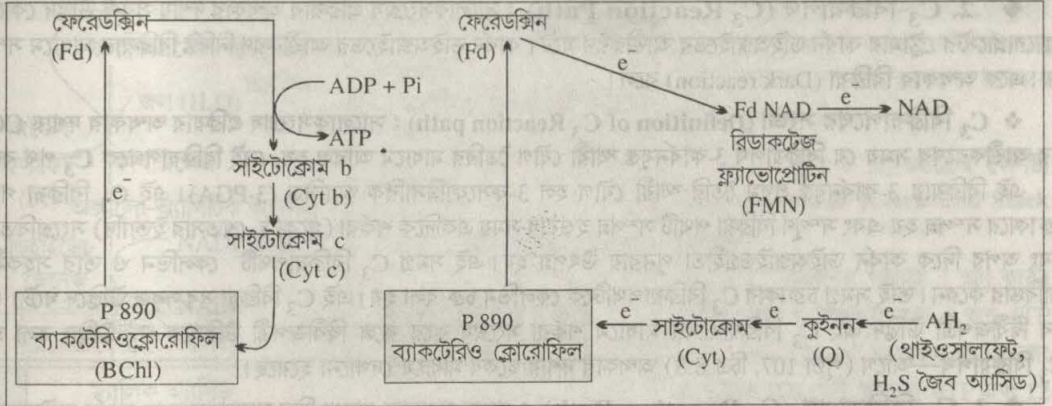
চিত্র 8.10 : ব্যাকটেরিয়ার আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশনের চিত্ররূপ।

বিক্রিয়া। ব্যাকটেরিয়ার সলোকসংশ্লেষে অক্সিজেন নির্গত হয় ন। তাই বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন ব্যাকটেরিয়ায় অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটি ঘটে না। পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে অক্সিজেন নির্গমন ছাড়াই ব্যাকটেরিয়া অনাবর্ত ফোটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়। এই পরিক্রমণে ইলেকট্রন একমুখীভাবে পরপর এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, যেমন—থায়োসালফেট, H_2S, জৈব অ্যাসিডসমূহ, DPIP—অ্যাসকরবেট হয়ে NADতে পৌঁছায়। NAD এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে (লাসাভা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, 1961)। এইভাবে সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া ATPকে শক্তি হিসেবে সংশ্লেষ করে এবং NADPH ও CO_2-এর আবদ্ধকরণে বিজারকের ভূমিকা নেয়। চিত্রে আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফোটোফসফোরাইলেশন চক্রে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া দেখানো হল।

8.4. C_2, C_3, C_4 বিক্রিয়াপথ ও CAM (C_2 Reaction path way and CAM)

❖ **C_2 বিক্রিয়াপথের সংজ্ঞা (Definition of C_2 reaction path ways) : যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াপথ ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবিউলোজ 1, 5 বিস্‌ফসফেট থেকে দুই কার্বনযুক্ত যৌগ গ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে আরম্ভ হয় তাকে C_2 বিক্রিয়াপথ বলে।**

◆ **1. C_2 বিক্রিয়াপথ (C_2 Reaction path way) :** প্রধানত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সবুজ কোশে বিশেষ অবস্থায় (উচ্চ আলোর তীব্রতা, বেশি অক্সিজেন, কম কার্বন ডাইঅক্সাইড ও উচ্চ তাপমাত্রা) বিশেষ ধরনের শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটে তাকে **আলোক শ্বসন** বা **ফোটোরেসপিরেশন** (Photorespiration) বলে। এই ফোটোরেসপিরেশন বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে আরম্ভ হয়ে পারক্সিজোম, মাইটোকনড্রিয়া হয়ে আবার পারক্সিজোমের মধ্য দিয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে শেষ হয়।

চিত্র 8.11 : C_2 বিক্রিয়াপথ।
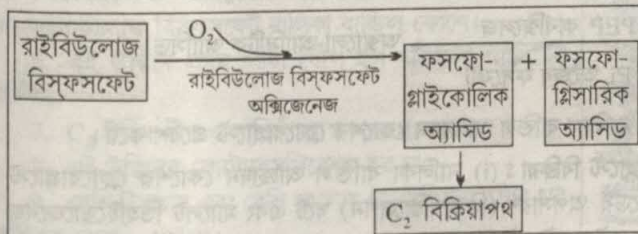
বিশেষ অবস্থায় ক্লোরোপ্লাস্টে রাইবিউলোজ বিসফসফেট মুখ্য উৎসেচক রাইবিউলেজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ (RuBisCO) সঙ্গে রাইবিউলোজ বিসফসফেট অক্সিজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে বিক্রিয়া করে। এর ফলে 3-কার্বন যুক্ত যৌগ—ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ও 2-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এর পর 2-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বিক্রিয়াগুলি প্রথমে ক্লোরোপ্লাস্ট, এর পর পারক্সিজোম এবং শেষে মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে। ওই

বিক্রিয়াপথটি শেষে মাইটোকনড্রিয়া থেকে পারক্সিজোম হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে শেষ হয়। তাই এই সম্পূর্ণ ফোটোরেসপিরেশানের বিক্রিয়াপথটিকে যা 2-কার্বনযুক্ত যৌগ থেকে আরম্ভ হয় তাকে C_2 বিক্রিয়াপথ বলা হয়। এই বিক্রিয়ার ফলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের শর্করা উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

◆ **2. C_3-বিক্রিয়াপথ (C_3 Reaction Path)** ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় সবুজ উদ্ভিদ কোশের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ ঘটে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একে **অন্ধকার বিক্রিয়া** (Dark reaction) বলে।

❖ **C_3 বিক্রিয়াপথের সংজ্ঞা (Definition of C_3 Reaction path) ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় CO_2-এর আত্তীকরণের সময় যে বিক্রিয়াপথ 3-কার্বনযুক্ত স্থায়ী যৌগ তৈরির মাধ্যমে আরম্ভ হয়, সেই বিক্রিয়াপথকে C_3 পথ বলে।**

এই বিক্রিয়ায় 3-কার্বনযুক্ত প্রথম তৈরি স্থায়ী যৌগ হল 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA)। এই C_3 বিক্রিয়া পথটি চক্রাকারে সম্পন্ন হয় এবং সম্পূর্ণ বিক্রিয়া পথটি সম্পন্ন হওয়ার সময় একদিকে শর্করা (গ্লুকোজ, শ্বেতসার ইত্যাদি) সংশ্লেষিত হয় এবং অপর দিকে কার্বন ডাইঅক্সাইডগ্রহীতা পুনরায় উৎপন্ন হয়। এই সমগ্র C_3 বিক্রিয়াপথটি কেলভিন ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন। তাই সমগ্র চক্রাকার C_3 বিক্রিয়াপথটিকে **কেলভিন চক্র** বলা হয়। এই C_3 বিক্রিয়া সব সবুজ উদ্ভিদে ঘটে। প্রায় সব দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এই C_3 বিক্রিয়াপথের মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষ করে বলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকে C_3 উদ্ভিদ বলা হয়। **C_3 বিক্রিয়াপথ**—আগে (পৃষ্ঠা 107, চিত্র 8.8) অন্ধকার দশায় ছকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

◆ **3. C_4 বিক্রিয়াপথ (C_4 Reaction Path)** ঃ প্রথমে সকলের ধারণা ছিল সালোকসংশ্লেষ কার্বন ডাইঅক্সাইড সংবন্ধন (Fixation) সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেলভিন চক্রের মাধ্যমে ঘটে। কিন্তু 1965 খ্রিস্টাব্দে **কর্টসচক, হ্যার্ট ও বুর** (Kortschak, Hart and Burr) আখ গাছে তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ($^{14}CO_2$) প্রয়োগ করে প্রমাণ করেন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অন্ধকার দশায় প্রথমে ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের সাহায্যে CO_2 গ্রহীত হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণের ফলে 4-কার্বনযুক্ত যৌগ অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ম্যালিক ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। এই বিক্রিয়াপথকে **হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্র** বলে। বর্তমানে প্রায় 900 প্রজাতির উদ্ভিদের কোশে এই চক্র দেখা যায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ একবীজপত্রী এবং কিছু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। একবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে যেমন—প্যানিকাম, আখ, জোয়ার, ভুট্টা এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে নোটে, অ্যাট্রিপ্লেক্স প্রভৃতি সচরাচর দেখা যায়। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হল নালিকাবান্ডিলকে বেষ্টিত করে একটি ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত আবরণী কোশের স্তর থাকে। এই বিশেষ অঙ্গকে **ক্রান্স অঙ্গসংস্থান** বলে।

❖ (a) **হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্রের বা C_4 চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Hatch and Slack cycle or C_4 Cycle) ঃ**

যে প্রক্রিয়ায় সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশায় ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত হয়, 4-কার্বনযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয় এবং প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে তাকে হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্র বলে।

(b) **হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্রের বিক্রিয়া চক্র (Reactions of Hatch and Slack cycle) ঃ**

1. **মেসোফিল কলার কোশে ক্লোরোপ্লাস্টের বিক্রিয়া**—দেখা যায় উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলায় C_4 চক্র এবং নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদনের (Bundle sheath) কোশে C_3 চক্র সংঘটিত হয়। চক্রাকার বিক্রিয়ার প্রথমে CO_2 বায়ুমণ্ডল থেকে পাতার মেসোফিল কলার কোশগুলিতে প্রবেশ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রথম গ্রহীতা হল 3-কার্বনযুক্ত যৌগ ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড। মেসোফিল কোশে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করার পর ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড (PEP) কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 4-কার্বনযুক্ত অ্যাসিড—অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড গঠিত হয়। এই সময় ফসফোইনোল কার্বক্সিলেজ উৎসেচক কাজ করে। অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$$\text{ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড} + CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{Pi অজৈব ফসফেট}]{\text{PEP কার্বক্সিলেজ}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড}$$
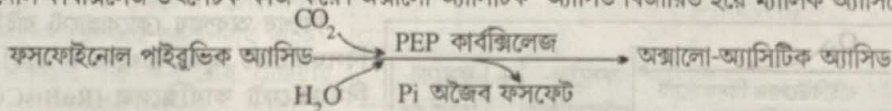
C_4 যুক্ত অ্যাসিড অর্থাৎ ম্যালিক অ্যাসিড-এর পর নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।

2. **নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে বিক্রিয়া ঃ** (i) নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে ম্যালিক অ্যাসিডের জারণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের অপসারণ (ডিকার্বক্সিলেশন) ঘটে এবং ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP \xrightarrow{\text{ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + NADPH{+}H^+ + CO_2$$

(ii) এই পাইরুভিক অ্যাসিড যা ম্যালিক অ্যাসিড জারিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তা আবার ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং CO_2 গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে।

চিত্র 8.12 : C_4 চক্র বিক্রিয়া।

(iii) এর পর উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশের কেলভিন চক্রের ক্লোরোপ্লাস্টে থাকা রাইবিউলোজ বাইফস্‌ফেট দ্বারা গৃহীত হয় এবং চক্রাকার বিক্রিয়া আরম্ভ হয়।

- **হ্যাচ ও স্ল্যাকচক্রের বৈশিষ্ট্য (Significance of Hatch and Slack cycle) :**

1. C_4 উদ্ভিদের পাতায় 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড সংবন্ধনের জন্য 5 অণু ATP এবং 2 NADPH+H$^+$ প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যায় চক্রে মোট 30 অণু ATP এবং 12 অণু NADPH+H$^+$ প্রয়োজন 1 অণু গ্লুকোজ সংশ্লেষে। 2. C_4 উদ্ভিদ খুব কম ঘনত্বের কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু থেকে শোষণ করতে পারে যা C_3 উদ্ভিদ পারে না। 3. এই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার অনেক বেশি হয়। 4. C_4 উদ্ভিদের ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। 5. এসব উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার C_3 উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশি।

◆ 4. C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of C_4 plants) :

1. C_4 উদ্ভিদের পাতার নালিকা বান্ডিলে আচ্ছাদন কলার কোশে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদন কলার বাইরে 1-3 স্তর মেসোফিল কলা আবৃত থাকে। মেসোফিল কলার কোশগুলিতে কোশান্তর রন্ধ্র থাকে।

2. C_4 উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলাগুলির আকৃতি স্বাভাবিক প্রকৃতির এবং নালিকা বান্ডিলের আচ্ছাদন কলার কোশগুলির আকৃতি অনেক বড়ো এবং ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রাণা থাকে না। শুধু স্টোমা থাকে।

3. ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বঅক্সিলেজ উৎসেচক (PEP) মেসোফিল কলায় থাকে।

4. C_4 চক্র মেসোফিল কলায় এবং C_3 চক্র নালিকা বান্ডিল আচ্ছাদন কোশে ঘটে।

5. C_4 উদ্ভিদে দু'রকম CO_2 গ্রহীতা থাকে, যেমন— (i) ফসফোইনোল পাইরুভেট (মেসোফিল কোশে) এবং (ii) রাইবিউলোজ বিস্‌ফসফেট নালিকা বান্ডিল কোশে।

6. এই উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী যৌগ হল অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

7. C_4 উদ্ভিদ গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়।

8. এই উদ্ভিদের ফোটোরেসপিরেশন হয় না।

9. বেশি উষ্ণতায় এবং বেশি আলোয় C_4 উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বেশি হয় (30° – 40°C)।

10. অক্সিজেনের প্রভাবে C_4 চক্রের বিক্রিয়া বন্ধ হয় না।
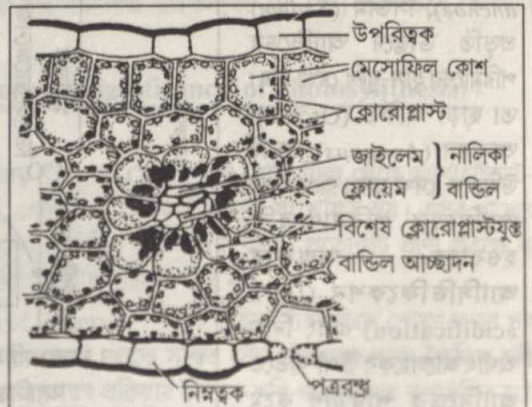
চিত্র 8.13 : একটি আদর্শ C_4 উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদ।

● কেলভিন চক্র (C_3 চক্র) এবং হ্যাচ-স্ল্যাক চক্রের (C_4 চক্র) পার্থক্য [**Difference between Calvin cycle (C_3 cycle) and Hatch-slack cycle (C_4 cycle)**] :

কেলভিন চক্র (C_3 চক্র)	হ্যাচ-স্ল্যাক চক্র (C_4 চক্র)
1. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা হল রাইবিউলোজ বাইফসফেট (5-কার্বন যৌগ)।	1. প্রাথমিক কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা হল ফসফোফেনল পাইরুভিক অ্যাসিড (3 কার্বন যৌগ)।
2. ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হল প্রথম স্থায়ী যৌগ।	2. অক্সলো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড হল প্রথম স্থায়ী যৌগ।
3. C_3 চক্রে মেসোফিল কলার কোশে উৎসেচক কার্বোক্সিলেজ কাজ করে।	3. C_4 চক্র মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্টে উৎসেচক PEP কার্বোক্সিলেজ কাজ করে।
4. সাধারণত অল্প উষ্ণতায় ঘটে।	4. সাধারণত বেশি উষ্ণতা ও বেশি আলোকে ঘটে।
5. এই চক্রে সঠিকভাবে CO_2-র আত্তীকরণ ঘটে।	5. এই চক্রে সঠিকভাবে CO_2-এর আত্তীকরণ ঘটে না।
6. সালোকসংশ্লেষের হার অপেক্ষাকৃত কম।	6. সালোকসংশ্লেষের হার অপেক্ষাকৃত বেশি।
7. C_3 চক্র স্বাধীন কারণ এর মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষিত হয়।	7. C_4 চক্র সর্বদা C_3 চক্রের উপর নির্ভরশীল শর্করা সংশ্লেষের জন্য।

▲ CAM চক্র বা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক চক্র (CAM cycle — Crassulacean Acid Metabolic Cycle) :

CAM বিপাক প্রক্রিয়া রসাল জাঙ্গল (Succulent) উদ্ভিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 1804 খ্রিস্টাব্দে দ্য সসুর (de Saussure) বলেন প্রথম বট (*Ficus benghalensis*) গাছে রাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি এবং দিনে এর পরিমাণ কমে যায়। এর পর ক্র্যাসুলেসি (*Crassulaceae*) ও কেক্‌টেসি (*Cactaceae*) গোত্রের বহু রসাল জাঙ্গল উদ্ভিদে, যেমন—ব্রায়োফাইলাম (*Bryophyllum*), ক্র্যাসুলা (*Crassula*), ক্যালানচো (*Kalanchoe*), সিডাম (*Sedum*) প্রভৃতি উদ্ভিদে অ্যাসিডের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। তা ছাড়া অর্কিড (Orchid), আনারস (*Annanus*) প্রভৃতি উদ্ভিদেও দেখা যায়। রাতে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াকে **অন্ধকার অ্যাসিডিফিকেশন** (Dark acidification) এবং দিনে অর্থাৎ আলোকের উপস্থিতিতে অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যাওয়াকে আলোক
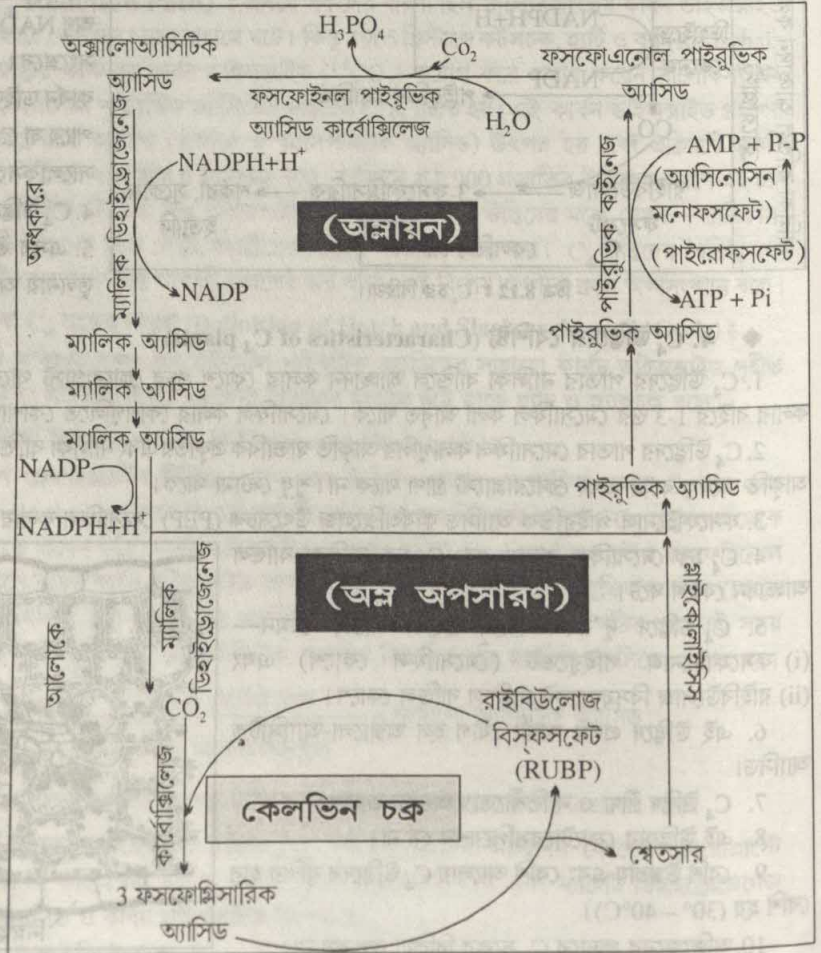
চিত্র 8.14 : CAM চক্র বা ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড চক্র।

ডিঅ্যাসিডিফিকেশন (Light deacidification) বলে। দিনে ও রাতে জৈব অ্যাসিডের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে **ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক** বলে। যেসব উদ্ভিদে এই চক্র দেখা যায় তাদের CAM উদ্ভিদ বলা হয়।

❖ (a) **CAM চক্রের সংজ্ঞা (Definition of CAM cycle) : যে প্রক্রিয়ায় রসাল উদ্ভিদের অন্ধকারে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে এবং আলোকের উপস্থিতিতে অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে বা জারিত হয়ে পরিমাণ কমে—এই পর্যায়ক্রমিক বিপাক চক্রকে ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক চক্র বা CAM cycle বলে।**

(b) **CAM চক্রের বিক্রিয়া (Cyclic reaction of CAM) :** ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড বিপাক প্রক্রিয়া দুটি অংশে বিভক্ত, যেমন— **অম্লায়ন** বা **অ্যাসিডিফিকেশন** (Acidification) এবং **অম্লঅপসারণ** বা **ডিঅ্যাসিডিফিকেশন** (Deacidification)। অম্লায়ন অন্ধকারে এবং অম্লঅপসারণ আলোকে ঘটে।

(1) **অম্লায়ন বা অ্যাসিডিফিকেশন** (Acidification) : এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি হল—

(i) উদ্ভিদের সঞ্চিত শ্বেতসার (Carbohydrate) গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় ফসফোএনোল **পাইরুভিক অ্যাসিডে** (PEP) পরিণত হয়। রাতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পাতার মধ্যে প্রবেশ করে।

(ii) ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বন আত্তীকরণের মাধ্যমে (কার্বোক্সিলেশান) অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ার সময় উৎসেচক ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড কার্বোক্সিলেজ সাহায্য করে।

$$\text{ফসফোএনোল পাইরুভিক অ্যাসিড} \xrightarrow[H_2O \;\searrow\; \text{Pi অজৈব ফসফেট}]{CO \;\; \text{PEP কার্বোক্সিলেজ}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড}$$
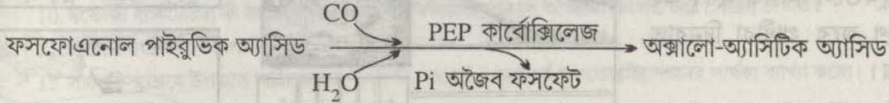
(iii) অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড ম্যালিক ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় $NADPH+H^+$ হাইড্রোজেন (H) দাতা হিসাবে কাজ করে।

$$\text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + NADPH+H^+ \xrightarrow{\text{ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP^+$$
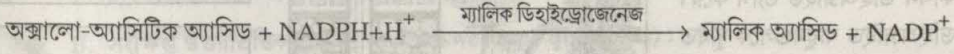
রাতে অম্লায়নে যে ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয় তা পাতার কোশ গহ্বরে থাকে।

(2) **অম্ল অপসারণ বা ডিঅ্যাসিডিফিকেশন** (Deacidification) : দিনে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকায় কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার কোশে প্রবেশ করতে পারে না এবং রাতে উৎপন্ন অ্যাসিডগুলি বিভিন্ন বিপাক কাজে ব্যবহৃত হয়।

আলোকের অভাবে রাতে সংশ্লেষিত ম্যালিক অ্যাসিড ভেঙে যায় বা জারিত হয়, ফলে পাইরুভিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ও $NADPH+H^+$ উৎপন্ন হয়। এই সময় ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচক কাজ করে।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NADP \xrightarrow{\text{ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{পাইরুভিক অ্যাসিড} + NADPH+H^+ + CO_2$$
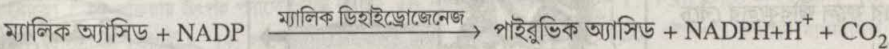
পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হবার পর ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জারিত হয় অথবা আবার ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে রাতে CO_2 গ্রহীতা হিসাবে কাজ করে। কিন্তু পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি এখনো জানা যায়নি। যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আলোক অম্ল অপসারণের সময় নির্গত হয় তা রাইবিউলোজ ডাইফসফেট (RuDP) গ্রহণ করে কেলভিন চক্রের বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষিত হয়।

▲ সালোকসংশ্লেষের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Importance or Significance of Photosynthesis) :

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য নীচে আলোচনা করা হল।

1. খাদ্য সংশ্লেষ (Food synthesis) — সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় CO_2, H_2O, আলো ও ক্লোরোফিল থেকে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই কার্বোহাইড্রেট থেকে শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয়। এসব খাদ্যের সামান্য অংশ উদ্ভিদ জৈবনিক কাজে ব্যয় করে এবং বাকি অংশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে জমা রাখে। প্রত্যেকটি প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। খাদ্য ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না।

2. শক্তির রূপান্তর ও সঞ্চয় (Transformation and Storage of Energy) — সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে শোষণ করার পর রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং কার্বোহাইড্রেট অণুতে আবদ্ধ করে। খাদ্যে সঞ্চিত সৌরশক্তি প্রকৃতপক্ষে **স্থৈতিক শক্তি** (Potential energy)। প্রাণীরা এই খাদ্য গ্রহণ করার পর কোশের মধ্যে জারণ প্রক্রিয়ায় স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তাপশক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই উৎপন্ন শক্তি জীবের বৃদ্ধি, চলন, সংবহন ও নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজ চালাতে পারে।

3. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা (Maintenance of O_2 and CO_2 balance) — জীব বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে। প্রতিটি জীবকোশে দিনরাত শ্বসন চলে। জীব সবসময় অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং জীবকুলকে বাঁচিয়ে রাখে।

4. অক্সিজেনের সরবরাহ (Supply of O_2) — শ্বসনের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন। সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রাণীরা দিনরাত শ্বাসকার্য চালায়।

5. বায়ুশোধন (Purification of air) — শ্বসনের সময় জীবকুল অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করতে পারত। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে ক্ষতিকারক কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে দূষিত বায়ুমণ্ডলের পরিশোধন করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়। এর ফলে জীবকুলের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়।

6. জ্বালানির উৎস (Source of fuel) — শিল্পে কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি যা কিছু ব্যবহৃত হয় সেগুলির উৎস হল উদ্ভিদ।

চিত্র 8.15 ঃ সালোকসংশ্লেষ যাবতীয় জৈব প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস।

তাপ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় অধিকাংশ উদ্ভিদ জ্বালানির মাধ্যমে। পেট্রোল এবং কয়লার সঞ্চিত সৌরশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই একমাত্র সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াই শক্তির রূপান্তর ও খাদ্যে শক্তি সঞ্চিত করতে পারে।

7. মানব সভ্যতায় সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis and human civilization) — সালোকসংশ্লেষের উপর মানবসভ্যতার অগ্রগতি অনেকটা নির্ভরশীল। তুলো, রেয়ন, সেলোফেন কাগজ, প্লাস্টিক, রবার প্রভৃতি পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষজাত উপাদান। বিভিন্ন প্রকার উপকার কুইনাইন, মরফিন, রেসারপিন ইত্যাদি ওষুধ আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতির জ্বালানির মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে, তা হল বহু বছর আগে উদ্ভিদদেহে সংরক্ষিত সৌরশক্তি। সুতরাং সালোকসংশ্লেষের উপর জীবকুল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

০ অ নু শী ল নী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. (a) সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে? (b) সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় প্রধান রঞ্জক পদার্থগুলি কী কী?
2. (a) প্রধান ও সহকারী রঞ্জক পদার্থ কাকে বলে? ক্লোরোফিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
3. (a) সালোকসংশ্লেষের আলোক ও অন্ধকার দশা কী? (b) আলোক দশায় সর্বশেষ উৎপন্নদ্রব্য কী? ফটোসিস্টেম I ও II দ্বারা অনুঘটিত প্রধান বিক্রিয়াগুলি বুঝাইয়া দাও।
4. (a) ফোটোফসফোরাইলেশন কী? (b) এটি কোন্ জীবনক্রিয়ায় এবং কোন্ দশায় ঘটে? উক্ত বিক্রিয়ার তাৎপর্য কী?
5. সালোকসংশ্লেষে আলোক দশার তাৎপর্য উল্লেখ করো।
6. (a) সালোকসংশ্লেষের উপাদানগুলির নাম করো। (b) এদের উৎস দেখাও। এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের ভূমিকা কী?
7. সালোকসংশ্লেষের আঁধার দশাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
8. (a) সালোকসংশ্লেষের হিল বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া বলতে কী বোঝো? (b) ওই দুজন বিজ্ঞানী তাঁদের সিদ্ধান্তে কীভাবে উপনীত হয়েছিলেন?
9. একটি স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষের বিক্রিয়াগুলির বিষয়ে লেখো।
10. স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া কী সালোকসংশ্লেষকালে উপজাত পদার্থরূপে অক্সিজেন নির্গত করে? কারণ দেখাও।
11. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
12. সালোকসংশ্লেষে উপজাত অক্সিজেনের উৎস কী? আবর্ত ও অনাবর্ত ফসফোরাইলেশনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
13. C_2 বিক্রিয়াপথ কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখো।
14. (a) C_4 বিক্রিয়াপথ কী? (b) চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
15. (a) CAM চক্র কাকে বলে? (b) CAM চক্রের বিবরণ দাও।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. (a) সালোকসংশ্লেষ কী? (b) সালোকসংশ্লেষ কোথায় হয়? 2. সালোকসংশ্লেষের জন্য অপরিহার্য একটি জৈব উৎসেচকও একটি সহ-উৎসেচকের নাম উল্লেখ করো। 3. ক্লোরোফিলের উপাদানগুলি কী কী? 4. হিল বিক্রিয়া কী? 5. সালোকসংশ্লেষের কয়টি দশা? কী কী? 6. সালোকসংশ্লেষের প্রথম জৈব যৌগ কী? 7. ক্লোরোফিল কণা কী? 8. ফোটনকণা বলতে কী বোঝো? 9. গ্লুকোজে-সঞ্চিত সৌরশক্তির রূপ কী ও পরিমাণ কত? 10. সালোকসংশ্লেষে উপজাত পদার্থ কী কী? 11. সূর্যালোকের ভূমিকা সালোকসংশ্লেষে কীরূপে সাধিত হয়? 12. একটি 3^{-C} যৌগের নাম করো। 13. সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের ভূমিকা কী? 14. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? 15. ফসফোরাইলেশন বলতে কী বোঝো? এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের নাম করো। 16. PSI বলতে কী বোঝো? 17. PSII বলতে কী বোঝো? 18. সালোকসংশ্লেষীয় কর্মক্ষম বর্ণালি বলতে কী বোঝো? 19. সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গ বলতে কী বোঝো? 20. সৌরশক্তি কীভাবে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? 21. সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থের বিষয় যাহা জানো লেখো। 22. ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া কী? 23. কেলভিন চক্র কী? 24. ফোটোলিসিস কী? 25. C_2 বিক্রিয়াপথ কাকে বলা হয়? 26. হ্যাচ-স্লাক চক্র কী? 27. ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড চক্র কাকে বলে? 28. উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষের জন্য দায়ী কোশগুলির নাম লেখো। 29. কোন্ উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে সংলোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলে? 30. উদ্ভিদের মূলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া হয় কেন? 31. সালোকসংশ্লেষ উদ্ভিদকোশে হয়, কিন্তু প্রাণী কোশে হয় না কেন? 32. দুটি প্রাণীর নাম করো যাদের দেহে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দেখা যায়। 33. ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল অণুগুলি সঞ্চিত থাকে? 34. ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল কী? কোথায় পাওয়া যায়? 35. ক্যারোটিনয়েড্সের কাজ কী কী? 36. সবুজ উদ্ভিদের সমগ্র সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জারক ও বিজারকের নাম লেখো। 37. কমপেনসেশন পয়েন্ট কী? 38. সালোকসংশ্লেষ একটি উপচিতি মূলক প্রক্রিয়া কেন? 39. সূর্যালোকের কোন্ তরঙ্গে সালোকসংশ্লেষ হয়? 40. কমপেনসেশন পয়েন্ট কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. সালোকসংশ্লেষ কোন্ জীবদেহে ঘটে? 2. সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গাণু কী? 3. সালোকসংশ্লেষকারী একক কী? 4. ফোটন বা কোয়ান্টাম কী? 7. আলোকদশা কেন বলা হয়? 8. অন্ধকার দশা কেন বলা হয়? 9. কার্যকরী বর্ণালি কোন্‌টি? 10. কতটা সৌরশক্তি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয়? 11. কোন্ উদ্ভিদ কলায় সালোকসংশ্লেষ ঘটে? 12. সালোকসংশ্লেষে সূর্যালোকের কোন্ রং ক্লোরোফিল বেশি শোষণ করে? 13. সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থের নাম করো। 14. সালোকসংশ্লেষে সূর্যশক্তির কতটা খাদ্যমধ্যে আবদ্ধ হয়? 15. সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেনের উৎস কী? 16. সালোকসংশ্লেষের কয়টি দশা? কী কী? 17. PS-I তন্ত্রে কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষিত হয়? 18. PS-II তন্ত্রে কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষিত হয়? 19. PSI-এর অবস্থান কী? 20. PS-II-এর অবস্থান কী? 21. NADI-এর নাম কী? 22. ADP-এর নাম কী? 23. ATP-এর নাম কী? 24. RuDP-এর নাম

কী? 25. PGA-এর নাম কী? 26. PGAld-এর নাম কী? 27. ক্লোরোফিলের ধাতব মৌলের নাম করো। 28. দুটি ইলেকট্রন বাহকের নাম করো। 29. সালোকসংশ্লেষে সক্ষম একটি প্রাণী ও অক্ষম একটি উদ্ভিদের নাম করো। 30. সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম করো। 31. নিম্নলিখিত বক্তব্যটি সঠিক না ভুল, বলো : জলমগ্ন উদ্ভিদ বাতাস থেকে তার প্রয়োজনীয় CO_2 পায়। 32. নিম্নলিখিত বক্তব্যটি সঠিক না ভুল লেখো : সালোকসংশ্লেষে জলের বিজারণ ঘটে। 33. অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেন তৈরি করে কি ? 34. হিল বিকারক কোন্‌গুলি ? 35. উদ্ভিদের কোন্ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের CO_2-এর ঘাটতি এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় এর পূরণ হয় ? 36. সালোকসংশ্লেষে সাহায্যকারী দুটি ভিটামিনের নাম লেখো। 37. ফোটোলিসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন H^+ আয়ন কার সঙ্গে যুক্ত হয়? 38. ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল অণুগুলি সজ্জিত থাকে ? 39. CAM-এর সম্পূর্ণ নাম কী? 40. দুটি C_4 উদ্ভিদের নাম লেখো। 41. অক্সিজেন বিহীন সালোকসংশ্লেষ কোথায় দেখা যায়?

D. পার্থক্য লেখো (Distinguish between) :

1. আলোকদশা ও অন্ধকার দশা। 2. PS-I ও PS-II তন্ত্র। 3. সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষ। 4. রাসায়নিক শক্তি ও সৌরশক্তি। 5. সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গ ও সালোকসংশ্লেষীয় অঙ্গাণু। 6. আবর্তন ও অনাবর্তক ফসফোরাইলেশন। 7. হিল বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া। 8. কোয়ান্টা ও কোয়ান্টাজোম। 9. ADP ও ATP। 10. ক্লোরোফিল a ও b। 11. ক্লোরোফিল ও ব্যাকটিরীয় ক্লোরোফিল।

E. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. ফোটোলিসিস। 2. ক্লোরোফিল। 3. অঙ্গার আত্তীকরণ। 4. অন্ধকার দশা। 5. আলোকদশা। 6. হিল বিক্রিয়া। 7. PS-I। 8. PS-II। 9. রাসায়নিক সংশ্লেষ। 10. কেলভিন চক্র। 11. ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া। 12. কোয়ান্টাজোম। 13. সালোকসংশ্লেষকারী একক। 14. সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ। 15. ফোটোসিন্থেটিক ফসফোরাইলেশন। 16. CO_2 বন্ধন। 17. কোয়ান্টাজোম। 18. স্ট্রোমা। 19. গ্রাণা। 20. বেনসন ও কেলভিন।

শ্বসন
RESPIRATION

➧ **সূচনা (Introduction) :** প্রতিটি জীবে শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি প্রতিটি জীব খাদ্য থেকে পায়। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের এই সঞ্চিত শক্তি জীব সম্প্রদায় প্রাথমিকভাবে সালোকসংশ্লেষের সময় সূর্যালোক (সৌরশক্তি) থেকে পায় এবং একে **স্থৈতিক শক্তি** বলে। জীবকোশে এক বিশেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ শ্বসন প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে প্রধানত ATP নামে উচ্চ জৈব শক্তি সম্পন্ন যৌগ তৈরি করে অর্থাৎ স্থৈতিক শক্তি **গতিশক্তিতে** রূপান্তরিত হয়। গতিশক্তি জীবের সব রকমের শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে।

❖ (a) **শ্বসনের সংজ্ঞা (Definition of Respiration) : যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে কোশের জটিল জৈববস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে জৈব বস্তুর মধ্যে নিহিত স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল নির্গত করে, তাকে শ্বসন (Respiration) বলে।**

◘ (b) **শ্বসনের গুরুত্ব (Importance of Respiration) :**

(i) শ্বসন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার জৈব রাসায়নিক বস্তু জারিত হয়।

(ii) এই পদ্ধতিতে কোশের বিভিন্ন খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। উৎপন্ন এই শক্তি দিয়ে জীবদেহে বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক কাজ সম্পন্ন হয়।

(iii) শ্বসন একপ্রকার অপচিতি প্রক্রিয়া কারণ শ্বসনে জীবের শুষ্ক ওজন হ্রাস পায়।

(iv) শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি শ্বসনবস্তু, শ্বসন প্রক্রিয়ায় জারিত হয়।

(v) শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে।

◘ (c) **শ্বসনবস্তু (Respiratory substrates) :** শ্বসনের সময় প্রোটোপ্লাজমে যেসব জমা খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে তাদের **শ্বসনবস্তু** বলে। শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও জৈব অ্যাসিড বিভিন্ন ধরনের শ্বসনবস্তু হলেও প্রায় সব জীবের প্রধান শ্বসনবস্তু হল **শর্করা**। আবার শর্করাগুলির মধ্যে **গ্লুকোজই প্রধান শ্বসন বস্তু**।

❂ শ্বসনকে বিপাকের অপচিতি এবং শক্তিমোচী বা তাপমোচী প্রক্রিয়া বলে কেন ? ❂
(Why is Respiration called a Catabolic and Calorigenic process ?)

1. **অপচিতি প্রক্রিয়া** (Catabolic process) **:** শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোশের মধ্যে যে জমানো খাদ্যবস্তু থাকে তা ভেঙে সরল উপাদানে (CO_2 এবং H_2O) পরিণত হয় এবং খাদ্যস্থিত শক্তির মুক্তি ঘটে। খাদ্যবস্তু বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে জীবদেহের শুষ্ক ওজন হ্রাস পায়। এই কারণে শ্বসনকে **অপচিতি প্রক্রিয়া** বলে।

2. **শক্তিমোচী প্রক্রিয়া** (Calorigenic process) **:** শ্বসন প্রক্রিয়ায় শ্বসনবস্তু (গ্লুকোজ) জারিত হয়ে ATP অর্থাৎ উচ্চ জৈবশক্তি-সম্পন্ন যৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগের আর্দ্রবিশ্লেষণে শক্তি নির্গত হয় বলে শ্বসনকে **তাপমোচী** বা **শক্তিমোচী প্রক্রিয়া** বলে।

➤ **শক্তির প্রকাশ :** শ্বসনকে শক্তির প্রকাশ বলে কারণ শ্বসনের সময় ATP নামে যে উচ্চ জৈবশক্তিসম্পন্ন যৌগ (গতিশক্তি) তৈরি হয় তার সাহায্যে জীব তার দেহের সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক গ্রাম মোল গ্লুকোজ বা 180 গ্রাম গ্লুকোজ [$C_6H_{12}O_6 = (12 \times 6) + (12 \times 1) + (6 \times 16) = 72 + 12 + 96 = 180$ গ্রাম] সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে প্রায় **686 KCal** তাপশক্তি উৎপন্ন করে এবং গ্লুকোজ অণুটি CO_2 ও H_2O-এ বিশ্লিষ্ট হয়। কোশীয় শ্বসনে এক মোল গ্লুকোজ ভেঙে যে শক্তি নির্গত করে তার কিছুটা (277 KCal) উচ্চ জৈবশক্তি যুক্ত ফসফেট যৌগ (ATP) গঠনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে। বাকি (409 KCal) তাপশক্তি (Heat energy) হিসাবে মুক্ত হয়। শারীরবৃত্তীয় কাজের সময় এই জৈবশক্তি-যৌগ ATP বিশ্লিষ্ট হয়ে ADP ও ~P (উচ্চ জৈবশক্তিসম্পন্ন ফসফেট)-তে

পরিণত হয়। এই জৈব ফসফেট (~P) মধ্যস্থ রাসায়নিক শক্তি মুক্ত হয়ে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে ফলে জৈব ফসফেট (~P) অজৈব ফসফেটে (Pi) পরিণত হয়।

■ (d) **শ্বসন প্রক্রিয়ার স্থান (Site of Respiration) :**
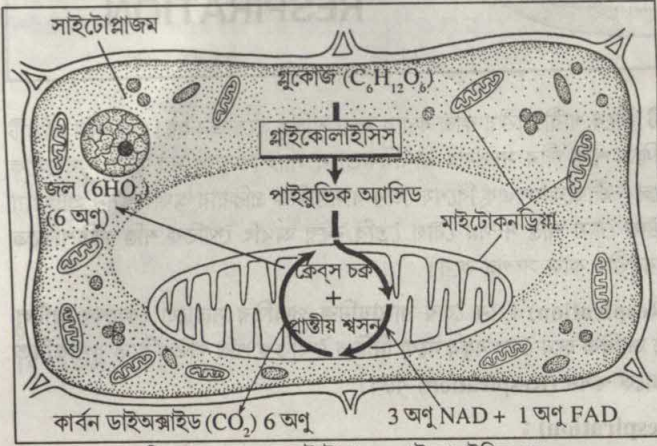
চিত্র 9.1 : কোশের সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলাইসিস্ এবং মাইটোকনড্রিয়ায় ক্রেব্স চক্রের বিক্রিয়া-স্থল।

1. ইউক্যারিওটিক কোশে শ্বসনের স্থান — শ্বসন গ্লাইকোলাইসিস্, ক্রেবস চক্র এবং প্রান্তীয় শ্বসন নামে তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রক্রিয়াগুলি কোশের দুটি অংশে সংঘটিত হয়, যেমন— সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকনড্রিয়া। **সাইটোপ্লাজমে** গ্লাইকোলাইসিস্ এবং **মাইটোকনড্রিয়ায়** ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসনের বিক্রিয়াগুলি ঘটে।

● **RBC-তে ক্রেবস চক্র হয় না কেন?** পরিণত RBC-তে মাইটোকনড্রিয়া নেই বলে এতে ক্রেবস চক্র (এবং প্রান্তীয় শ্বসন) সংঘটিত হয় না।

2. প্রোক্যারিওটিক কোশে শ্বসনের স্থান— ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল প্রভৃতি আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোশে মাইটোকনড্রিয়া থাকে না। এইসব জীবে শ্বসন প্রক্রিয়া **মেসোজোম** নামে কোশের অঙ্গাণুতে ঘটে।

❁ সজীব কোশ থেকে সব মাইটোকনড্রিয়াকে অপসারিত করলে কী ঘটবে ? ❁

ক্রেবস চক্র এবং প্রান্তীয় শ্বসন সংঘটিত করা মাইটোকনড্রিয়ার প্রধান কাজ। কোশ থেকে সবকটি মাইটোকনড্রিয়া অপসারণ করলে, কোশে ক্রেবস চক্র অথবা প্রান্তীয় শ্বসন হবে না। এর ফলে কোশের শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না ও ATP উৎপাদন ব্যাহত হয়। শক্তির অভাবে কোশের যাবতীয় বিপাকীয় কাজগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষে কোশটি সজীবতা হারায়।

■ (e) **শ্বসনের প্রকারভেদ (Types of Respiration) :** শ্বসন দু'প্রকারের, যেমন— **সবাত শ্বসন** এবং **অবাত শ্বসন**।

1. সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) :

❖ **(i) সংজ্ঞা — যে শ্বসন পদ্ধতিতে বায়ুজীবী জীবকোশে গ্লুকোজ মুক্ত আণবিক অক্সিজেন দিয়ে সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয় এবং খাদ্যের স্থৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ নির্গত হয় তাকে সবাত শ্বসন বলে।**

(ii) **সবাত শ্বসনের স্থান**— সবাত শ্বসন সমস্ত বায়ুজীবী জীবকোশে সংঘটিত হয়। এই প্রকার শ্বসন তিনটি পর্যায়ে ঘটে, যেমন— প্রথম পর্যায় গ্লাইকোলাইসিস্, দ্বিতীয় পর্যায় ক্রেবস চক্র এবং তৃতীয় পর্যায় প্রান্তীয় শ্বসন। সাইটোপ্লাজমের কোশ-অঙ্গাণুগুলি সাইটোপ্লাজম থেকে বাদ দিলে যে ধাত্র পদার্থ থাকে, তাকে **সাইটোসল** বলে। গ্লাইকোলাইসিস্ কোশের সাইটোসলে এবং ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন কোশের মাইটোকনড্রিয়াতে হয়।

(iii) **সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ :** $\underset{\text{(গ্লুকোজ)}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 \xrightarrow[\text{উৎসেচক}]{} 6CO_2 + 6H_2O + \underset{\text{(শক্তি)}}{686 \text{ KCal.}}$
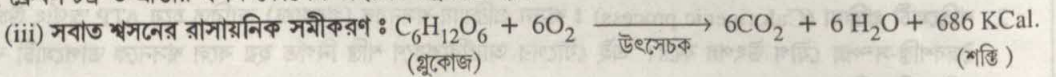
(iv) **উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থের নাম**— সবাত শ্বসনে এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হতে 6-অণু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং জারণের ফলে 6-অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড, 6-অণু জল ও 686 KCal শক্তি উৎপন্ন হয়।

2. অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration) :

❖ **(i) সংজ্ঞা—যে পদ্ধতিতে জীবকোশের শ্বসন বস্তু (গ্লুকোজ) মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া অক্সিজেনযুক্ত অজৈব যৌগের অক্সিজেন দিয়ে অসম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অপর যৌগে পরিণত হয় এবং শ্বসনবস্তু থেকে আংশিক শক্তি নির্গত হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে।**

(ii) **অবাত শ্বসনের স্থান**—অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং কয়েক রকমের প্রাণী, যেমন— মনোসিস্টিস, ফিতাকৃমি, গোলকৃমি প্রভৃতি জীবে অবাত শ্বসন দেখা যায়।

(iii) **অবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ (ব্যাকটেরিয়া কোশে) :**

$$C_6H_{12}O_6 + 12\,NO_3 \rightarrow 12\,NO_2 + 6CO_2 + 6\,H_2O + 50\text{ KCal.}$$
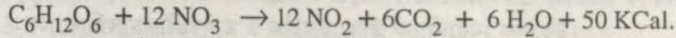
(গ্লুকোজ) (নাইট্রেট যৌগ) (নাইট্রাইট যৌগ)

(iv) **উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থের নাম**— নাইট্রাইট যৌগ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল এবং জৈবশক্তি।

● **সবাত ও অবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Aerobic and Anaerobic respirations) :**

সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
1. সবাত শ্বসন মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে।	1. অবাত শ্বসন অক্সিজেনযুক্ত যৌগের উপস্থিতিতে ঘটে।
2. বায়ুজীবী জীবে এই প্রক্রিয়াটি হয়।	2. অবায়ুজীবী জীবে এই প্রক্রিয়াটি হয়।
3. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি গ্লাইকোলাইসিস্, ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন নামে তিনটি পর্যায়ে শেষ হয়।	3. এই প্রক্রিয়ার মূল বিক্রিয়াটি হল গ্লাইকোলাইসিস্।
4. সবাত শ্বসনের প্রথম পর্যায় গ্লাইকোলাইসিস্ সাইটোসলে এবং ক্রেবস চক্র ও প্রান্তীয় শ্বসন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় মাইটোকনড্রিয়াতে সংঘটিত হয়।	4. অবাত শ্বসনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সাইটোসলে ঘটে।
5. উৎপন্ন বস্তুগুলি হল — $CO_2 + H_2O +$ শক্তি।	5. উৎপন্ন বস্তুগুলি হল — অক্সিজেনযুক্ত যৌগ (নাইট্রেট) $+ CO_2 + H_2O +$ শক্তি।
6. প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে 686 KCal শক্তি উৎপন্ন করে।	6. প্রতি গ্রাম-অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে 50 KCal শক্তি উৎপন্ন করে।

চিত্র 9.2 : মাইটোকনড্রিয়া

➤ **বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী জীব (Aerobes and Anaerobes) :**

1. **বায়ুজীবী জীব**— যেসব জীব বাতাসের (পরিবেশের) অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না, তাদেরকে **বায়ুজীবী জীব** বলে। **উদাহরণ**— অ্যামিবা, উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণী।

2. **অবায়ুজীবী জীব**— যেসব জীব বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে তাদের **অবায়ুজীবী জীব** বলে। **উদাহরণ**— ঈস্ট, মনোসিস্টিস, গোলকৃমি, ফিতাকৃমি প্রভৃতি। অবায়ুজীবী জীব দু'রকমের হয় : (i) **সম্পূর্ণ অবায়ুজীবী**—যে সব জীবের বাঁচার জন্য O_2-এর আদৌ প্রয়োজন হয় না তাদের সম্পূর্ণ অবায়ুজীবী বলে। (ii) **অসম্পূর্ণ অবায়ুজীবী**—যে সব অবায়ুজীবী জীব O_2-এর উপস্থিতিতেও বেঁচে থাকে তাদের অসম্পূর্ণ অবায়ুজীবী বলে।

▲ শ্বসন পদ্ধতি (প্রক্রিয়া) (Process of Respiration) :

কোশের ভিতরে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে গ্লুকোজ হল মুখ্য শ্বসন বস্তু। বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে বিভিন্ন জৈব-যৌগের মাধ্যমে গ্লুকোজের জারণ সম্পূর্ণ হয়। গ্লুকোজের জারণ পদ্ধতি গ্লাইকোলাইসিস্, পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ, ক্রেবস চক্র এবং প্রান্তীয় শ্বসন-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়।

(i) **গ্লাইকোলাইসিস্ (Glycolysis) :** যে প্রক্রিয়ায় কোশের সাইটোসলে বিভিন্ন রকমের উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ আংশিকভাবে জারিত হয়ে 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, 2 অণু $NADH+H^+$, 2 অণু H_2O ও 2 অণু ATP উৎপন্ন করে তাকে **গ্লাইকোলাইসিস্** বলে। এটি শ্বসনের প্রথম পর্যায়।

(ii) **পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ (Oxidation of Pyruvic acid) :** যে প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিড জারিত হয়ে অ্যাসিটাইল CoA-তে পরিণত হয় তাকে পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ বলে। পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় বলে এই প্রকার জারণকে **ডিকার্বোক্সিলেশন জারণ** (Oxidative Decarboxylation) **বলে।**

(iii) **ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) :** কোশের মাইটোকনড্রিয়ায় বিভিন্ন উৎসেচক ও জৈব যৌগের (হাইড্রোজেন বাহক-NAD ও FAD) সাহায্যে যে চক্রাকার বিক্রিয়াপথে হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয় এবং

কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে তাকে বিজ্ঞানী ক্রেবসের নামানুসারে **ক্রেবস চক্র** (Krebs cycle) বলে। এটি শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়।

(iv) **প্রান্তীয় শ্বসন (Terminal respiration) ঃ** যে প্রক্রিয়ায় মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় ঘটিত গ্লুকোজের অপচিতির সময় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ফলে ATP নির্গত হয় তাকে **প্রান্তীয় শ্বসন** বলে। এটি শ্বসন পদ্ধতির শেষ পর্যায়। ক্রেবস চক্রে উৎপন্ন বিজারিত NAD^+ ($NADH+H^+$) ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয়ে শেষে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জল উৎপন্ন করে। ইলেকট্রন স্থানান্তরের ফলে যে বিভব পার্থক্য (Potential difference) তৈরি হয় তার জন্য উৎপাদিত শক্তি ATP সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

❂ ক্ষয়, সন্ধান ও শটন (Decay, Fermentation and Putrefaction) ❂

1. **ক্ষয় (Decay) ঃ** যে-কোনো জৈব বস্তুকে যদি সবাত অণুজীব অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত করে ভেঙে ফেলে তাহলে তাকে **ক্ষয়** বা ডিকে (Decay) বলে।
2. **সন্ধান (Fermentation) ঃ** সজীব কোশের একপ্রকার অবাত জারণ প্রক্রিয়াকে **সন্ধান** বা **ফারমেনটেশন** বলে। এই প্রক্রিয়ায় অণুজীব কার্বোহাইড্রেটকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জারিত করে ভেঙে ফেলে তাপ শক্তি, বর্জ্য গ্যাস ও জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে।
3. **শটন (Putrefaction) ঃ** অবাত ব্যাকটেরিয়া যদি অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব বস্তুকে (প্রধানত প্রোটিনকে) ভেঙে ফেলে তবে তাকে **শটন** বা **পচন** বলে। এর ফলে প্রোটিন ভেঙে H_2S (দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস), NH_3, CO_2, H_2 এবং জৈব অ্যাসিডে পরিণত হয়।

❂ 9.1. গ্লাইকোলাইসিস্ এবং ক্রেবস চক্রের পদ্ধতি ❂
(Mechanism of Glycolysis and Krebs cycle)

▲ A. গ্লাইকোলাইসিস্ (Glycolysis)

● গ্লাইকোলাইসিসের সংজ্ঞা, প্রক্রিয়া, উৎপন্ন বস্তু এবং তাৎপর্য (Definition, Process, End products and Significance of Glycolysis) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ শ্বসনের সময় যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন ছাড়াই কোশের সাইটোসলে গ্লুকোজ ধাপে ধাপে ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড, $NADH+H^+$, H_2O এবং ATP-তে পরিণত হয় তাকে গ্লাইকোলাইসিস্ বলে।**

প্রক্রিয়া আবিষ্কারকদের নাম অনুযায়ী গ্লাইকোলাইসিস্ **এমডেন-মায়ারহফ-প্যারনাস বিক্রিয়াপথ** (Embden–Meyerhof–Parnas Pathway) সংক্ষেপে **EMP Pathway** নামে পরিচিত। গ্লাইকোলাইসিস্ পদ্ধতির বিক্রিয়াগুলি বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে।

◘ (b) **গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ার বর্ণনা (Description of process of Glycolysis) ঃ**

(i) গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ার আরম্ভে শ্বসনবস্তু **গ্লুকোজ**, ATP এবং **হেক্সোকাইনেজ** (গ্লুকোকাইনেজ) উৎসেচকের সাহায্যে **গ্লুকোজ-6-ফসফেট** যৌগ ও ADP উৎপন্ন করে।

$$\text{গ্লুকোজ} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{হেক্সোকাইনেজ}} \text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} + \text{ADP}$$
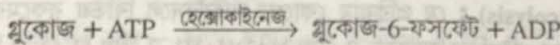
(ii) গ্লুকোজ-6-ফসফেট **ফসফোহেক্সো আইসোমারেজ** উৎসেচকের সহায়তায় **ফ্রুকটোজ-6-ফসফেটে** পরিণত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} \xrightleftharpoons{\text{ফসফোহেক্সো আইসোম্যারেজ}} \text{ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট}$$
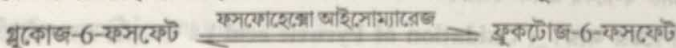
(iii) **ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট** আবার **ফসফোহেক্সোকাইনেজ** উৎসেচক এবং ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে **ফ্রুকটোজ-1, 6 বিসফসফেট** নামে ছয়-কার্বনযুক্ত (6C) যৌগ ও ADP উৎপন্ন করে।

$$\text{ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{ফসফোফ্রুকটোকাইনেজ}} \text{ফ্রুকটোজ-1, 6-বিসফসফেট} + \text{ADP}$$
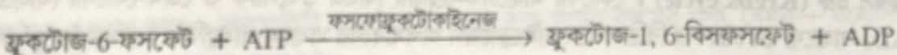
(iv) **ফ্রুকটোজ-1, 6 বিস্‌ফসফেট** এরপর **অ্যালডোলেজ** উৎসেচক দিয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে দুটি তিন-কার্বনযুক্ত (3C) যৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগ দুটি হল **3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ও ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট।**

ফ্রুকটোজ-1, 6 বিস্‌ফসফেট $\xrightleftharpoons{\text{অ্যালডোলেজ}}$ ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট + 3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড

এই দুটি যৌগ আবার **আইসোমারেজ** উৎসেচক দিয়ে উভয়েই একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হয়।

গ্লাইকোলাইসিসের পরের বিক্রিয়া 3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড থেকে চলতে থাকে।

(v) **3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজ** উৎসেচকের প্রভাবে এবং **অজৈব ফসফেটের** উপস্থিতিতে এরপর **3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড** জারিত হয় এবং **1, 3-বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় NAD হাইড্রোজেন (ইলেকট্রন) বাহকের কাজ করে, ফলে NAD বিজারিত হয়ে $NADH+H^+$-তে পরিণত হয়।

3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড + Pi + NAD $\xrightleftharpoons[\text{ডিহাইড্রোজেনেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসারালডিহাইড}}$ 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + NADH + H^+

(vi) **1, 3-বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** ও ADP-র রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এবং **ফসফোগ্লিসারিক কাইনেজ** উৎসেচকের প্রভাবে **3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** এবং ATP উৎপন্ন হয়।

1-3 -বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP $\xrightleftharpoons[\text{কাইনেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসারিক}}$ 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ATP

(vii) **3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** এরপর **মিউটেজ** উৎসেচকের সাহায্যে **2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে** পরিণত হয়।

3 -ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons[\text{মিউটেজ}]{\text{ফসফোগ্লিসেরো}}$ 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

(viii) **এনোলেজ** উৎসেচকের প্রভাবে **2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড** থেকে জল (H_2O) অপসারিত হলে **2-ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড** উৎপন্ন হয়।

2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড $\xrightleftharpoons{\text{এনোলেজ}}$ 2-ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড + জল (H_2O)

(ix) শেষ বিক্রিয়াতে **পাইরুভিক কাইনেজ** উৎসেচকের প্রভাবে **2-ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড** এবং ADP-র বিক্রিয়ায় **পাইরুভিক অ্যাসিড** ও ATP উৎপন্ন হয়।

2-ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড + ADP $\xrightleftharpoons[\text{কাইনেজ}]{\text{পাইরুভিক}}$ পাইরুভিক অ্যাসিড + ATP

(c) গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুসমূহ (End products of Glycolysis) :

অবাত শ্বসনের সময় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ থেকে **দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, 2 অণু $NADH+H^+$, 2 অণু H_2O** এবং **2 অণু ATP** উৎপন্ন হয়।

(d) গ্লাইকোলাইসিসের তাৎপর্য (Significance of Glycolysis) :

1. গ্লাইকোলাইসিসের বিভিন্ন বিক্রিয়ার শেষে যে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তা ক্রেবস চক্রের এবং ফারমেনটেশন সাবস্ট্রেট বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
2. গ্লাইকোলাইসিসে প্রত্যেকটি গ্লুকোজ অণুর জারণে 2 টি ধাপে সরাসরি ATP অণু পাওয়া যায়।
3. গ্লাইকোলাইসিসের উপজাত ডাই-হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট স্নেহপদার্থের বিপাকের সঙ্গে শর্করা-জাতীয় পদার্থের বিপাকের সংযোগ স্থাপন করে।
4. গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড একটি অপরিহার্য কিটো অ্যাসিড। এর থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে।
5. এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একাধিক অন্তর্বর্তী পদার্থ জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে প্রয়োজন।

চিত্র 9.3 : গ্লাইকোলাইসিস্ পদ্ধতি।

❂ পাইরুভিক অ্যাসিড (Pyruvic Acid) :

(a) পাইরুভিক অ্যাসিড 3-কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিড (কিটো অ্যাসিড) যা গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কোশের সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে উৎপন্ন হয়।

উৎপন্ন হওয়ার পর পাইরুভিক অ্যাসিড সন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রাণীর পেশিতে **ল্যাকটিক অ্যাসিড**, উদ্ভিদে **ইথাইল অ্যালকোহলে** এবং সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে $CO_2 + H_2O$ এবং **জৈবশক্তি (ATP)** উৎপন্ন করে।

(b) পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি (Fate of Pyruvic acid) :

1. **সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড** $6CO_2 + 6H_2O$ + বেশি গতিশক্তি উৎপন্ন করে।

2. **অবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড** $6CO_2 + 6H_2O + 12NO_2$ + কম গতিশক্তি উৎপন্ন করে।

3. **ফারমেনটেশন প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে নিম্নলিখিত পদার্থ উৎপন্ন হয়;** (i) উদ্ভিদদেহে—ইথাইল অ্যালকোহল + $2CO_2$ + গতিশক্তি।
(ii) প্রাণীদেহ — ল্যাকটিক অ্যাসিড + গতিশক্তি।

(c) পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেটিভ ডিকার্বোক্সিলেশন (Oxidative decarboxylation of Pyruvic acid) : বিজ্ঞানী **লাইনেন** (Lynen) 1951 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করেন। এই পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলি **জটিল প্রকৃতির বহু উৎসেচকের (Multi enzyme complex)** সাহায্যে ঘটে থাকে। প্রতিটি বিক্রিয়া কতকগুলি সহ-উৎসেচক এবং কয়েকটি ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল।

পাইরুভিক অ্যাসিড + CoA SH + NAD $\rightarrow$ অ্যাসিটাইল CoA + CO_2 + NADH + H^+
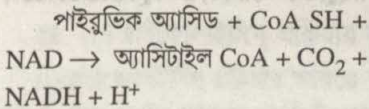
পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণের জন্য পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেজ, সহ-উৎসেচক এবং ফ্যাক্টরগুলি হল—থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP), লিপোয়িক অ্যাসিড, কোএনজাইম-এ (CoA-SH) এবং NAD^+। এই পর্যায়ের বিক্রিয়ায় 3-কার্বনযুক্ত **পাইরুভিক অ্যাসিড** 2-কার্বনযুক্ত **অ্যাসিটাইল কো-এ** এবং **কার্বন ডাইঅক্সাইড** উৎপন্ন করে।
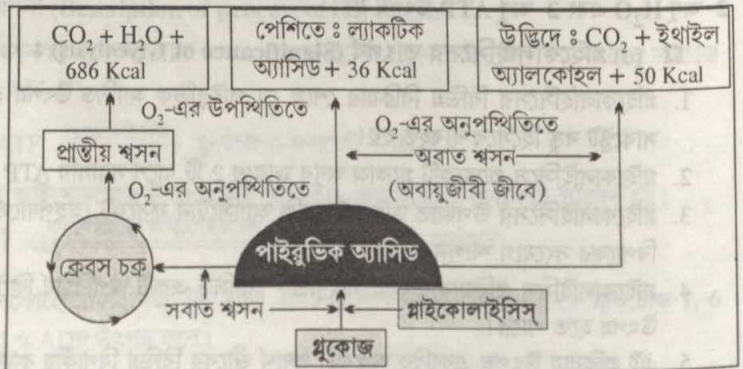
চিত্র 9.4 : পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতির ছক।

▲ B. ক্রেবস চক্র (Krebs Cycle) বা ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বা TCA চক্র

● **ক্রেবস চক্রের সংজ্ঞা, বিক্রিয়াস্থল, বিক্রিয়া পথ এবং গুরুত্ব (Definition, Site of reaction and path and Significance of Krebs cycle) ঃ**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ** যে প্রক্রিয়ায় দেহে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল কো-এ বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় চক্রাকারে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও বিজারিত হাইড্রোজেন বাহক উৎপন্ন করে তাকে ক্রেবস চক্র বা ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (সংক্ষেপে TCA চক্র) বলে।

ক্রেবস চক্র বা TCA চক্র বলার কারণ— (i) বৈজ্ঞানিক **এইচ. এ. ক্রেবস** (H. A. Krebs) 1937 খ্রিস্টাব্দে এই চক্রটির বিক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এই চক্রকে **ক্রেবস চক্র** (Krebs cycle) বলা হয়।

(ii) **TCA চক্র বলার কারণ**— এই চক্রের প্রথম উৎপাদিত যৌগটি হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড, তাই এই চক্রটিকে **সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র** (Citric acid cycle) বলে। সাইট্রিক অ্যাসিডে তিনটি কার্বক্সিল গ্রুপ (–COOH) থাকায় একে Tricarboxylic acid cycle সংক্ষেপে **TCA চক্রও** বলা হয়।
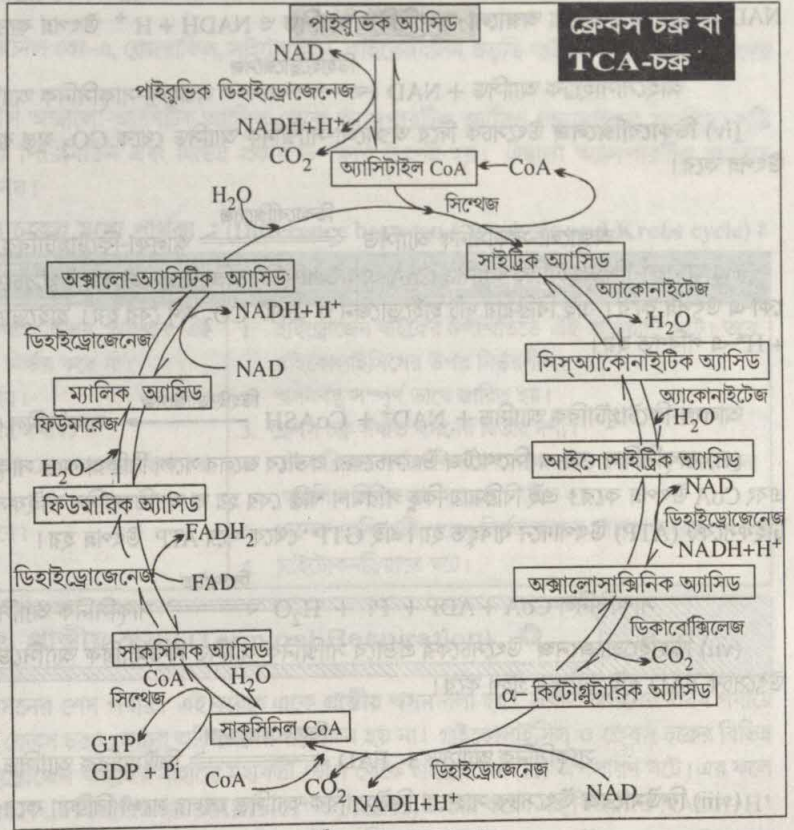
চিত্র 9.5 ঃ ক্রেবস চক্র।

◘ (b) **ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াস্থল (Site of reaction) ঃ** ক্রেবস চক্রের সমস্ত বিক্রিয়াগুলি কোশের **মাইটোকনড্রিয়ায়** সম্পন্ন হয়।

◘ (c) **ক্রেবস চক্রের পদ্ধতি (Mechanism of Krebs cycle) ঃ** সবাত শ্বসনের ফলে পাইরুভিক অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কো-এ এতে পরিণত হয়। এই অ্যাসিটাইল কো-এ মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে যায় এবং চক্রাকার বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ জারিত হয়। চিত্র 9.2 ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলি ছকের সাহায্যে বর্ণনা করা হল —

(i) অ্যাসিটিল কো-এ **সাইট্রেট সিন্থেজ** উৎসেচক ও H_2O-এর উপস্থিতিতে চক্রাকারে উৎপন্ন **অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডের** সঙ্গে যুক্ত হয়ে **সাইট্রিক অ্যাসিড** এবং CoA উৎপন্ন করে।

$$\text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড + অ্যাসিটিল কো-এ} + H_2O \xrightarrow{\text{কন্ডেনসিং উৎসেচক}} \text{সাইট্রিক অ্যাসিড + CoA}$$
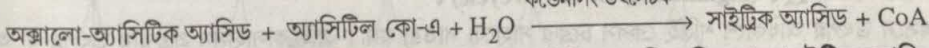
(ii) এই ধাপে **অ্যাকোনাইটেজ** উৎসেচকের উপস্থিতিতে সাইট্রিক অ্যাসিড **সিস্অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিডে** রূপান্তরিত হয় এবং পরের বিক্রিয়ায় একই উৎসেচকের প্রভাবে জল বিয়োজনের মাধ্যমে **সিস্অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড আইসোসাইট্রিক অ্যাসিডে** পরিণত হয়।

$$\text{সাইট্রিক অ্যাসিড} \xrightleftharpoons{\text{অ্যাকোনাইটেজ}} \text{সিস্অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড} + H_2O$$

$$\text{সিসঅ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightleftharpoons{\text{অ্যাকোনাইটেজ}} \text{আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড}$$
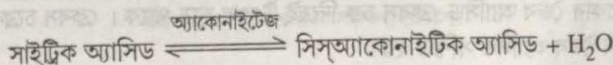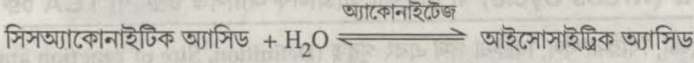
(iii) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড এরপর **ডিহাইড্রোজেনেজ** (আইসোসাইট্রিক ডিহাইড্রোজিনেজ) উৎসেচক ও সহ-উৎসেচক NAD প্রভাবে জারিত হয়ে **অক্সালো-সাক্‌সিনিক অ্যাসিড** ও $NADH + H^+$ উৎপন্ন করে।

$$\text{আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড} + NAD \xrightleftharpoons{\text{ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{অক্সালো-সাক্‌সিনিক অ্যাসিড} + NADH + H^+$$
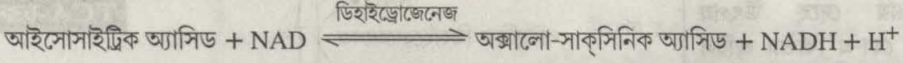
(iv) **ডিকার্বোক্সিলেজ** উৎসেচক দিয়ে অক্সালো-সাক্সিনিক অ্যাসিড থেকে CO_2 মুক্ত করে **আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে।

$$\text{অক্সালো-সাক্‌সিনিক অ্যাসিড} \xrightleftharpoons{\text{ডিকার্বোক্সিলেজ}} \text{আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড} + CO_2$$
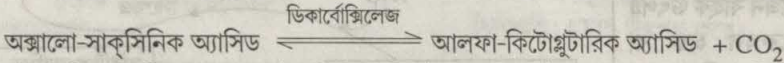
(v) আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড CoA-এর উপস্থিতিতে **ডিহাইড্রোজেনেজ** উৎসেচকের প্রভাবে জারিত হয়ে **সাক্‌সিনিল কো-এ** উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় দুটি হাইড্রোজেন ও একটি CO_2 অণু বের হয়। হাইড্রোজেনকে NAD^+ গ্রহণ করে $NADH + H^+$-এ পরিণত হয়।

$$\text{আলফা-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড} + NAD^+ + CoASH \xrightarrow{\text{ডিহাইড্রোজিনেজ}} \text{সাক্‌সিনিল } CoA^- + NADH + H^+ + CO_2$$
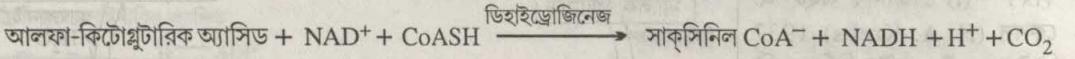
(vi) সাক্‌সিনিল কো-এ **সিন্থেটেজ** উৎসেচকের প্রভাবে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাক্‌সিনিল কো-এ **সাক্‌সিনিক অ্যাসিড** এবং CoA উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ শক্তি বের হয় যা অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (ADP) থেকে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই GTP থেকে পরে ATP উৎপন্ন হয়।

$$\text{সাক্‌সিনিল } CoA + ADP + Pi + H_2O \xrightleftharpoons{\text{সিন্থেটেজ}} \text{সাক্‌সিনিক অ্যাসিড} + ATP + CoA$$
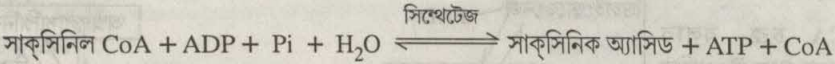
(vii) **ডিহাইড্রোজেনেজ** উৎসেচকের প্রভাবে সাক্সিনিক অ্যাসিড **ফিউম্যারিক অ্যাসিডে** রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় সহ-উৎসেচক FAD হাইড্রোজেন গ্রহণ করে।

$$\text{সাক্‌সিনিক অ্যাসিড} + FAD \xrightleftharpoons{\text{ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{ফিউম্যারিক অ্যাসিড} + FADH_2$$
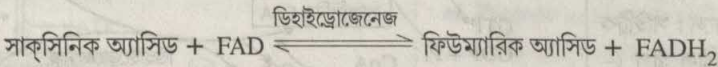
(viii) **ফিউমারেজ** উৎসেচক সাহায্যে ফিউম্যারিক অ্যাসিড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে **ম্যালিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে।

$$\text{ফিউম্যারিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightleftharpoons{\text{ফিউম্যারেজ}} \text{ম্যালিক অ্যাসিড}$$
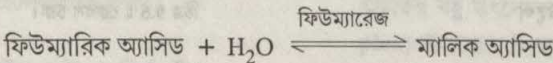
(ix) ম্যালিক অ্যাসিড **ডিহাইড্রোজেনেজ** উৎসেচক দিয়ে জারিত হয়ে **অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিডে** রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে NAD গ্রহণ করে $NADH + H^+$ এ পরিণত হয়।

$$\text{ম্যালিক অ্যাসিড} + NAD \xrightleftharpoons{\text{ডিহাইড্রোজেনেজ}} \text{অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড} + NADH + H^+$$
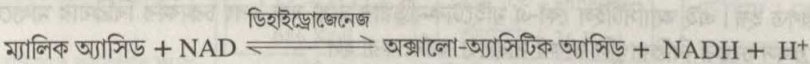
এরপর অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড আবার নতুন একটি অ্যাসিটাইল CoA-কে ক্রেবস চক্রে যাওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং একই পদ্ধতিতে আবার চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে ক্রেবস চক্র হতে থাকে।

◘ (d) ক্রেবস চক্রের গুরুত্ব (Significance of Krebs cycle) :

(i) অবাত শ্বসনে উৎপন্ন অধিকাংশ শক্তিই ক্রেবস চক্রের সাহায্যে পাওয়া যায়। গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দু' অণু পাইরুভিক অ্যাসিড এই চক্রের মাধ্যমে জারিত হওয়ার সময় বিজারিত হাইড্রোজেন বাহক $NADH+H^+$ এবং $FADH_2$ উৎপন্ন করে তা প্রান্তীয় শ্বসনে জারিত হয়ে 24 অণু ATP উৎপন্ন করে। ATP বিশ্লেষিত হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে তার সাহায্যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ যথা— শোষণ, পরিবহন, বৃদ্ধি, চলন, জনন প্রভৃতি কাজ হয়।

(ii) উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড ক্রেবস চক্র দিয়েই উৎপন্ন হয়ে থাকে। ক্রেবস চক্রের অসম্পূর্ণ জারণের ফলেই কোশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জৈব অ্যাসিড সঞ্চিত হয়।

(iii) ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন ধাপে উৎপন্ন জৈব অ্যাসিডগুলি সাধারণভাবে উদ্ভিদের জৈব অ্যাসিড বিপাকে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(iv) ক্রেবস চক্রের সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রস্তুতির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন ধাপে উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিড, α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড এবং অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(v) এই চক্রের উৎপন্ন যৌগ সাক্সিনিল কো-এ, ক্লোরোফিল, সাইটোক্রোম, ফাইকোবিলিন প্রভৃতি পাইরল যৌগের সংশ্লেষণের কাজে লাগে।

(vi) ক্রেবস চক্রের অন্তর্বর্তী যৌগ অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিড (অ্যামাইনো অ্যাসিড) সৃষ্টি হয়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পিরিমিডিন এবং বিভিন্ন প্রকার উপক্ষার উৎপন্ন হয়। এছাড়া অ্যাসপারটিক অ্যাসিড প্রাণীদেহে ইউরিয়া সংশ্লেষণে অংশ নেয়।

● **গ্লাইকোলাইসিস্ ও ক্রেবস চক্রের মধ্যে পার্থক্য : (Difference between Glycolysis and Krebs cycle) :**

গ্লাইকোলাইসিস্	ক্রেবস চক্র
1. অক্সিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় এই প্রক্রিয়াটি ঘটে, ক্রেবস চক্রের উপর নির্ভর করে না।	1. হাইড্রোজেন বাহকের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। তবে গ্লাইকোলাইসিসের উপর নির্ভরশীল।
2. শ্বসনবস্তু অসম্পূর্ণ ভাবে জারিত হয়।	2. শ্বসনবস্তু সম্পূর্ণ ভাবে জারিত হয়।
3. গ্লাইকোলাইসিস্ সবাত শ্বসনের প্রথম দশা।	3. ক্রেবস চক্র সবাত শ্বসনের দ্বিতীয় দশা।
4. এই প্রক্রিয়ায় শর্করার বিপাকের সঙ্গে স্নেহপদার্থের বিপাকের সংযোগ সাধিত হয়।	4. এই প্রক্রিয়ায় শর্করা বিপাকের সঙ্গে স্নেহ পদার্থ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকের সংযোগ সাধিত হয়।
5. কম পরিমাণ শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে।	5. অনেক বেশি শক্তি (ATP) নির্গত করতে সাহায্য করে।
6. সাইটোপ্লাজমে ঘটে।	6. মাইটোকনড্রিয়াতে ঘটে।

9.2. প্রান্তীয় শ্বসন (Terminal Respiration)

প্রান্তীয় শ্বসন প্রক্রিয়াটি সবাত শ্বসনের শেষ পর্যায়। এই কারণে একে **প্রান্তীয় শ্বসন** বলা হয়। সবাত শ্বসনের প্রথম পর্যায়ে (গ্লাইকোলাইসিস্) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে (ক্রেবস চক্র) কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। গ্লাইকোলাইসিস্ ও ক্রেবস চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে NAD এবং FAD প্রভৃতি **হাইড্রোজেন বাহকের** সাহায্যে মধ্যবর্তী যৌগ থেকে হাইড্রোজেন (H) অপসারণ ঘটে। এর ফলে যৌগগুলি জারিত হয় কিন্তু NAD এবং FAD বিজারিত হয়ে $NADH+H^+$ ও $FADH_2$ উৎপন্ন করে। এই বিজারিত $NADH+H^+$ ও $FADH_2$ মাইটোকনড্রিয়াতে যে তন্ত্রের মাধ্যমে জারিত হয় তাকে **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (Electron Transport System সংক্ষেপে ETS)** বলে। জারণের সময় অক্সিজেন (O_2)-এর প্রয়োজন হয়। (এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিজারিত বাহকগুলির হাইড্রোজেন (H^+) সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না)।
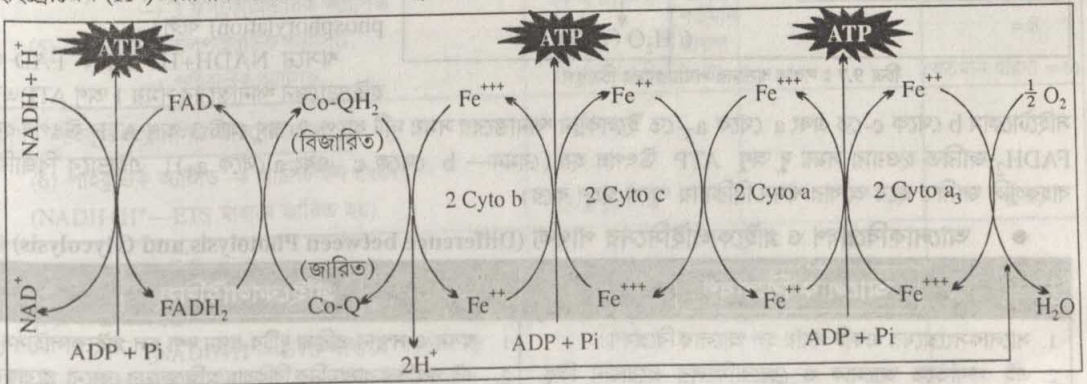
চিত্র 9.6 : প্রান্তীয় শ্বসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

$NADH+H^+$ ও $FADH_2$ ইলেকট্রন পরিবহনতন্ত্রে জারণের সময় হাইড্রোজেন আয়ন ধাত্র বা ম্যাট্রিক্সে (Matrix) নির্গত হয় এবং প্রত্যেক জোড়া ইলেকট্রন পরিবহনতন্ত্রের বাহকগুলি দিয়ে পরিবাহিত হয়ে এই তন্ত্রের (Electron Transport System or ETS) প্রান্তে পৌঁছায়। এখানে প্রতি অক্সিজেন পরমাণু এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং শেষে এক জোড়া হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **জল** (H_2O) উৎপন্ন করে।

ইলেকট্রন পরিবহনতন্ত্র (ETS) লৌহঘটিত কয়েক রকমের **সাইটোক্রোম** (Cytochrome–b, c, a, a_3) দিয়ে গঠিত এবং একসারিতে সাজানো থাকে।

● **প্রান্তীয় শ্বসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (Steps of Terminal Respiration) ঃ**

(i) শ্বসনের বিভিন্ন ধাপে NAD ও FAD শ্বসন বস্তু থেকে দুটি হাইড্রোজেন আয়ন ও দুটি ইলেকট্রন (e^-) গ্রহণ করে বিজারিত হয়।

$$NAD + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NADH+H^+ ;\ FAD + 2H^+ + 2e^- \rightarrow FADH_2$$
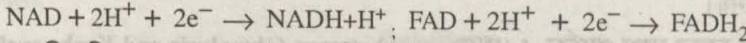
(ii) বিজারিত $NADH+H^+$ অন্য একটি বাহক FAD-এর সংস্পর্শে এসে এর হাইড্রোজেনকে FAD-এতে স্থানান্তরিত করে ও নিজে আবার NAD-এতে পরিণত হয়। FAD বিজারিত হয়ে $FADH_2$-তে পরিণত হয়।

$$NADH+H^+ + FAD \rightarrow FADH_2 + NAD$$
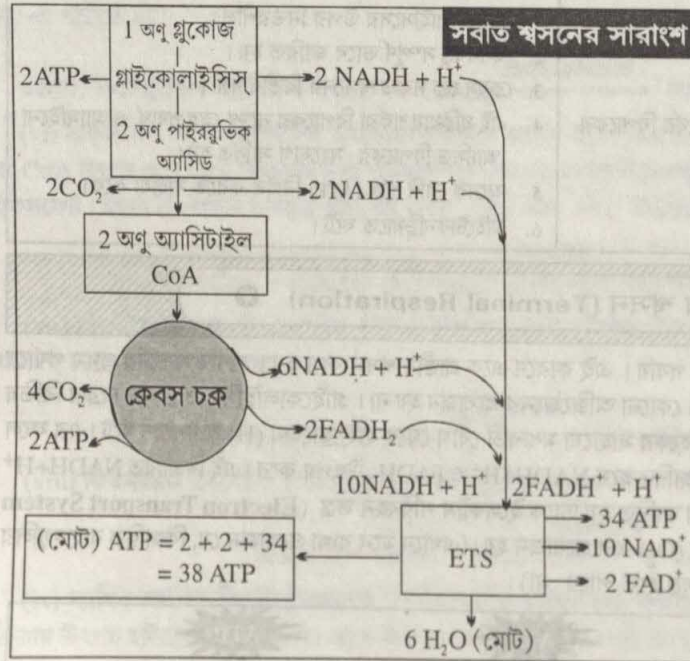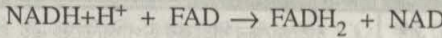
চিত্র 9.7 ঃ সবাত শ্বসনের পর্যায়ক্রমের চিত্ররূপ।

(iii) এর পর $FADH_2$ থেকে বিচ্যুত হাইড্রোজেন অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ($2H^+$) ও ইলেকট্রনে ($2e^-$) পরিণত হয়। হাইড্রোজেন আয়ন মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে (Matrix) মুক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইলেকট্রন পরের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহক যেমন—সাইটোক্রোম **b, c, a, a_3** দিয়ে পর পর স্থানান্তরিত হয়ে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ উৎসেচকের প্রভাবে আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শেষে হাইড্রোজেন আয়ন, ইলেকট্রন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে **জল** উৎপন্ন করে।

(iv) ইলেকট্রন একটি বাহক থেকে অন্য বাহকে স্থানান্তরের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি ADP ও Pi (অজৈব ফসফেট) গ্রহণ করে যুক্ত হয়ে ATP তৈরি করে। জারণ পদ্ধতির মাধ্যমে এইভাবে ATP সৃষ্টিকে **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশান** (Oxidative phosphorylation) বলে।

শ্বসনে $NADH+H^+$ থেকে FAD-তে হাইড্রোজেন স্থানান্তরের সময় 1 অণু ATP এবং সাইটোক্রোম b থেকে c-তে এবং a থেকে a_3-তে ইলেকট্রন স্থানান্তরের সময় দুটি ধাপে 2 অণু মোট 3 অণু ATP উৎপন্ন হয়। $FADH_2$-জারিত হওয়ার সময় দু অণু ATP উৎপন্ন হয় (যেমন— b থেকে c এবং a থেকে a_3)। এইভাবে বিজারিত বাহকগুলি জারিত হয়ে আবার শ্বসন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

● **আলোকবিশ্লেষণ ও গ্লাইকোলাইসিসের পার্থক্য (Difference between Photolysis and Glycolysis) ঃ**

আলোক বিশ্লেষণ	গ্লাইকোলাইসিস্
1. সালোকসংশ্লেষের একটি পর্যায় হল আলোক বিশ্লেষণ।	1. শ্বসন ও সন্ধান প্রক্রিয়া দুটির প্রথম দশা হল গ্লাইকোলাইসিস্।
2. এই পদ্ধতিতে আলোক ও ক্লোরোফিলের প্রয়োজন কিন্তু কোনো উৎসেচক প্রয়োজন হয় না।	2. এই পদ্ধতির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন হয় না কিন্তু উৎসেচকের প্রয়োজন হয়।

আলোক বিশ্লেষণ	গ্লাইকোলাইসিস্
3. **সমীকরণ**—আলোক শক্তির সাহায্যে জল (H_2O) হাইড্রোজেন (H^+) ও হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নে বিশ্লেষিত হওয়াকে আলোকবিশ্লেষণ বলে। একে হিল বিক্রিয়াও বলা হয়। $H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} 2H^+ + \frac{1}{2}O_2$	3. **সমীকরণ** — এই দশায় শ্বসন বস্তু গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) কোশের সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, 2 অণু ATP, 2 অণু জল ও 2 অণু NADH+H^+ উৎপন্ন করে। গ্লুকোজ + 2NAD + 2ADP + 2 Pi → 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড + 2NADH+H^+ + 2ATP + 2 H_2O

▲ ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট—Adenosine Triphosphate) :

ATP-এর পুরো নাম অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। এটি একটি উচ্চ জৈবশক্তি সম্পন্ন জৈবযৌগ। অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট (AMP) নামে নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে পর পর দু'অণু ফসফেট উচ্চ জৈবশক্তি বন্ধনী (~) দিয়ে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে প্রথমে **অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট** (ADP) এবং পরে **অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট** (ATP) উৎপন্ন করে। অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট এবং ডাইফসফেটের সঙ্গে ফসফেট যুক্ত হওয়ার সময় প্রতিবারে প্রায় 7 KCal শক্তির প্রয়োজন হয়। ATP = AMP ~ P ~ P (~ জৈবশক্তির বন্ধনী)। প্রতিটি বন্ধনী (Bonds) থেকে প্রায় 8,000 KCal শক্তি উৎপন্ন হয়।

ATP-প্রধান কাজ— কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের বিপাকে এবং জীবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য দেহে যে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয় তা ATP থেকে পাওয়া যায়। ATP প্রথমে ADP এবং পরে AMP-তে পরিণত হয় ও জৈব শক্তি উৎপন্ন করে।

▲ ATP, H_2O, O_2 এবং CO_2-এর হিসেব :

● I. সবাত শ্বসনে ATP তৈরির হিসেব :

বিক্রিয়া	উৎপাদিত ATP অণু	ব্যবহৃত ATP অণু	মোট ATP লাভ
(a) গ্লাইকোলিসিস্ প্রক্রিয়ার ফলে			
(1) গ্লুকোজ → গ্লুকোজ-6-ফসফেট		= 1	
(2) ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট → ফ্রুকটোজ 1-6 বিস্‌ফসফেট		= 1	
(3) 3 ফসফোগ্লিসারালডিহাইড → 1, 3-বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (NADH+H^+—ETS মাধ্যমে জারিত হয়)	(3 × 2) = 6 [বর্তমান ধারণা (2×2)=4]		
(4) 1, 3-বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড → 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড	(1 × 2) = 2		
(5) 2 ফসফোইনোলপাইরুভিক অ্যাসিড → পাইরুভিক অ্যাসিড	(1 × 2) = 2 } = 10 (বর্তমান ধারণা = 8)		= 8 (বর্তমান ধারণা = 6)
(b) পাইরুভিক অ্যাসিড জারণের ফলে			
(6) পাইরুভিক অ্যাসিড → অ্যাসিটাইল CoA (NADH+H^+—ETS মাধ্যমে জারিত হয়)	(3 × 2) = 6	—	= 6
(c) ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়ার ফলে			
(7) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড → অক্সালো-সাক্সিনিক অ্যাসিড (NADH+H^+—ETS মাধ্যমে জারিত হয়)	(3 × 2) = 6		
(8) α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড → সাক্সিনাইল CoA (NADH+H^+—ETS মাধ্যমে জারিত হয়)	(3 × 2) = 6		

বিক্রিয়া	উৎপাদিত ATP অণু	ব্যবহৃত ATP অণু	মোট ATP লাভ
(9) সাক্‌সিনিক অ্যাসিড → ফিউমারিক অ্যাসিড ($FADH_2$—ETS মাধ্যমে জারিত হয়) (10) ম্যালিক অ্যাসিড → অক্সালো-অ্যাসিডিক অ্যাসিড ($NADH+H^+$—ETS মাধ্যমে জারিত হয়) (11) সাক্সিনাইলকোএ → সাক্‌সিনিক অ্যাসিড	$(2 \times 2) = 4$ $(3 \times 2) = 6$ $(1 \times 2) = 2$ $= 24$		$= 24$
মোট ATP উৎপন্ন	$= 40$	$= -2$	$= 38$ (বর্তমান ধারণা = 36)

1. **গ্লাইকোলাইসিস্ প্রক্রিয়ায়**— 4 অণু ATP উৎপন্ন হয় এবং 2 অণু ATP ব্যয় হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় মোট $4 - 2 = 2$ অণু ATP লাভ হয়।

2. **ক্রেবস চক্রে** —সরাসরি 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়।

3. **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রের (ETS) মাধ্যমে**— 10 অণু $NADH + H^+$ ও 2 অণু $FADH_2$ জারিত হয়, এই জারণে প্রতি অণু $NADH + H^+$ থেকে 3 অণু ATP এবং প্রতি অণু $FADH_2$ থেকে 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়। সুতরাং 10 অণু $NADH + H^+$ থেকে $10 \times 3 = 30$ অণু ATP এবং 2 অণু $FADH_2$ থেকে $2 \times 2 = 4$ অণু ATP উৎপন্ন হয়। এভাবে ETS-এর মাধ্যমে মোট 34 অণু (বর্তমান ধারণা = 32 অণু) ATP উৎপাদিত হয়। গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন $NADH + H^+$ (যেহেতু মাইটোকনড্রিয়ার বাইরে এর থেকে উৎপন্ন ATP = 2টি অর্থাৎ ETS-এর মাধ্যমে 32 অণু ATP উৎপন্ন হয়।)

II. শ্বসনে নির্গত এবং ব্যবহৃত জলের হিসেব ঃ

বিক্রিয়ার ধাপ	নির্গত জল	বিক্রিয়ার ধাপ	ব্যবহৃত জল
(a) গ্লাইকোলাইসিস্			
(1) 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড → 2 ফসফোইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড	2 মোল	(1) 3-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড → 1,3 বিস্‌ফসফোগ্লিসারালডিহাইড	2 মোল
(2) 1, 3 বিস্‌ফসফোগ্লিসারালডিহাইড → 1, 3 বিস্‌ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (ETS মাধ্যমে)	2 মোল		
(b) পাইরুভিক অ্যাসিড			
পাইরুভিক অ্যাসিড→ অ্যাসিটাইল CoA (ETS মাধ্যমে)	2 মোল		
(c) ক্রেবস চক্র			
(1) সাইট্রিক অ্যাসিড → সিস্‌অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড	2 মোল	(1) অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড → সাইট্রিক অ্যাসিড	2 মোল
(2) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড → অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড	2 মোল	(2) সিসঅ্যাকোনাইটিক অ্যাসিড → আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড	2 মোল
(3) আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড → সাক্‌সিনাইল CoA (ETS মাধ্যমে)	2 মোল	(3) সাকসিনাইল CoA → সাকসিনিক অ্যাসিড	2 মোল

বিক্রিয়ার ধাপ	নির্গত জল	বিক্রিয়ার ধাপ	ব্যবহৃত জল
(4) সাক্সিনিক অ্যাসিড → ফিউমারিক অ্যাসিড (ETS মাধ্যমে)	2 মোল	(4) ফিউমারিক অ্যাসিড → ম্যালিক অ্যাসিড	2 মোল
(5) ম্যালিক অ্যাসিড → অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ETS মাধ্যমে)	2 মোল		
মোট = 16 মোল গ্লাইকোলাইসিস্, পাইরুভিক অ্যাসিড জারণ এবং ক্রেবস চক্রে নির্গত জলের মোট পরিমাণ = 4 + 2 + 10 =16 মোল		মোট = 10 মোল গ্লাইকোলাইসিস্ এবং ক্রেবস চক্রে ব্যবহৃত সর্বমোট জলের পরিমাণ = 2 + 8 =10 মোল	

অতএব, শ্বসনে অর্জিত জলের পরিমাণ (16 মোল − 10 মোল) = 6 মোল

III. সবাত শ্বসনে ব্যবহৃত অক্সিজেনের (ETC মাধ্যমে) হিসেব ঃ

বিক্রিয়া		পরিমাণ	
(1) 1, 3 বিস্ফসফোগ্লিসারালডিহাইড → 1, 3 বিস্ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড		1 মোল	মোট ব্যবহৃত O_2-এর পরিমাণ = 6 মোল
(2) পাইরুভিক অ্যাসিড → অ্যাসিটাইল CoA		1 মোল	
(3) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড → অক্সালোসাক্সিনিক্ অ্যাসিড	(ক্রেবস চক্র)	1 মোল	
(4) আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড → সাক্সিনাইল CoA	(ক্রেবস চক্র)	1 মোল	
(5) সাক্সিনিক অ্যাসিড → ফিউমারিক অ্যাসিড	(ক্রেবস চক্র)	1 মোল	
(6) ম্যালিক অ্যাসিড → অক্সালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড	(ক্রেবস চক্র)	1 মোল	

IV. শ্বসনে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের হিসেব ঃ

বিক্রিয়া	পরিমাণ	
(1) পাইরুভিক অ্যাসিড → অ্যাসিটাইল CoA	2 মোল	মোট = 6 মোল
(2) অক্সালো-সাক্সিনিক অ্যাসিড → α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড (ক্রেবস চক্রে)	2 মোল	
(3) α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড → সাক্সিনাইল CoA (ক্রেবস চক্রে)	2 মোল	

- **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ও ফোটোফসফোরাইলেশনের পার্থক্য (Difference between Oxidative Phosphorylation and Photophosphorylation) ঃ**

অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন	ফোটোফসফোরাইলেশন
1. শ্বসনের সময় প্রক্রিয়াটি ঘটে।	1. সালোকসংশ্লেষের সময় প্রক্রিয়াটি ঘটে।
2. এই প্রক্রিয়া মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে ঘটে।	2. এই প্রক্রিয়া কোশের ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ঘটে।
3. অক্সিজেন গৃহীত হয়।	3. অক্সিজেন বর্জিত হয়।
4. আলোর প্রয়োজন হয় না।	4. আলোর প্রয়োজন হয়।
5. সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক পদার্থের প্রয়োজন হয় না।	5. সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক পদার্থের প্রয়োজন হয়।
6. উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ঘটে।	6. শুধু উদ্ভিদদেহে ঘটে।
7. অক্সিজেন প্রান্তীয় ইলেকট্রন গ্রাহকের কাজ করে।	7. $NADP^+$ প্রান্তীয় ইলেকট্রন গ্রাহকের কাজ করে।
8. প্রক্রিয়াটিকে আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ভাবে ভাগ করা যায় না। প্রক্রিয়াটিকে অনেকটা অনাবর্তাকার বলা হয়।	8. প্রক্রিয়াটি আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ভাবে ভাগ করা যায়।

9.3. সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Photosynthesis and Respiration)

এই দুই প্রকার জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক দেখা যায় ঃ

● **সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Photosynthesis and Respiration) ঃ**

সালোকসংশ্লেষ	শ্বসন
1. সব সজীব সবুজ উদ্ভিদকোশে ও কয়েকটি প্রাণীকোশে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।	1. সব সজীব উদ্ভিদ কোশে ও সব প্রাণীকোশে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।
2. এক ধরনের উপচিতিমূলক (Anabolic) প্রক্রিয়া।	2. এক ধরনের অপচিতি মূলক (Catabolic) প্রক্রিয়া।
3. সালোকসংশ্লেষ একটি বিজারণ প্রক্রিয়া।	3. শ্বসন একটি জারণ প্রক্রিয়া।
4. সালোকসংশ্লেষ সূর্যালোক বা কৃত্রিম আলোতে ঘটে।	4. শ্বসনে আলোর প্রয়োজন হয় না।
5. শর্করা জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয়।	5. শর্করা জাতীয় খাদ্য বিশ্লেষিত হয়।
6. আলোকশক্তি, স্থৈতিক রাসায়নিক শক্তি হিসাবে শর্করা খাদ্যে জমা রাখে।	6. খাদ্যে জমা স্থৈতিক রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তি ও ATP হিসেবে মুক্ত করে।
7. এই প্রক্রিয়ায় জীবের ওজন বাড়ে।	7. এই প্রক্রিয়ায় জীবের ওজন কমে।
8. এটি একটি তাপগ্রাহী (Endothermic) প্রক্রিয়া।	8. এটি একটি তাপমোচী (Exothermic) প্রক্রিয়া।
9. কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল হল এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপকরণ।	9. গ্লুকোজ ও অক্সিজেন এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপকরণ।
10. প্রক্রিয়ার শেষে শর্করা ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।	10. প্রক্রিয়ার শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল এবং জৈবশক্তি উৎপন্ন হয়।
11. সরল অণু থেকে জটিল খাদ্য অণু সৃষ্টি হয়।	11. জটিল খাদ্য অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে সরল অণুতে পরিণত হয়।
12. কার্বন ডাইঅক্সাইড গৃহীত এবং অক্সিজেন নির্গত হয়।	12. অক্সিজেন গৃহীত এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।
13. প্রতি অণু গ্লুকোজের মধ্যে 686 KCal তাপশক্তি জমা হয়।	13. প্রতি অণু গ্লুকোজ সবাত শ্বসনে জারিত হয়ে 686 KCal ও অবাত শ্বসনে জারিত হয়ে 28-54 KCal তাপ বের করে।
14. কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্ভর প্রক্রিয়া বলা যায়।	14. কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর করে না।
15. প্রতি গ্লুকোজ অণুর সংশ্লেষে 18 টি ATP অণুর প্রয়োজন হয়।	15. প্রতি গ্লুকোজ অণু বিশ্লেষণে 36 টি ATP অণু উৎপন্ন হয়।

▲ ফারমেনটেশন বা সন্ধান (Fermentation) ঃ

সন্ধান প্রক্রিয়া একধরনের অবাত শ্বসন। কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের অক্সিজেনের ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকায় শ্বসনের প্রথম পর্যায়ে (গ্লাইকোলাইসিসে) উৎপন্ন পাইরুভিক অ্যাসিডের বিজারণ ঘটে এবং উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তি ছাড়া অন্য সব বস্তু কোশের বাইরে নির্গত হয়। এই বিজারণকে উন্নত উদ্ভিদে **অবাত শ্বসন** এবং আণুবীক্ষণিক জীবাণু অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বেলায় **সন্ধান** বলা হয়। লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, 1857) প্রথম সন্ধান প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। সন্ধান প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পদার্থের উপর নির্ভর করে সন্ধান প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—অ্যালকোহল সন্ধান, ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান ও বিউটিরিক অ্যাসিড সন্ধান। বিভিন্ন প্রকার সন্ধানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

(i) উদ্ভিদে অ্যালকোহল সন্ধানের সমীকরণ—

$$\underset{\text{(গ্লুকোজ)}}{C_6H_{12}O_6} \rightarrow \underset{\text{পাইরুভিক অ্যাসিড}}{2CH_3COCOOH} \rightarrow \underset{\text{(ইথাইল অ্যালকোহল)}}{2C_2H_5OH} + \underset{\text{(কার্বন ডাইঅক্সাইড)}}{2CO_2} + \underset{\text{শক্তি}}{50KCal}$$

(ii) প্রাণীর পেশিতে সন্ধানের সমীকরণ—

$$\underset{\text{(গ্লুকোজ)}}{C_6H_{12}O_6} \rightarrow \underset{\text{পাইরুভিক অ্যাসিড}}{2CH_3COCOOH} \rightarrow \underset{\text{ল্যাকটিক অ্যাসিড}}{2CH_3CH(OH)COOH} + \underset{\text{শক্তি}}{50KCal}$$
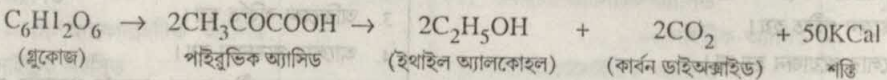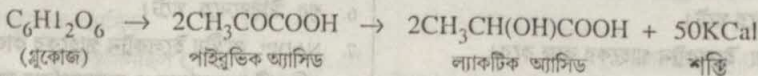
❖ **(a) সন্ধানের সংজ্ঞা (Definition of Fermentation) ঃ** অক্সিজেনের ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকা জীবের কোশের সঞ্চিত খাদ্য আংশিকভাবে যে প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে জীব অনুসারে বিভিন্ন যৌগ ও সামান্য পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন যৌগ কোশের বাইরে নির্গত হয় তাকে সন্ধান প্রক্রিয়া বলে।

(b) **সন্ধান প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristic features of Fermentation) ঃ** (i) সন্ধান ও কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া ঈস্ট প্রভৃতি ছত্রাকের সাহায্যে ঘটে। (ii) বিভিন্ন প্রকার সন্ধান প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল, ল্যাকটিক অ্যাসিড ও বিউটিরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে। (iii) সাধারণভাবে সন্ধান হল বহিঃকোশীয় প্রক্রিয়া। (iv) সন্ধান প্রক্রিয়া জাইমেজ নামে একপ্রকার উৎসেচকের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

9.4. সন্ধান প্রক্রিয়ার প্রয়োগ (Application of Fermentation)

সন্ধান প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শিল্পে ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। সন্ধান প্রক্রিয়ার প্রয়োগগুলি নীচে আলোচনা করা হল ঃ

1. **অ্যালকোহল শিল্পে**—এই শিল্পে গ্লুকোজ দ্রবণে কিছু ঈস্ট মিশিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করা হয়। এই বিক্রিয়ার সক্রিয় উপাদান হল জাইমেজ উৎসেচক। অ্যালকোহল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার ঈস্ট প্রজাতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রধান হল স্যাকারোমাইসিস সারেভিসি (*Saccharomyces cerevisiae*)

2. **রুটি তৈরি শিল্পে**—রুটিকে নরম ও হালকা করার জন্য অ্যালকোহল সন্ধান প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়।

3. **দুগ্ধ শিল্পে**—স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস (*Streptococcus lactis*) দুগ্ধ শর্করা ল্যাকটোজে প্রয়োগ করে সন্ধান প্রক্রিয়ায় চিজ ও মাখন তৈরি করা হয়। এইক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড দুগ্ধ প্রোটিন ক্যাসিন (Cascin) জমতে ও দুগ্ধ স্নেহ কণাকেপরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করে।

4. **চা ও তামাক শিল্পে**—চা ও তামাক গাছের পাতাকে সুগন্ধ ও রুচিকর করতে কতকগুলি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সন্ধান চালানো হয়। এতে প্রধানত *Bacillus megatarium* (ব্যাসিলাস মেগাটেরিয়াম) ব্যবহার করা হয়।

5. **ভিনিগার উৎপাদনে**—ভিনিগার তৈরি করতে গুড়ের মধ্যে ঈস্ট মিশিয়ে সন্ধান ঘটিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। এতে *Acetobacter aceti* (অ্যাসিটোব্যাকটর অ্যাসিটি) ব্যাকটেরিয়া দিয়ে জারণ প্রক্রিয়ায় অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনিগার তৈরি করা হয়।

6. **বিউটাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন উৎপাদনে**—বিউটাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোন তৈরিতে গুড়ে ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটিলিয়াম (*Clostridium acetobutylium*) ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সন্ধান চালানো হয়।

7. **চর্ম শিল্পে**—চামড়া শিল্পে, চামড়া থেকে পশুর লোম, চর্বি ও অন্যান্য কলা বা টিসু আলাদা করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সন্ধান ঘটিয়ে কাজে লাগানো হয়।

8. **ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদনে**—*Lactobacillus delbreukii* (ল্যাকটোব্যাসিলাস ডালব্রিউকি) দিয়ে সন্ধান প্রক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়।

9. **পাটের তন্তু নিষ্কাশনে**—*Clostridium butrium* (ক্লসট্রিডিয়াম বিউট্রিয়াম) ব্যাকটেরিয়া সন্ধান ঘটালে পেক্টিন বিনষ্ট করে পাটগাছের কাণ্ড থেকে তন্তু নিষ্কাশন করা যায়।

10. **ঔষধ শিল্প**—বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক ওযুধ উৎপাদন সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে।

● **সবাত শ্বসন এবং সন্ধানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Aerobic respiration and Fermentation) ঃ**

সবাত শ্বসন	সন্ধান
1. মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে।	1. অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
2. বায়ুজীবী জীবে ঘটে।	2. উন্নত উদ্ভিদ (বীজ) ও প্রাণীর পেশিতে এবং ঈস্ট ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অণুজীবে ঘটে।
3. প্রক্রিয়াটি তিনটি পর্যায় নিয়ে গঠিত, প্রথম পর্যায় সাইটোপ্লাজমে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়টি মাইটোকনড্রিয়াতে ঘটে।	3. প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে সাইটোপ্লাজমে হয়।
4. এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুগুলি হল—$CO_2 + H_2O$ + শক্তি।	4. এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুগুলি হল— উদ্ভিদে CO_2 + ইথাইল অ্যালকোহল + শক্তি এবং প্রাণীতে ল্যাকটিক অ্যাসিড + শক্তি।
5. এক গ্রাম গ্লুকোজ অণু এই প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে 686 KCal শক্তি উৎপন্ন করে।	5. প্রতি গ্রাম গ্লুকোজ অণু এই প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে 36–50 KCal শক্তি উৎপন্ন করে।

● অবাত শ্বসন ও সন্ধান প্রক্রিয়ার পার্থক্য (Difference between Anaerobic respiration and Fermentation) :

অবাত শ্বসন	সন্ধান
1. অবাত শ্বসন অক্সিজেনযুক্ত যৌগের উপস্থিতিতে হয়।	1. সন্ধান প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কোনো ভাবেই ব্যবহৃত হয় না।
2. এই প্রক্রিয়া অবায়ুজীবে ঘটে।	2. এই প্রক্রিয়া প্রাণীর পেশি এবং উদ্ভিদ (বীজ), ঈস্টও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অণুজীবে ঘটে।
3. এই প্রক্রিয়াতে শ্বসন বস্তু আংশিকভাবে জারিত হয়।	3. এই প্রক্রিয়াতেও শ্বসনবস্তুর আংশিক জারণ ঘটে।
4. প্রতি গ্রাম গ্লুকোজ অণু থেকে 50 KCal শক্তি পাওয়া যায়।	4. প্রতি গ্রাম গ্লুকোজ অণু থেকে 30–50 KCal শক্তি পাওয়া যায়।
5. প্রক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন বস্তুগুলি হল—অক্সিজেনযুক্ত যৌগ (নাইট্রাইট) + CO_2 + শক্তি।	5. প্রক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন বস্তুগুলি হল উদ্ভিদে — C_2H_5OH (কোহল) + CO_2 + শক্তি। প্রাণীর দেহে— ল্যাকটিক অ্যাসিড + শক্তি।

9.5. আলোকশ্বসন (Photorespiration)

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সূর্যালোকে ও অন্ধকারে শ্বসনের হার সমান। আধুনিক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে অন্ধকার অপেক্ষা আলোকে শ্বসনের হার প্রায় তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি হতে পারে। 1955 এবং 1959 খ্রিস্টাব্দে ডেকার (Decker) আলোর শ্বসন ব্যাখ্যা করেন।

❖ (a) **আলোকশ্বসনের সংজ্ঞা (Definition of Photorespiration) : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ কোশে আলোকের উপস্থিতিতে শ্বসনের হার স্বাভাবিকের তুলনায় বাড়ে এবং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় তাকে আলোকশ্বসন বলে।**

আলোকশ্বসনের ক্রমপর্যায়।
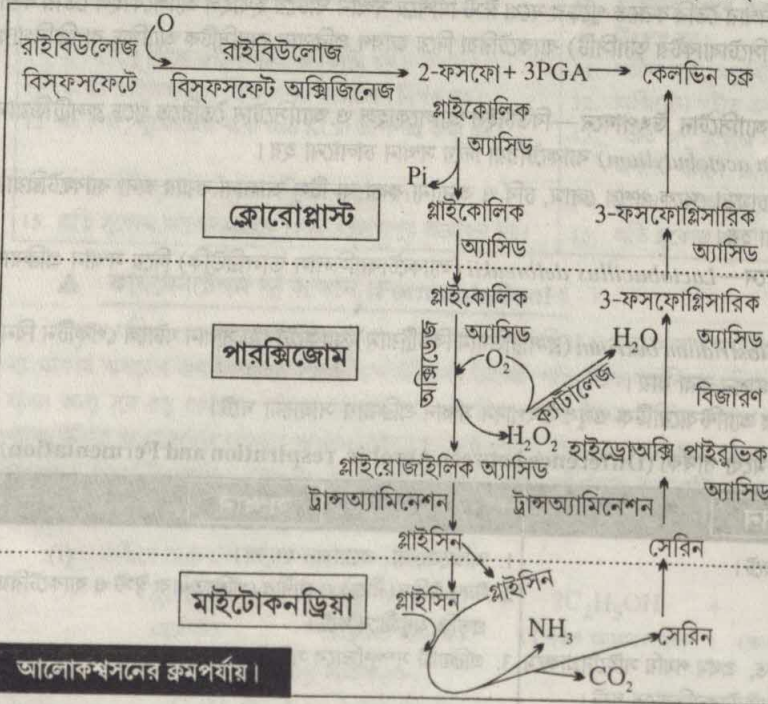
● **আলোকশ্বসনকারী উদ্ভিদ (Plants of Photorespiration) :** তামাক (*Nicotiana*), মুগ (*Phaseolus*), মটর (*Psium*), পিটুনিয়া (*Petunia*), তুলো (*Grossypium*), লংকা (*Capsicum*), ধান (*Oryza*), সয়াবিন (*Glycine*), সূর্যমুখী (*Helianthus*) প্রভৃতি সপুষ্পক সবুজ উদ্ভিদের কোশে এবং কারা (*Chara*), নাইটেলা (*Nitella*) প্রভৃতি শৈবালে আলোকশ্বসন দেখা যায়। বর্তমানে জানা গেছে গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে এই শ্বসন ঘটে। সাধারণভাবে বলা যায় C_3 সব উদ্ভিদে আলোকশ্বসন দেখা যায়।

◻ **আলোকশ্বসনের স্থান (Site of Photorespiration) :** ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়া নামে কোশীয় অঙ্গাণুগুলিতে আলোকশ্বসন ঘটে। তাই এই তিনটি অঙ্গাণুকে আলোকশ্বসনের স্থান বলে।

◻ **আলোকশ্বসন প্রক্রিয়া (Process of Photorespiration) :** কোশে এই তিনটি অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্ট, পারক্সিজোম ও মাইটোকনড্রিয়া একসঙ্গে কাছাকাছি থাকে। পারক্সিজোম ক্লোরোপ্লাস্ট সংলগ্ন ক্ষুদ্র গোলাকার অঙ্গাণু। কেলভিন চক্রের ফসফেটযুক্ত হেক্সোজ থেকে 2-কার্বন বিশিষ্ট ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড (Phosphoglycolic acid) তৈরি হয়। ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড

ফসফোটেজ উ্ৎসেচকের প্রভাবে গ্লাইকোলিক অ্যাসিডে (Glycolic acid—$CH_3OHCOOH$) পরিণত হয়। গ্লাইকোলিক অ্যাসিড হল আলোকশ্বসনের প্রথম উপাদান। সালোকসংশ্লেষের সময় আলোর তীব্রতা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণের উপর গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন নির্ভর করে। এই সময় বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 1%-এর কম থাকে। কোশের ক্লোরোপ্লাস্টে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড সংশ্লেষিত হওয়ার পর পারক্সিজোমে যায় এবং সেখানে বিজারিত হয়ে গ্লায়োজাইলিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অক্সিডেজ উৎসেচক অংশগ্রহণ করে।

- **1. ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Formation of Phosphogeycolic acid) ঃ**

$$\text{রাইবুলোজ 1, 5-বিস্‌ফসফেট} + O_2 \xrightarrow[\text{কার্বোক্সিলেজ}]{\text{রাইবুলোজ বিস্‌ফসফেট}} \text{3- ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড (3PGA)} + \text{2- ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড।}$$
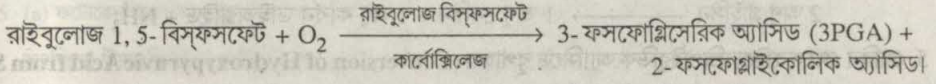
- **2. 2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিডের রূপান্তর এবং গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Conversion of 2-Phosphoglycolic Acid and Formation of Glycolic Acid) ঃ**

$$\text{2-ফসফোগ্লাইকোলিক অ্যাসিড} + H_2O \xrightarrow{\text{ফসফাটেজ}} \text{গ্লাইকোলিক অ্যাসিড + ফসফোরিক অ্যাসিড}$$
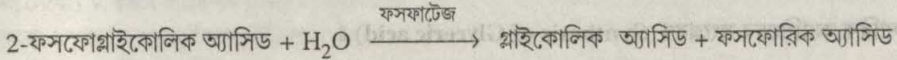
- **3. গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিডের উৎপাদন (Formation of Glyoxylic Acid) ঃ**

$$\text{গ্লাইকোলিক অ্যাসিড} + O_2 \xrightarrow[\text{আলোক}]{\text{গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অক্সিডেজ}} \text{গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড + হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড } (H_2O_2)$$
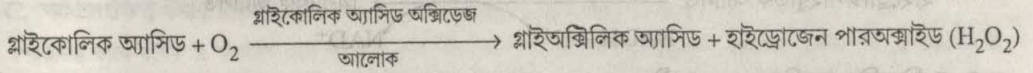
কেটালেজ উৎসেচকের সহায়তায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিশ্লিষ্ট হয়ে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$
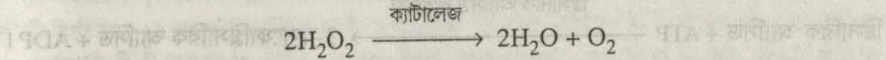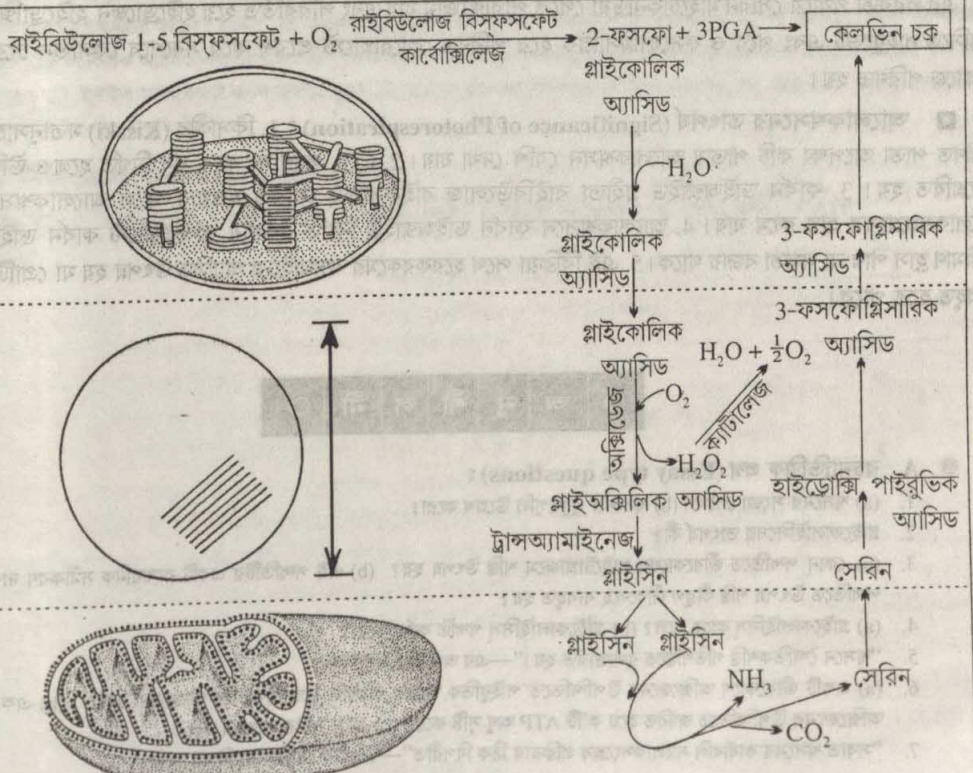
● 4. **গ্লাইসিনের সংশ্লেষণ (Synthesis of Glycine) :**

গ্লাইঅক্সিলিক —(গ্লুটামেট-গ্লাইঅক্সিলেট ট্রান্সঅ্যামাইনেজ)→ গ্লাইসিন
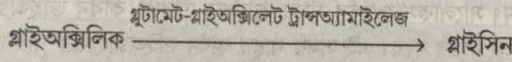
সংশ্লেষিত গ্লাইসিন (অ্যামাইনো অ্যাসিড) এরপর মাইটোকনড্রিয়ায় যায় এবং সেখানে 2 অণু গ্লাইসিন যুক্ত হয়ে এক অণু সেরিন (Serine) নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সময় 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও সামান্য অ্যামোনিয়া (NH_3) নির্গত হয়।

2 অণু গ্লাইসিন ——→ 1 অণু সেরিন + 1 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড + NH_3
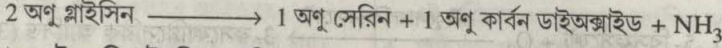
● 5. **সেরিন থেকে হাইড্রোক্সিপাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তর (Conversion of Hydroxypyruvic Acid from Serine) :**

সেরিন + গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড —(সেরিন গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিড অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ)→ হাইড্রোক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড + গ্লাইসিন।
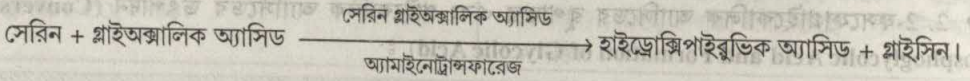
● 6. **গ্লিসারিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ (Synthesis of Glyceric acid) :**

হাইড্রোক্সিপাইরুভিক অ্যাসিড —(হাইড্রক্সিপাইরুভেট রিডাকটেজ; NADH + H^+ → NAD^+)→ গ্লিসারিক অ্যাসিড
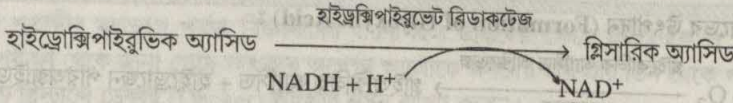
● 7. **গ্লিসারিক অ্যাসিডের ফসফোরীভবন (Phosphorylation of Glyceric Acid) :**

গ্লিসারিক অ্যাসিড + ATP —(গ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ)→ 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP।
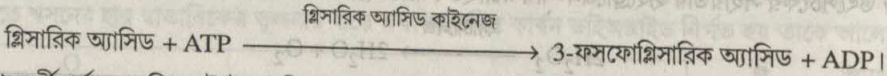
এর পরবর্তী পর্যায়ে সেরিন মাইটোকনড্রিয়া থেকে পারক্সিজোম যায় এবং পরিবর্তিত হয়ে হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সি পাইরুভিক অ্যাসিডে পাইরুভেট এবং পরে ও ফসফোগ্লিসারিক হয়ে পরিণত ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে সবশেষে কেলভিন চক্রের মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

□ **আলোকশ্বসনের তাৎপর্য (Significance of Photorespiration) :** 1. কিসাকীর (Kisaki) মতানুসারে উদ্ভিদের পরিণত পাতা অপেক্ষা কচি পাতায় আলোকশ্বসন বেশি দেখা যায়। 2. CO_2 গ্রহণ না করে, শুধু নির্গত হলেও উদ্ভিদে শর্করা সংশ্লেষিত হয়। 3. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা রাইবিউলোজ বাইফসফেট জারিত হওয়ার ফলে আলোকশ্বসনের ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায়। 4. আলোকশ্বসনে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হওয়ায় ক্লোরোপ্লাস্টে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায় না সমতা বজায় থাকে। 5. এই বিক্রিয়া পথে হরেকরকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যা প্রোটিন সংশ্লেষে ব্যবহৃত হতে পারে।

○ অনুশীলনী ○

● A. **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :**

1. (a) শ্বসনের সংজ্ঞা লেখো। (b) শ্বসনের গুরুত্বগুলি উল্লেখ করো।
2. গ্লাইকোলাইসিসের তাৎপর্য কী?
3. (a) কোন্ পদ্ধতিতে জীবকোশের সাইটোপ্লাজমে শক্তি উৎপন্ন হয়? (b) এই পদ্ধতিটির একটি রাসায়নিক সমীকরণ দাও। (c) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন শক্তি কীরূপ জীবদেহে ব্যবহৃত হয়?
4. (a) গ্লাইকোলাইসিস্ কাকে বলে? (b) গ্লাইকোলাইসিস্ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
5. "শ্বসনে স্থৈতিকশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।"—এর অর্থ কী?
6. (a) একটি জীবকোশে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অম্লের পরিণতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো। (b) এক অণু গ্লুকোজ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে ক'টি ATP অণু সৃষ্টি করে? (c) ATP সৃষ্টির তাৎপর্য কী?
7. "সবাত শ্বসনের কার্যাবলি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত"—উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

8. (a) ATP-এর পুরো নাম কী? (b) সবাত শ্বসনের সময় কোশের মধ্যে উৎপন্ন ATP হিসাব তালিকার মাধ্যমে উল্লেখ করো।
9. (a) অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসন কী? (b) ক্রেবস চক্রের বর্ণনা দাও।
10. (a) শ্বসন কাকে বলে? (b) সন্ধান প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝো? (c) কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও।
11. (a) সবাত শ্বসন ও সন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখো। (b) ল্যাকটিক অ্যাসিডের সন্ধান প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।
12. শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষ এবং অবাত ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য আলোচনা করো।
13. শ্বসনের সময় ব্যবহৃত এবং নির্গত জলের হিসাব তালিকার মাধ্যমে দেখাও।
14. (a) সন্ধান প্রক্রিয়া কাকে বলে? (b) এর প্রয়োগ সম্পর্কে যা জানো লেখো।
15. (a) ফটোরেসপিরেসানের সংজ্ঞা লেখো। (b) এটি জীবদেহে কোথায় ও কীভাবে ঘটে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. গ্লাইকোলিসিস্ বলতে কী বোঝো? 2. গ্লাইকোলিসিসের দরুন কী কী উৎপন্ন হয়? 3. ক্রেবস চক্র কী? 4. সন্ধান প্রক্রিয়া কাকে বলে? 5. ক্রেবস চক্রের গুরুত্ব কী? 6. ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান কাকে বলে? 7. অবাত শ্বসন ও সন্ধান প্রক্রিয়ার সম্পর্ক উল্লেখ করো। 8. ক্রেবস চক্রের যে-কোনো তিনটি বিক্রিয়া লেখো। 9. শ্বসনে বাহ্যিক শর্ত বিষয়ে যা জানো লেখো। 10. শ্বসনের গুরুত্ব কী? 11. সবাত ও অবাত শ্বসনের পার্থক্য কী? 12. অবায়ুজীবী বলতে কী বোঝো? সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অবায়ুজীবী কাকে বলে? 13. প্রান্তীয় শ্বসন কী? একে ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র বলা হয় কেন? 14. অবাত ও সবাত শ্বসনের শেষে উৎপন্ন বস্তুগুলির নাম কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. স্থিতিশক্তি কাকে বলে? 2. শ্বসনকে কেন অপচিতি প্রক্রিয়া বলা হয়? 3. কোশে গ্লাইকোলাইসিস্ বিক্রিয়া কোথায় হয়? 4. শ্বসনবস্তু কী? 5. TCA চক্রের সম্পূর্ণ নাম লেখো। 6. ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন কোথায় ঘটে? 7. ঈস্টে কোন্ ধরনের শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটে? 8. ক্রেবস চক্র কোথায় সংঘটিত হয়? 9. EMP পথ-এর সম্পূর্ণ নাম কী? 10. শ্বসনে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা কোথায় আবদ্ধ থাকে? 11. ATP-র সম্পূর্ণ নাম বলো। 12. সবাত শ্বসনে কত পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়? 13. অবাতশ্বসনে নির্গত শক্তির পরিমাণ কত? 14. এক গ্রাম অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণে সর্বমোট কত শক্তি উৎপন্ন হয়? 15. শ্বসনের পর্যায়গুলি কী কী তাদের নাম করো। 16. কোন্ ক্রিয়ার ফলে বায়ুতে O_2-এর ঘাটতি ও কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে তা পূরণ হয়? 17. রাত্রিবেলা গাছের নীচে ঘুমানো ক্ষতিকর কেন? 18. সকল প্রকার শ্বসনের সাধারণ দশা কোন্‌টি? এটি কোথায় ঘটে? 19. কোহল সন্ধানে কী পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়? 20. ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধানে কত শক্তি উৎপন্ন হয়? 21. ক্রেবস চক্রের দুটি সহ-উৎসেচকের নাম করো। 22. ভিনিগার কী? এটি কীভাবে তৈরি হয়? 23. ইথাইল অ্যালকোহল কখন উৎপন্ন হয়? 24. এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হলে কত অণু ATP তৈরি করে? 25. কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কী কী?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. শ্বসন বস্তু। 2. অবাত শ্বসন। 3. সবাত শ্বসন। 4. কোহল সন্ধান। 5. পাইরুভিক অ্যাসিড। 6. প্রান্তীয় শ্বসন। 7. ATP।
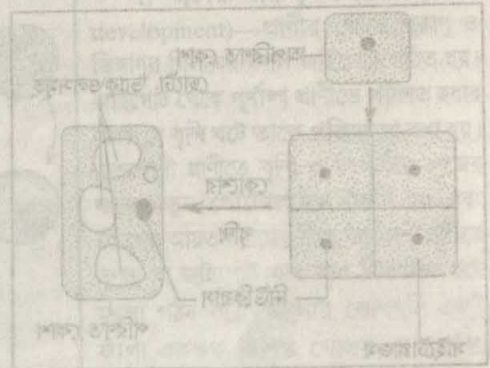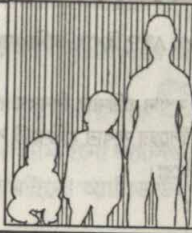
অধ্যায় ১০
বৃদ্ধি, রূপান্তর ও বয়ঃপ্রাপ্তি [GROWTH, METAMORPHOSIS AND AGEING]

○ বৃদ্ধি (Growth) ○

সূচনা (Introduction) : বৃদ্ধি সজীব বস্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শারীরবৃত্তীয় কারণে উপচিতি অপচিতির থেকে বেশি হলে দেহজ বস্তুর সংযোজন ঘটে। এভাবে জীবের দেহের আয়তন স্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৃদ্ধি বলে। কোশের প্রোটোপ্লাজম এই বৃদ্ধির প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাধারণত একটি এককোশী ভ্রূণ অবস্থা থেকে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়ে পরিণত জীব গঠিত হয়। এককোশী জীবের ক্ষেত্রে জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষের জন্য নূতন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং কোশের আয়তন বেড়ে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বহুকোশী জীবের ক্ষেত্রে কোশবিভাজন ও কোশের আয়তন বেড়ে সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধির ফলে জীবের বিকাশ ঘটে। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোশের আয়তনও বেড়ে যায়। সজীব জীবকোশ খাদ্য থেকে তার প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উপাদান সংগ্রহ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

জীবদেহে বিপাকের (Metabolism) সময় গঠনমূলক প্রক্রিয়া বা **উপচিতি** (Anabolism) এবং ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া বা অপচিতি (Catabolism) উভয় প্রক্রিয়া চলে। উপচিতি ও অপচিতির হার সমান হলে জীবদেহ বাড়ে না, কিন্তু উপচিতির হার অপচিতির হারকে ছাড়িয়ে গেলে বা বেশি হলে বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। বৃদ্ধির সময় দেহকোশের সংখ্যা, আকার ও আয়তন স্থায়ীভাবে বাড়ে। এতে জীবের শুষ্ক ওজন (Dry weight) ও বেড়ে যায়। **মিলার** (Miller) 1957 খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধিকে **"ওজন ও গঠনের স্থায়ী পরিবর্তন"** বলে ব্যাখ্যা করেছেন। **থিম্যান** (Thimann) 1960 খ্রিস্টাব্দে বলেছেন **"আয়তনের অপরিবর্তনীয় অবস্থাই"** হল বৃদ্ধি। বৃদ্ধির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—(i) স্থায়ী পরিবর্তন, (ii) প্রোটোপ্লাজম নিয়ন্ত্রিত এবং (iii) অপরিবর্তনীয়।

❖ **বৃদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Growth) : জীবকোশের প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষণের ফলে জীবদেহে যে প্রক্রিয়ায় আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজন স্থায়ীভাবে বাড়ে তাকে বৃদ্ধি বলে।**

◎ 10.1. বৃদ্ধির দশা এবং কারণসমূহ (Phases and Factors of Growth) ◎

▲ বৃদ্ধির দশা (Phases of Growths) :

➤ **A. উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশা (Growth phases of Plants) :** উদ্ভিদের বৃদ্ধি আজীবন ঘটে। এই বৃদ্ধি সাধারণত মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে সীমাবদ্ধ। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **অগ্রস্থ বৃদ্ধি** (Apical growth) বলে। অগ্রস্থ ভাজক কলা বারবার বিভাজিত হয়ে নতুন নতুন অপত্য কোশ সৃষ্টি করে। এই নতুন কোশগুলির নিজস্ব বৃদ্ধিও ঘটে। প্রথম অবস্থায় কোশগুলির কোশপ্রাচীর পাতলা হয় এবং ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এর পর আস্তে আস্তে কোশগুলি আকারে বড়ো হয় এবং কোশপ্রাচীরে নানা প্রকার পদার্থ জমে পুরু হয়। দেখা যায় কোশগুলি যে হারে বাড়ে, কোশের প্রোটোপ্লাজম সেই হারে বাড়ে না। উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোশ গহ্বরের আবির্ভাব ঘটে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি তিনটি দশায় দেখা যায়, যেমন—(i) কোশ বিভাজন দশা, (ii) কোশ দীর্ঘিকরণ দশা এবং (iii) পরিণত দশা।

চিত্র 10.1 : উদ্ভিদকোশের বিভাজন ও বৃদ্ধি এবং একটি কোশগহ্বরযুক্ত পরিণত কোশের চিত্ররূপ।

(i) **কোশ-বিভাজন দশা** (Phase of cell division)—এই দশায় ভাজক কলার কোশগুলি দ্রুত বিভক্ত হতে থাকে এবং বহু অপত্য কোশ সৃষ্টি হয়। সাধারণত মাইটোটিক কোশ-বিভাজনের ফলে এই ধরনের বৃদ্ধি হয়। জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডের শীর্ষের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দশা দেখা যায়।

(ii) **দীর্ঘিকরণ দশা** (Phase of cell elongation)— কোশ বিভাজন অঞ্চলের পরবর্তী অংশ হল দীর্ঘিকরণ দশা। এই দশায় অপত্য কোশগুলির আয়তন বাড়ে এবং প্রসারিত হয়। কোশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকুওল বা গহ্বর সৃষ্টি হয়। (চিত্র 10.1 দেখো) ভ্যাকুওলের কোশরস কোষের রসস্ফীতি চাপ বাড়তে সাহায্য করে, এর ফলে কোশের আয়তন আরও বাড়ে। এই অঞ্চলে উদ্ভিদের সক্রিয় বৃদ্ধি ঘটে এবং উদ্ভিদ লম্বায় বাড়ে।

(iii) **পরিণতি দশা** (Phase of maturation)— এই শেষ দশায় কোশগুলির নানাপ্রকার কাজের জন্য পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের কলা, অঙ্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে দেহের আয়তন বাড়ে। এই দশায় কোশগুলি পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত হয়ে স্থায়ী অবস্থায় আসে।

সাধারণত উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশাগুলিতে যে সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে তাকে **প্রাথমিক বৃদ্ধি** (Primary growth) বলা হয়। কিন্তু বিশেষভাবে অনেকগুলি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর কিছু কিছু পরিণত কলা, যেমন—ক্যাম্বিয়াম কলা (Cambium) পুনর্বিভাজন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়। এর ফলে উদ্ভিদ প্রস্থে বাড়ে। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **গৌণ বৃদ্ধি** (Secondary growth) বলে। প্রাথমিক ও গৌণবৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের **অঙ্গজ বৃদ্ধি** (Vegetative growth) ঘটে। অঙ্গজ বৃদ্ধির পর উদ্ভিদের **জনন বৃদ্ধি** (Reproductive growth) আরম্ভ হয়। এতে প্রথমে পুষ্পমুকুল এবং পরে ফুল ও ফল গঠিত হয়।
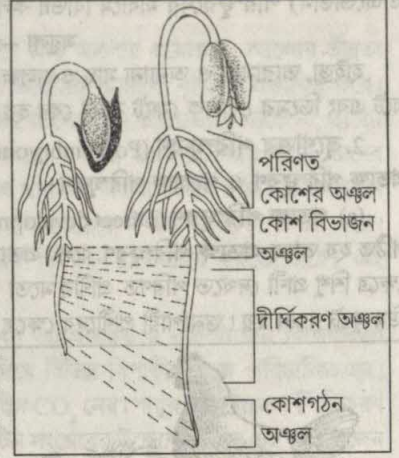
চিত্র 10.2 : উদ্ভিদ মূলের বৃদ্ধির ক্রমপর্যায়।

- উদ্ভিদের জীবন দশায় কোনো অঙ্গের ক্ষতি হলে বা অঙ্গহানি ঘটলে কোশ বিভাজনের মাধ্যমে তা পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় বহু উদ্ভিদে শুধু মাত্র মূল সজীব থাকলে অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদের বিটপ অংশ আবার গঠিত হয়। এই ধরনের বৃদ্ধিকে **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি** (Regenerative growth) বলে।
- উদ্ভিদের জনন অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধিকে **অঙ্গজ বৃদ্ধি** (Vegetative growth) বলে।
- উদ্ভিদ অঙ্গে পুষ্পমুকুল সৃষ্টি এবং পরে ফুল ও ফল গঠনের সময় যে বৃদ্ধি হয়, তাকে **জনন বৃদ্ধি** (Reproductive growth) বলে।

➤ **B. প্রাণীর বৃদ্ধি দশা (Growth Phases in Animals) :** উদ্ভিদের মতো প্রাণীর বৃদ্ধিতেও কোশবিভাজন, কোশের আয়তন বৃদ্ধি ও কোশের পরিণতি— এই তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সঙ্গে **পরিস্ফুরণ**ও ঘটে।
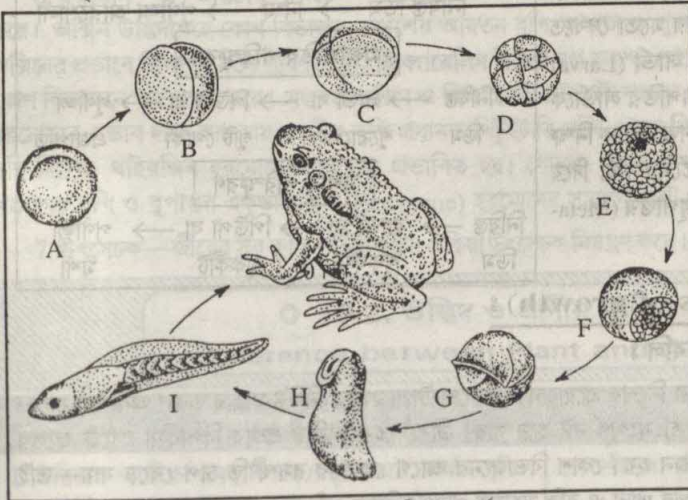
চিত্র 10.3 : কুনো ব্যাঙের ভ্রূণজ বৃদ্ধির ক্রমপর্যায় দশা।
A-জাইগোট, B-E-ব্লাস্টুলা গঠন, F-G-গ্যাস্ট্রুলা গঠন, H-ভ্রূণ, I-ব্যাঙাচি।

■ **প্রাণীদের পরিস্ফুরণ :** নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি এখানে দেখা যায়—

1. **ভ্রূণের পরিস্ফুরণ** (Embryonic development)—প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট গঠিত হয়। **জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হবার সময় যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে পরিস্ফুরণ বলা হয়।** এককোশী প্রাণীতে বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজের ফলে নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় এবং কোশের আয়তন বাড়ে। কিন্তু বহুকোশী প্রাণীতে ভ্রূণাণু বা জাইগোট বার বার বিভাজিত হয়ে মরুলা গঠন করে। মরুলার কোশগুলি একটি ফাঁপা একস্তর বিশিষ্ট গোলক বা **ব্লাস্টুলা** (Blastula) এবং এর পর ত্রিস্তরযুক্ত **গ্যাস্ট্রুলাতে** (Gastrula) পরিণত হয়। গ্যাস্ট্রুলার

কোশগুলির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণ গঠিত হয়। সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে ত্রিস্তরযুক্ত গ্যাস্ট্রুলা থেকে কোশ বিভাজিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হয়। বহুকোশী প্রাণীতে এই ত্রিস্তরযুক্ত গ্যাস্ট্রুলা (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) পরিস্ফুরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র উৎপন্ন করে (চিত্র 10.3)।

মরুলা → ব্লাস্টুলা → গ্যাস্ট্রুলা → ভ্রূণ → পূর্ণাঙ্গ

হাইড্রা, তারামাছ ও অন্যান্য মাছ ও জলজ প্রাণীর ভ্রূণের বৃদ্ধি জলে ঘটে। সরীসৃপ, পাখি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভ্রূণের বৃদ্ধি স্থলে ঘটে এবং ডিমের খোলক ফেটে বাচ্চা বের হয়। মানুষ অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণের পরিস্ফূরণ ঘটে।

2. **ভ্রূণোত্তর পরিস্ফূরণ** (Post embryonic development)— প্রাণী জগতে ভ্রূণোত্তর পরিস্ফূরণ দু'রকমের হয়, যেমন— **প্রত্যক্ষ পরিস্ফূরণ ও পরোক্ষ পরিস্ফূরণ।**

(a) **প্রত্যক্ষ পরিস্ফূরণ** (Direct development)—**যে পরিস্ফূরণে ভ্রূণ থেকে কোনো অন্তর্বর্তী দশা ছাড়া সরাসরি শিশুপ্রাণী গঠিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ বলে।** প্রত্যক্ষ পরিস্ফূরণে লার্ভা দশা থাকে না। সরীসৃপ, পাখি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশু প্রাণী দেখতে পরিণত প্রাণীর মতো হয় এবং ক্রমশ এটি বেড়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিবর্তিত হয়। সরীসৃপ ও পাখিদের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মা শাবক প্রসব করে।
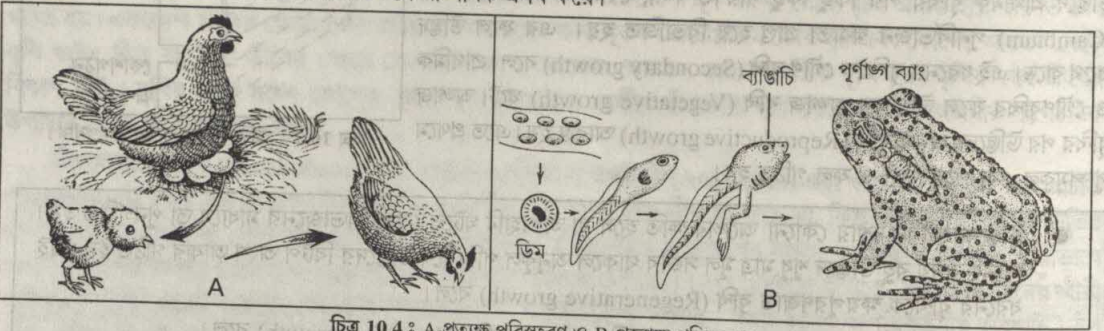
চিত্র 10.4 : A-প্রত্যক্ষ পরিস্ফূরণ ও B-পরোক্ষ পরিস্ফুরণ।

(b) **পরোক্ষ পরিস্ফূরণ** (Indirect development)— **যে পরিস্ফূরণে ভ্রূণ যখন স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী লার্ভা দশা অতিক্রম করে ক্রমশ রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তখন তাকে পরোক্ষ পরিস্ফূরণ বলা হয়।** উভচর (ব্যাং, স্যালাম্যান্ডার), পতঙ্গ (মশা, মাছি, প্রজাপতি) প্রভৃতি প্রাণীদের ভ্রূণ থেকে লার্ভা গঠিত হয়। লার্ভাটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় না। কিন্তু এরা স্বাবলম্বী। এই স্বাবলম্বী দশাকে **লার্ভা** (Larva) বলে। ব্যাঙের লার্ভাকে **ব্যাঙাচি** (Tadpole), প্রজাপতির লার্ভাকে **ক্যাটারপিলার** (Caterpillar), আরশোলার অপরিণত দশাকে **নিম্ফ** (Nymph) বলে। অপরিণত দশার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। লার্ভার পরিবর্তনকে রূপান্তর (Metamorphosis) বলে।
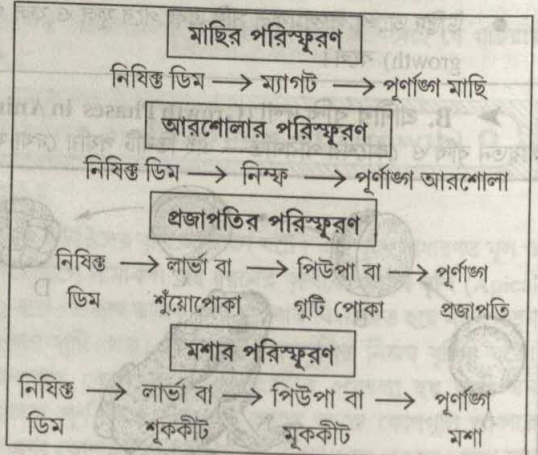
▲ বৃদ্ধির শর্তাবলি (Factors of growth) :

◻ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির বাহ্যিক শর্তাবলি :

1. **জল**— উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। জল প্রোটোপ্লাজমকে নির্দিষ্ট মাত্রায় তরল অবস্থায় রাখে। জলের অভাবে প্রোটোপ্লাজমের কাজ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজে জলের প্রয়োজন। রসস্ফীতি চাপের জন্যও জলের প্রয়োজন হয়। কোশ বিভাজনের আগে কোশের রসস্ফীতি চাপ বেড়ে যায়—তাই কোশ আকারে বাড়ে। জল খাদ্যের উপাদান, উৎপন্ন খাদ্য ও বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থগুলিকে পরিবহন করে।

2. **উষ্ণতা (তাপমাত্রা)**—জীবদেহের জৈব রাসায়নিক কাজ স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য 25^0C — 35^0C উষ্ণতা সবচেয়ে

উপযুক্ত। এই উষ্ণতায় বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণকারী উৎসেচকগুলি খুব সক্রিয় থাকে। সাধারণত 4°C-এর কম এবং 50°C-র বেশি উষ্ণতায় উৎসেচকের কাজ ব্যাহত হয়, ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তা ছাড়া 50°C এর বেশি উষ্ণতায় প্রোটোপ্লাজমের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

3. **আলো**—(i) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে** ঃ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করার জন্য আলোর প্রয়োজন। আলোর তীব্রতা কোশ বিভাজনকে প্রভাবিত করে। আলোর তীব্রতার প্রকারভেদ এবং স্থিতিকাল উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সূর্যের লাল ও নীল রশ্মি উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সূর্যমুখী, টম্যাটো প্রভৃতি যেসব গাছ আলো ছাড়া ভালোভাবে বাড়ে না, তাদের **আলোকপ্রেমী** (Photophilic) উদ্ভিদ বলে। আবার, গোলাপ ইত্যাদি যেসব গাছ আলো ও ছায়া উভয় অবস্থায় বাড়ে, তাদের **আলোক নিরপেক্ষ** (Photoneutral) উদ্ভিদ বলা হয়। ফার্ন, মস্, কচু প্রভৃতি যেসব গাছ কম আলো অর্থাৎ ছায়ায় ভালোভাবে বাড়ে, তাদের **আলোকবিমুখী** (Photophobic) উদ্ভিদ বলে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম আলোকের উপর অনেকটা নির্ভর করে। (ii) **প্রাণীর বৃদ্ধিতে** ঃ আলোর সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। সূর্যালোকে প্রাণীর ত্বক ভিটামিন-D সংশ্লেষ করতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে প্রাণীদের অস্থিবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

4. **বায়ু**—(i) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে**—বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন বিশেষভাবে প্রয়োজন। অক্সিজেন শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্য জারিত করে শক্তি জোগায়। এই শক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ পরিচালিত হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন। বায়ু থেকে উদ্ভিদ CO_2 নেয়। বায়ুর নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়ায় মাটিতে জমা হয়। এতে মাটির উর্বরতা বাড়ে। বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। (ii) **প্রাণীর বৃদ্ধিতে**—অক্সিজেন বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। অক্সিজেনের প্রভাবে জীবকোশের সঞ্চিত খাদ্য জারিত হয় এবং শক্তি মুক্ত করে। এই শক্তি বিভিন্ন সংশ্লেষমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

■ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি ঃ

5. **খাদ্য**—উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য খাদ্য বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। জীবদেহে নানা প্রকার জীবন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। উদ্ভিদ বীজের ভিতর সঞ্চিত খাদ্য থেকে প্রাথমিক বৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে পাতা ও মূল সৃষ্টির পর উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ, প্রোটিন সংশ্লেষ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন রকম খাদ্য তৈরি করে এবং এই সব খাদ্য থেকে পুষ্টি লাভ করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।

প্রাণীরা ভ্রূণ অবস্থায় জাইগোটের কুসুম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ অমরার (Placenta) সাহায্যে মাতৃদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে এই প্রাণীরা বাইরের পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, তৈল, ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ প্রয়োজন হয়।

6. **হরমোন**—(i) **উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে**—অক্সিন, জিব্বারেলিন ও সাইটোকাইনিন প্রভৃতি হরমোনগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অক্সিন উদ্ভিদদেহে কোশ বিভাজন, কোশের আয়তন বৃদ্ধি, অঙ্গজ ও পুষ্পমুকুলের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া অক্সিনের প্রভাবে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। **জিব্বারেলিন** বীজের সুপ্ত অবস্থা থেকে অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করে। **সাইটোকাইনিন** কোশ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে। সম্ভবত অক্সিন ও জিব্বারেলিন উভয়ই ফুলের গঠনে সহায়তা করে। (ii) **প্রাণীদের বৃদ্ধিতে**—হরমোনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাণীর বৃদ্ধি প্রধানত পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **সোমাটোট্রপিক হরমোন** এবং থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন** হরমোনের সাহায্যে প্রভাবিত হয়। গোনাড থেকে উৎপন্ন যৌন হরমোনও বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। পতঙ্গের বৃদ্ধি ও রূপান্তর **একডাইসোন** (Ecdysone) হরমোনের সাহায্যে ঘটে।

7. **উৎসেচক**—জীবের সব রকম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উৎসেচক নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বৃদ্ধির সময় উৎসেচকের বিশেষ প্রয়োজন।

◎ 10.2. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পার্থক্য ◎
(Difference between Plant and Animal Growth)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি	প্রাণীর বৃদ্ধি
1. উদ্ভিদের আজীবন (মৃত্যু পর্যন্ত) বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট।	1. প্রাণীদের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট, সাধারণত আজীবন ঘটে না।
2. উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধির পর গৌণ বৃদ্ধি ঘটে।	2. প্রাণীদের কোনো গৌণ বৃদ্ধি নেই।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি	প্রাণীর বৃদ্ধি
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সমগ্র দেহে না হয়ে বিশেষ বিশেষ অংশে ঘটে।	3. সমগ্র দেহে বৃদ্ধি ঘটে।
4. বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে ভাজককলার সাহায্যে বৃদ্ধি ঘটে।	4. প্রাণীদেহে কোনো বিশেষভাবে চিহ্নিত বর্ধিষ্ণু অঞ্চল নেই এবং ভাজককলা থাকে না। প্রাণীর বৃদ্ধি দেহের সব কলায় ঘটে।
5. উদ্ভিদের বৃদ্ধির মধ্যে সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা দেখা যায় না।	5. প্রাণীর বৃদ্ধি সুসামঞ্জস্যভাবে ঘটে।
6. উদ্ভিদের বৃদ্ধি সমভাবে সব অঙ্গে দেখা যায় না।	6. প্রাণীর বৃদ্ধি সমভাবে সর্বাঙ্গে ঘটে।
7. উচ্চতর উদ্ভিদে বৃদ্ধিজনিত—বার্ষিক বলয় গঠিত হয়।	7. প্রাণীদেহে বৃদ্ধির এই ধরনের কোনো নিদর্শন দেখা যায় না।

▲ মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of Growth) :

❖ **সংজ্ঞা : জীবের জন্মের পর থেকে যতদিন বৃদ্ধি চলে সেই সময়কালকে মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of growth)** বলে।

জীবের বৃদ্ধি সারা জীবন সমান হারে হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধির শুরুতে বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। বৃদ্ধির এই প্রাথমিক পর্যায়কে **বিলম্বকাল বা ল্যাগ দশা** (Lag phase) বলে। বিলম্বকালের পর থেকে বৃদ্ধি দ্রুত হারে সম্পন্ন হয়। একে **লগ দশা** (Log phase) বলে। এই বৃদ্ধিতে প্রাণীদেহের সব কলা ও অঙ্গ অংশগ্রহণ করে। উদ্ভিদের মতো শুধুমাত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গের বৃদ্ধি হয় না। প্রাণীদেহের সব অঙ্গের বৃদ্ধি হতে থাকে। তবে সব অঙ্গের বৃদ্ধি একই হারে হয় না। কোনো কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে আবার কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছানোর সময় মাথা অপেক্ষা ধড়, হাত ও পা দ্রুত গতিতে বাড়ে। এর পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। একে **বিলম্বিত দশা** (Decelerating phase) বলা হয়। সব শেষে বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই দশাকে **স্থায়ী দশা বা স্থিতিশীল দশা** (Stationary phase) বলে। এই দশায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত ধ্রুবক থাকে। বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী বৃদ্ধির হার ও সময়ের অনুপাত নির্ভর লেখচিত্র বা গ্রাফ (Graph) তৈরি করলে সেটি ইংরেজি বর্ণ 'S'-এর মতো দেখায়। বৃদ্ধির এই ধরনের লেখচিত্রকে **সিগময়েড কার্ভ** (Sigmoid curve) বলে।

চিত্র 10.5 : বৃদ্ধির হার (সিগময়েড কার্ভ)

◘ বৃদ্ধির প্রকৃতি (Nature of growth) :
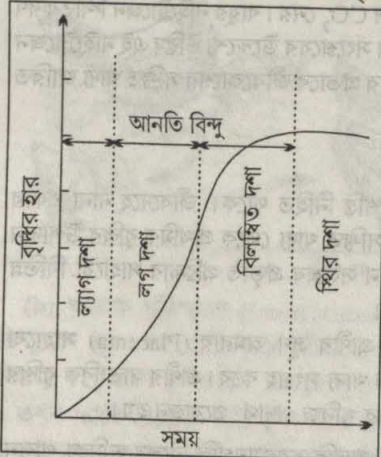
প্রাণীদেহে বৃদ্ধি সাধারণত **নিয়ত** (Determinate) বলে সব স্থানেই একই সঙ্গে ঘটে; আজীবন চলে না—নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে বন্ধ হয়ে যায়; উদ্ভিদদেহে এই বৃদ্ধি **অনিয়ত** (Indeterminate), কারণ এই বৃদ্ধি উদ্ভিদের নির্দিষ্ট স্থানে (মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ, পত্রমূলে) আজীবন ঘটে। বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদদেহে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভাজক কলার বিভাজন, অপত্য কোশের রূপান্তর ও পরিবর্তনের ফলেই এই নতুন অঙ্গের সূচনা হয়।

চিত্র 10.6 : আর্ক ইন্ডিকেটার।

◘ বৃদ্ধির স্থান (Site of growth) :

1. **উদ্ভিদের ক্ষেত্রে**—এককোশী উদ্ভিদে কোশটির ধীরে ধীরে আয়তন বেড়ে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বহুকোশী ও উন্নত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি সব স্থানে সমান ভাবে হয় না। সাধারণত বৃদ্ধি কাণ্ড ও মূলের শীর্ষে, পত্রবৃন্তে এবং কুঁড়িতে সীমাবদ্ধ থাকে। এসব বৃদ্ধি অঞ্চলগুলিতে **ভাজককলা** (Meristem) থাকে। ভাজককলার কোশগুলি স্বাভাবিকভাবে ক্রমাগত বিভাজিত হয় এবং কোশের সংখ্যা বাড়ে এবং পরিণত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার **আর্ক ইন্ডিকেটার** (Arc indicator), **অক্সানোমিটার** (Auxanometer) প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে সহজেই পরিমাপ করা যায়।

2. **প্রাণীদের ক্ষেত্রে**— নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেহের সমস্ত অঙ্গে বৃদ্ধি চলে। উদ্ভিদের মতো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ

থাকে না। ভ্রূণের পরিস্ফুরণে প্রাণীদেহের অঙ্গগুলি সংযোজিত হয় অর্থাৎ জন্মানোর পরই সব অঙ্গগুলি প্রাণীদেহে থাকে, কোনো নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয় না। কোশ বিভাজন ও কোশের আয়তন বেড়ে প্রাণীদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে।

▲ বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ (Growth and Development) :

এককোশী ও বহুকোশী জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে। এককোশী জীবের বৃদ্ধি একটি কোশের আয়তন বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বহুকোশী জীবের কোশ বিভাজন এবং অপত্য কোশের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইসব অপত্য কোশ থেকে ক্রমশ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। বৃদ্ধির যে পর্যায়ে একটি কোশ থেকে মাইটোটিক বিভাজন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহুকোশী জীবের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে তাকে **পরিস্ফুরণ** বলা হয়।

✪ 10.3. বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের মধ্যে পার্থক্য ✪ (Difference between Growth and Development)

বৃদ্ধি	পরিস্ফুরণ
1. এই প্রক্রিয়ায় কোশের বা দেহের সামগ্রিক আয়তন বাড়ে, কোনো ভ্রূণ সৃষ্টি হয় না।	1. এই প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম্বাণু কয়েক প্রকার ভ্রূণ গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়।
2. জীবের জীবনের যে-কোনো দশায় বৃদ্ধি ঘটে।	2. জীবের জীবনচক্রের শুধুমাত্র ভ্রূণ দশাগুলির পরিস্ফুরণ ঘটে।
3. বৃদ্ধির জন্য পরিস্ফুরণের প্রয়োজন হয় না।	3. পরিস্ফুরণের জন্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।
4. এই প্রক্রিয়ায় কোশের গুণগত কোনো পরিবর্তন হয় না।	4. এই প্রক্রিয়ায় কোশের গুণগত পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে।
5. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-কোনো সময় বৃদ্ধি ঘটতে পারে।	5. জীবনচক্রে শুধুমাত্র ভ্রূণদশাগুলি গঠনের সময় পরিস্ফুরণ ঘটে।

○ রূপান্তর (Metamorphosis) ○

➧ **সূচনা (Introduction) :** যৌন জননে অংশগ্রহণকারী প্রাণীদের জাইগোট (Zygote) গঠনের মাধ্যমে জীবন শুরু হয়। জাইগোটটি উপর্যুপরি বহুবার মাইটোসিস্ পদ্ধতির সাহায্যে বিভাজিত হতে থাকে এবং ভ্রূণ দশার সৃষ্টি হয়। এই ভ্রূণ দশার পরিস্ফুরণ (Development) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঘটে ফলে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত হয়। প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণে ভ্রূণ দশা থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠিত হয়। যেমন—স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি ইত্যাদি, কিন্তু পরোক্ষ পরিস্ফুরণে প্রাণীর ডিম থেকে একটি মধ্যবর্তী প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ (Pre-adult), স্বাধীনজীবী একটি দশার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনকারী এই খাদক দশার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন বা রূপান্তরের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহ গঠিত হয়।

✪ 10.4. রূপান্তরের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও হরমোনের ভূমিকা ✪ (Definition, Types and Role of Hormones in Metamorphosis)

❖ (a) **রূপান্তরের সংজ্ঞা (Definition of Metamorphosis) : প্রাণীর জীবনচক্রে যে প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ অন্তবর্তী, প্রাকপূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীনজীবী দশা সৃষ্টি হয় যার আকৃতি ও গঠন পরিবর্তিত হয়ে শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীদেহ গঠিত হয় তাকে রূপান্তর (Metamorphosis) বলে।**

রূপান্তরের সাহায্যে একটি প্রাণীর প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশার দেহের কিছু অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলোপ ঘটে এবং পূর্ণাঙ্গ দশার উপযোগী এবং কার্যকরী কিছু অঙ্গ গঠিত হয়। প্রধানত পতঙ্গ এবং উভচর শ্রেণির প্রাণীদের জীবনচক্রে রূপান্তর দেখা যায়।

◘ (b) **রূপান্তরের প্রকারভেদ (Types of Metamorphosis)** : প্রাণীর জীবনচক্রে প্রধানত দু'ধরনের রূপান্তর ঘটে, যেমন— অসম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ রূপান্তর।

1. **অসম্পূর্ণ রূপান্তর** (Incomplete Metamorphosis) **: সংজ্ঞা—যে ধরনের রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ (Pre-adult), স্বাধীনজীবী (Free living) দশা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে।**

অসম্পূর্ণ রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশাটিকে নিম্ফ (Nymph) বলে। নিম্ফ খোলস (Moulting) ত্যাগ করে এবং কয়েকটি দশা (Instar) গঠনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে কোনো লার্ভা ও পিউপা (Pupa) দশার সৃষ্টি হয় না এবং প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশাটি সর্বদাই স্বাধীনজীবী ও খাদক অবস্থায় থাকে।

যে সমস্ত প্রাণীদের জীবনচক্রে অসম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে তাদের **হেমিমেটাবোলাস** (Hemimetabolous) প্রাণী বলে। **উদাহরণ**— আরশোলা, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল ইত্যাদি।

2. **সম্পূর্ণ রূপান্তর** (Complete Metamorphosis) ঃ **সংজ্ঞা**—যে ধরনের রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীনজীবী দশা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো দেখতে হয় না তাকে **সম্পূর্ণ রূপান্তর** বলে। সম্পূর্ণ রূপান্তরে প্রাক্-পূর্ণাঙ্গ দশাটিকে **লার্ভা** বা ক্যাটারপিলার (Caterpillar) বা ম্যাগট (Maggot) বলে। লার্ভা দশা কয়েকবার খোলস ত্যাগ (Molting) করে এবং দেহ গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে **পিউপা** (Pupa) দশায় পরিণত হয়। পিউপা দশাতে প্রাণীটি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। এই সময় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহগঠনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয় এবং পরিশেষে পিউপার খোলস কেটে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়।
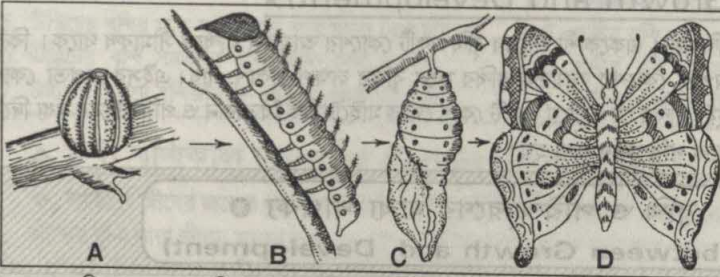
চিত্র 10.7 ঃ প্রজাপতির পরোক্ষ পরিস্ফুরণের চিত্ররূপ— (A)- ডিম, (B)- লার্ভা, (C)- পিউপা এবং (D)- পূর্ণাঙ্গ।

যে সমস্ত প্রাণীদের জীবনচক্রে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে তাদের **হোলোমেটাবোলাস** (Holometabolous) প্রাণী বলে। **উদাহরণ**— প্রজাপতি, মথ, মাছি, মশা ইত্যাদি।

◻ (c) রূপান্তর প্রক্রিয়ায় হরমোনের ভূমিকা (Role of Hormones in metamorphosis) ঃ

প্রাণীর জীবনচক্রের রূপান্তরে হরমোনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। বিশেষ করে ক্রাসটেসিয়ান (Crustaceans) এবং পতঙ্গের (Insects) মোল্টিং বা খোলস ত্যাগের সময় এই সব হরমোনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, যেমন—

1. খোলস ত্যাগের সময় **একডাইসোন** (Ecdysone) নামে একটি স্টেরয়েড হরমোন প্রয়োজন হয়। একডাইসোন পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণীদের **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic gland) থেকে নিঃসৃত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এই প্রাণীদের মস্তিষ্কের **নিউরোসিক্রেটারি কোশ** (Neuro-secretory cell) **প্রোথোরাসিকোনিউরোট্রফিক** (Pro-thoraciconeurotrophic) হরমোন ক্ষরণ করে যা প্রোথোরাসিক্ গ্রন্থিকে একডাইসোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। 2. পতঙ্গশ্রেণি প্রাণীদের মস্তিষ্কের কাছে অবস্থানকারী করপোরা এলাটা (Corpora allata) গ্রন্থি থেকে **জুভেনাইল হরমোন** (Juvenile hormone) নামে একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন প্রাণীর রূপান্তরে বাধা দেয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে খোলস ত্যাগের সময় জুভেনাইল হরমোনের ক্ষরণ খুবই কম মাত্রায় হয় অথবা ক্ষরণ একেবারেই হয় না।

• **ব্যাঙের জীবনচক্রে রূপান্তর (Metamorphosis in the life cycle of Frogs)** ঃ ব্যাঙের জীবনচক্রে ডিম থেকে লার্ভা বা ব্যাঙাচি (Tadpole) সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচি স্বাধীনজীবী একটি অপরিণত দশা। ব্যাঙাচির পরিস্ফুরন তিনটি দশায় ঘটে, যেমন—

(i) **প্রিমেটামরফোসিস্** (Premeta-morphosis)—এই সময় ব্যাঙাচির দেহের বৃদ্ধি ঘটে।
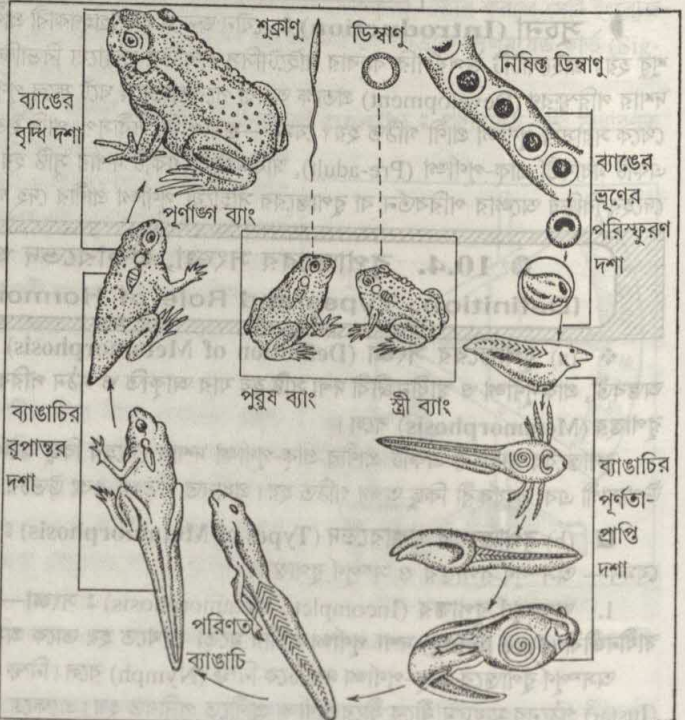
চিত্র 10.8 ঃ কুনো ব্যাঙের জীবন চক্রের বৃদ্ধি, পরিণতি এবং রূপান্তর দশাগুলির চিত্ররূপ।

(ii) প্রোমেটামরফোসিস্ (Prometamorphosis)—এই সময় ব্যাঙাচির পশ্চাদপদ গঠিত হয়।

(iii) মেটামরফিক ক্লাইম্যাক্স (Metamorphic climax)—এই সময় ব্যাঙাচি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাং সৃষ্টি হয়। এই দশায় অগ্রপদ গঠিত হয়, ঠোঁট বিনষ্ট হয়, মুখছিদ্র প্রশস্ত হয় এবং লেজ অপসারিত হয় বা সংকুচিত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন হরমোন** (Thyroxine hormone) ব্যাঙাচির রূপান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

○ বয়ঃপ্রাপ্তি (Ageing) ○

সূচনা (Introduction) ঃ প্রত্যেক জীবের জীবন চক্র একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শেষ হয়। সব জীব জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। জীব তাদের জীবন দশায় নানা পরিবর্তন অতিক্রম করে বার্ধক্যপ্রাপ্তি লাভ করে এবং অবশেষে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের যে শাখায় বার্ধক্য, জরা ও তার পরিণতি সম্বন্ধে আলোচিত হয় তাকে গেরেন্টোলজি (Gerentology) বলে। আপাতদৃষ্টিতে **বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তি** দুটো কথা একই রকমের মনে হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। নীচে বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল।

◎ 10.5. বার্ধক্যপ্রাপ্তি ও বয়ঃপ্রাপ্তি (Senescence and Ageing) ◎

▲ বার্ধক্যপ্রাপ্তি (Senescence) ঃ

❖ **বার্ধক্যপ্রাপ্তির সংজ্ঞা (Definition of Senescence) ঃ জীবদেহের পরিণত অবস্থা থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে দেহের যে অবনতিজনিত পরিবর্তন ঘটে ও জীবনকাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাকে বার্ধক্যপ্রাপ্তি বলে।**

➤ A. উদ্ভিদের বার্ধক্য (Senescence in Plants) ঃ

একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল গঠন করে পরিণত হয়। এরপর ক্রমশ বার্ধক্য আসে। বার্ধক্য দশাতে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যু ঘটে। পরিণত দশা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালকে **বার্ধক্য দশা** বা **সেনিসসেন্স** বলে।

(a) **উদ্ভিদের বার্ধক্যপ্রাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণ ও পরিবর্তন (Different symptoms and changes of senescence)**— সব উদ্ভিদের বার্ধক্য একরকম ভাবে আসে না। তাই এদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

1. **সম্পূর্ণ উদ্ভিদের বার্ধক্য** (Whole plant senescence)— যেসব উদ্ভিদ জীবনে একবার ফুল ও ফল ধারণ করে মরে যায় তাদের বার্ধক্য সমগ্র উদ্ভিদে একই সঙ্গে আসে। ফল পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আয়ুও শেষ হয়। **উদাহরণ**—একবর্ষজীবী উদ্ভিদ, যেমন—ধান, গম, ছোলা, সয়াবীন ইত্যাদি। দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদের মধ্যে মুলো ও সরষে। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মধ্যে বাঁশ (*Bambusa*), অ্যাগেভ (*Agave*) প্রভৃতি।
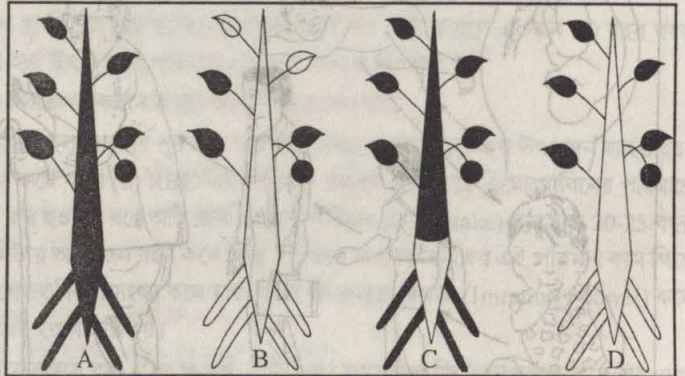
চিত্র 10.9 ঃ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বার্ধক্য ঃ A-সম্পূর্ণ উদ্ভিদের বার্ধক্য, B-উদ্ভিদ অঙ্গের বার্ধক্য, C-উদ্ভিদ কান্ডের ও পাতার বার্ধক্য, D-উদ্ভিদের পাতার বার্ধক্য (উদ্ভিদের কালো অংশগুলি বার্ধক্যপ্রাপ্ত বোঝানো হয়েছে)।

2. **উদ্ভিদ অঙ্গের বার্ধক্য** (Plant organ Senescence)—যেসব উদ্ভিদে বহুবার ফুল-ফল হয়, তাদের মৃত্যু ফুল-ফলের সঙ্গে জড়িত নয়। এদের কোনো অঙ্গ, যেমন—কাণ্ড, পাতা, ফল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নষ্ট হতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে সমগ্র উদ্ভিদের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। অঙ্গের বার্ধক্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(i) **কান্ডের বার্ধক্য** (Stem Senescence)— কোনো-কোনো বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদে মাটির উপরের অংশ প্রতিবছর মরে যায় কিন্তু নীচের অংশ জীবিত থাকে। একে **কান্ডের বার্ধক্য** বলে। **উদাহরণ**—গ্লেডিওলাস (*Gladiolus*), কলা (*Musa*) প্রভৃতি।

(ii) **যুগপৎ পত্র-বার্ধক্য** (Simultaneous leaf Senescence)— কাষ্ঠাল পর্ণমোচী উদ্ভিদের পাতা বছরের একটি ঋতুতে ঝড়ে যায়। এই পাতা ঝড়া বা অন্যান্য অঙ্গ খসে পড়াকে **যুগপৎ পত্র-বার্ধক্য** বলে। **উদাহরণ**—আপেল (*Pyrus*), ওল (*Amorphophallus*) প্রভৃতি।

(iii) **ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন বা ধারাবাহিক বার্ধক্য** (Sequential Senescence)— এইপ্রকার বার্ধক্যে পরিণত পাতাগুলি ঝরে পড়ে। এসব উদ্ভিদের পাতার জীবন পরিসর সীমিত—সেই কারণে বৃক্ষগুলি লম্বায় বাড়ে এবং নীচের দিকের পাতাগুলি ঝরে যায়। একই ভাবে নতুন পাতা জন্মায় এবং পুরানো পাতা খসে পড়ে। **উদাহরণ**—শিশু (*Dalbergia*), শাল (*Shorea*) প্রভৃতি।

(b) **উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণ (Physiological causes of Senescence)** ঃ বার্ধক্য হল উদ্ভিদের সব অঙ্গের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বহু পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তন হল—(i) কোশের আকৃতি হ্রাস পায় এবং কোশপর্দায় আবদ্ধ অঙ্গাণুগুলির (রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাসমিক জালিকা, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি) কর্মক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। (ii) সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায় ও শর্করার পরিমাণ হ্রাস পায়। তা ছাড়া শ্বসনের হার কমে যায়। (iii) ক্লোরোফিল তৈরি হয় না ও অ্যাম্থোসায়ানিনের সঞ্চয় বেড়ে যায়। (iv) প্রোটিন কম তৈরি হয়। (v) পাতা ঝরে পড়ার আগে পুষ্টিদ্রব্যগুলি কান্ডে সঞ্চারিত হয়। (vi) ক্রোমাটিন বস্তুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। (vii) উদ্ভিদের আত্তীকরণ ক্ষমতা (Assimilative power), প্রোটিন, RNA ও DNA-এর উপচিতিকর পদ্ধতির হ্রাস ঘটে।

➤ B. প্রাণীর বার্ধক্য (Senescence in Animals) ঃ

প্রাণীর ক্ষেত্রে মুখ্য বৃদ্ধিকাল অতিক্রম করে বিরতিকাল (Stationary) আসে। এরপর থেকে ক্রমশ বার্ধক্য আসে। বার্ধক্য থেকে দেহের ক্ষয়জনিত পরিবর্তন ঘটে ও শেষে মৃত্যু হয়। এখানে হাজার হাজার প্রাণীর বার্ধক্য আলোচনা না করে মানুষের বার্ধক্য আলোচনা করা হল। মানুষের বার্ধক্য আরম্ভ হয় সাধারণত 40 বছর বয়সের পর। বার্ধক্য দশায় পরিবেশের একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। মানুষের বার্ধক্যের লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হল—
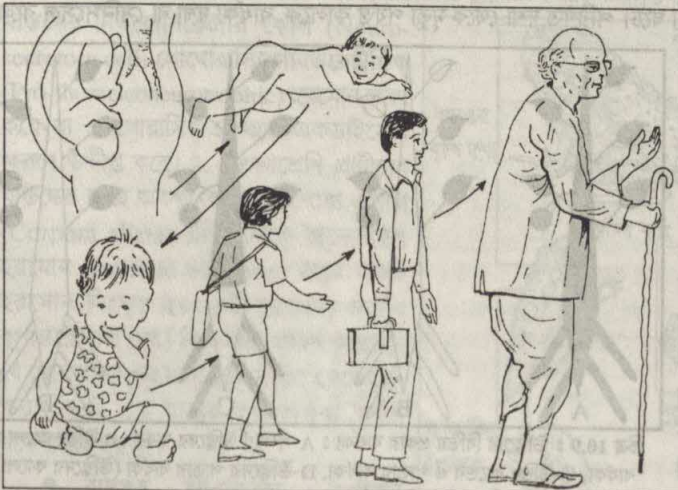
চিত্র 10.10 ঃ মানুষের ভ্রূণাবস্থা থেকে বার্ধক্যের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্ররূপ।

(i) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চুল পাকে। (ii) চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে আসে ফলে কম এবং অল্প আলোতে পড়াশুনো করতে পারে না। (iii) শ্রবণ ক্ষমতা কমে যায়। (iv) জিভের স্বাদকুঁড়িগুলির সংবেদনশীলতা ক্রমশ নষ্ট হয়ে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। (v) ঘ্রাণ ক্ষমতা কমে আসে। (vi) পেশির কোশের পরিবর্তন ঘটে। পেশি কোশগুলির স্থিতিস্থাপকতাও নষ্ট হয়, এর ফলে পেশি শিথিল হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অস্থির ক্যালসিয়াম নষ্ট হয় বলে সহজে হাড় ভেঙে যায়। স্ত্রীলোকের মাসিক যৌন চক্র বন্ধ হয়ে যায়। (vii) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। মস্তিষ্কের নার্ভকোশের অপজনন (Degeneration) ঘটে। (ix) হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও বৃক্কের কাজ ও ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। এইভাবে ক্ষয়ক্ষতি হতে হতে একসময়ে শারীরবৃত্তীয় কাজ বন্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটে।

▲ বয়ঃপ্রাপ্তি (Ageing) ঃ

জীবের জীবনের পূর্ণাঙ্গ দশা থেকে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ হওয়াকে **বয়ঃপ্রাপ্তি** বলে। এর সঙ্গে মৃত্যু জড়িত নয়। সব জীবই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্রমশ বৃদ্ধ হতে থাকে। তবে কেন বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে তা এখনো সঠিক ভাবে জানা যায়নি। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া।

গেরেন্টোলজি (Gerentology) হল বিজ্ঞানের একটি শাখা। এই শাখা অধ্যয়ন করলে বয়ঃপ্রাপ্তি বা এজিং সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যায়।

❖ **বয়ঃপ্রাপ্তির সংজ্ঞা (Definition of Ageing) : যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কোশ, কলা ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কার্যাবলির ক্রমশ অবনতির ফলে যে পরিবর্তন আসে তাকে বয়ঃপ্রাপ্তি বলে।**

➤ A. উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তি (Ageing of Plants) :

প্রাণীর বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় সব অঙ্গের একই সঙ্গে অবনতি ঘটতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটা, জনন ও বীজের পরিণতির পর সব অঙ্গ একসঙ্গে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় না অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তি একসঙ্গে হয় না। উদ্ভিদের বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তনগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(i) বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান লক্ষণ—পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ফলে পাতাগুলি হলুদ হয়ে যায়। (ii) পাতার ক্লোরোপ্লাস্টিডের গ্রাণার পর্দার বিনষ্ট হয় এবং রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা প্রভৃতি কোশের অঙ্গাণুগুলির কাজ ব্যাহত হয়। অবশেষে মাইটোকনড্রিয়ার সক্রিয়তা নষ্ট হয়। (iii) উদ্ভিদ কোশের বিপাকীয় কাজ সঠিকভাবে ঘটে না। (iv) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি হ্রাস পায়। (v) প্রোটিনের পরিমাণ কমতে থাকে। তা ছাড়া প্রোটিন, RNA ও DNA-এর উপচিতিকর কাজ হ্রাস পায়। (vi) পরবর্তী পর্যায়ে অনেকগুলি অঙ্গের কোশবিভাজন প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় ও DNA অণু বিনষ্ট হয়। (vii) পরিশেষে উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা শুকিয়ে যায় এবং ফুল, ফল প্রভৃতির ধারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়।

➤ B. প্রাণীর বয়ঃপ্রাপ্তি (Ageing of Animals) :

প্রাণীর মধ্যে বিশেষ করে মানুষের বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণগুলি সহজেই লক্ষ করা যায়। মানুষের বার্ধক্য দশার সঙ্গে অঙ্গসংস্থানগত, শারীরবৃত্তীয়, কোশীয় ও অকোশীয় সব কিছুর রূপান্তর ঘটে। নীচে বার্ধক্যজনিত শারীরিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হল।

● **মানুষের দেহে শারীরবৃত্তীয় কয়েকটি পরিবর্তন (Some Physiological changes in human) :**

1. **হৃৎপিণ্ড**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা অনেকটা কমে যায়। এই কারণে একজন 70 বছর বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক 25 বছর মানুষের তুলনায় হার্দ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 65 শতাংশ কম হয়।

2. **রক্তবাহ**—বয়স্ক মানুষের রক্তনালির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় বলে, রক্তের চাপ বাড়ে।

3. **রক্ত**— (i) অধিকাংশ অস্থি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হলুদ মজ্জায় পূর্ণ হয়ে যায় বলে মজ্জা থেকে RBC-এর উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণে রক্তের পরিমাণ (Blood volume) কমে যায়। (ii) RBC-এর পরিমাণ কম হয় বলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণে হ্রাস ঘটে। (iii) রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম হওয়ায় রক্তে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ (O_2-Uptake) কম হয়। 20-25 বছর বয়সে দেহের সম্পূর্ণ রক্ত প্রতিমিনিটে প্রায় 4 লিটার অক্সিজেন বহন করে কিন্তু 75 বছর বয়সের মানুষের এই পরিমাণ কমে গিয়ে প্রায় 1·4 লিটার হয়। (iv) রক্তে লিম্ফোসাইট শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যায়, ফলে অনক্রম্যতা ক্ষমতা (Immunity power) কমে যায়। এই কারণে সামান্য সংক্রমণে দেহে সহজেই রোগ সৃষ্টি হয়।

4. **ফুসফুস**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসে বায়ু ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং এই কারণে বিভিন্ন কলাকোশে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হয়।

5. **বৃক্ক**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় নেফ্রনের সংখ্যা কমে যায় ফলে মূত্র উৎপাদন এবং মূত্রের রেচনের পরিমাণ ব্যাহত হয়। এছাড়া নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস এবং বৃক্ক নালিকার কার্য ক্ষমতা হ্রাস ঘটে ফলে বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে নানা প্রকার রোগ, যেমন—গ্লাইকোসুরিয়া, ইউরেমিয়া ইত্যাদি ঘটে।

6. **পরিপাক তন্ত্র**—বৃদ্ধ বয়সে (i) জিভে স্বাদ কোরক (Taste buds)-এর সংখ্যা প্রায় স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় $1/3$ অংশ কমে যায়। (ii) পাচক রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এছাড়া পাচক রসের বিভিন্ন উৎসেচকের পরিমাণ কমে যায়। (iii) উৎসেচকের অভাবে দেহে বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই সব কারণের জন্য ক্ষুধামান্দ্য, খাদ্য গ্রহণে অনীহা, হজমে গণ্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস-অম্বল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

7. ত্বক— বৃদ্ধ বয়সে দেহকোশের সক্রিয়তা হ্রাস হওয়ায় এই সব কোশের জল ধারণ ক্ষমতা (Retention of water) কমে যায়। এই কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং কুঁচকে যায়।

8. পেশি—পেশিতন্তু এবং স্নায়ু পেশির সংযোগ স্থানের জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে পেশি কলার অপজনন (Degeneration) ঘটে। এর ফলে পেশিটান, পেশির সংকোচন ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায়।

9. অস্থি—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিগুলি ক্ষণভঙ্গুর হয় ফলে সহজেই ভাঙার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ অস্থিতে অজৈব পদার্থের সঞ্চয় ঘটে। এছাড়া অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হতে থাকে। এর ফলেও অস্থি ক্ষণভঙ্গুর ও নরম হয়। তা ছাড়া শিরদাঁড়া বেঁকে যায় ফলে বৃদ্ধ বয়সে অনেকে কুঁজো হয়ে যায়।

10. স্নায়ুতন্ত্র—বয়স্কলোকের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোশ বা নিউরোনের সংখ্যা কমে যায়। ফলে মস্তিষ্কের ওজন প্রায় 56 শতাংশ কমে যায়। ভুলে যাওয়া, স্মৃতি শক্তির অবনতি অর্থাৎ মনে না রাখা (Memory loss) ইত্যাদি ঘটে। স্নায়ুর মধ্য দিয়ে স্নায়ু আবেগের (Nerve impulse) পরিবহনের গতি প্রায় 85% কমে যায়।
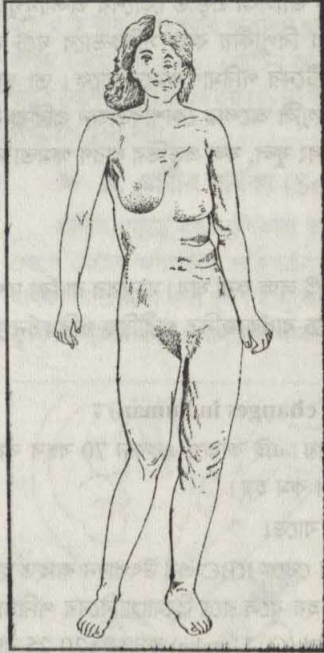
চিত্র 10.11 ঃ তুলনামূলক চিত্র—চিত্রের বাঁ দিকের অংশটি একজন 30 বছর বয়সের স্ত্রীলোকের এবং ডান দিকের অংশটি এক জন 75 বছর বয়সের বৃদ্ধার কয়েকটি অঙ্গসংস্থানগত পরিবর্তনের চিত্ররূপ।

11. চোখ, কান, নাক ও জিভ— (i) চোখের অভিযোজন (Accommodation) ক্ষমতা কমে যায় ফলে খালি চোখে বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না। (ii) শ্রবণ ক্ষমতা কমে যায় ফলে স্বাভাবিক কথোপকথন শুনতে অসুবিধা হয়। (iii) জিভে স্বাদ-কোরক নষ্ট হয়ে যায় বলে খাদ্যবস্তুর স্বাভাবিক স্বাদের অনুভূতি ব্যাহত হয়।

● **বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের পরিবর্তন (Cellular changes due to Ageing) ঃ**

1. **প্লাজমামেমব্রেন**—বার্ধক্য কোশের প্লাজমামেমব্রেনের ভেদ্যতা কমে যায়। মেমব্রেনের ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের ফলে ভেদ্যতা বাড়ে।

2. **মাইটোকনড্রিয়া**—পুরাতন কোশের মাইটোকনড্রিয়ার অপজনন (Degeneration) ঘটে ফলে কার্বোহাইড্রেট বিপাক প্রধানত (ক্রেবস চক্র) কমে যায়।

3. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম**—বয়ঃবৃদ্ধির ফলে কোশের সাইটোপ্লাজমে দানাদার (অমসৃণ রাইবোজোমযুক্ত) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সংখ্যা কমে যায়। রাইবোজোমের অভাবে দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়।

4. **নিউক্লিয়াস**—নিউক্লিয়াসটি কুঁচকে আকৃতিতে ছোটো হয়। কারণ নিউক্লিয়াস থেকে জল-বিয়োজন ঘটে, ফলে ক্রোমাটিন সূত্রগুলি ঘনীভূত হয়। এই প্রকার নিউক্লিয়াসকে পিকনোটিক নিউক্লিয়াস (Pyknotic nucleus) বলে। এই কারণে DNA-এর রেপ্লিকেশন কমে যায়।

5. **রঞ্জক পদার্থের সঞ্চয়**—বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ রঞ্জক পদার্থের অর্থাৎ লাইপোফুসিন (Lipofuscin), হরিদ্রাভ রঞ্জক সঞ্চয় ঘটে। কারও কারও মতে বার্ধক্য কোশে ক্যালসিয়াম, বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ, অন্যান্য নিষ্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি সঞ্চিত হয়।

6. **DNA এবং RNA**—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকোশের ক্রোমোজোমের ত্রুটির (Chromosomal aberration) এবং gene mutation ফলে DNA এবং RNA গঠনের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে কোশে উৎসেচকের সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়।

● **বার্ধক্যের তত্ত্ব (Theory of Ageing)**—বার্ধক্য সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। নীচে সংক্ষেপে তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হল।

1. **ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তত্ত্ব (Wear and Tear theory)**—এই তত্ত্ব অনুসারে কোশের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বার্ধক্য আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মৃত্যু ঘটে। এই তত্ত্ব এখন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ নতুন নতুন কোশ পুরানো কোশের স্থান দখল করে। তা ছাড়া DNA তন্ত্র বিনষ্ট হলে সেখানে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।

2. **অস্বাভাবিক দেহকোশ তত্ত্ব (Abnormal body cell theory)**—এই তত্ত্ব অনুসারে দেহে কতকগুলি অস্বাভাবিক কোশ গঠিত হয়। এর ফলে বার্ধক্য দেখা দেয়। দেহের লক্ষ লক্ষ কোশের মধ্যে যেগুলি মৃত কোশে পরিণত হয়, তাদের জায়গায় সেই গুণসম্পন্ন কোশ গঠিত হয় না। কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় এবং পরে এরা অস্বাভাবিক কোশে পরিণত হয়।

3. **দেহকোশের পরিব্যক্তি তত্ত্ব** (Somatic mutation theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে দেহকোশে জিনপরিব্যক্তি সঞ্চয়ের ফলে কলা ও কোশের কার্য ক্ষমতার পরিবর্তন হয় ও হ্রাস পায়। দেহকোশে পরিব্যক্তি ঘটানোর জন্য কতকগুলি দূত (Agent) আছে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বার্ধক্য তাড়াতাড়ি আসে। অর্থাৎ কোশের আয়ু কমে যায়।

4. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তত্ত্ব** (Immunity theory)—এই তত্ত্ব অনুসারে বার্ধক্য আসে কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। মাঝ বয়সে **থাইমাস গ্রন্থির** (Thymus gland) বৃদ্ধি ও অবলুপ্তির জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

5. **মৃত্যুজিন তত্ত্ব** (Death genes' theory)—বংশগতির ধারার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে মৃত্যু আসে। তার কারণ কোশের DNA অণুর মধ্যে মৃত্যুর বার্তা বাহিত হয়। জেনেটিক ক্লক্ই (Genetic clock) নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু ঘটায়।

6. **বার্ধক্যের আণবিক তত্ত্ব** (Molecular basis of Ageing)—এই তত্ত্ব অনুসারে বার্ধক্যের প্রধান কারণ হল জীবদেহে জিনের আন্তঃক্রিয়ার ফলশ্রুতি। বংশগতির বাহক জিন ও পরিবেশের প্রভাবে, DNA থেকে প্রোটিন সংশ্লেষের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে জিনের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলি ব্যাহত হয়। অতঃপর বার্ধক্য এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

✪ 10.6. মোচন বা ঝরে পড়া (Abscission) ✪

পরিণত উদ্ভিদে নির্দিষ্ট সময়ে অনেকগুলি অঙ্গের মোচন হয়। নিম্নশ্রেণির সংবহনকলাযুক্ত উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ খসে পড়ে না। এদের অঙ্গগুলি পরিণত ও পরিপক্ব হলে শুকিয়ে যায় বা মরে যায়। কিন্তু উচ্চশ্রেণির সংবহন কলাযুক্ত উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলির মোচন হয়, যেমন—বাকল, পাতা, ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং ফল।

❖ (a) **মোচনের সংজ্ঞা (Definition of Abscission) ঃ নির্দিষ্ট সময়ে পরিণত উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় অঙ্গ যেমন—পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি উদ্ভিদদেহ থেকে খসে পড়ে, অথবা পরিত্যাগ করে তাকে মোচন বলে।**

◘ (b) **উদ্ভিদের পত্রমোচন প্রক্রিয়া (Leaf Abscission Mechanism)** ঃ পত্রমোচন (Leaf fall) ব্যক্তবীজী ও কাষ্ঠল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পর্ণমোচী উদ্ভিদে শীতকালের প্রারম্ভে গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে। চিরহরিৎ উদ্ভিদে পাতা খসে পড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট ঋতু নেই। এদের পাতা যে-কোনো ঋতুতে খসে পড়তে পারে। পাতা খসে পড়ার আগে পত্রমূলের (Leaf base) গোড়ায় কতকগুলি অভ্যন্তরীণ গঠনগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই লক্ষণগুলি হল—

(i) পত্রমূলে পত্রমোচনের আগে যোজকস্তর গঠিত(Abscission) হয়। এই সময় পাতা পরিণত হয় এবং ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তা ছাড়া উদ্ভিদের বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি ও পাতায় সঞ্চারিত হয়। পাতা খসে পড়ার সময় উদ্ভিদ বর্জ্য পদার্থগুলিও ত্যাগ করে।

(ii) একক পত্রযুক্ত উদ্ভিদে যোজকস্তর পত্রমূলের গোড়ায় গঠিত হয়। কিন্তু যৌগিক পত্রের বেলায় পত্র অক্ষের গোড়ায় অথবা পত্রকের নীচে যোজক গঠন করে।

চিত্র 10.12 ঃ পাতার যোজকস্তর— A-পত্রবৃন্তের যোজকস্তর, B-যোজকস্তরের অভ্যন্তরীণ গঠন, C-বৃন্তের বিভেদস্তরের গঠন।

(iii) এরপর যোজকস্তর একটি সুস্পষ্ট **বিভেদস্তর** (Separation layer) গঠন করে। এই বিভেদস্তর পাতা খসে পড়ার প্রধান কারণ বলা যায়।

(iv) যোজকস্তর পাতার সব থেকে দুর্বল স্থান। এই অঞ্চলের নালিকা বান্ডিলের পরিধি অনেকটা কম থাকে। এই স্তরে স্ক্লেরেনকাইমা ও কোলেনকাইমা থাকে না। কোনো কোনো কোশে সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব বাড়ে। যোজকস্তরের কোশগুলি

উপরের ও নীচের দিকের অন্যান্য কোশ থেকে আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কোশগুলির আকার ছোটো এবং এতে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চদানা থাকে। যোজকস্তরের নীচের দিকে নালিকা বান্ডিলের জাইলেম বাহিকাগুলির (Treachea or Vessel) গহ্বর টাইলোসিস (Tylosis) গঠন করে বন্ধ হয়ে যায়। টাইলোসিস হল বাহিকা সংলগ্ন সজীব কোশে বেলুনের মতো উপবৃদ্ধি। এতে নলের মতো বাহিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় পাতার রসস্ফীতি রক্ষা করার জন্য গৌণ কলাগুলির মাধ্যমে সংবহন অব্যাহত থাকে।

(v) পাতা খসে পড়ার আগে কোশগুলির মধ্যপর্দা ও বাইরের কোশ প্রাচীর স্ফীত হয় এবং ক্রমশ আঠালো পদার্থে পরিণত হয়। পাতা খসে পড়ার আগে আঠালো পদার্থ দ্রবীভূত হয় বা গলে যায়।

(vi) অবশেষে সংবহন কলার কোশ দিয়ে পাতাটি কাণ্ডের সঙ্গে সাময়িকভাবে লেগে থাকে। যোজকস্তরের কোশগুলি বিচ্ছিন্ন হলে পাতা বৃন্তের গোড়া থেকে বায়ুপ্রবাহে বা পাতার ভরে খসে পড়ে।

(vii) পাতা খসে পড়ার পর একটি ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয়। এই উন্মুক্ত ক্ষতস্থানটি ক্রমশ শুকিয়ে যায় অথবা ভাজক কলা বিভাজিত হয়ে একপ্রকার কোশ উৎপন্ন করে। এই কোশগুলিকে **কর্ক** (Cork) কোশ বলে। চিহ্নিত ক্ষতের বাহিকাগুলি মিউসিলেজ বা গঁদ দিয়ে আবৃত হয় এবং পরে ওই স্থানে লিগনিন ও সুবেরিন জমা হয়।

▫ (c) **পত্রমোচনে হরমোনের ভূমিকা (Role of hormone on Abscission) ঃ অ্যাব্‌সিসিক** অ্যাসিড (ABA) এবং ইথিলিন নামে দু'প্রকার হরমোন পত্রমোচনে অংশ নেয়। এই হরমোন দুটি পেক্টিনেজ এবং সেলুলেজ উৎসেচক দুটির সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে পত্রমোচন ঘটাতে সাহায্য করে।

✪ 10.7. ফেরোমোন (Pheromone) ✪

বিভিন্ন কারণে প্রাণীরা তাদের নিজেদের প্রজাতি প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর জন্য তারা নানারকম সংকেত বা পন্থার সাহায্য নেয়। এই যোগাযোগ রক্ষার সাহায্যে প্রাণীরা কোনো খাদক প্রাণীর উপস্থিতির সংকেত পাঠায় বা খাদ্যভাণ্ডারের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। অন্য কয়েকটি প্রজাতির প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে যৌন আবেদনে আকৃষ্ট করে, অথবা তাদের বসবাসের সীমানা নির্দেশ করে। এই সব আচরণের জন্য প্রাণীরা একপ্রকার **উদ্‌বায়ী রাসায়নিক পদার্থ** বা **সংকেত** (Signal) সৃষ্টি করে যার সাহায্যে একই প্রজাতির অন্য প্রাণীরা বিশেষ আচরণ প্রদর্শন করে। ফেরোমোন হল এই ধরনের একটি রাসায়নিক সংকেত (Chemical signal) যার সাহায্যে একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণী নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

❖ (a) **ফেরোমোনের সংজ্ঞা (Definition of Pheromone) ঃ যে উদ্‌বায়ী স্বল্প নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে একই প্রজাতির প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে সেই রাসায়নিক পদার্থকে ফেরোমোন বলে।**

▫ (b) **সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characters)** ঃ 1. ফেরোমোন বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এবং এই নিঃসরণ হরমোনের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। 2. ফেরোমোন রাসায়নিক সংকেত হিসাবে একই প্রজাতির প্রাণীদের ভিতরে কোনো বার্তা বহন করে। 3. ফেরোমোন সাধারণত একই প্রজাতির প্রাণীদের উপর ক্রিয়াশীল হয় এবং খুবই অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়। 4. ফেরোমোন সাধারণত কম আণবিক ভরযুক্ত এবং খুবই উদ্‌বায়ী। 5. ফেরোমোনগুলিকে **এক্টোহরমোনও** বলে।

● **ফেরোমোন ও হরমোনের ভিতর পার্থক্য (Difference between Pheromone and Hormone) ঃ**

ফেরোমোন	হরমোন
1. ফেরোমোন বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।	1. হরমোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়।
2. এগুলি কম আণবিক ভরযুক্ত উদ্‌বায়ী পদার্থ।	2. এগুলি বেশি আণবিক ভরযুক্ত কিন্তু উদ্‌বায়ী নয়।
3. এগুলি সাধারণত একপ্রকার রাসায়নিক সংকেত যা একটি প্রজাতির সব প্রাণীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।	3. এগুলি রাসায়নিক বার্তা হিসাবে একই প্রাণীতে অথবা একই বা ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীতে বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
4. এগুলি দেহের বাইরে নিঃসৃত হয় এবং বায়ুর মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।	4. এগুলি দেহের ভিতরে নিঃসৃত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে।

(c) ফেরোমোনের প্রকারভেদ (Types of Pheromones) ঃ কাজের ধারা অনুযায়ী ফেরোমোনগুলিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

1. **রিলিজার ফেরোমোন** (Releaser pheromone)—এই ফেরোমোনগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।
উদাহরণ—(i) পুরুষ ইঁদুরের মূত্রে উপস্থিত রিলিজার ফেরোমোন স্ত্রী ইঁদুরকে আকর্ষণ করে। (ii) পিঁপড়ে তাদের উদর অংশ থেকে ফরমিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে যা বিপদ সংকেত ফেরোমোন হিসাবে কাজ করে। (iii) পোল ক্যাট (Pole cat), অ্যান্টিলোপ (Antelope) ইত্যাদি প্রাণী কোনো কারণে ভয় পেলে স্যাক্রাল অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রন্থি থেকে ফেরোমোন নিঃসৃত করে। এই ফেরোমোনের বিপদসংকেত বার্তা অন্য প্রাণীরা পেলে তারা সচেতন হয় এবং স্থান পরিত্যাগ করে।

2. **প্রাইমার ফেরোমোন** (Primer pheromone)—যে ফেরোমোনগুলি গ্রহণ করে প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা বা দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবর্তিত হয় বা ক্রিয়াশীল থাকে তাদের **প্রাইমার ফেরোমোন** বলে।
উদাহরণ—(i) মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা ইত্যাদি প্রাণীরা একধরনের প্রাইমার ফেরোমোন প্রস্তুত করে যার সাহায্যে এরা নিজস্ব কলোনির সত্তা বজায় রাখে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) রানি মৌমাছি **কুইন বস্তু** (Queen substance) নামে একপ্রকার ফেরোমোন নিঃসরণ করে যার সাহায্যে স্ত্রী মৌমাছি বন্ধ্যা হয় এবং শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত হয়। (iii) উইপোকার দেহ থেকে সৃষ্ট **সামাজিক ফেরোমোন** (Social pheromone) তাদের কলোনি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

3. **ইমপ্রিন্টিং ফেরোমোন** (Imprinting pheromone) —যে ফেরোমোনগুলি পরিস্ফুরণের একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় কার্যশীল হয় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর স্থায়ী আচরণগত পরিবর্তন ঘটায় তাদের **ইমপ্রিন্টিং ফেরোমোন** বলে।
উদাহরণ—বিভিন্ন প্রকার ইঁদুরের এই ফেরোমোন সৃষ্টি হয়।

কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ফেরোমোন ও তার প্রয়োগ (Synthetic pheromone and its application)

বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে ফেরোমোন উৎপাদন করেছেন। এই ফেরোমোনগুলি পেস্ট দমনে এবং মথ, বিট্‌ল প্রভৃতি পতঙ্গ প্রাণীদের আকর্ষণ করে তাদের ফাঁদে ধরতে সাহায্য করে।

ফেরোমোনের কাজ (Functions of Pheromone) ঃ

1. ফেরোমোন যৌন আকর্ষণকারী বস্তু হিসাবে কাজ করে। যেমন—স্ত্রী রেশমমথ **"বম্বিকল"** (bombykoi) ফেরোমোন তৈরি করে যার সাহায্যে পুরুষ মথ আকৃষ্ট হয়।
2. মৌমাছি, উইপোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি প্রাণী **"কলোনি ওডর"** (Colony odour) গন্ধ তৈরি করে কলোনি সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।
3. পিঁপড়ের দেহ নিঃসৃত ফেরোমোন পিঁপড়ের যাতায়াতের পথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সাহায্য করে।

10.8. চারাগাছের বৃদ্ধি ও জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ভূমিকা (Growth of Seedlings and the role of Gibberellic acid)

পরিবেশ থেকে আলো, বাতাস, উষ্ণতা, জল ও অক্সিজেন প্রভৃতি প্রয়োজন মতো পেলে বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে জল শোষণ করে বীজ স্ফীত হয়। এর ফলে বীজত্বক ফেটে যায়। জল পেয়ে বীজকোশ প্রোটোপ্লাজমের শারীরবৃত্তীয় কাজ আরম্ভ করে। এই সময় শ্বসনের হার বেড়ে যায় এবং উৎসেচক ক্ষরিত হয়ে সঞ্চিত খাদ্যের বিপাক ক্রিয়া চালাতে থাকে। সঞ্চিত খাদ্য জলে দ্রবীভূত হয়ে বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyle), বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyle), ভ্রূণমুকুল (Plumule) ও ভ্রূণমূলে (Radical) যায়। খাদ্য পেরিস্পার্ম (Perisperm) থেকে সস্যে (Endosperm), সস্য থেকে বীজপত্রে (Cotyledon) এবং বীজপত্র থেকে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে যায়। সাধারণত অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় DNA সংশ্লেষ ও কোশ বিভাজন আরম্ভ হয়। অঙ্কুরোদ্‌গমের কয়েকঘণ্টা পরে RNA তৈরিও আরম্ভ হয়। এছাড়া কোশের বৃদ্ধি, কোশ বিভাজন, প্রোটিন ও বিভিন্ন কোশ গঠনকারী বস্তু তৈরি, হরমোন সংশ্লেষ প্রভৃতি কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে ঘটে। এর ফলে অঙ্কুরিত বীজ ক্রমশ জেগে ওঠে এবং চারাগাছে পরিণত হয়। অঙ্গজ বৃদ্ধির ফলে মূল, কাণ্ড, পাতা এবং জনন বৃদ্ধির ফলে ফুল ও ফল গঠিত হয়। এইভাবে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে চারা গাছ পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি একটি গতিময়, জটিল ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি।

যেসব জৈব পদার্থ উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন হয়ে ওই উদ্ভিদদেহে সক্রিয়ভাবে জৈবনিক কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে এবং বৃদ্ধি পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উদ্ভিদ হরমোন বলে। সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ হরমোনকে **ফাইটোহরমোন** (Phytohormone) বলে। **জিব্বারেলিন** উদ্ভিদের একপ্রকার বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন। জিব্বারেলা ফুজিকুরই (*Gibberella fujikuroi*) নামে ছত্রাকের আক্রমণে ধান গাছ খুব লম্বা হবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জাপানি বিজ্ঞানী **কুরোসওয়া** (Kurosawa, 1928) ছত্রাকটির নির্যাস পরীক্ষা করে দেখেন যে এই নির্যাসটির মধ্যে এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ আছে যা ধানগাছকে লম্বা করে। 1935 সালে **ইয়াবুটা** (Yabuta) এই রাসায়নিক পদার্থটিকে কেলাসিত করে নামকরণ করেন **জিব্বারেলিন**। জিব্বারেলিন বর্ণহীন এবং অম্লধর্মী। আজ পর্যন্ত 57টির বেশি বিভিন্ন জিব্বারেলিন আবিষ্কৃত হয়েছে। GA সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে জিব্বারেলিনকে প্রকাশ করা হয়। GA যৌগগুলির আবিষ্কারের ক্রমঅনুসারে GA_1, GA_2, GA_3, GA_4 .... ইত্যাদিভাবে নামকরণ করা হয়। জিব্বারেলিন সংগ্রহ করে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি **জিব্বারেলিক অ্যাসিড** (Gibberallic acid)। জিব্বারেলিনগুলির মধ্যে GA_3 প্রায় সব উদ্ভিদ দেহে থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটি যৌগ।

■ **চারাগাছের বৃদ্ধি ও জিব্বারেলিক অ্যাসিড (Seedling growth and Gibberellic acid)** : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্‌গম থেকে ফল উৎপাদন পর্যন্ত সব বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশজনিত কাজ জিব্বারেলিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রভাবিত হয়। ফুল উৎপাদন ছাড়া জিব্বারেলিক অ্যাসিডের সব কাজই কোশের প্রসারণ ও বিভাজনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন—
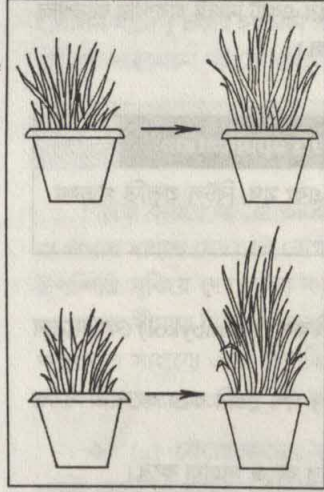
চিত্র 10.13 : চারাগাছে জিব্বারেলিনের ভূমিকা : A-উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং B-জিব্বারেলিন প্রয়োগের পর উদ্ভিদের বৃদ্ধির চিত্ররূপ।

(1) অঙ্কুরোদ্‌গমে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের প্রভাব আছে অর্থাৎ বীজে এই হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং অঙ্কুরোদ্‌গম তরান্বিত করে।

(2) চারা গাছের কোশ বিভাজনে ও কোশের আয়তন বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিক অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের অথবা উদ্ভিদ অঙ্গের লম্বালম্বি বৃদ্ধি ঘটে। (i) গমের চারা গাছের উপর γ-রশ্মি প্রয়োগ করলে কোশ বিভাজন বন্ধ হয়, জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেখানে আবার লম্বায় বৃদ্ধি ঘটে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড আবার অনেক ক্ষেত্রে কোশ বিভাজনও ঘটিয়ে থাকে। (ii) পিঁয়াজ মূলের শীর্ষ অংশ যদি জিব্বারেলিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে শীর্ষের কোশগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে লম্বায় বাড়ে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে জিব্বারেলিক অ্যাসিড চারা গাছের কোশ বিভাজন ও প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়।

(3) চারা গাছে এই হরমোন প্রয়োগ করলে কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(4) জিব্বারেলিন কাণ্ডের বৃদ্ধি ছাড়াও পাতার আয়তন বাড়ায়। অনেকসময় বাইরে থেকে স্প্রে করলে ফুল ও ফলের আয়তন বাড়ে।

(5) দীর্ঘ দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদে এই হরমোন প্রয়োগ করলে অল্প সময়ের মধ্যে ফুল ফোটে।

(6) বীজহীন ফল উৎপাদনেও জিব্বারেলিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

(7) তা ছাড়া ফুলের লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটানো, ফলের আকার বড়ো করাতেও এই হরমোন কাজ করে।

জিব্বারেলিনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলা যায়, যদিও এই হরমোন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। তবুও, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে কৃষিক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

❂ 10.9. আলোকপর্যায় বৃত্তি বা ফোটোপিরিয়ডিজম (Photoperiodism) ❂

❖ **আলোকপর্যায় বৃত্তির সংজ্ঞা (Definition of Photoperiodism) : যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে ফুল ফোটানোর জন্য আলোকের স্থায়ীভাবে প্রভাব বা দিবা দৈর্ঘ্যের প্রভাব প্রয়োজন তাকে আলোকপর্যায় বৃত্তি বলে।**

■ (a) **আলোকপর্যায় বৃত্তি** (Photoperiodism)— আমাদের ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বহুদেশে গ্রীষ্ম ও শীতে দিবা দৈর্ঘ্যের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছে ফুল আসে এবং শীতকালে ডালিয়া, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি গাছে ফুল ফোটে। সুতরাং দেখা যায় দিবাদৈর্ঘ্যের উপর ফুল ফোটার প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।

1920 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানী **গার্নার ও অ্যালার্ড (Garner and Allard) ফুল** ফোটার ক্ষেত্রে আলোকপর্যায় বৃত্তির ভূমিকা প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা **মেরিল্যান্ড ম্যামথ (Maryland Mammoth)** নামে একজাতীয় তামাক (*Nicotiana tabacum*) ও **বাইলক্সি (*Biloxi*)** নামে সয়াবিনের **(*Glycine max*)** উপর পরীক্ষা করে দেখান যে এই উদ্ভিদ-দুটির গ্রীষ্মকালে অঙ্গজ বৃদ্ধি হলেও শীতকাল ছাড়া ফুল আসে না। এর পর তারা গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদ দুটির দিবা দৈর্ঘ্য হ্রাস করে অথবা শীতকালে দিবা দৈর্ঘ্য কৃত্রিম আলোকে বাড়িয়ে দেখেন ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন তামাক উদ্ভিদ অন্তত পক্ষে 12 ঘণ্টা সূর্যালোক না পেলে ফুল ফোটে না। বহু পরীক্ষার পর তাঁরা প্রমাণ করেন দিবা দৈর্ঘ্যের তারতম্য হল ফুল ফোটার প্রধান নিয়ন্ত্রক।
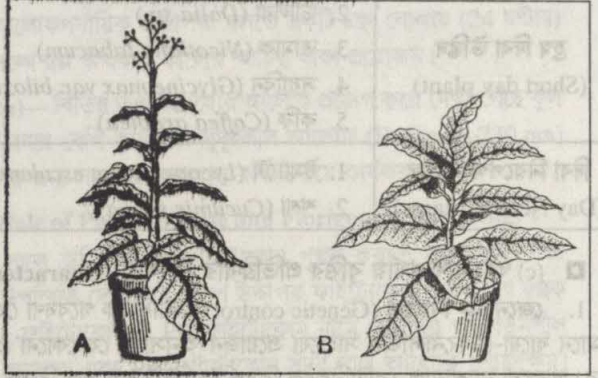
চিত্র 10.14 : মেরিল্যান্ড ম্যামথ তামাক গাছ— A-হ্রস্ব দিবায় বড়ো হওয়া উদ্ভিদ; B-দীর্ঘ দিবায় বড়ো হওয়া উদ্ভিদ।

(b) দিবা দৈর্ঘ্যের স্থায়িত্ব অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Plants on the basis of the length of Photoperiod) : আলোকের স্থায়িত্বের (Dweation) তারতম্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(i) দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ (Long day plant)— যেসব উদ্ভিদে 12 ঘণ্টার বেশি দিবা দৈর্ঘ্যে ফুল ফোটে তাদের দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ বলে। **উদাহরণ**— গম, বার্লি, মুলো, মটর প্রভৃতি।
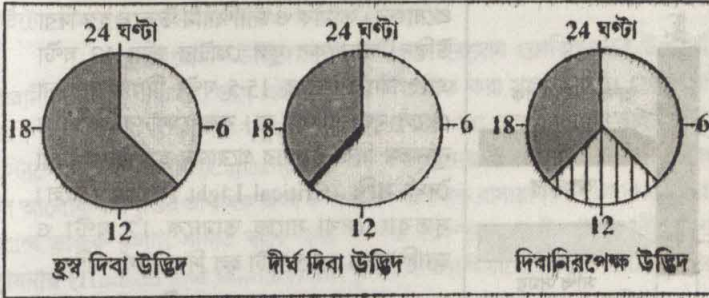
চিত্র 10.15 : হ্রস্ব দিবা, দীর্ঘ দিবা ও দিবানিরপেক্ষ উদ্ভিদে ফুল ফোটার জন্য আলোক ও অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা।

(ii) হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ (Short day plant) — যে সব উদ্ভিদে 12 ঘন্টার কম দিবা দৈর্ঘ্যে ফুল ফোটে তাদের **হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ** বল্য হয়। উদাহরণ—সয়াবিন, তামাক, কলসি, ডালিয়া, কস্‌মস্ প্রভৃতি।

(iii) দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral Plant)—যেসব উদ্ভিদের ফুল ফোটা দীর্ঘ দিবা বা হ্রস্ব দিবালোক প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না তাদের **দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ—সূর্যমুখী, তুলো, ভুট্টা প্রভৃতি।**

(iv) দীর্ঘ-হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ (Long-short day plant)—বহু উদ্ভিদ আছে যাদের প্রথমে দীর্ঘদিবা এবং পরে হ্রস্ব দিবার প্রয়োজন হয়। এদের **দীর্ঘ-হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ** বলে। **উদাহরণ**—পাথরকুচি, হাসনাহানা ইত্যাদি।

(v) হ্রস্ব-দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ (Short-long day plant)—অনেকগুলি উদ্ভিদে ফুল ফোটার জন্য প্রথমে হ্রস্ব দিবা এবং পরে দীর্ঘ দিবার প্রয়োজন হয়। এদের **হ্রস্ব-দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ** বলা হয়। **উদাহরণ**—ক্যাম্পানুলা, ট্রাইফোলিয়াম প্রভৃতি।

○ কয়েকটি দীর্ঘ দিবা, হ্রস্ব দিবা ও দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদের নাম :

দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ (Long day plants)	1. গম (*Triticum aestivum*) 2. ভুট্টা (*Zea mays*) 3. যব (*Avena sativa*) 4. রাই (*Secale creale*) 5. বীট (*Beta vulgaris*)	6. মটর (*Pisum sativum*) 7. মুলো (*Raphanus sativus*) 8. আফিং (*Papaver somniferum*) 9. পিপারমেন্ট (*Mentha piperita*) 10. স্পাইন্যাক (*Spinacia oleracea*)

হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ (Short day plant)	1. চন্দ্রমল্লিকা (*Chrysanthemum morifolium*) 2. ডালিয়া (*Dalia sp.*) 3. তামাক (*Nicotiana tabacum*) 4. সয়াবিন (*Glycine max var. biloxi*) 5. কফি (*Coffea arabica*)	6. আখ (*Saccharum officinarum*) 7. কস্‌মস্ (*Cosmos bipinata*) 8. লাল পাতা (*Euphobia pulcherrima*) 9. পাট (*Corchorus sativa*) 10. আলু (*Solanum tuberosum*)
দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral plants)	1. টম্যাটো (*Lycopersicum esculantum*) 2. শশা (*Cucumis sativa*)	3. সন্ধ্যামালতী (*Miribilis jalapa*) 4. নারকেল (*Cocos nucifera*)

(c) আলোকপর্যায় বৃত্তির প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Photoperiodic Responses) :

1. **জেনেটিক নিয়ন্ত্রণ** (Genetic control)—আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায় আলোকপর্যায় বৃত্তি জিন নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে যে-কোনো প্রকার অর্থাৎ দীর্ঘ দিবা বা হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব। লাক্‌নো ন্যাশানাল বোটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এক বিশেষ ধরনের চন্দ্রমল্লিকা তৈরি করা হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফুল ফোটে। আরও কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের ওপরও গবেষণা চলছে।
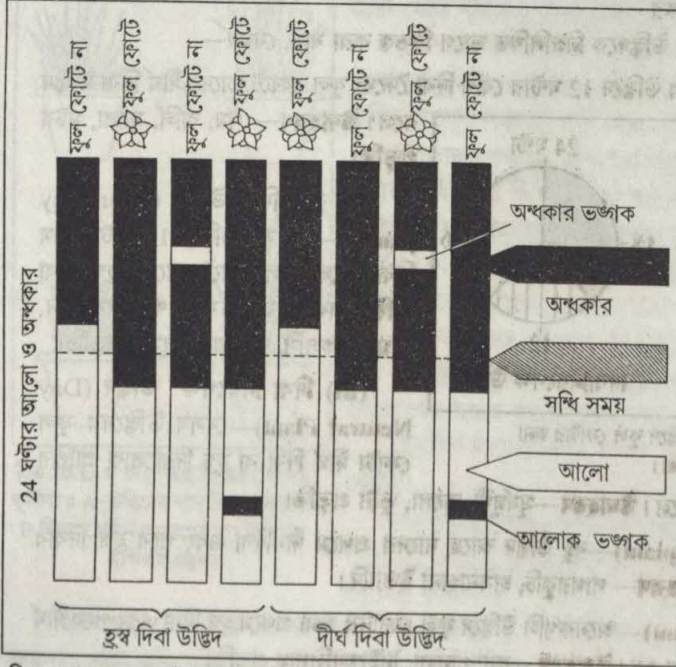
চিত্র 10.16 : ফুল ফোটার জন্য হ্রস্বদিবা ও দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদের অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা।

2. **দিবা দৈর্ঘ্য সন্ধি বা সন্ধিক্ষণকালীন দিবা দৈর্ঘ্য** (Critical day length)—উদ্ভিদের ফুল ফোটার জন্য ন্যূনতম দিবা দৈর্ঘ্যের একান্ত প্রয়োজন। তামাক ও জ্যান্থিয়াম উভয়ে হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ। তামাকের ফুল ফোটার জন্য 12 ঘণ্টা এবং জ্যান্থিয়ামের 15·5 ঘণ্টা দিবা দৈর্ঘ্য না পেলে ফুল ফোটে না। ফুল ফোটার জন্য যে ন্যূনতম দিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয় তাকে **দিবা দৈর্ঘ্য সন্ধি** (Critical Light Period) বলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তামাকে 12 ঘণ্টা ও জ্যান্থিয়ামে 15·5 ঘণ্টা হল দিবা দৈর্ঘ্য সন্ধি।

3. **অন্ধকার দশার প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Dark period)—ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম **হ্যামনার ও বনারের** (Hamner and Bonner, 1938) পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায়। জ্যান্থিয়াম উদ্ভিদটি হল একটি হ্রস্ব দিবা দৈর্ঘ্য উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদটি 16 ঘণ্টা অন্ধকারে এবং 8 ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখলে ফুল ফোটে। আবার একই উদ্ভিদকে 16 ঘণ্টা অন্ধকারে রাখার সময় অল্প সময়ের জন্য আলোতে এনে আবার অন্ধকারে রাখলে ফুল ফোটে না। অন্য পরীক্ষায় দেখা গেছে উদ্ভিদটিকে 16 ঘণ্টা অন্ধকারে রেখে 8 ঘণ্টা আলোকে রাখার সময় কিছুক্ষণ অন্ধকারে নিয়ে আবার আলোকে নিয়ে এলে ফুল ফোটে। কোনো উদ্ভিদকে যদি 24 ঘণ্টা আলোকে রেখে দেওয়া যায় দেখা যাবে উদ্ভিদে কোনো ফুল হবে না। তাই সহজে বোঝা যায় ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশা ও আলোক দশা বিশেষ প্রয়োজন।

4. **আলোক দশার প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Light period)—পরজীবী ও মৃতজীবী উদ্ভিদেরও আলো ছাড়া ফুল হয় না। তা ছাড়া ছত্রাককে অন্ধকারে রেখে দিলে তাদের জনন অঙ্গ গঠিত হয় না। ফুল ফোটার জন্য অন্ধকার দশার প্রয়োজন হলেও আলোকদশার প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়েছে। ফুলের গঠন ও সংখ্যা নির্ধারণে আলোকের প্রভাব বিশেষ প্রয়োজনীয়।

5. **আলোকপর্যায়িক উদ্দীপনা বা ফোটোপিরিয়ডিক আবেশ** (Photoperiodic induction)—দীর্ঘ দিবা বা হ্রস্ব দিবা, উভয় প্রকার উদ্ভিদ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় মাত্রা আলোক পেলে ফুল ফোটার ক্ষমতা লাভ করে। এর পর প্রতিকূল আলোক দৈর্ঘ্যে রাখলে ফুল ফুটতে থাকে। এই উদ্ভিদকে আর আলোকে রাখার প্রয়োজন হয় না। একে **আলোকপর্যায়িক উদ্দীপক বা ফোটোপিরিয়ডিক আবেশ** বলে। 1940 খ্রিস্টাব্দে **হ্যামার** (Hammer) বলেন, আলোকপর্যায়িক উদ্দীপনা বলতে একটি চক্র বোঝায় (24 ঘণ্টায়) যাতে স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্যের স্থায়িত্ব ও স্বল্প আলোকের তীব্রতার সঙ্গে স্বল্প অন্ধকার কালের স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন।

6. **তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুরুত্ব** (Importance of wave-length)— বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক প্রয়োগ করে দেখা গেছে ফুল গঠনের জন্য লাল রশ্মি (640—660 nm) অন্যান্য রশ্মির তুলনায় বেশি কার্যকর। সুদূরলাল আলোক (Far red—730 nm) রশ্মি অঙ্কুরোদ্‌গম, অঙ্গজ গঠন ও ফুল ফোটা আরম্ভ করানোর জন্য লাল ও সুদূরলাল রশ্মি উভয়ে কার্যকর।

7. **পুষ্পারম্ভে ফাইটোক্রোম ও ফ্লোরিজেনের ভূমিকা (Role of Phytochrome and Florigen in flowering)** ঃ

(i) **ফাইটোক্রোম**—আমেরিকার বিজ্ঞানীরা 1960 সালে উদ্ভিদ থেকে ফাইটোক্রোম পৃথক করতে সক্ষম হন। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ ছাড়াও নিম্নশ্রেণির বহু উদ্ভিদে ফাইটোক্রোমের উপস্থিতি দেখা যায়। পুষ্প উদ্দীপক ফাইটোক্রোম একপ্রকার **রঞ্জক পদার্থ** এবং প্রোটিনযুক্ত অর্থাৎ **ক্রোমোপ্রোটিন**। এই পদার্থ Pr-ফাইটোক্রোম ও Pfr-ফাইটোক্রোম নামে পরস্পর পরিবর্তনশীল রঞ্জক পদার্থ হিসাবে থাকে। তা ছাড়া Pr ফাইটোক্রোম লাল আলোক এবং Pfr ফাইটোক্রোম সুদুর লাল আলোক শোষণক্ষম। প্রকৃতপক্ষে এর অনুপাতের উপর ফুল ফোটা ও গঠনের তারতম্য হয়। **হ্যান্স মোর** (Hans Mohr, 1966) মনে করেন ফাইটোক্রোমের পরিমাণ কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনের সক্রিয়তা বাড়ায়। তিনি মনে করেন ফাইটোক্রোম বিশেষ RNA, প্রোটিন ও উৎসেচক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। ফাইটোক্রোম ফুল ফোটার প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে।

প্রথম আলোকের প্রভাবে উদ্ভিদে ফাইটোক্রোম Pfr-এর পরিমাণ বাড়ে এবং দীর্ঘ অন্ধকারে ফাইটোক্রোম Pfr, ফাইটোক্রোম Pr-এ পরিবর্তিত হয়।
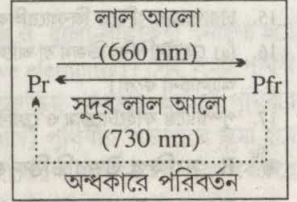
(ii) **ফ্লোরিজেন**—উদ্ভিদে পুষ্প উদ্দীপক হরমোন ফ্লোরিজেনের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সবাই একমত, তবে এই হরমোন নিষ্কাশিত করা সম্ভব হয়নি। ফ্লোরিজেন পাতায় তৈরি হয়ে প্রান্তীয় ও কাক্ষিক মুকুলে স্থানান্তরিত হয় এবং ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। 1936 খ্রিস্টাব্দে **কাজলাখজান** (Cajlachjann) এই হরমোনের নামকরণ করেন **ফ্লোরিজেন**। পাতা হল আলোকপর্যাবৃত্তির প্রাথমিক অঙ্গ এবং এতে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে ফ্লোরিজেন সংশ্লেষিত হয়। ফ্লোরিজেন অগ্রস্থ ভাজক কলায় সঞ্চিত থাকে এবং অঙ্গজ কোশকে ফুল উৎপাদনকারী কোশে পরিণত করতে সাহায্য করে। **হডসন ও হ্যামনার** (Hodson and Hamner) 1970 সালে জ্যান্থিয়ামের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখান জ্যান্থিয়াম (Xanthium) থেকে নির্যাসিত রস অন্য উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে ফুল ফোটানো যায়। একইভাবে লেম্না (*Lemna*) নামে জলজ উদ্ভিদে নির্যাস প্রয়োগ করেও অন্য উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন ফ্লোরিজেন একক ভাবে কাজ করে না। তাদের মতে **অ্যান্থেসিন, জিব্বেরেলিন** এবং **ফ্লোরিজেন** সমতা ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। এছাড়া লোহা, ক্যালসিয়াম ও খনিজ লবণ প্রভৃতিও ফুল গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফুল ফোটা নিয়ে নানা রকম মত প্রচলিত আছে। মনে করা হয় প্রত্যেক 24 ঘণ্টায় আলো ও অন্ধকারের আবর্তন ঘটে চলেছে। এই আবর্তনে Pr ও Pfr ফাইটোক্রোমের পারস্পরিক আন্তপরিবর্তনশীল (interconversion)। এর ফলে ফ্লোরিজেন সংশ্লেষিত হয়।
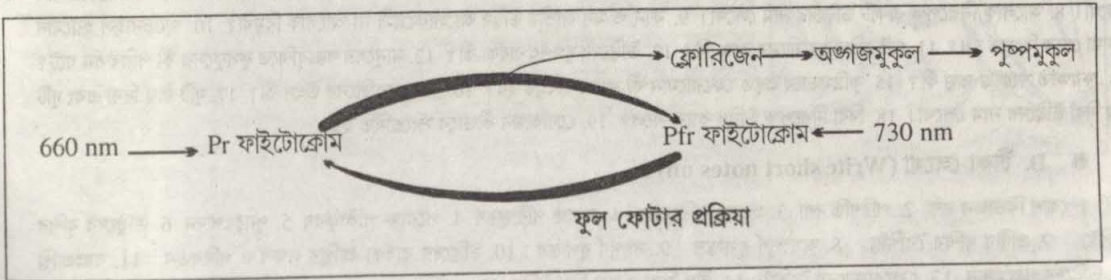
ফুল ফোটার প্রক্রিয়া

০ অনুশীলনী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. (a) বৃদ্ধি কাকে বলে? (b) উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশার বিবরণ দাও।
2. প্রাণীর বৃদ্ধি দশাগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
3. (a) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কী কী শর্তাবলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? (b) প্রত্যেকটি শর্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
4. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে লেখো।
5. মুখ্যবৃদ্ধিকাল কাকে বলে? সংক্ষেপে আলোচনা করো।
6. রূপান্তর কাকে বলে? অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বোঝো?
7. রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করো।
8. (a) বার্ধক্য কাকে বলে? (b) উদ্ভিদে বার্ধক্য প্রাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণ ও পরিবর্তন উল্লেখ করো।
9. প্রাণীর বার্ধক্য প্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো।
10. (a) বয়ঃপ্রাপ্তি কাকে বলে? (b) উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো।
11. মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে লেখো।
12. (a) মোচন বা ঝরে পড়া কাকে বলা হয়? উদ্ভিদের পত্রমোচন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও।
13. (a) ফেরোমোন কাকে বলে? (b) ফেরোমোন ও হরমোনের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায়?
14. বিভিন্ন প্রকার ফেরোমোনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
15. চারাগাছের বৃদ্ধিতে জিব্বারেলিক অ্যাসিডের ভূমিকা আলোচনা করো।
16. (a) ফোটোপিরিয়ডিজম বা আলোকপর্যায় বৃত্তি কাকে বলে? (b) হ্রস্ব দিবা ও দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদের আলোক ও অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করো।
17. পুষ্পারম্ভে ফাইটোক্রোম ও ফ্লোরিজেনের ভূমিকা আলোচনা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি কী কী শর্তাবলি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? 2. উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশাগুলির নাম লেখো। 3. পরিণতি দশা কী? 4. প্রাণীর বৃদ্ধি দশাগুলির নাম লেখো। 5. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ কাকে বলে? 6. পরোক্ষ পরিস্ফুরণ কী? উদাহরণ দাও। 7. অসম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে? 8. সম্পূর্ণ রূপান্তর কাকে বলে? 9. রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করো। 10. বার্ধক্য কাকে বলে? 11. উদ্ভিদের অঙ্গজ বার্ধক্য কী কী? 12. উদ্ভিদের বার্ধক্যের শারীরবৃত্তীয় কারণগুলি লেখো। 13. মানুষের বার্ধক্যের লক্ষণগুলি কী কী? 14. বয়ঃপ্রাপ্তি কাকে বলে? 15. উদ্ভিদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলি লেখো। 16. মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে পরিপাকতন্ত্র, অস্থি ও ত্বকের কী কী পরিবর্তন ঘটে? 17. বয়ঃপ্রাপ্তিতে কোশের পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করো। 18. মোচন বা অ্যাবসিসান কী? 19. ফেরোমোনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 20. ফেরোমোনের কাজ উল্লেখ করো। 21. জিব্বারেলিক অ্যাসিডের প্রধান কাজগুলি লেখো। 22. আলোকপর্যায় বৃত্তি কী? 23. ফাইটোক্রোম কী? 24. ফ্লোরিজেনের কাজ উল্লেখ করো।

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. উপচিতির হার অপচিতির হার থেকে বেশি হলে কী ঘটে? 2. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কতদিন ঘটে? 3. গৌণবৃদ্ধি কী? 4. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ একটি উদাহরণ দাও। 5. ব্যাঙে কী ধরনের পরিস্ফুরণ দেখা যায়? 6. দুটি প্রাণীর নাম করো যাদের পুনরুৎপাদন দেখা যায়। 7. একটি আলোকপ্রেমী উদ্ভিদের নাম লেখো। 8. আলোক নিরপেক্ষ একটি উদ্ভিদের নাম লেখো। 9. ফার্ন ও মস্ জাতীয় উদ্ভিদ আলোকপ্রেমী না আলোক বিমুখী? 10. জুভেনাইল হরমোন কোথা থেকে নিঃসৃত হয়? 11. থাইরক্সিন হরমোনের কাজ কী? 12. উদ্ভিদের যুগপৎ বার্ধক্য কী? 13. মানুষের বয়ঃবৃদ্ধিতে ফুসফুসের কী পরিবর্তন ঘটে? 14. ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তত্ত্ব কী? 15. কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ফেরোমোন কী কাজে ব্যবহৃত হয়? 16. জিব্বারেলিনের উৎস কী? 17. দুটি দীর্ঘ দিবা এবং দুটি হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদের নাম লেখো। 18. দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কাকে বলে? 19. ফ্লোরিজেন কীভাবে সংশ্লেষিত হয়?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. কোশ বিভাজন দশা 2. পরিণতি দশা 3. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ 4. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ 4. পরোক্ষ পরিস্ফুরণ 5. পুনরুৎপাদন 6. উদ্ভিদের বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য 7. প্রাণীর বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য 8. অসম্পূর্ণ রূপান্তর 9. সম্পূর্ণ রূপান্তর 10. উদ্ভিদের বার্ধক্য প্রাপ্তির লক্ষণ ও পরিবর্তন 11. বয়ঃপ্রাপ্তি 12. উদ্ভিদের পত্রমোচন 13. ফেরোমোনের বৈশিষ্ট্য 14. দীর্ঘ দিবা ও হ্রস্ব দিবা উদ্ভিদ 15. ফ্লোরিজেন।

জীবনের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন
[ORIGIN AND EVOLUTION OF LIFE]

✪ জীবনের উৎপত্তি (Origin of Life) ✪

✪ 11.1. জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে হ্যাল্ডেন ও ওপারিন-এর মতবাদ ✪ (Haldane and Oparin concept of the Origin of Life)

সূচনা (Introduction) ঃ রাশিয়ার জীববিজ্ঞানী **আই. এ. ওপারিন** (I. A. Oparin) ও ইংরেজ জীববিজ্ঞানী **জে. বি. এস. হ্যাল্ডেন** (J. B. S. Haldane) জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মত প্রকাশ করেন। তাঁরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জীবন সৃষ্টির রহস্য কিছুটা উন্মোচন করতে পেরেছিলেন। জীবনের আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের তত্ত্বকে **আধুনিক রাসায়নিক মতবাদ** বলা হয়।

◻ জীবের উৎপত্তি তত্ত্বের রাসায়নিক মতবাদ ঃ

জীবনের উৎপত্তির বিবরণকে নিম্নলিখিত প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করতে হয়, যেমন—

1. **প্রথম পর্যায়**—অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় 450 কোটি বছর আগে গ্যাসীয়পুঞ্জ ও ধুলো-বালিকণা ঘনীভূত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। ধূলিকণার বেশিরভাগ অংশ ছিল **তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ** (Radioactive elements)। সেই সময় পৃথিবী ছিল উত্তপ্ত গ্যাসীয় গোলাকার পিণ্ড। মনে করা হয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের চাপ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরের পদার্থগুলি গলতে আরম্ভ করে। ওই সময় ভারী পদার্থগুলি (লোহা, নিকেল ইত্যাদি) পৃথিবীর অভ্যন্তরে জমা হয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র তৈরি করে। তুলনামূলক হালকা মৌলগুলি (সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি) মাঝের স্তরে জমা হয় এবং সবচেয়ে হালকা মৌলগুলি (কার্বন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) বাইরে অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে জমা হয়।

2. **দ্বিতীয় পর্যায়—ওপারিন** (Oparin), **হ্যাল্ডেন** (Haldane) প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন 160 কোটি বছর আগে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছিল। মনে করা হয় কোটি কোটি বছর ধরে তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর তাপ কমতে থাকে। মৌলগুলি একে অপরের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থ তৈরি করেছিল। এভাবে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে মুক্ত পরমাণুগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হয়। মুক্ত পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে বিক্রিয়া করে জল (H_2O), মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) ইত্যাদি অণু গঠিত হয়। বায়ুমণ্ডলে তখনও অক্সিজেনের আবির্ভাব ঘটেনি।
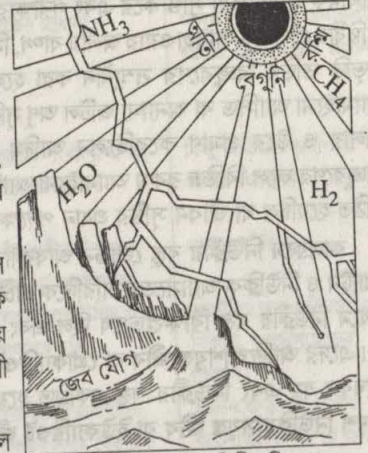
3. **তৃতীয় পর্যায়**—তাপ বিকিরণ করে পৃথিবীপৃষ্ঠ ক্রমে ঠান্ডা হলে কিছু গ্যাস তরলে এবং কিছু গ্যাস কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই অবস্থায় পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকে ভারী গলিত পদার্থ এবং তার উপরে গঠিত হয় কঠিন পদার্থের আস্তরণ। মনে করা হয় প্রায় তিনশ কোটি বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠ কঠিন আকার ধারণ করে। কঠিন আবরণী ক্রমে আরও ঠান্ডা হলে ভাঁজযুক্ত হয়ে পাহাড়, পর্বত ও গভীর গহ্বর সৃষ্টি করে।

চিত্র 11.1 ঃ আদি পৃথিবীর চিত্ররূপ।

4. **চতুর্থ পর্যায়**—পৃথিবী আরও ঠান্ডা হলে বায়ুমণ্ডলে যে বাষ্প তৈরি হয়েছিল তা ঘনীভূত ও ঠান্ডা হয়ে জলকণা তৈরি করে। এইভাবে বাষ্প থেকে মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটতে থাকে। অনবরত বৃষ্টির ফলে সমস্ত খাদ, গহ্বর জলে ভরে যায় এবং গঠিত হয় সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়। সমুদ্রের ফুটন্ত জলে সেই সময়ে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, জল প্রভৃতির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে বিভিন্ন ধরনের জটিল জৈব যৌগের সৃষ্টি হয়। যে সময়ের মধ্যে এসব জৈব যৌগের আবির্ভাব ঘটেছিল তাকে **রাসায়নিক বিবর্তন কাল** (Period of chemical evolution) বলা হয়।

বৃষ্টির ধারার সঙ্গে অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং নানা প্রকার লবণ প্রভৃতি ধুয়ে এসে সমুদ্রে পড়েছিল। সমুদ্রের জলে এসব পদার্থ থেকে জীবনের সূত্রপাত হয়। মনে করা হয় মিথেনই প্রথম পদার্থ, যার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থ বিক্রিয়া করে কার্বনযুক্ত বিভিন্ন অণু উৎপন্ন করেছিল। এসব কার্বন অণু থেকে ক্রমশ সরল শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, নাইট্রোজেন বেস (পিউরিন ও পিরামিডিন) প্রভৃতি তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় গঠিত পদার্থগুলি সমুদ্রের জলে মিশ্রিত ছিল। বিজ্ঞানী হ্যাল্ডেন একে উত্তপ্ত স্যুপের সঙ্গে তুলনা করেন। উত্তপ্ত স্যুপের মধ্যে বিভিন্ন সরল জৈব অণুগুলি বিক্রিয়া করে বড়ো আকারের জটিল জৈব অণু উৎপন্ন করেছিল। এর ফলে সরল শর্করা থেকে পলিস্যাকারাইড, অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে স্নেহ পদার্থ সৃষ্টি হয়। বৃহৎ অণুগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন বিন্দু। ওপারিন এদের নাম দিয়েছিলেন **কোয়াসারভেট ফোঁটা** (Coacervate drops) এবং ফক্স এদের নামকরণ করেন **মাইক্রোস্ফিয়ার** (Microsphere)। কালক্রমে এই কোয়াসারভেট বা মাইক্রোস্ফিয়ার উৎসেচকের কার্যক্ষমতা পায় এবং কোরক সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্জন করে। এই সব কোরকের মধ্যে প্রোটিন, RNA ও DNA তৈরি হয়।

চিত্র 11.2 : পৃথিবীতে প্রথম কোশ গঠনের চিত্ররূপ।

● **RNA ওয়ার্ল্ড তত্ত্ব** (RNA world hypothesis) : **আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন** RNA প্রথম সৃষ্টি হয় এবং এই RNA ছিল উৎসেচকের কার্যক্ষমতাসম্পন্ন। এর পর নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পর এক সময় এমন একটি পদার্থের সঞ্চার ঘটেছিল যা প্রতিলিপি (Replication) গঠনে সক্ষম এবং এখান থেকেই জীবনের সূত্রপাত হয়।

◘ জীবের জৈব রাসায়নিক উৎপত্তি সম্পর্কে মিলার ও উরের পরীক্ষা :

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller) এবং হ্যারল্ড উরে (Harold Urey) পরীক্ষাগারে পৃথিবীর প্রাথমিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে পৃথিবীর প্রাথমিক আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প, মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন প্রভৃতি তড়িৎ বিচ্ছুরণের সম্মুখীন করা হলে গ্লাইসিন, অ্যালানিন জাতীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বা অন্যান্য জটিল অণু সৃষ্টি করা যায়। এই পরীক্ষা থেকে মিলার ও উরে প্রমাণ করেছিলেন আদিম পৃথিবীতে ভয়ংকর বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণের ফলে বিভিন্ন রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন জটিল জৈব অণু গঠিত হয়েছিল যা জীবন সৃষ্টির প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়।

কালক্রমে নিউক্লীয় বস্তু প্রোটিন আবরণীর মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং পরে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের চারিদিকে প্রাচীর গঠিত হয়ে কোশ তৈরি হয়। প্রথমে নিউক্লীয় বস্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছিল এবং কোশীয় অঙ্গাণু সংঘবদ্ধ ছিল না। এদের **আদিকোশযুক্ত জীব বা প্রোক্যারিওটা** বলে। পরে কোশীয় অঙ্গাণু সংঘবদ্ধ হয় এবং নিউক্লীয় বস্তু একত্রিত হয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং **আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত জীব বা ইউক্যারিওট জীব সৃষ্টি হয়।**

5. **পঞ্চম পর্যায়**—মনে করা হয় প্রথম তৈরি হয় ভাইরাস। ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয় ব্যাকটেরিয়া। এই সময় পৃথিবীতে অক্সিজেন না থাকার জন্য সব জীবই অবাতশ্বাসী ছিল। পৃথিবীতে প্রথম আসা এককোশী জীবে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কালক্রমে কিছু এককোশী জীবের দেহে ক্লোরোফিলের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য

চিত্র 11.3 : মিলার ও উরের পরীক্ষা।

প্রস্তুত করে ও বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন নির্গত করে। পরিবেশে অক্সিজেনের আবির্ভাবে সবাতশ্বাসী জীবের আগমন ঘটল এবং এদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। উদ্ভব হল এককোশী থেকে বহুকোশী জীব। এককোশী জীবদের মধ্যে যারা ক্লোরোফিল পেল তারা উদ্ভিদে রূপান্তরিত হল। আবার অন্য দিকে কিছু এককোশী জীবে ক্লোরোফিলের আবির্ভাব না ঘটায় তারা এককোশী প্রাণী হিসাবে পরিচিতি পেল।

চিত্র 11.4 : আদি পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি ও কোশীয় জীবগঠনের চিত্ররূপ।

যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উপরিলিখিত বিষয়ের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তবুও রাসায়নিক বিবর্তনবাদের কিছু প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। প্রথমত, জীব বিজ্ঞানীরা জৈবযৌগ কীভাবে কোশের মতো এক সজীব, প্রাথমিক এককের রূপ নেয় তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সম্পর্ক কী ধরনের, যার ফলে কোশস্থ সব প্রোটিনের সংশ্লেষ নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করে তার সঠিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।

✪ 11.2. ভূতাত্ত্বিক সময়ে বিভিন্ন জীব ও জীবের বিস্তার ✪ (Distribution of Life form in time and space)

• জীবনের ক্রমবিবর্তন (Evolution of life) •

যুগ (Era)	পর্যায় (Period)	উপপর্যায় (Epoch)	সময় (Time) (বৎসর আগে)	আবহাওয়া (Climate)	উল্লেখযোগ্য জীব	উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
সিনোজয়িক (Coenozoic)	কোয়ার্টারনারি (Quarter-nary)	সাম্প্রতিক (Recent)	10,000		মানুষ এবং বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য	বীরুতের প্রাধান্য।	মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর (mammal) প্রাধান্য।
		প্লাইস্টোসিন (Pleiosto-cene)	1,00,000	পর্যায়ক্রমিক তুষারযুগ (চারবার)	গুপ্তবীজী উদ্ভিদ angios-perm) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির প্রাধান্য	বীরুতের সংখ্যাবৃদ্ধি, বহু বৃক্ষের অবলুপ্তি।	কিছু অতিকায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তি। মানুষের উদ্ভব।
	টারসিয়ারী (Tertiary)	প্লায়োসিন (Pleiocene)	10,000,000	শুরুতে আবহাওয়া উষ্ণ ছিল, নানা পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল		দ্বিবীজপত্রীর বীরুতের উদ্ভব, ঘাসের বিস্তার, উত্তরাঞ্চলের উদ্ভিদ ও জঙ্গলের হ্রাস।	আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিকাশ, অ্যান্থ্রপয়েডের বিকাশ।
		মায়োসিন (Miocene)	30,000,000				
		ওলিগোসিন (Oligocene)	40,000,000	বৃহৎ মহাদেশীয় ভূখণ্ডের উপস্থিতি		গ্রীষ্মাঞ্চলের জঙ্গলের পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার।	প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবলুপ্তি, সরীসৃপের প্রাধান্য, অ্যান্থ্রপয়েডের (anthropo-id-গরিলা) সৃষ্টি, আধুনিক পাখি ও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব।
		ইওসিন (Eocene)	60,000,000			গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জঙ্গল *Sequoia*-র প্রাধান্য।	

যুগ (Era)	পর্যায় (Period)	উপপর্যায় (Epoch)	সময় (Time) (বৎসর আগে)	আবহাওয়া (Climate)	উল্লেখযোগ্য জীব	উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
মেসোজয়িক (Mesozoic)	ক্রেটেশিয়াস (Cretaceous)		110,000,000	আবহাওয়া পরিবর্তনশীল, পর্বতের সৃষ্টি, বৃহৎ জলাভূমি (swamp)		গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বিকাশ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস, একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদ্ভব।	বৃহৎ সরীসৃপের এবং দাঁত-যুক্ত পাখির অবলুপ্তি প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব, আধুনিক পতঙ্গের বিস্তার।
	জুরাসিক (Jurassic)		175,000,000	গুপ্তবীজী, নীচু জমির বিস্তার, আবহাওয়া উষ্ণ	উচ্চশ্রেণির ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ও সরীসৃপের প্রাধান্য	উদ্ভিদের প্রথম উদ্ভব, সাইকাস (Cycads) জাতীয় উদ্ভিদের প্রাধান্য।	অতিকায় সরীসৃপের প্রাধান্য দাঁতবিশিষ্ট পাখির উদ্ভব।
	ট্রায়াসিক (Triassic)		200,000,000	উষ্ণ, শুষ্ক আবহাওয়া, বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল		উচ্চশ্রেণির ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের প্রাধান্য, বীজযুক্ত ফার্নের সংখ্যা হ্রাস।	অতিকায় সরীসৃপের উদ্ভব, সরীসৃপের সদৃশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব, প্রাচীন উভচর প্রাণীর অবলুপ্তি।
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	পারমিয়ান (Permian)		240,000,000	শুকনো আবহাওয়া, কখনও বা তুষার যুগ		সাইকাড ও কনিফারের উৎপত্তি, প্রাচীন লাইকোপড এবং প্রাচীন ইকুইজিটাম জাতীয় (horsetail) উদ্ভিদের অবলুপ্তি	স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব, প্রাচীন উভচর প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস।
	পেনসিল-ভানিয়ান (Pensyl-vanian) বা কার্বোনিফেরাস		280,000,000	উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া	লাইকোপড ফার্ন ও উভচর প্রাণীর প্রাধান্য।	seed ফার্ন ও প্রাচীন ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের (Cordaits) প্রাচুর্য, অতি-কায় লাইকোপড, হর্সটেল (horsetail) ও ফার্নের প্রাধান্য, লাইকোপড ও হর্সটেলের এবং টেরিডো-স্পার্মের (seed ferm) প্রাচুর্য।	উভচর প্রাণীর প্রাধান্য, সরীসৃপের বিস্তার এবং অতি কায় পতঙ্গের উপস্থিতি।
	মিসিসিপিয়ান (Mississip-ean) বা কার্বোনিফেরাস		310,000,000	বিরাট অগভীর সমুদ্র			প্রাচীন সরীসৃপ ও পতঙ্গের উদ্ভব, উভচরের প্রাধান্য, বৃহদাকার হাঙ্গরের উপস্থিতি।
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		350,000,000	বিশাল অগভীর সমুদ্র	প্রাচীন স্থলজ উদ্ভিদ ও মাছের প্রাধান্য	প্রাচীন স্থলজ উদ্ভিদের (অর্থাৎ Rhymophytales, Rhymia ইত্যাদি) উপস্থিতি লাইকোপড, হর্সটেল, টেরিডোস্পার্ম ও ফার্নের উপস্থিতি, ব্রায়োফাইটার উপস্থিতি।	উভচর প্রাণীর বিকাশ, মাছের প্রাধান্য।
	সিলুরিয়ান (Silurian)		381,000,000	স্থলভাগ ক্রমশ গঠিত হতে থাকে, পর্বতের সৃষ্টি, অগভীর	শৈবাল ও উচ্চশ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাধান্য	শৈবালের প্রাচুর্য, স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি, ব্রায়োফাইটার উদ্ভব।	সামুদ্রিক মাছের প্রাধান্য, বড়ো সামুদ্রিক মাকড়সা ও পক্ষবিহীন পতঙ্গের আবির্ভাব, ফুসফুসযুক্ত মাছের (lungfish) উপস্থিতি।
	অরডোভিসি-য়ান (Ordo-vician)		448,000,000	সমুদ্রস্থলের সৃষ্টি, সহনীয় আবহাওয়া।		সামুদ্রিক শৈবালের প্রাধান্য।	কম্বোজ শ্রেণির (molluscs) প্রাণীর বিস্তার, প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী বর্মযুক্ত মাছের (armoured fish) উদ্ভব।

যুগ (Era)	পর্যায় (Period)	উপ পর্যায় (Epoch)	সময় (Time) (বৎসর আগে)	আবহাওয়া (Climate)	উল্লেখযোগ্য জীব	উদ্ভিদ (Plants)	প্রাণী (Animals)
	ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian)		553,000,000	নিম্নভূমি, স্থলমধ্যস্থ সমুদ্র এবং সম্ভবত মৃদু আবহাওয়া	শৈবাল ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাধান্য	সামুদ্রিক শৈবালের উপস্থিতি।	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাচুর্য, ট্রাইলোবাইটের (Trilobites) প্রাধান্য, কম্বোজ প্রাণী (molluscs) ও branchiopods-এর উৎপত্তি।
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			1450,000,000	প্রাথমিক ও পরবর্তী তুষার যুগ, পাললিক শিলা	প্রাচীন সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাধান্য, শৈবালের উপস্থিতি।	ব্যাকটেরিয়া ও শৈবালের (নীলাভ সবুজ শৈবাল) উপস্থিতি	প্রোটোজোয়া, স্পঞ্জ, (ছিদ্রাল প্রাণী) ইত্যাদির উপস্থিতি।
আর্কিওজয়িক (Archeozoic)			2000,000,000	প্রধানত আগ্নেয় শিলার উপস্থিতি, কিছু পাললিক শিলাও ছিল	সম্ভবত এক-কোশী জীবের উপস্থিতি।	কোনো জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি।	এই সময়ের কোনো জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি।

◎ 11.3. প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধুনিক ধারণা ◎ (Modern concept of Natural Selection)

▲ ডারউইনবাদ (Darwinism)

ল্যামার্কবাদ প্রকাশিত হবার প্রায় 50 বৎসর পর অভিব্যক্তিবাদের আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। নতুন অধ্যায়ের বহু বিতর্কিত ও সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদটির নাম **প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ** (Theory of Natural Selection)। প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের প্রবক্তা হলেন **চার্লস ডারউইন**। 1859 খ্রিস্টাব্দের 24শে নভেম্বর বহু তথ্য সম্বলিত 'On the Origin of Species by means of Natural Selection' নামে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ডারউইনবাদের মূল কথা প্রকাশিত হয়।

● **ডারউনবাদের মূল বক্তব্য (Principle Ideas of Darwinism) :**

1. জীবের **জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি** এবং **সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের** ফলে জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং জীবগুলি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য **জীবনসংগ্রামে** লিপ্ত হয়।

2. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য জীবগুলির মধ্যে প্রকরণ দেখা যায় এবং সহায়ক প্রকরণযুক্ত জীব, জীবন সংগ্রামে জয়ী হয় ও তাদের বিবর্তন ঘটে।

3. এইভাবে সহায়ক বা অনুকূল প্রকরণযুক্ত জীবেরা প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করে এবং তারা যোগ্যতম জীব হিসাবে নির্বাচিত হয়। ডারউইনের মতানুযায়ী একেই **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) বলে।

4. জীবন সংগ্রামে জয়ী জীবের অনুকূল প্রকরণগুলি বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয় এবং ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার শেষে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবগোষ্ঠী যখন আদি পূর্বপুরুষ থেকে প্রজননগতভাবে পৃথক হয় তখনই তাদের **নতুন প্রজাতি** বলে। এভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সহায়তায় নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

চিত্র 11.5 : চার্লস ডারউইন।

উদাহরণ : ডারউইনের মতে জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ—

1. ডারউইনের মতে প্রকরণের ফলে জিরাফের পূর্বপুরষের গলা ছিল বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের। কালক্রমে সমতলভূমি ও নীচু গাছের

পাতা নিঃশেষিত হওয়ায়, কেবল দীর্ঘ গলাযুক্ত জিরাফেরা উঁচু গাছের পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তারা জীবন সংগ্রামে নিজেদের যোগ্যতম রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। ছোটো গলাযুক্ত জিরাফেরা খাদ্যের অভাবে কালক্রমে অবলুপ্ত হয়।

2. যেসব জিরাফ জীবন সংগ্রামে জয়ী বলে বিবেচিত হয়েছে তারা সুপ্রজননক্ষম ও বেশি কর্মক্ষম হওয়ার ফলে এদের দীর্ঘ গলা ও দীর্ঘ অগ্রপদ বৈশিষ্ট্যগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত ও পুঞ্জীভূত হয়ে আধুনিক লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের উদ্ভব হয়েছে।

● **প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের তথ্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায় ঃ**

তথ্য	সিদ্ধান্ত
1. অত্যধিক জন্মহার 2. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান	জীবন সংগ্রাম
3. জীবন সংগ্রাম ও 4. প্রকরণ	যোগ্যতমের বিবর্তন
5. যোগ্যতমের বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন 6. অনুকূল প্রকরণের পুঞ্জীভবন এবং বংশ পরম্পরায় সঞ্চারণ	নতুন প্রজাতির সৃষ্টি

● **I. নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism) ঃ** ডারউইন পরবর্তী বিজ্ঞানীরা ডারউইনবাদের যে নতুন রূপ দিয়েছেন তাকেই নয়া ডারউইনবাদ বলে। এই তত্ত্বে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের সঙ্গে বংশগতি বিদ্যার (Genetics) নীতি যুক্ত করা হয়েছে। নয়া ডারউইনবাদের মূল নীতি নিম্নরূপ—

ডি ভ্রিসের (de Vries)-এর মিউটেশান মতবাদ প্রকাশের পর ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে যেসব প্রকরণ (Variation) কার্যকরী হয় তার উদ্ভব কীভাবে হয় তা জানা যায়। প্রধানত প্রকরণগুলির উদ্ভব হয় মিউটেশনের মাধ্যমে। এছাড়া প্রকৃতিতে যেসব সংকর জীব পাওয়া যায়, তার থেকেও কিছু প্রকরণ বৈশিষ্ট্য জীবের সৃষ্টি হয়। মিউটেশন ছোটো বা বড়ো হতে পারে অর্থাৎ এর ফলে অল্প বা বেশি পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং, ডারউইনের বর্ণিত প্রকরণের সৃষ্টি মিউটেশনের মাধ্যমে হতে পারে। এই রকম মিউটেশন হল বংশগত। পর পর প্রজন্ম ধরে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মিউটেশন সঞ্চিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সময় প্রকৃতিযোগ্য মিউটেশনযুক্ত জীবকে নির্বাচন করে। এইভাবে মিউটেশন মতবাদের সাহায্যে ডারউইনের মতবাদ ব্যাখ্যা করা যায়। এর ফলে ডারউইনবাদ আবার নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটিই নব-ডারউইনবাদ নামে পরিচিত। বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী যেমন **আর. এ. ফিসার** (R. A. Fischer), **জে. হাক্সলে** (J. Huxley), **জে. বি. এস. হল্ডেন** (J. B. S. Haldane), **টি. ডবঝানস্কি** (T. Dobzhansky), **এস. রাইট** (S. Wright), **ই. বি. মায়ার** (E. B. Mayr) প্রভৃতি নব-ডারউইনবাদের সমর্থক। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদের সঙ্গে প্রকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আধুনিক ধারণার সমন্বয়কে বিস্তৃত অর্থে **নব-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

❖ (a) **নয়া-ডারউইনবাদের সংজ্ঞা ঃ "ডারউইন তত্ত্বের পরবর্তী যে ধারণার ফলে জীবের মিউট্যান্ট জিনের মাধ্যমে অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় এবং জীবের বিবর্তন ঘটে তাকে নয়া-ডারউইনবাদ বলে।**

◘ (b) **নয়া-ডারউইনবাদের ব্যাখ্যা (Explanation of Neo-Darwinism) ঃ** জিরাফের লম্বা গলার উৎপত্তি নয়া-ডারউইনবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, এই ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ— 1. পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের (Mutation) সাহায্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের সৃষ্টি হয়। 2. এই সময় জিরাফের খাদ্য হিসাবে গাছের উঁচু ডালের পাতা অবশিষ্ট ছিল বা লভ্য ছিল। এর ফলে লম্বা গলাযুক্ত জিরাফ খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ পেল এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হল। 3. এইভাবে সমস্ত জিরাফ প্রাকৃতিক নির্বাচনজনিত বলের সম্মুখীন হল এবং এখানে শুধুমাত্র লম্বা গলা জিরাফ নির্বাচিত হল এবং বেঁচে থাকল। 4. এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র লম্বা গলার জিনগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে অভিযোজনের মূল্য পেল এবং এইভাবেই লম্বা গলা জিরাফের বিবর্তন হল।

● **II. সংশ্লেষ তত্ত্ব (Synthetic theory) ঃ** নিরলস গবেষণা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষানিরীক্ষা করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিবর্তনের নতুন আধুনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন— ডবঝান্স্কি (Dobzhansky), হাক্সলে (Huxley), মায়ার (Mayr), সিম্পসন (Sympson), ফিশার (Fisher), হল্‌ডেন (Haldane), রাইট (Wright), স্টেবিনস্ (Stebbins) ইত্যাদি বিজ্ঞানী। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রস্তাবিত বিবর্তনের মতবাদগুলি একত্রিত করে ও সংশ্লেষ করে এই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে বলেই একে বিবর্তনের **সংশ্লেষ তত্ত্ব** বলে।

(a) **সংশ্লেষ তত্ত্বের মূল কথাটি হল— "জীবগোষ্ঠীতে জিনের ভারসাম্য (Genetic equilibrium) বিনষ্টকারী প্রাকৃতিক বল (Force) বা শক্তিগুলির সাহায্যেই বিবর্তন সংঘটিত হয়।"**

বিবর্তনে সাহায্যকারী বলগুলি (Forces) হল—

1. **জিনের প্রকরণ** (Genetic variation) যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীবগোষ্ঠী সৃষ্টিতে কাঁচা উপাদান (Raw material) সরবরাহ করে।

2. **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural selection) যা পরিবেশে অভিযোজনজনিত পরিবর্তনের মাধ্যমে "জীব-পরিবেশ" (Organism-environment) সম্পর্ক স্থাপনের দিক নির্দেশ করে।
3. **পৃথকীকরণ** (Isolation) যা একটি জীবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে, কালক্রমে যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়, ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

(b) **সংশ্লেষ তত্ত্বের ব্যাখ্যা (Explanation of Synthetic theory) :**

1. জিনের প্রকরণ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে, যেমন— (i) পরিব্যক্তি (Mutation), (ii) পুনঃসংযুক্তি (Recombination) এবং (iii) জিনের আন্তঃক্রিয়া (Gene interaction)।
2. জিনের প্রকরণ যত বেশি হবে জীবের যোগ্যতা ততই বৃদ্ধি পাবে।
3. প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীব তার পরিবেশে উন্নত অভিযোজনজনিত সম্পর্কে আবদ্ধ হবে নিম্নলিখিত কৌশলের মাধ্যমে, যেমন— (i) জিনের আনুপাতিক হার (Frequency) পরিবর্তনের সাহায্যে, (ii) অন্য জিনগুলির তুলনায় সাহায্যকারী বা উপকারী জিনগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সাহায্যে।
4. সবশেষে **পৃথকীকরণ** (Isolation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবগোষ্ঠীর জিন ভান্ডার (Gene pool) দুই বা তার বেশি ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীতে জিনগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে। এই জীবগোষ্ঠীগুলি প্রকরণ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে স্বতন্ত্র ও প্রজননগতভাবে পৃথক (Reproductively isolated) জীবগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং এর ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

11.4. অনুকৃতি ও বর্ণগ্রহ (Mimicry and Colouration)

A. অনুকৃতি (Mimicry)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : উদ্ভিদ বা প্রাণী শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিপজ্জনক জীবের আকৃতি ধারণ করে অথবা কোনো জড় বস্তুর আকার ধারণ করে নিজেকে গোপন করে রাখার পদ্ধতিকে অনুকৃতি (Mimicry) বলে।**

চিত্র 11.6 : সর্প উদ্ভিদ (অ্যারিসিমা)।

□ (b) **প্রকারভেদ (Types) :** উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুকৃতির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অনুকৃতি প্রাণী দেখা যায়। অনুকৃতি দু'রকমের হয়, যেমন—**রক্ষণাত্মক** এবং **আক্রমণাত্মক**।

● **I. রক্ষণাত্মক** (Defensive) : 1. **উদ্ভিদ**— কতকগুলি উদ্ভিদ তৃণভোজী গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর আকার ধারণ করে আত্মগোপন করতে পারে। (i) এক ধরনের **বন ওল** (*Amorphoshallus bulbifer*) মাটি ভেদ করে যখন উপরের দিকে বর্ধিত হয়, দূর থেকে দেখতে অনেকটা সাপের ফণার মতো দেখায়। (ii) অপর একটি কচু জাতীয় উদ্ভিদ **সর্প উদ্ভিদ** (*Arisaema*) নামে পরিচিত। বর্ষার সময় উত্তর বঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে দেখা যায়। এই উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাসের বাইরের সবুজ-বেগুনি আবরণ বা চমশাটি (Spathe) অনেকটা কোবরা সাপের ফণার আকৃতির মতো হয়। তৃণভোজী প্রাণী এদের এড়িয়ে চলে।
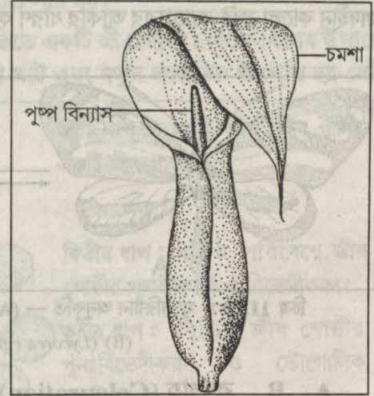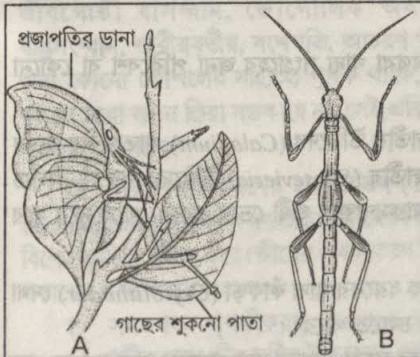
চিত্র 11.7 : (A) লিফ্ ইন্‌সেক্ট (*Kallima paralecta*) ও (B) কাঠি পোকা (*Carausius morosus*)

2. **প্রাণী**— (i) শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক ধরনের **কাঠি পোকা** (*Carausius morosus*) গাছের শুকনো ডালের সঙ্গে প্রায় মিশে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

(ii) পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য একধরনের **সুস্বাদু প্রজাপতি** (Viceroy butterfly) আত্মরক্ষার জন্য স্বাদহীন অপর এক ধরনের প্রজাপতির (Monarch butterfly) আকৃতি ধারণ করে।

(iii) **কালিমা পারাল্যাকটা** (*Kallima paralecta*) নামে প্রজাপতি (লিফ্ ইন্‌সেক্ট) গাছের ডালে অবিকল শুকনো পাতার মতো আকৃতি ধারণ করে পাখির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। একে লিফ ইনসেক্ট বলে।

চিত্র 11.8 ঃ বিশেষ এক প্রজাতির ইঁদুর (*Didelphis virginiana*)।

(iv) আমেরিকার একধরনের **ইঁদুরের মতো প্রাণী** (*Didelphis virginiana*) শত্রু দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে মৃতের মতো আচরণ করে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

II. আক্রমণাত্মক (Offensive) ঃ (i) কয়েক প্রকার মাকড়সা ওক গাছের ডালে অনেকটা পাখির বিষ্ঠা বা অর্কিডের ফল প্রভৃতির আকার ধারণ করে। ভুল করে শিকারযোগ্য কোনো জীব তার কাছে এলে তাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে শিকার ধরে।

(ii) কয়েকটি সাপ শিকার ধরার সময় মাথাটি স্থির রেখে লেজ নাড়তে থাকে। এর ফলে শিকারযোগ্য প্রাণীটি শিকারী প্রাণীকে বুঝতে পারে না।

(iii) **থিলকা** (Thelca) নামে এক ধরনের প্রজাপতির ডানার অগ্রপ্রান্তে ছদ্ম মাথা (Psedohead) থাকে।

➤ **অনুকৃতির বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Mimicry)** ঃ অনুকৃতির সাধারণত দুটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, যেমন—বেটেসিয়ান অনুকৃতি ও মুলেরিয়ান অনুকৃতি।

(a) **বেটেসিয়ান অনুকৃতি** (Batesian Mimicry) ঃ এক্ষেত্রে একটি সুস্বাদু প্রজাতির প্রাণী একটি স্বাদহীন প্রজাতি প্রাণীর মতো বর্ণ ধারণ করে, ফলে শুধুমাত্র সুস্বাদু প্রাণী অনুকৃতির সুবিধা পায়। **উদাহরণ**—সুস্বাদু কালো ফিঙ্গে পাখি স্বাদহীন কালো ফ্লাই ক্যাচারের আকার ধারণ করে।
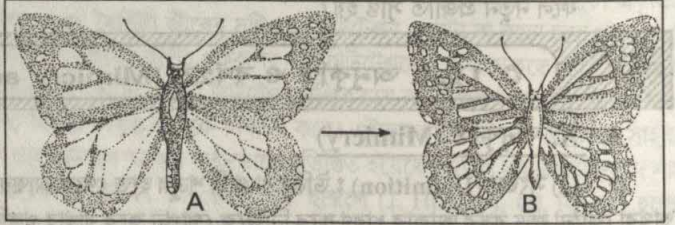
চিত্র 11.9 ঃ বেটেসিয়ান অনুকৃতি — (A) ভাইসরয় প্রজাপতি (*Danaus plexippus*) এবং (B) মোনার্ক প্রজাপতি (*Limenitis archippus*)।
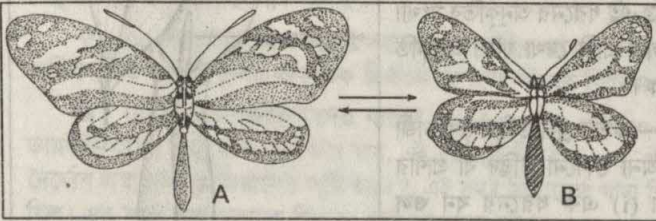
চিত্র 11.10 ঃ মুলেরিয়ান অনুকৃতি — (A) (*Hirsutis megara*) এবং (B) (*Lycorea ceres*)।

(b) **মুলেরিয়ান অনুকৃতি** (Mullerian Mimicry) ঃ এক্ষেত্রে দুটি স্বাদহীন প্রজাতির প্রাণী পরস্পরকে অনুকরণ করে এবং একই প্রকার দেখতে হয়। এর ফলে খাদক প্রাণীর খাদ্য নির্বাচনে পরখ করে দেখার সময় প্রাণী ধ্বংস বা হত্যার হার অনেক কম হয়। **উদাহরণ**—দুটি ডানাযুক্ত অনেক স্বাদহীন পতঙ্গ স্বাদহীন বোলতার আকার ধারণ করে।

▲ B. বর্ণগ্রহ (Colouration)

❖ **সংজ্ঞা ঃ যেসব পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য অথবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য পরিবেশ বা কোনো জীবের বর্ণ ধারণ করে তাদের বর্ণগ্রহ (Colouration) বলে।**

1. **উদ্ভিদে বর্ণগ্রহ** (Colouration in plants)— (i) এক ধরনের **কচু জাতীয়** উদ্ভিদের (*Caladium*) পাতায় বহু বর্ণের দাগ (spot) থাকে। এদের অনেকটা সাপের মতো দেখায়। অনেকগুলি **মারুল জাতীয়** (*Sansevieria*) উদ্ভিদের পাতায় কালচে গাঢ় সবুজ বর্ণের দাগ ও লম্বা রেখা থাকে। তৃণভোজী প্রাণীরা এদের সাপ বা আক্রমণাত্মক প্রাণী ভেবে এদের থেকে দূরে সরে যায়।

2. **প্রাণীতে বর্ণগ্রহ** (Colouration in Animals)— (i) সমুদ্রের ধারে এক ধরনের **সাদা কাঁকড়া** (*Crytolithoder*) দেখা যায়। এদের অনেকটা সাদা নুড়ির মতো দেখায় বলে সহজে শত্রুর নজর এড়িয়ে চলতে পারে।

(ii) সবুজ পাতার মতো **ফাইলিয়াম** নামে পতঙ্গ (*Phyllium*) গাছের পাতার মতো দেখতে বলে সহজে শত্রুর নজরে পড়ে না।

(iii) বিভিন্ন প্রকার **মাকড়সা** যেসব ফুলে বসবাস করে সেই ফুলের রং ও আকৃতি ধারণ করে আত্মগোপন করে।

(iv) **বাঘের** গায়ের রং হলদে কালো ডোরা কাটা। এর জন্য অতি সহজে এরা গাছের ছায়ায় ও ঘাসের জঙ্গলে আত্মগোপন করতে পারে। একইভাবে **জেব্রাও** আত্মগোপন করে।

(v) সবুজ **লাউডগা সাপ** গাছের সবুজ অঙ্গে অতি সহজেই আত্মগোপন করে।

(vi) **ক্যামেলিয়ন** নামে এক রকম বহুরূপী সরীসৃপ প্রাণী পরিবেশ অনুযায়ী নিজ দেহের রং পালটাতে পারে।

(vii) **শ্বেত ভালুক** এমন ভাবে তুষারের মধ্যে আত্মগোপন করে যে সহজে চিহ্নিত করা যায় না।

(viii) কিছু **মথ** ও **প্রজাপতির** ডানায় চক্ষুবিন্দু (Eye spot) থাকে যেগুলি দেখতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের মতো হয়।

(xi) অনেক মাংসাশী মাকড়সা সোনালি ফুলের মতো দেখতে হয় এবং পতঙ্গ আকর্ষণ করে।

(x) উত্তরমেরুতে বসবাসকারী এক ধরনের **খেঁকশিয়াল** সাদা রং-এর হয় এবং তুষারের মধ্যে নিজেকে আত্মগোপন করে শিকারের অপেক্ষায় থাকে।

চিত্র 11.11 : পাতার মতো ফাইলিয়াম পতঙ্গ।

✪ 11.5. প্রজাতির উৎপত্তি ও পৃথকীকরণ (Speciation and Isolation) ✪

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী সৃষ্টির সময় কোনো জীব পৃথিবীতে ছিল না; অজৈব উপাদান থেকে জৈব উপাদানে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। সরলতর জীব থেকে ধীরে ধীরে জটিল ও জটিলতর জীবের উদ্ভব ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় একগোষ্ঠী জীব বহুভাগে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিকভাবে, বাস্তুসংস্থানগতভাবে, শারীরবৃত্তীয়ভাবে অথবা অন্য উপায়ে পৃথক থাকে। এর ফলে এই ছোটো ছোটো জীবগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রজননগত পৃথকীকরণ ঘটে এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

❖ **প্রজাতির উৎপত্তির সংজ্ঞা (Definition of Speciation) : যে পদ্ধতিতে একটি জীবগোষ্ঠী কোনো বিশেষ উপায়ে দুটি পৃথক জীবগোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে প্রজননগত পৃথকীকরণ ঘটে এবং নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয় সেই পদ্ধতিকে স্পিশিয়েশন বলে।**

স্পিশিয়েশন হল বিবর্তনের একটি কেন্দ্রীয় পদ্ধতি। স্পিশিয়েশন প্রক্রিয়ায় জীবগোষ্ঠী পৃথকীকরণের বিভিন্ন কৌশল দেখা যায়। এই কৌশলগুলির সাহায্যে জীবগোষ্ঠীগুলি এমনভাবে পৃথক থাকে যে, তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটে না।

❖ (a) **পৃথকীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Isolation) : যে প্রক্রিয়ায় প্রজননক্ষম বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বাসস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান, বাস্তুসংস্থান, শারীরবৃত্তীয়, বংশগতি, আচরণ অথবা অন্য কোনো কৌশলের সাহায্যে পৃথক থাকে, ফলে তাদের মধ্যে জনন ক্রিয়া সম্ভব হয় না, সেই প্রক্রিয়াকে পৃথকীকরণ বলে।**

চিত্র 11.12 : পৃথকীরণের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি।

■ (b) **পৃথকীকরণের প্রকারভেদ (Types of Isolation)** : পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া জীবের বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জীবের পৃথকীকরণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন—
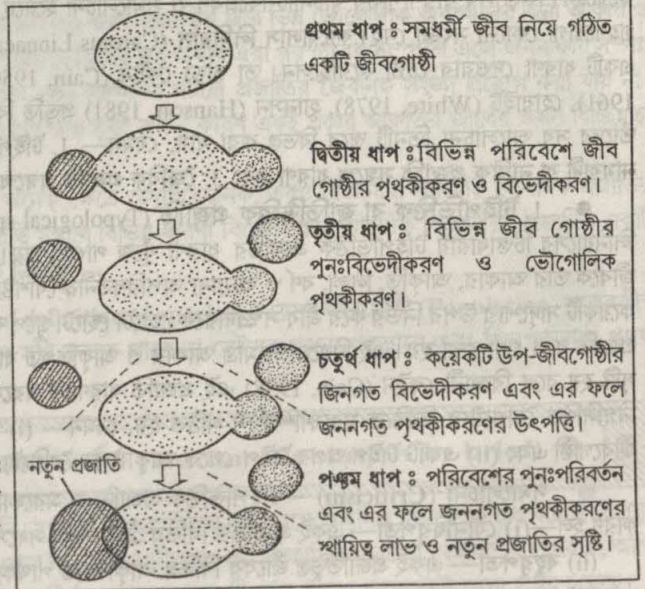
1. **সময়গত পৃথকীকরণ** (Isolation by time)—প্রাচীনকালে জীব সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন যুগে সৃষ্টি হয়, ফলে তারা পৃথক থাকে।

2. **দূরত্বগত পৃথকীকরণ** (Isolation by distance)—একটি প্রজাতির বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে পৃথক থাকার ফলে তারা উপপ্রজাতি (Sub-species) বা স্থানীয় জাতিতে (Local race) পরিণত হয়।

3. **ভৌগোলিক পৃথকীকরণ** (Geographical Isolation)— বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা (Barrier) যেমন— নদী, সমুদ্র, মরুভূমি, হিমবাহ, পর্বত ইত্যাদি থাকার ফলে জীবগোষ্ঠী পৃথক হয়ে পড়ে।

4. **প্রজননগত পৃথকীকরণ** (Reproductive isolation)— এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে জনন ক্রিয়া করতে পারে না।

◘ (c) **স্পিশিয়েশন বা প্রজাতি সৃষ্টিতে পৃথকীকরণের ভূমিকা (Role of Isolation in Speciation) :**

1. **পৃথকীকরণের সাহায্যে একটি জিন ভাণ্ডার** (Gene pool) **বা একটি সমসত্ত্ব জীবগোষ্ঠী (Homogeneous population)** অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়। প্রতিভাগ জীবগোষ্ঠী তাদের পরিবেশে বিভিন্ন নির্বাচন চাপের (Selection pressure) মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া কিছুকাল চলার পরে একভাগ জীবগোষ্ঠী অন্য জীবগোষ্ঠীগুলি থেকে বৈশিষ্ট্যগত পৃথক হয় এবং বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়।

2. বিভিন্ন প্রকার পৃথকীকরণ কৌশলের সাহায্যে দুটি গোষ্ঠী জীবের মধ্যে প্রজনন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

3. ভৌগোলিকপৃথকীকরণ কৌশলের সাহায্যে অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতি (Allopatric species) সৃষ্টি হয় যেগুলি মিলিত হলে প্রজনন ক্রিয়া করতে পারে। অ্যালোপ্যাট্রিক প্রজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্রমাগত সমন্বয়ের ফলে তাদের মধ্যে প্রজননগত পৃথকীকরণ ঘটে এবং এগুলি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়। প্রজাতিগতপৃথক জীবগোষ্ঠীকে **সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি** (Sympatric species) বলে।

❂ 11.6. প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা (Species concept) ❂

প্রজাতি শব্দটি জীব বিজ্ঞানী ও জীব বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে খুবই পরিচিত। শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক হল প্রজাতি (species)। **পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং অপরিবর্তনীয় অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবকে প্রজাতি বলা হয়।** দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌লের যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিকযুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রজাতি সম্বন্ধে নানারকম ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সব ধারণাগুলির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ও সমালোচনা হয়েছে। তাই আজও আমাদের কাছে প্রজাতি সম্বন্ধে সবার গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞা নেই। **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus, 1753) প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রজাতি সম্বন্ধে প্রথম একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তা ছাড়া কেইন (Cain, 1950), মেয়ার (Mayr, 1969), সিম্পসন (Simpson, 1961), হোয়াইট (White, 1978), হ্যানসন (Hanson, 1981) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সব আলোচনা তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যেমন— 1. **টাইপভিত্তিক বা জাতিভিত্তিক প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা**, 2. **নামবাদী বা নামিক প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা** এবং 3. **জৈবিক প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা**।

● 1. **টাইপভিত্তিক বা জাতিভিত্তিক প্রজাতি** (Typological species concept) : দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল ও লিনিয়াসের চিন্তাধারায় টাইপভিত্তিক প্রজাতির ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে অজস্র জীব বসবাস করে। প্রত্যেকটি জীবকে তার আকার, আকৃতি, লিঙ্গ, বর্ণ ও অন্যান্য অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে অন্য জীব থেকে পৃথক করা যায়। বিশেষ কয়েকটি সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে জীব-সম্প্রদায়কে ছোটো ছোটো গ্রুপে বা **টাইপে** বিভক্ত করা হয়। এই টাইপগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে গণ্য করা হয়। এই নিয়মে একমাত্র আকার ও আকৃতিগত বাহ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে প্রজাতি সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞানী কেইন (Cain, 1958) এই প্রজাতি ধারণাকে **মরফোস্পিসিস** (Morphospecies) আখ্যা দিয়েছিলেন। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মরফোস্পিসিস গঠিত হয়, যেমন— (i) অপরিবর্তনীয় (দৃশ্যমান) সমআকৃতিগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবগোষ্ঠী এবং (ii) একটি টাইপ অপর টাইপ থেকে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পৃথক জীবগোষ্ঠী।

● **সমালোচনা (Criticism)** —টাইপভিত্তিক প্রজাতি বা মরফোস্পিসিস সকলের গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দুটি প্রধান কারণ হল—(i) **যৌনদ্বিরূপতা**— একই প্রজাতির বিভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্যকে যৌনদ্বিরূপতা বলে।

(ii) **বহুরূপতা**— একই প্রজাতিভুক্ত জীবের বিভিন্ন আকৃতিগত পার্থক্যকে বহুরূপতা বলে।

(iii) **বয়সগত** প্রভৃতি কারণে আকারগত পার্থক্য বেশি হলেও তাদের পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা যায় না।

(iv) আকৃতিগত ভাবে একই প্রকার কিন্তু জননগতভাবে পৃথক প্রজাতিগুলিকে একই প্রজাতিভুক্ত করাও সম্ভব নয়।

এইসব কারণে মরফোস্পিসিসের ধারণা শ্রেণিবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

● 2. **নামিক বা নামবাদী প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা** (Nominalistic species concept) : অষ্টাদশ শতাব্দীতে নামিক বা নামবাদী প্রজাতি ধারণা ফরাসি দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। **অক্কাম** (Occum) এই মতবাদের প্রবক্তা। তা ছাড়া **বাফুন** (Buffon), **রবিনেট** (Robinet), **লামার্ক** (Lamarck) প্রভৃতি বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীরা এই মতবাদ সমর্থন করেন। **বেসি** (Bessey, 1908) নামবাদী প্রজাতি সম্বন্ধে বলেছেন যে প্রকৃতি কেবলমাত্র স্বতন্ত্র জীবসৃষ্টি করেছে এবং প্রকৃতিতে প্রজাতির কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রজাতি কেবলমাত্র মানুষের সৃষ্ট ধারণা। অনেকগুলি জীবকে একসঙ্গে উল্লেখ করার পদ্ধতি হিসাবে প্রজাতি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

● **সমালোচনা (Criticism)**— জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রজাতি জীবজগতের একটি বাস্তব সত্তা। কোনো প্রজাতির সব জীব আকৃতিগতভাবে একই রকম, কারণ তারা একই বংশধারায় উদ্ভূত। জাতিজনিত ও অভিব্যক্তির ধারণার নিরিখে নামবাদী প্রজাতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

● 3. **জৈবিক প্রজাতি সম্বন্ধে ধারণা** (Biological species concept) : উনবিংশ শতকের শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানীরা জৈবিক প্রজাতির ধারণা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে **ডবঝানস্কি** (Dobzhansky), **মেয়ার** (Mayr), **স্ট্রেসম্যান** (Stressman) প্রভৃতি হলেন প্রধান। বিজ্ঞানী **মেয়ার** 1966 খ্রিস্টাব্দে জৈবিক প্রজাতির সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে প্রজাতি হল **"একটি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মধ্যে জননে সক্ষম কিন্তু অনুরূপ অপর একটি জীবগোষ্ঠী থেকে জননগতভাবে পৃথক।"**

এইক্ষেত্রে একটি প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে জিনের আদান প্রদান ঘটে এবং সেই প্রজাতির একটি জিন ভান্ডার (Gene pool) তৈরি হয়। এখানে বলা যায়, উদ্ভিদের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি এবং প্রাণীর মধ্যে বাঘ, সিংহ, গোরু, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি এক একটি প্রজাতির উদাহরণ। প্রত্যেক প্রজাতির স্বতন্ত্র জিন ভান্ডার থাকে। জৈবিক প্রজাতিকে অন্য ভাবে বলা যায়— "প্রজাতি একটি সংরক্ষিত জিন ভান্ডার, যারা নিজেদের মধ্যে এমন গঠন ব্যবস্থা তৈরি করে যার ফলে অন্যান্য জিন ভান্ডার থেকে জিন প্রবেশ করতে পারে না।" বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson, 1961) জৈবিক প্রজাতিকে জেনেটিক্যাল প্রজাতি (Genetical species) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

● **সমালোচনা (Criticism)** —আধুনিক বিজ্ঞানীরা জৈবনিক প্রজাতি মতবাদ সমর্থন করেছেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা অসুবিধেজনক, যেমন— (i) একই ভৌগোলিক এলাকায় বা খুব নিকটবর্তী এলাকায় দুটি একই প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণী বাস করে, তবুও এদের বসতিস্থান (Habitat) পৃথক এবং এরা জননগতভাবে বিচ্ছিন্ন। এরা কী একই প্রজাতি না ভিন্ন বাসস্থানের জন্য এদের জনন বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তা বলা খুবই কঠিন। (ii) একই প্রজাতির জীব ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আকার ও আকৃতিগতভাবে পৃথক হতে পারে, কিন্তু এরা জননগতভাবে বিচ্ছিন্ন নয় অর্থাৎ এরা পরস্পরের সংস্পর্শে এলে জনন কার্য সম্পন্ন করে। সুতরাং আকৃতিগত পার্থক্য ও জনন বিচ্ছিন্নতা একই সঙ্গে না ঘটলে প্রজাতির জৈবনিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যায় না। (iii) জৈবনিক প্রজাতির সংজ্ঞা জীবাশ্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন কারণ একই প্রকার আকৃতির জীবের জনন বিচ্ছিন্নতা ছিল কিনা বলা যায় না।

যদিও জৈবনিক প্রজাতির সংজ্ঞা প্রয়োগ করা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধেজনক, তবুও বিজ্ঞানীরা সকলেই জৈবনিক প্রজাতির ধারণা সমর্থন করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দেওয়া প্রজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বিশ্লেষণ করে আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রজাতির একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন। এই সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ—

❖ **প্রজাতির সর্বসম্মত সংজ্ঞা (Accepted definition of species) : যেসব জীবগোষ্ঠী (Population) সংকরজীব সৃষ্টি করে না বা প্রজননগতভাবে সক্ষম সংকরজীব সৃষ্টি করতে পারে না সেইসব প্রজননগতভাবে এবং জিনগতভাবে পৃথক জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।**

❂ 11.7. মানুষের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিবর্তন (Human Evolution in brief) ❂

আধুনিক মানুষ পৃথিবীতে হঠাৎ আবির্ভাব হয়নি। যুগ যুগ ধরে ক্রমবিবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে মানুষ সৃষ্টির সুস্পষ্ট অনুক্রম দশা জানা না গেলেও জীবাশ্ম, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দেহাবশেষ (করোটি, অস্থি, দাঁত, চোয়াল ইত্যাদি) এবং ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রীর উপর নির্ভর করে মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে অনেকটাই জানা সম্ভব হয়েছে।

(a) **মানুষ উদ্ভাবনের স্থান (Place of origin of man)** : জীবাশ্ম আবিষ্কারের তথ্য হিসাবে জানা যায় যে, সম্ভবত মধ্য এশিয়া, চীন, জাভা এবং ভারতবর্ষে প্রথমে মানুষের উদ্ভাবন বা সৃষ্টি ঘটে।

(b) **মানুষ উদ্ভাবনের সময় (Time of origin of man)** ঃ গণনা করে বলা যায় যে, প্রায় 128—200 মিলিয়ন বছর পূর্বে জুরাসিক যুগের সরীসৃপ থেকে প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী সৃষ্টি হয়; ট্রায়াসিক যুগের প্রথমে, প্রায় 65 মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম প্রাইমেট সৃষ্টি হয়; এবং সবশেষে প্রায় 4 মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম বানর ও মানুষ সৃষ্টি হয়।

▲ মানুষের বিবর্তন (Evolution of man) ঃ

আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি ও গরিলা এবং এশিয়ার ওরাং ওটাং ও গিবনকে একসঙ্গে **বনমানুষ বা এপ** (Ape) বলে। বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্ন দিক থেকে বনমানুষ ও মানুষের মিল দেখা যায়। এই কারণে মানুষের বিবর্তন বনমানুষ থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়।
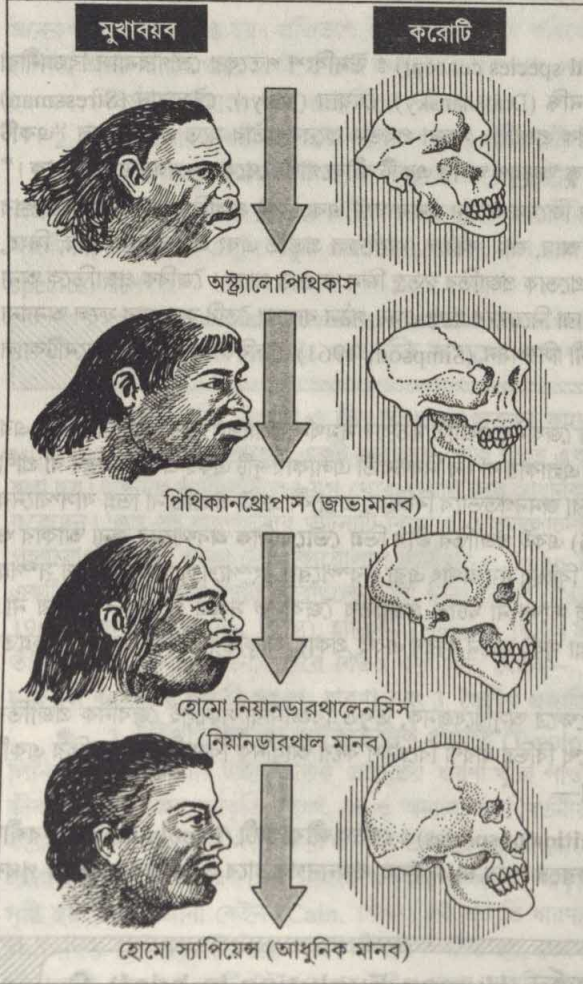
চিত্র 11.13 ঃ মানুষের ক্রম বিবর্তনে মুখাবয়ব ও করোটির পরিবর্তন।

জীবাশ্মঘটিত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে আদিম বনমানুষ ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus) থেকে দুটি ভিন্ন ধারায় বা লাইনে বিবর্তন ঘটে। একটি ধারায় **র‍্যামাপিথেকাস** (Ramapithecus) থেকে মানুষ সৃষ্টি হয় এবং অন্য ধারায় **সিভাপিথেকাস** (Sivapithecus) থেকে মায়োসিন যুগে ওরাং ওটাং-এর উৎপত্তি ঘটে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, র‍্যামাপিথেকাস থেকে **অস্ট্র্যালোপিথেকাস** (Australopithecus) সৃষ্টি হয় এবং এখান থেকে মানুষের সরাসরি উৎপত্তি ঘটে।

অস্ট্র্যালোপিথেকাস থেকে মানুষের উৎপত্তির ক্রমপর্যায় নীচে উপস্থাপিত করা হল।

● 1. *অস্ট্র্যালোপিথেকাস* (**Australopithecus**) ঃ প্লায়োসিন যুগের প্রথম বনমানুষ।

● বৈশিষ্ট্য (Characters) —(i) উচ্চতায় স্ত্রী প্রাণী 105 cm ও পুরুষ প্রাণী 150 cm। (ii) মস্তিষ্কের আয়তন 350—530 c.c.। (iii) বড়ো আঙুলযুক্ত লম্বা হাত। (iv) পায়ের পাতা ও নিতম্ব দ্বিপদী গমনের উপযোগী। (v) চওড়া পেলভিস্। (vi) ফোরামেন ম্যাগনামের স্থান পরিবর্তন। (vii) ডেন্টাল আর্চ (চোয়ালে দাঁতের সজ্জা) প্যারাবোলা আকৃতির। (viii) মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র, চিবুক অনুপস্থিত, এবং ভুরু প্রোগন্যাথাস্ (সামনের দিকে প্রসারিত চোয়াল) মুখমন্ডলের মতো।

● 2. *হোমো হ্যাবিলিস* (***Homo habilis***) ঃ প্লিস্টোসিন যুগের শেষে উদ্ভূত প্রথম *Homo* গণ।

● বৈশিষ্ট্য (Characters) —(i) মস্তিষ্কের আয়তন 650—700 c.c.। (ii) করোটির হাড়গুলি পাতলা। (iii) উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল ক্ষুদ্র আকৃতির। (iv) করোটির পরবর্তী কঙ্কালগুলি Homo sapiens-এর মতো। (v) হিউমেরাস, রেডিয়াস ও স্ক্যাপিউলার স্পাইনের গঠন বনমানুষের মতো এবং গাছে চড়ার উপযোগী।

বিভিন্ন বিজ্ঞানী *Homo sapiens*-এর নিম্নলিখিত বিবর্তন ধারা প্রবর্তন করেন।

Homo habilis → *Homo erectus* → *Homo sapiens* → *Homo sapiens sapiens*

● 3. *হোমো ইরেক্টাস* (***Homo erectus***) ঃ মধ্য প্লিস্টোসিন যুগে উদ্ভূত হয় ঋজু (erect) মানুষ। প্রায় 1·6 মিলিয়ন বছর পূর্বে আদি *Homo erectus*-এর জীবাশ্ম পূর্ব আফ্রিকাতে আবিষ্কার হয়েছিল। এছাড়া এশিয়ার জাভা ও পিকিং-এ *Homo*

erectus-এর জীবাশ্ম পাওয়া যায় এবং এদের যথাক্রমে **জাভা মানব** (Java man) ও **পিকিং মানব** (Peaking man) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(a) **জাভা মানব (Java man)**— 0·5 মিলিয়ন বছর পূর্বের *Homo erectus erectus* (i) এদের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় 940 c.c.। (ii) এদের উচ্চতা 5 ফুটের বেশি। (iii) কপাল (Forehead) নিম্নগামী ও হেলানো (Slanting)। (iv) মুখমন্ডল প্রোগন্যাথাস্ ধরনের, চোয়াল ও দাঁত বেশ বড়ো। (v) চোখের উপরে ভুরুর অংশটি বেশ উঁচু। (vi) চিবুকের প্রবর্ধিত অংশ অনুপস্থিত।

(b) **পিকিং-মানব (Peaking man)**— 0·5-0·2 মিলিয়ন বছর পূর্বের *Homo erectus peakinensis*

● **বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) এদের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় 830—1200 c.c.। (ii) কপাল সামান্য হেলানো। (iii) চোখের উপরে ভুরুর অংশটি বেশ উঁচু। (iv) চিবুকের প্রবর্ধিত অংশ অনুপস্থিত।

● **4. আদিম বা আরকাইক *হোমো স্যাপিয়েন্স* (Archaic *Homo sapiens*) ঃ** প্রায় 0·4-0·3 বছর পূর্বে মধ্য-প্লিস্টোসিন্ যুগে এই প্রাণীর উদ্ভব হয় বলে জানা যায়।

আফ্রিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নানান জীবাশ্ম আবিষ্কারের সাহায্যে জানা যায় যে, হোমো ইরেক্টাস থেকে আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হয়। পূর্বে এই জীবাশ্মগুলিকে হোমো ইরেক্টাস বা আদি হোমো স্যাপিয়েন্স বা হোমো স্যাপিয়েন্স্ নিয়েনডারট্যালেনসিস্ (*Homo sapiens neandertalensis*) গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই জীবাশ্মগুলি হল—আফ্রিকা থেকে পাওয়া কাবে (Kabwe, রোডেশিয়ার মানুষ); ইউরোপ থেকে পাওয়া আরাগো (Arago), পেট্রালোনা (Petralona), ভারতেস্‌জোলাস্ (Vertesszollas), স্টাইনহেম (Steinheim), এরিংস্‌ডর্ফ (Ehringsdorf) এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে পাওয়া স্যাংবুম মাচান (Sangbum Machan)। এই অন্তবর্তীকালীন জীবাশ্মগুলিকে **আরকাইক হোমো স্যাপিয়েন্স** (Archaic *Homo sapiens*) গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই আরকাইক্ হোমো স্যাপিয়েন্স থেকে প্রায় 0·1 মিলিয়ন বছর পূর্বে হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়েনডারট্যালেনসিসের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রায় 35-40 হাজার বছর পূর্বে হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স-এর আবির্ভাব ঘটে। যেমন—

হোমো ইরেক্টাস (*Homo erectus*) → "আরকাইক" *Homo sapiens* → *Homo sapiens neandertalensis*; → *Homo sapiens sapiens* (আধুনিক মানুষ)
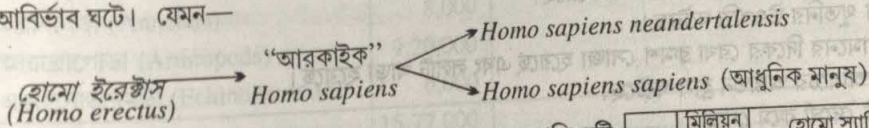
নৃবিজ্ঞানীদের (Anthropologist) মতে *Homo sapiens* প্রজাতি দুটি উপপ্রজাতিতে বিভক্ত, যেমন—***H. s. neandertalensis*** এবং H. s. sapiens উৎপত্তি হওয়ার কিছুকাল পরে H. s. neandertalensis অবলুপ্তি হয়ে যায় এবং *H. s. sapiens* আধুনিক মানুষ হিসাবে পৃথিবী শাসন করতে থাকে। আধুনিক মানুষকে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ (Cro-magnon man) নাম দেওয়া হয়।

চিত্র 11.14 ঃ মানুষের বিবর্তনের সম্ভাব্য পথ।

● **5. আধুনিক মানুষ বা ক্রো-ম্যাগনন মানুষের আবির্ভাব (Appearance of Modern man or Cro-Magnon man) ঃ**

বিজ্ঞানী ট্রিঙ্কানস্ (Trinkans, 1984, '86) এবং সাইমনস্ (Simons, 1989)-এর মতে মানুষের দেহগত, বিভিন্ন গুণ বা ধর্মগত এবং সংস্কৃতিগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ—

(i) যান্ত্রিক ক্ষমতাযুক্ত হাত ও পা-এর ক্রম বিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্র তৈরি করা এবং তা ব্যবহারের ফলে হাতের পেশি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এর ফলে কাঁধ, কনুই, কব্জি ও হাতের গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। (ii) চোয়ালের ব্যবহার কমে যাওয়ায় চোয়ালটি ছোটো হয়ে গেছে। (iii) আধুনিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—দ্বিপদ গমন, যন্ত্রের ব্যবহার, বৃহৎ ও জটিল মস্তিষ্ক, আগুনের ব্যবহার, পশু শিকার, কথা বলে ভাব বিনিময় করা, সংস্কৃতি ও কলা চর্চা, সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার। বিবর্তনের বিভিন্ন সময়ে এই ধর্মগুলি উদ্ভূত

হয়েছে। (iv) প্রায় 1-2 মিলিয়ন বছর পূর্বে দ্বিপদ গমন প্রথম উদ্ভূত হয়। এই সঙ্গে গোষ্ঠী সম্পর্কের (kinship) উন্মেষ, কলাবিদ্যার (art) চর্চা, ঘরবাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেশ কিছু হাজার বছর পূর্বে উন্মেষ ঘটে।
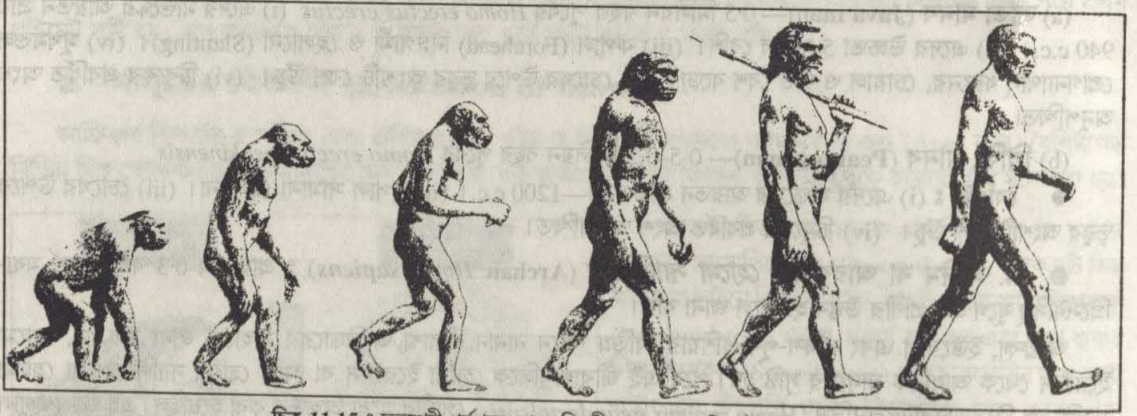
চিত্র 11.15 : চতুষ্পদী পূর্বপুরুষ থেকে দ্বিপদী মানুষের ক্রমবিবর্তনের চিত্ররূপ।

◻ মানুষের বিবর্তনের ধারা (Trends in human evolution) : আধুনিক মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে কয়েকটি চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যেমন—

(i) করোটির গহ্বরের (Cranial cavity) আয়তন ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। এটিকে মস্তিষ্কের (Brain) বিকাশ বলে মনে করা হয়।

(ii) ক্রমশ সোজা হয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

(iii) চিবুক বা থুতনির উৎপত্তি ঘটেছে।

(iv) মুখের সামনের দিকের রেখা ক্রমশ সোজা হয়েছে এবং ললাট খাড়া হয়েছে।

(v) ডেন্টাল আরচের আয়তন হ্রাস ঘটেছে।

(vi) অগ্রপদটি দৈর্ঘ্যে কমে গেছে।

মানুষের শুরু হয় গরিলা ও মানুষের সংমিশ্রণে। তারপর বহু সহস্র বছরের ক্রম বিবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে।

✪ 11.8. জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) ✪

❖ **(a) জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা (Definition of Biodiversity) : জীবমণ্ডলের সব রকম অসংখ্য উদ্ভিদ, প্রাণী, আণুবীক্ষণিক জীব ইত্যাদি যারা একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের একসঙ্গে জীববৈচিত্র্য বলা হয়।**

◻ (b) জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ (Different types of Biodiversity) : জীববৈচিত্র্যের ধারণার জটিলতাকে বোঝার সুবিধের জন্য অর্থবহ তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়, যেমন—জেনেটিক বৈচিত্র্য, প্রজাতিক বৈচিত্র্য ও ইকোলজিক্যাল বৈচিত্র্য।

(i) **জেনেটিক বৈচিত্র্য**—'জিন' দিয়েই জেনেটিক বৈচিত্র্য তৈরি হয় এবং জেনেটিক বৈচিত্র্যই হল কোনো জীব বা প্রজাতির মধ্যে জিনগত গঠনের প্রকারভেদ।

(ii) **প্রজাতিক বৈচিত্র্য**—প্রজাতিক বৈচিত্র্য বলতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির মোট সংখ্যা ও পৃথকীকরণকে বোঝায়।

(iii) **ইকোলজিক্যাল বৈচিত্র্য**—বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জীব-সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যকে বোঝায়।

◻ (c) জীববৈচিত্র্যের বিবরণ (Description of Biodiversity) :

➤ **A. বিশ্বের জীববৈচিত্র্য** (Biodiversity of the World) **:** জীববৈচিত্র্য অর্থাৎ কত ধরনের জীব পৃথিবীতে রয়েছে—এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। জীবনের উষালগ্ন থেকে ব্যাকটেরিয়ার প্রাধান্য ছিল। তারপর আর্কিয়ান (Archean), প্যালিওজোয়িক (Paleozoic), পার্মিয়ান (Permian) প্রভৃতি ভূতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। পৃথিবীর মহাদেশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাওয়াতে পৃথিবীর জলবায়ু, সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জীব-বণ্টনের উপর প্রভাব

বিস্তার করেছিল। তা ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে অনেক বড়ো বড়ো ধ্বংসলীলা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। জীবিত প্রজাতিরা আবার নতুন নতুন পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। 1980 সাল পর্যন্ত জীবের সংখ্যা অনুমান করা হয়েছিল 1 থেকে 3 কোটির মধ্যে। পৃথিবীর নানা দেশের ট্যাক্সোনমিক গবেষণার হিসেব থেকে এ পর্যন্ত 1·6 কোটি জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। নীচে পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগে জীবপ্রজাতির সংখ্যা দেখানো হল।

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের সবচেয়ে বড়ো ভাণ্ডার হচ্ছে **ক্রান্তীয় বর্ষা অরণ্যগুলি** (Tropical rain forest)। এই অরণ্যগুলিতে যে বিপুল জীববৈচিত্র্য রয়েছে তা এখনও বেশির ভাগ অনাবিষ্কৃত বলা যায়। পেরুর একটি বর্ষা অরণ্যের একটি গাছ থেকে পাওয়া গেছে 43টি পিঁপড়ের প্রজাতি। ইন্দো-মালয়ান অঞ্চলে আনুমানিক 25,000 প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে।

- **পৃথিবীতে বিভিন্ন বিভাগে জীব প্রজাতির সংখ্যা :**

ট্যাক্সোনমিক বিভাগ ও প্রজাতি	সংখ্যা	ট্যাক্সোনমিক বিভাগ ও প্রজাতি	সংখ্যা
প্রাণী : অমেরুদণ্ডী		**উদ্ভিদ : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ**	
1. প্রোটোজোয়া (Protozoa)	5,02,000	1. শৈবাল (Algae)	20,175
2. পরিফেরা (Porifera)	10,000	2. ছত্রাক (Fungi)	80,000
3. সিলেনটেরাটা (Coelenterata)	9,000	3. ব্রায়োফাইট্‌স (Bryophytes)	14,900
4. প্ল্যাটিহেলমিন্থিস (Platyhelminthes)	12,000	4. টেরিডোফাইটস্ (Pteridophytes)	11,000
5. নিমাটোডা (Nematoda)	10,000		1,26,075
6. মোলাস্‌কা (Mollusca)	1,00,000		
7. অ্যানিলিডা (Annelida)	8,000		
8. আরথ্রোপোডা (Arthropoda)	9,20,000		
9. একাইনোডারমাটা (Echinodermata)	6,000		
	15,77,000		
প্রাণী : মেরুদণ্ডী		**উদ্ভিদ : সপুষ্পক উদ্ভিদ**	
1. মাছ (Pisces)	23,000	1. সরলবর্গীয় (Conifers)	650
2. উভচর (Amphibia)	2,400	2. গুপ্তবীজী (Angiosperm)	300,000
3. সরীসৃপ (Reptilia)	5,200		3,00,650
4. পক্ষী (Aves)	3,300		
5. স্তন্যপায়ী (Mammalia)	4,200		
	38,100		
○ মোট প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা	1,615,100	○ মোট উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	4,26,275

➤ **B. ভারতের জীববৈচিত্র্য** (Biodiversity of India)— ভারতের মোট আয়তন হল 3 কোটি 10 লক্ষ হেক্টর। ভারতের উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে মরুভূমি, গঙ্গা উপকূলবর্তী অঞ্চল, 100টি নদী, 600 কিলোমিটার সমুদ্র তীর, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, অসংখ্য জলাভূমি ও দ্বীপসমূহের জন্য ভারতের জীববৈচিত্র্য বিত্তশালী বা সমৃদ্ধ।

অনুমান করা হয় ভারতে প্রায় 45,000 উদ্ভিদ-প্রজাতি আছে। প্রাণী-প্রজাতির সংখ্যা হল আনুমানিক 81,000-এর মতো। উদ্ভিদের মধ্যে 15,000 সপুষ্পক উদ্ভিদপ্রজাতি রয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে 64 ব্যক্তবীজী, 2,843 ব্রায়োফাইটস, 1,012 টেরিডোফাইটস, 12,480 শৈবাল, 23,000 ছত্রাক এবং 1,940 লাইকেন।

প্রাণীদের মধ্যে 5,000 হল শামুকজাতীয় ও 57,000 পতঙ্গ শ্রেণির। তা ছাড়া 2,546 মাছ, 204 উভচর, 2,428 সরীসৃপ, 1,228 পাখি এবং 372 স্তন্যপায়ী। তা ছাড়া রয়েছে অসংখ্য অণুজীব বৈচিত্র্য। অণুজীবের সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

● (a) **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity) :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, যাতে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের প্রয়োজনীয় জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে এবং অপরদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে।

সংরক্ষণ বলতে বোঝায় জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার ও পুনরুদ্ধার।

● (b) **ইন-সিটু কনজার্ভেশন (In-situ conservation)—মূল প্রাকৃতিক বাসস্থানে অর্থাৎ নিজস্ব পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে বলা হয় ইন-সিটু কনজার্ভেশন।**

উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের কথা বলা যায়। এই গাছ সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে জন্মায়। সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের এই বাস্তুতন্ত্রে সংরক্ষণ করাই হল ইন-সিটু কনজার্ভেশন। সহজ কথা বলতে গেলে নিজস্ব বাসস্থানে রেখে জীব-বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ইন-সিটু কনজার্ভেশন।

● **ইন-সিটু কনজার্ভেশনের সুবিধা (Advantage of In-situ conservation) :**

(i) কোনো প্রজাতি সংরক্ষণের সহজ উপায় হল যে বাসস্থানে জন্মায় সেই বাসস্থান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এর ফলে এই প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু প্রজাতিকুলও সংরক্ষিত হয়।

(ii) একটি প্রজাতি কেবলমাত্র একটি বাস্তুতন্ত্রের অংশই নয়, এটি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং বহু প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

(iii) কোনো প্রজাতিকে নিজস্ব পরিবেশে রেখে সংরক্ষণ করলে ওই বাস্তুতন্ত্রের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলি সচল থাকে এবং বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা অর্জন করে।

(iv) যেসব দেশে এখনও জীব-বৈচিত্র্য ভালোভাবে তালিকাভুক্ত হয়নি বা বিশদভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি, সেই দেশে ইন-সিটু কনজার্ভেশন প্রয়োজন।

(v) যেসব অঞ্চলে এখনও অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে সেই অঞ্চলে ইন-সিটু কনজার্ভেশন বিশেষভাবে আবশ্যক।

(vi) রিক্যালসিট্র্যান্ট (Recalcitrant) বীজ অর্থাৎ যেসব বীজ শুকিয়ে সীড ব্যাংকে রাখলে অঙ্কুরিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে ইন-সিটু কনজার্ভেশন পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

● (c) **এক্স-সিটু কনজার্ভেশন (Ex-situ conservation)—জীববৈচিত্র্যকে তাদের মূল প্রাকৃতিক বাসস্থান বা প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হল এক্স-সিটু কনজার্ভেশন।**

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাঁচিয়ে রাখাই হল এক্স-সিটু কনজার্ভেশন। আবার একই পদ্ধতিতে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঁচিয়ে রাখা হল এক্স-সিটু কনজার্ভেশন। নিম্নলিখিত উপায়ে এক্স-সিটু কনজার্ভেশন করা হয় :

(i) জাতীয় পার্ক, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি সংরক্ষিত জায়গাগুলিতে জীবের সংরক্ষণ করলে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(ii) সারা বিশ্বে প্রায় 1600 বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। পৃথিবীর মোট সপুষ্পক উদ্ভিদ-প্রজাতির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ প্রজাতি বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলিতে আছে। কাজেই বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণের একটি সুবিধেজনক উপায় হল বোটানিক্যাল গার্ডেন।

(iii) সীড ব্যাংক হল উদ্ভিদ-প্রজাতি সংরক্ষণের সহজ উপায়। কারণ সীড ব্যাংকে অল্প জায়গায় ও অল্প খরচে বহু জীব প্রজাতিকে ধরে রাখা যায়।

(iv) প্রাণীর ডিম্বাণু ও স্পার্ম ইত্যাদি জার্মপ্লাজম ব্যাংকে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

(v) উদ্ভিদের পরাগরেণু নিম্ন তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং পরে জীবন্ত উদ্ভিদের সঙ্গে ক্রসিং-এ ব্যবহার করা সম্ভব।

(vi) উদ্ভিদ ও প্রাণীর DNA-ও সংরক্ষণ করা যায়। DNA সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত জিন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু এখনও সংরক্ষিত DNA থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন করা যায়নি। এনিয়ে বহু গবেষণা নানা দেশে চলছে।

● (d) **কোন্ কোন্ প্রজাতি সংরক্ষণের দাবিদার :** সংরক্ষণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

(i) দুর্লভ এবং সংকটাপন্ন প্রজাতি।

(ii) অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির নিকট-সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি।

(iii) **কীস্টোন (Key stone) প্রজাতি** (যে প্রজাতি বিলুপ্ত হলে অন্য প্রজাতিও বিলুপ্ত হয়। **উদাহরণ**—সুন্দরবনের বাঘ)।

● **(e) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Importance of Biodiversity) :** মানুষের জীবনে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নীচে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বগুলি দেওয়া হল :

(i) **খাদ্যের উৎস সবুজ উদ্ভিদ**—সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলোকরশ্মির সাহায্যে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল নিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষ করে। তাই সবুজ উদ্ভিদে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন স্তরের প্রাণীদেহে ক্রমিকপর্যায়ে শক্তি প্রবাহিত হয় এবং ক্রমশ শক্তি হ্রাস পায়।

(ii) **জিন ভাণ্ডার হিসাবে বৈচিত্র্য**—আমরা বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি, যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, যব, ওট, জোয়ার, শস্য, সয়াবীন, মটরশুটি, শিম, বিন, টম্যাটো, আখ, রাঙাআলু, গাজর, কলা, কমলা আপেল ইত্যাদি। এ সব উদ্ভিদের অসংখ্য বন্য প্রজাতি (Wild species) প্রকৃতির বিভিন্ন অরণ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের জিন রয়েছে। এদের সংগ্রহ করে প্রযুক্তির মাধ্যমে পছন্দমতো উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর ফলে উন্নতমানের এবং উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি তৈরি করা যাবে। তা ছাড়া যে সমস্ত প্রজাতি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবমণ্ডলে আমাদের স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

উচ্চমানের বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রেও জিন প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার গৃহপালিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সৃষ্টি করা সম্ভব।

(iii) **গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ**—রোগ নিরাময়ের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার ওষুধপত্র জীববৈচিত্র্য থেকে পাই। অনেক ওষুধ আমরা ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক ও সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করি। জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব না থাকলে আমাদের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হবে।

(iv) **অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য**—জীববৈচিত্র্য প্রত্যেক দেশের মূল্যবান সম্পদ। বিদেশে রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া চিড়িয়াখানা, অভয়ারণ্য, মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়।

(v) **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য**—যে-কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রের জীবসম্প্রদায় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করে। এদের মধ্যে উৎপাদক, বিভিন্ন শ্রেণির খাদক ও বিয়োজক রয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের যে-কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী-প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হল সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত খাদ্যশৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটা এবং এর ফলে অন্যান্য নির্ভরশীল প্রজাতিগুলির সংকট দেখা দেয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেমন সুন্দরবনের হরিণ, শূকর প্রভৃতি শাকাশী প্রাণী কমে গেলে মাংসাশী প্রাণী বাঘের অসুবিধে হবে। তখন সে বাঁচার জন্য অন্যান্য পশু ও মানুষের উপর আক্রমণ করবে। আবার বাঘের সংখ্যা কমে গেলে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। খাদ্যের জন্য তারা আশেপাশের শস্য নষ্ট করবে। তাই যে-কোনো বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

(vi) **কৃষ্টিগত গুরুত্ব**—প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাহিত্যে, কাব্যে, গল্পে, কবিতায় অরণ্য ও বন্য প্রাণীর বিভিন্ন সুন্দর বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে অরণ্য ও বন্যপ্রাণীর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

(vii) **মূল্যবোধ**—জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 1992 সালের 3 থেকে 14 জুন জাতিসংঘের বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে। এই সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়।

1. জীববৈচিত্র্যের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা। 2. ইন-সিটু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। 3. এক্স-সিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা। 4. সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। 5. জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের ও দক্ষতার থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সম অংশীদারির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যবোধ শক্তিশালী করা। 6. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বর্ধিত বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। 7. সংরক্ষণ কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, মূল মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, তথ্য ও শিক্ষায় উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ।

০ অনুশীলনী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে হ্যাল্ডেন ও ওপারিনের মতামত সংক্ষেপে লেখো। 2. জীবের জৈব রাসায়নিক উৎপত্তি সম্পর্কে মিলার ও উরের পরীক্ষা আলোচনা করো। 3. ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধুনিক ধারণা ব্যক্ত করো। 4. (a) অনুকৃতি কী? (b) বর্ণগ্রহ কাকে বলে? (c) উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনুকৃতি ও বর্ণগ্রহ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। 5. (a) স্পিশিয়েশন কাকে বলে? (b) পৃথকীকরণের সংজ্ঞা লেখো। (c) প্রজাতি সৃষ্টিতে পৃথকীকরণের ভূমিকা আলোচনা করো। 6. (a) প্রজাতি কাকে বলে? (b) জৈবিক প্রজাতি সম্বন্ধে তোমার ধারণা ব্যক্ত করো। 7. টাইপভিত্তিক ও নামিক প্রজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করো। 8. (a) ড্রাইওপিথেকাস কী? (b) র‍্যামপিথেকাস, অস্ট্রেলোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস ও হোমো হ্যাবিলিসের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। 9. কীভাবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল ছকের মাধ্যমে দেখাও। 10. *হোমো স্যাপিন্স ফসিলিস* কাকে বলে? মানুষের বিবর্তনের ধারা সংক্ষেপে লেখো। 11. (a) জীববৈচিত্র্য কী? (b) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব আলোচনা করো। 12. ইন-সিটু-কনজার্ভেশন ও এক্স-সিটু কনজার্ভেশনের পার্থক্য দেখাও।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. রাসায়নিক বিবর্তনকাল কাকে বলে? 2. প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবীর আবহাওয়া কেমন ছিল? 3. মাইক্রোস্ফিয়ার কী? 4. প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কী বোঝো? 5. নয়া-ডারউইনবাদ কাকে বলে? 6. অনুকৃতি কী? 7. বর্ণগ্রহ কাকে বলে? 8. প্রজাতি কাকে বলে? 9. স্পিশিয়েশন কী? 10. পৃথকীকরণের সংজ্ঞা লেখো। 11. হোমো নিয়েনডার্থলেনসিস কী? 12. হোমো স্যাপিয়েন্স ফসিলিসের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। 13. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে? 14. জেনেটিক বৈচিত্র্য ও প্রজাতিক বৈচিত্র্য কাকে বলে? 15. ইন-সিটু কনজার্ভেশন কাকে বলে? 16. এক্স-সিটু কনজার্ভেশন কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. আদিম পৃথিবীর আবহাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল? 2. মিলার ও উরে পরীক্ষা করে কী প্রমাণ করেছিলেন? 3. কোন্ যুগে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে? 3. কোয়াসারভেট ফোঁটা কী? 4. জীবের উৎপত্তি কত বছর আগে ঘটে? 5. রাসায়নিক বিবর্তন কাল কী? 6. নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লম্বাগলাযুক্ত জিরাফ কীভাবে সৃষ্টি হয়? 7. সর্প উদ্ভিদ কী? 8. ভাইসরয় প্রজাপতি পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কী করে? 9. *কালিমা পারাল্যাকটা* কী? 10. একটি বর্ণগ্রহ প্রাণীর নাম লেখো। 11. ভৌগোলিক পৃথকীকরণ কী? 12. অ্যালোপ্যাট্রিক জীবগোষ্ঠী কাকে বলে? 13. সিম্প্যাট্রিক জীবগোষ্ঠী কী? 14. টাইপভিত্তিক প্রজাতি কাকে বলে? 15. জৈবনিক প্রজাতি বলতে কী বোঝো? 17. কুড়ি লক্ষ বছর আগে প্রাইমেট বর্গের একটি প্রাণীর নাম করো। 18. ক্রো-ম্যাগনন কী? 19. বর্তমান মানুষ কোথায় প্রথম আবির্ভূত হয়? 20. প্রজাতি বৈচিত্র্য কী? 21. সারা বিশ্বে মোট কত বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে? 22. সীড ব্যাংক কী? 23. কীস্টোন প্রজাতি কী? 24. 1992 সালের 3 মে থেকে 14 জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে কী অনুষ্ঠিত হয়? 25. জিন ভাণ্ডার কী?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. মাইক্রোস্ফিয়ার; 2. মেসোজয়িক যুগ ; 3. সিলুরিয়ান যুগ ; 4. প্যালিওজয়িক যুগ; 5. সংশ্লেষ তত্ত্ব; 6. অনুকৃতি; 7. বর্ণগ্রহ; 8. জৈবনিক প্রজাতি; 9. *হোমো হ্যাবিলিস*; 10. ইন-সিটু কনজার্ভেশন; 10. জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব; 11. পিকিং মানব; 12. *হোমো ইরেক্টাস*।

পপুলেশন বায়োলজি [POPULATION BIOLOGY]
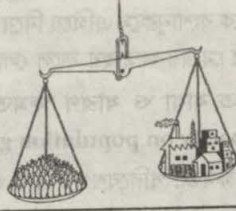
12.1. পপুলেশন বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারণা (Concepts of Population Growth)

❖ **জনসংখ্যার সংজ্ঞা (Definition of Population)** : একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, নির্দিষ্ট সময়ে একই প্রজাতিভুক্ত জীবের সংখ্যাকে পপুলেশন বলা হয়।

বিজ্ঞানী ক্লার্ক (Clark, 1954) পপুলেশনকে দুভাবে প্রকাশ করেন, যেমন— (i) **পপুলেশন**—একই প্রজাতিভুক্ত জীবদের নিয়ে গঠিত এবং (ii) **মিশ্র পপুলেশন**—বিভিন্ন প্রকার জীবদের নিয়ে গঠিত।

▲ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ (Causes of Population) :

জনসংখ্যা হার বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান।

1. **জন্ম ও মৃত্যুর হার (Birth and Death rates)**— যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে জনসংখ্যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ, সেই সময়ে জন্ম ও মৃত্যুর হার সমান ছিল। এখনকার তুলনায় ওই সময়ে মৃত্যুর হার বেশি ছিল কারণ, দুর্ভিক্ষ, রোগ-ভোগ এবং যুদ্ধের জন্য বহু মানুষ মারা যেত। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রস্তর যুগে মানুষের গড় আয়ু ছিল 17 বছর, রোম ও মিশরের মানুষের গড় আয়ু ছিল 30 বছর। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু 70-100 বছর।

2. **মরণশীলতা (Mortality)**— মানুষের জীবনকালের উপর জনসংখ্যা নির্ভর করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের মৃত্যুর হার কমে গেছে। 1970 সালের পর থেকে প্রতি বছর মানুষের গড় আয়ু প্রায় 4 মাস করে বেড়েছে।

3. **প্রচরণশীল কার্যকলাপ (Migratory activities)**— প্রচরণশীল কার্যকলাপে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থায়ী ভাবে চলে যাওয়া বা আসাকে **প্রচরণশীল কার্যকলাপ** বলে। প্রচরণ দু'রকমের হয়, যেমন—(i) **দেশ ত্যাগ** (Emigration) হল স্থায়ীভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং (ii) **অভিবাসন** (Immigration) হল বসবাসের জন্য দেশ ছেড়ে স্থায়ীভাবে বিদেশে আসা। কোনো দেশে দেশ-ত্যাগের তুলনায় অভিবাসন বেশি হলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। আবার অভিবাসনের তুলনায় দেশ ত্যাগ বেশি হলে জনসংখ্যার হ্রাস ঘটে। উদাহরণ—1947 খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় (ভারত ও পাকিস্তান) বহু মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে। এতে ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং পাকিস্তানের জনসংখ্যার হ্রাস ঘটে।

4. **অজ্ঞানতা এবং শিক্ষাহীনতা (Ignorance and Illiteracy)**— মানুষের অজ্ঞানতা এবং শিক্ষাহীনতা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাধা হিসাবে কাজ করেছে। সঠিক শিক্ষার অভাবে সমাজের লোকেরা স্মরণাতীত কাল থেকে ভেবে আসছে যে সন্তান-সন্ততি ভগবানের দান, তাই এদের ধারণা হল জন্ম নিয়ন্ত্রণ একটি অপরাধ। আবার বহু গরিব লোকেদের ধারণা যত বেশি সন্তান তাদের পরিবারে জন্ম নেবে তত বেশি কাজ করার লোক পাওয়া যাবে ফলে বেশি রোজগার হবে। এই সব কারণগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু এরফলে এই সব অভিভাবকরা পরিবারে অধিক লোকসংখ্যার চাপে হাবুডুবু খায়।

5. **বড়ো পরিবার গঠনে সামাজিক নিয়ম (Social Norms favouring large family)**— জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে বিভিন্ন সামাজিক অনিয়ম বা কুপ্রথাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কুপ্রথাগুলি হল বাল্য বিবাহ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরোধিতা ইত্যাদি। কম বয়সে বিবাহের ফলে প্রজনন ক্ষমতার সময়কাল দীর্ঘায়িত হয় ফলে বহু শিশুর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধর্মের লোক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। এর ফলে এই সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়তে দেখা যায়।

6. **পুত্র সন্তানের আশা (Desire for male child)**—কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার ইচ্ছা অধিকাংশ

পিতামাতার থাকে। তাদের ধারণা ছেলেরা তাদের নিজের পরিবারকে বংশানুক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এদের মতে ছেলে না হলে তাদের পরিবারের সমাপ্তি ঘটবে। ছেলে হওয়ার আশায় বারে বারে মেয়ের জন্ম হয় ফলে লোক সংখ্যা বাড়ে।

◘ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জৈবিক ক্ষমতা, পরিবেশগত বাধা ও ধারণ ক্ষমতার ভূমিকা (Role of biotic potential, Environmental resistance and carrying capacity on population growth) ঃ

কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা নির্ভর করে জৈবিক ক্ষমতা, পরিবেশগত বাধা ও ধারণ ক্ষমতার উপর।

1. **জৈবিক ক্ষমতা (Biotic potential)**— জৈবিক ক্ষমতার উপর একটি আদর্শ পরিবেশে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে। তা ছাড়া জীবের বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাতও এর সঙ্গে জড়িত। সব জীবের জৈবিক ক্ষমতা বেশি মাত্রায় থাকে। যদি সংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা না হয়, তাহলে সেই জীবের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। জৈবিক ক্ষমতা কতকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি প্রজাতির সংখ্যা বিস্তারে সাহায্য করে। উপাদানগুলি হল— (i) বংশবৃদ্ধির হার, (ii) জীবের অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য, (iii) অন্য বাসস্থানে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, (iv) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও (v) প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা।

2. **পরিবেশগত বাধা (Environmental resistance)**— পরিবেশে জীব সংখ্যার বিস্ফোরণ হয় না তার কারণ কেবলমাত্র জৈবিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নয়, পরিবেশগত বাধাও একটা বড়ো কারণ বলা যায়। পরিবেশে প্রত্যেক জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশগত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। পরিবেশগত বাধাগুলি হল— (i) খাদ্যাভাব বা পুষ্টির অভাব, (ii) জল ও বাসস্থানের অভাব। (iii) আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। (iv) রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিকারির দৌরাত্ম্য। (v) বাসস্থান দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (vi) দুর্ভিক্ষ ও মহামারি।

পরিবেশগত বাধা জীবসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এইগুলিকে জীবসংখ্যা **নিয়ন্ত্রণকারী শর্তাবলি** বলে। সব প্রজাতির বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শর্তগুলি বাধার সৃষ্টি করে। পরিবেশগত বাধা ও জৈবনিক ক্ষমতার মধ্যে একটা সাম্য দেখা যায়। পরিবেশগত বাধা বেশি হলে জৈবিক ক্ষমতা কম হবে এবং জীব সংখ্যাও কমবে। আবার পরিবেশগত বাধা কম হলে জৈবিক ক্ষমতা বাড়ে ও জীবসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

3. **ধারণ ক্ষমতা (Carrying capacity)— সংজ্ঞা ঃ একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অন্য কোনো প্রজাতির ক্ষতি না করে একটি প্রজাতির সর্বাধিক সংখ্যা বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাকে ধারণ ক্ষমতা বলে।**

● **ধারণ ক্ষমতার ব্যাখ্যা**—ধারণ ক্ষমতা মতবাদ বা বহন করার চরম সীমা শব্দটি কিছুদিন ধরে কোনো অঞ্চলের সর্বাধিক জনসংখ্যাকে ন্যূনতম পর্যায়ে বাঁচিয়ে রাখার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোনো একটি জীবের সংখ্যা প্রথমে ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সংখ্যা আরও বাড়ার পর একটি অবস্থায় ওই স্থানের ধারণ ক্ষমতা শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়। জীবের সংখ্যা এর পরেও বাড়লে ধারণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য জীব সংখ্যার হ্রাস ঘটে এবং পরে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় এসে স্থিতিশীল হয়।

বহন ক্ষমতা প্রধানত দুটি মৌলের উপর নির্ভরশীল; এই দুটি হল—(i) **সংশ্লেষ ক্ষমতা** (Assimilative capacity) এবং (ii) **সরবরাহ ক্ষমতা** (Availability capacity)। এই দুটির অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার সম্পদের সরবরাহ ও পরিবেশের গ্রহণের উপর বহন ক্ষমতা নির্ভর করে। বহন ক্ষমতা কোনো স্থির সংখ্যা হয় না। বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে বহন সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে। বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় প্রকার হতে পারে। বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন সাধারণত খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, রোগ, প্রতিকূল পরিবেশ, জলের অভাব প্রভৃতি কারণের উপর নির্ভর করে। যে-কোনো বাস্তুতন্ত্রের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে পারে না, কারণ পরিবেশগত বাধা থাকে এবং বহন ক্ষমতারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
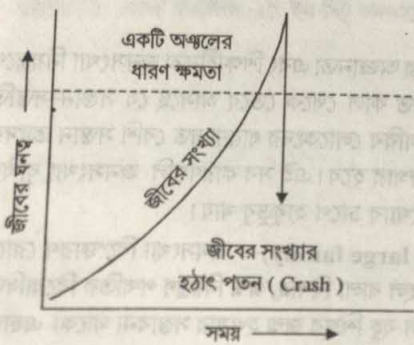
চিত্র 12.1. কোনো নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতার গ্রাফ।

4. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির গ্রাফ (Population growth curve)**— জনসংখ্যা বৃদ্ধির গ্রাফ সাধারণত দু'রকমের হয়, যেমন— (i) 'S' আকারের বৃদ্ধি (S-shaped) গ্রাফ ও (ii) 'J' আকারের (J-shaped) গ্রাফ।

(i) **'S' আকৃতির সিগমোয়ড গ্রাফ**— উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির হার 'S' আকারে নির্দেশ করে। এই গ্রাফে তিনটি দশা লক্ষ

করা যায়, যেমন— **ল্যাগ দশা** (Lag phase), **লগ দশা** (Log phase) এবং **স্থির দশা** (Stationary phase)। কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবগোষ্ঠীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে কিছুদিন সময় লাগে তাই বৃদ্ধির হার খুব কম হয় (ল্যাগ দশা)। জীব যখন ওই পরিবেশে মানিয়ে নেয় তখন বৃদ্ধি অতি দ্রুত বাড়ে (লগ দশা) এবং পরে বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। এর পর বৃদ্ধির হার কমে একটি সংখ্যায় স্থিতিশীল হয়। জন্ম ও মৃত্যুর হার সমান হলে স্থিতিশীল অবস্থা আসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান ও বিভিন্ন সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, ফলে বৃদ্ধির হার কমে যায়। এখানে স্থিতিশীল অবস্থায় আসা মানে নির্দিষ্ট পরিবেশ জীবের সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতাকে বোঝায়।

চিত্র 12.2. জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঃ S-আকারে গ্রাফ।

(ii) **'J' আকৃতির গ্রাফ**— যখন প্রকৃতিতে পরিবেশের কোনো বাধা থাকে না তখন এই প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির গ্রাফ হয়। এই গ্রাফে দেখা যায় জীবের সংখ্যা প্রাথমিক অবস্থায় খুব ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিবেশের চাপে অর্থাৎ খাদ্য, বাসস্থান আবহাওয়ার প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটলে বা পরিবেশগত চাপের (বাধার) ফলে সংখ্যার হ্রাস ঘটে।

চিত্র 12.3. জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঃ J-আকারে গ্রাফ।

▲ জনবিস্ফোরণের প্রভাব (Effect of Over-population) ঃ

একটি দেশের জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক, সামাজিক অন্যান্য অবক্ষয় ও সমস্যাগুলি হল—

(i) মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় না। (ii) বাসস্থানের অভাব দেখা দেবে। (iii) কৃষি জমির ঘাটতি দেখা দেবে। (iv) খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। (v) অরণ্য ধ্বংস হবে। (vi) অপুষ্টি ও বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ দেখা দেবে। তা ছাড়া চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। (vii) বেশি সংখ্যক মানুষ অনাহার ও অপুষ্টির শিকার হবে। (viii) জলের অভাব দেখা দেবে। (ix) নানা প্রকার রোগ ও মহামারি দেখা দেবে। (x) পরিবেশগত দূষণ বৃদ্ধি পাবে। (xi) দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

▲ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Control of Population) ঃ

জনসংখ্যা হারের বৃদ্ধিকে প্রধানত জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েক রকমের বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birth control) পদ্ধতির সাহায্যে জন্ম ধারণ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়।

1. **গর্ভ নিরোধক বড়ি** (Oral contraceptive tablets) ঃ নানা প্রকার গর্ভনিরোধক বড়ি (মুখে গ্রহণযোগ্য গর্ভনিরোধক বড়ি), সাধারণত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন নামে দু'রকমের হরমোনের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। কোনো স্ত্রীলোক এগুলি নিয়মিত খেলে ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) বন্ধ থাকে, এছাড়া দেহে স্ত্রী-যৌন হরমোনগুলি পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পরিবর্তিত হয়। এই সব কারণে প্রধানত ডিম্বাণুর অভাবে গর্ভধারণ হতে পারে না।

2. **নির্বীজকরণ** (Sterilization) ঃ (i) পুরুষের দু-দিকের শুক্রাশয় থেকে আসা ভাসডিফারেন্স বা শুক্রনালিকে কেটে ও বেঁধে দিলে তাকে **ভ্যাসেক্টমি** (Vasectomy) বলে। এর ফলে শুক্রাশয় ও এপিডিডাইমিস থেকে শুক্রাণুগুলি দেহের বাইরে আসতে পারে না। এই কারণে গর্ভাবস্থা সৃষ্টি হয় না। (ii) একইভাবে, স্ত্রী লোকের জরায়ু থেকে উৎপন্ন উভয় দিকের ফ্যালোপিয়ান নালি কেটে ও বেঁধে দিলে তাকে **টিউবেক্টমি ও লাইগেশন** (Tubectomy or ligation) বলে। এর ফলে ডিম্বাণুটি (Ovum) ফ্যালোপিয়ান নালির মধ্য দিয়ে জরায়ুতে আসতে পারে না এবং শুক্রাণু ডিম্বাশয় কাছে যেতে পারে না। এই কারণে গর্ভাবস্থা সৃষ্টি হয় না। এই প্রকার অস্ত্রোপচারের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে না পারায় গর্ভধারণ ক্ষমতা নিবারিত হয়।
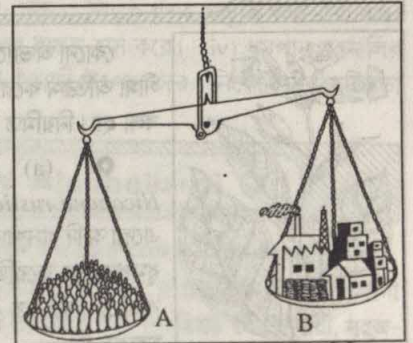
চিত্র 12.4 ঃ (A) জনসংখ্যা এবং (B) বিভিন্ন সংস্থানের মধ্যে সম্পর্কের চিত্ররূপ।

3. **অন্যান্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া**— লুপ, ডায়াফ্রাম, নিরোধ (কন্‌ডোম্) শুক্রাণুনাশক জেলি ও ফোম ইত্যাদি ব্যবহার করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

12.2.A. মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health)

❖ (a) **মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা (Definition of Mental Health) : মানসিক স্বাস্থ্য হল পরিবেশের সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের এক সুখকর সামঞ্জস্য।**

◘ **মানসিক সুস্থ ব্যক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (A few characteristic features of a Mentally healthy person) :**

(i) একজন মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান মানুষ সবসময় আত্মবিশ্বাসী হয় এবং নিজের কাজে সন্তুষ্ট থাকে। (ii) সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও কর্মদক্ষতা দেখা যায়। (iii) সুস্থ মানুষ সবসময় হাসিখুশি থাকে এবং কোনো সময় বিচলিত হয় না। অর্থাৎ সহজেই মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগেন না। (iv) মানসিক দিক থেকে সুস্থ মানুষ অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে সহজে চলতে পারে। অন্যের সমালোচনা সহ্য করতে পারে এবং কোনো ভাবেই হতাশায় ভোগে না। (v) এইরূপ মানুষ অন্যের আবেগকে অনুভব করতে সক্ষম হয়। অন্যের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করে। (vi) মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ হঠাৎ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয় না এবং নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারে। (vii) এই ধরনের সুস্থ লোক অহংকার, রাগ, ভীতি, হিংসা ও উৎকণ্ঠা থেকেও মুক্ত থাকে। (viii) যে-কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা ও সাহস থাকে এবং বুদ্ধির মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করে। (xi) মানসিক সুস্থ মানুষের একাগ্রতা ও সুকুমার বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। (x) রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, স্বাভাবিক ঘুমের কোনো অসুবিধে হয় না।

▲ **মানসিক পীড়া (Mental illness) :**

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : কোনো ব্যক্তির কোনো কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি ব্যাহত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে মানসিক পীড়া (Mental illness) বলে।**

◘ (b) **মানসিক রোগীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (A few characteristic features of Mental patient) :**

(i) মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চিন্তা, উপলব্ধি, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত, স্মৃতি ইত্যাদি অস্বাভাবিক হওয়ার ফলে রোগীর ব্যক্তিত্ব এবং আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। (ii) উপরের পরিবর্তনগুলি মানসিক রোগী এবং তার পরিবারের লোকেদের দুর্দশা, অশান্তি, যন্ত্রণা-ভোগ প্রভৃতিকে বাড়ায়। (iii) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য**—উদ্‌বিগ্ন, পীড়ন, ঘুমের ব্যাঘাত, অবসাদ, আগ্রাসন আচরণ, ভয়, আতঙ্ক, বাধা এবং নিজের কাজ করার অনীহা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে।

◘ (c) **মানসিক রোগের প্রকারভেদ (Types of Mental illness) :** মানসিক রোগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে (categories) ভাগ করে আলোচনা করা হল—সাইকোসিস, নিউরোসিস, এপিলেপসি ইত্যাদি।

12.2.B. তামাকের ধূমপান ও তামাক চিবানো (Tobacco Smoking and Chewing)

চিত্র 12.5. তামাক গাছের ফল ও পাতাসহ একটি শাখা।

কোনো অভ্যাসের উপর যখন মানুষের ঐচ্ছিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক নির্ভরতা তার নিয়ন্ত্রণের সীমা অতিক্রম করে যায় সেই অবস্থাটিকে **আসক্তি বা নেশা** বলে। এইরূপ আসক্ত মানুষকে **'নেশাগ্রস্ত'** বলা হয়। নিয়মিত তামাকের ধূমপান ও তামাক চিবানো হল একপ্রকার **সামাজিক কুঅভ্যাস।**

o (a) **তামাকের পরিচিতি**— তামাক বা তাম্রকূট (*Nicotiana tabacum* ও *Nicotiana rustica*) হল লম্বা ঔষধি গুল্ম এবং **সোলানেসি** (Solanaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এদের আদি বাসস্থান হল দক্ষিণ আমেরিকা। সেখানকার রেড-ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা সর্বপ্রথম তামাকের ধূমপান শুরু করেছিলেন। তামাক গাছের তরুণ শাখার পাতাগুলি শুকিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে রেখে বাজারে বিক্রি হয় এবং তার থেকে তামাক প্রস্তুত করা হয়। তামাক প্রকৃতপক্ষে একটি **অনিষ্টকর মাদকদ্রব্য।**

o (b) **ব্যবহার বিধি**—ধূমপানের উপাদান বিড়ি, সিগারেট ও চুরুট, মুখে চিবিয়ে রস

খাওয়া (খইনি, গুটখা) ও নাসারন্ধ্রে পুরে শ্বাস টেনে তামাকের গুড়ার (নস্য) ঘ্রাণ-গ্রহণ ইত্যাদি। এই ভাবে সাধারণত তামাক ধূমপান বা চিবানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

(c) **মানবদেহে তামাক/ নিকোটিন-এর প্রভাব (Effect of Tobacco / Nicotin on Human body)** ঃ তামাকের প্রধান উত্তেজক পদার্থ হল নিকোটিন যা মানুষের দেহে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

1. **ক্যানসার উৎপাদনে ধূমপানের প্রভাব** (Effect of tobacco on Cancer production)—সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যানসার উৎপাদক, ক্যানসার-উদ্দীপক, ক্যারসিনোজেন, কো-ক্যারসিনোজেন, মিউটাজেন প্রভৃতি পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এইসব পদার্থগুলি মানুষের মুখ, শ্বাসনালি, গ্রাসনালি ও ফুসফুসে ক্যানসার হতে সাহায্য করে।

2. **ফুসফুসের উপর ধূমপানের ক্রিয়া** (Effect of smoking on Lungs)—ধূমপান ফুসফুসে যেসব রোগের সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রধান —(i) **শ্বাসনালির প্রদাহ** (Bronchitis)—ধূমপান থেকে **ব্রংকাইটিস** বা শ্বাসনালিতে প্রদাহ ও কাশির উদ্ভব হয়। ব্রংকাইটিসের একটি বিশেষত্ব হল শ্বাসনালিকা পর্যায়ক্রমিক সংকীর্ণ হয়ে হাই ওঠে ফলে **হাঁপানি** বা **শ্বাসকষ্টের** উদ্ভব হতে পারে।

(ii) **ফুসফুসের অতিস্ফীতি**— ধূমপানের ফলে শ্বসন নালিকাগুলি বায়ুপথ সমূহের সরু হয়ে যায়, এর ফলে একে এমফিসেমা বলে। জটিল এমফিসেমা অবস্থায় ফুসফুসে যেসব পরিবর্তন আসে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় না।

(iii) **উদ্‌গারি কাশি**—প্রচণ্ড কাশি বা কেশে কেশে ফুসফুস থেকে শ্লেষ্মা ইত্যাদিকে তুলে আনার নাম **উদ্‌গারি কাশি**। ধূমপায়ীদের মধ্যে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

3. **রক্তবাহ-হ্রাসজনিত হৃদ্‌রোগ** (Ischemic heart diseases) —পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও জানা গেছে **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** বা বুকে হৃৎপিণ্ডের ব্যথা ও **ইসচেমিক হৃদ্‌রোগের** সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক রয়েছে। (ii) ধূমপান অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে **ক্যাটেকোলামিন ক্ষরণ** বাড়িয়ে দেয়, যা অণুচক্রিকায় অসঞ্জন (Adhesiveness) বৃদ্ধি করে **থ্রমবোসিসের** ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া হৃৎপিণ্ডের **স্পন্দনবিকার** (arrhythmia) দেখা যায় যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। (iii) ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যাটেকোলামিনের অত্যধিক ক্ষরণে ট্যাকিকারডিয়া (হৃৎস্পন্দন হারের বৃদ্ধি) ও খানিকটা রক্তচাপ-বৃদ্ধিও লক্ষ করা যায়।

4. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on central nervous system) —সামান্য পরিমাণে মাথা ঝিমঝিম, কম্পন, অনিদ্রা ও কখনো-কখনো স্নায়ুশূল (Neuralgia) দেখা যায়।

5. **পৌষ্টিকনালির উপর ক্রিয়া** (Effect on gastrointestinal disorder)—ধূমপান পাকস্থলী বা ডিওডিনামে ঘা (ulcer) ইত্যাদির জন্য দায়ী না হলেও সম্ভবত এদের প্রকোপ বৃদ্ধি করে।

6. **গর্ভাবস্থার উপর প্রভাব** (Effect of smoking on pregnancy)—গর্ভাবস্থায় যেসব মা ধূমপান করে তাঁদের শিশু জন্মের সময় কম ওজনের হয় এবং তাদের গর্ভপাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

7. **যৌনজীবনের উপর ধূমপানের ক্রিয়া** (Effect on reproductive system) —এই সময় মাসিক যৌন চক্র বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ মেনোপেজ তাড়াতাড়ি ঘটে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু উৎপাদন ব্যাহত হয়।

8. **অন্যান্য পরিবর্তন** (Other changes)— (i) ক্ষুধামান্দ্য, দাঁতের ক্ষয়, গলা ও জিহ্বার প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। (ii) কিছু কিছু ধূমপায়ীর দৃষ্টিশক্তিও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। (iii) ধূমপান ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা হ্রাস করে। (iv) ধূমপান রক্তনালির সংকোচনের মাধ্যমে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। প্রায়ই বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঝিমঝিম ইত্যাদি উৎপন্ন করে। নিকোটিনের সক্রিয়তা অনেকটা অ্যাডরেন্যালিনের মতো।

12.2.C. মদ ও মদাসক্ত (Alcohol and Alcoholism)

(a) **অ্যালকোহল এবং অ্যালকোহলিজিমের সংজ্ঞা (Definition of Alcohol and Alcoholism)** ঃ

1. **অ্যালকোহলের সংজ্ঞা (Definition of Alcohol) ঃ ইষ্ট-এনজাইমের সাহায্যে পাতন (Distillation) প্রক্রিয়ায় দানা শস্য, ফলের রস (আঙুরের রস), শ্বেতসার ইত্যাদি পদার্থ থেকে কোহল সন্ধান (ফারমেন্টেশন) পদ্ধতিতে যে উদ্‌বায়ী, সহজ-দাহ্য (Inflammable), অন্তঃস্পর্শী গন্ধ ও জ্বালা উদ্রেককারী স্বাদের (Penetrating odour and burning taste sensation) তরল উৎপন্ন হয় তাকে কোহল বা অ্যালকোহল বলে।**

2. **মদাসক্তের সংজ্ঞা (Definition of Alcoholism) ঃ একজন লোক নিয়মিত অ্যালকোহল পানের অভ্যাসের ফলে**

অ্যালকোহল-নির্ভর (আসক্ত) হয়ে পড়ে এবং এই কুঅভ্যাস থেকে সহজেই বেরিয়ে আসতে না পারার অবস্থাকে মদাসক্ত বলা হয়।

■ (b) **ব্যক্তি বিশেষের উপর প্রভাব (Effects on Individual) :** দেহের প্রতিটি অঙ্গে অ্যালকোহলের প্রভাব দেখা যায়। নীচে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অ্যালকোহলের প্রধান প্রভাবগুলি আলোচনা করা হল।

1. **স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effect on nervous system)— স্নায়ুতন্ত্রের উপর অ্যালকোহলের একটি চেতনানাশক প্রভাব দেখা যায়। এটা সব স্নায়ুকোশের উপরই কাজ করে। কোনো ব্যক্তি বেশিমাত্রায় অ্যালকোহল পান করলে তার পরিবেশের প্রতি সচেতনা, সতর্কতা, অভ্রান্ত সিন্ধান্ত, স্মৃতিশক্তি এবং মেজাজ স্থির রাখা ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য উপসর্গগুলি হল—(i) মাথাধরা, অবসাদ, ঘুমঘুমভাব, কাজ করার প্রতি অনীহা, (ii) আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযমের বিলুপ্তি, (iii) বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (চোখ, কান ইত্যাদি) স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছু বুঝতে বা উপলব্ধি করতে না পারা, (iv) জিভে সংযোগকারী স্নায়ু আক্রান্ত হয় ফলে জিভের নড়াচড়া এবং স্পষ্ট কথাবার্তা বলতে না পারা অর্থাৎ কথা জড়িয়ে যাওয়া। (v) স্মৃতি বা স্মরণশক্তি, সিদ্ধান্ত, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি নষ্ট হওয়া। পেশি দুর্বল হয়ে সহজেই অসাড়তা দেখা যায়।

2. **পাকস্থলীর উপর প্রভাব** (Effect on Stomach)—বেশি মাত্রায় উচ্চ ঘনত্বের অ্যালকোহল পান করলে পাকস্থলীর কোশের ক্ষতি হয় এবং গ্যাস্ট্রাইটিস্ নামে প্রচণ্ড প্রদাহজনিত রোগের আলসার (Ulcer) সৃষ্টি হয়।

3. **যকৃতের উপর প্রভাব** (Effect on Liver)— মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় যকৃতের। অ্যালকোহল যকৃতে গিয়ে অ্যাসিটালডিহাইড নামে আরও মারাত্মক একটি বিষ পদার্থে পরিণত হয়। যকৃৎ অ্যালকোহল থেকে চর্বি বা ফ্যাট তৈরি করে। এই ফ্যাট যকৃতে এবং পিত্তনালিতে সঞ্চিত হয়। এছাড়া যকৃতে অধিক পরিমাণ ফ্যাট গ্লাইকোজেন প্রোটিন এবং উৎসেচকের সংশ্লেষণকে কমিয়ে দেয়। যকৃৎ এইভাবে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং প্রোটিন বিপাকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের পরিবর্তে কেবল ফ্যাট জমা করতে থাকে বলে একে চর্বিযুক্ত যকৃৎ-সংক্রান্ত রোগের উপসর্গ বা **ফ্যাটি লিভার সিনড্রোম** (Fatty liver syndrome) বলে। পরবর্তী অবস্থায় যকৃতের কোশগুলি শক্ত হয়ে ওঠে কারণ যকৃৎ কোশগুলি তন্তুময় কলায় পরিণত হয় এবং শুকিয়ে যায়। যকৃতের এই ধরনের পরিণতিকে **যকৃতের সিরসিস** (Cirrhosis of liver) বলে।

4. **হৃৎপিন্ডের উপর প্রভাব** (Effect on Heart)—নিয়মিত অ্যালকোহল পান করলে রক্ত নালিকাগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে হৃৎপিন্ডের কাজ ব্যাহত হতে পারে।

5. **বৃক্কের উপর প্রভাব** (Effect on Kidney)—অ্যালকোহলের সঙ্গে পান করা অতিরিক্ত জল নির্গত করার জন্য বৃক্ককে মাত্রাতিরিক্ত কাজ করতে হয় এর ফলে বৃক্কের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়।

6. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর প্রভাব**—অ্যালকোহলপায়ীরা সাধারণত তাদের স্বাস্থ্যবিধি পালন করে না। তারা অপুষ্টিতে ভোগেন এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

7. **অন্যান্য প্রভাব**—পরিবার, সমাজ ও শিশুদের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। তা ছাড়া অ্যালকোহল-আসক্তা মায়েদের শিশুরা স্বাস্থ্যহীন ও কম ওজনের হয়ে থাকে; এমনকি তারা দেহে ও মনে অস্বাভাবিকও হতে পারে।

12.2.D. মাদকাসক্তি বা ড্রাগের প্রতি আসক্তি (Drug Addiction)

❖ (a) **মাদকদ্রব্য এবং মাদকাশক্তির সংজ্ঞা (Definition of drug and Drug addiction) :**

1. **মাদকদ্রব্যের সংজ্ঞা :** যেসব রাসায়নিক বস্তুগুলি জীবদেহে প্রবেশ করার পর জীবের দেহে নানারকমের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন ঘটায় তাদের মাদকদ্রব্য (Drug) বলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা World Health Organisation—WHO-র মতবাদ অনুযায়ী—**যেসব ভেষজ রাসায়নিক পদার্থ** দেহে প্রবেশ করলে শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিকে পরিবর্তিত করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে।

2. **মাদকাসক্তির সংজ্ঞা**—যখন কোনো মানুষ কোনো উদ্দীপক কিংবা নিস্তেজক পদার্থ যা গ্রহণ করতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে বা গ্রহণ করতে বাধ্য করে তখন সেই অভ্যাসকে মাদকাসক্তি (Drug Addiction) বলে।

■ (b) **কয়েকটি প্রধান মাদক দ্রব্য (Some main Drugs) :**

1. **নারকোটিক ড্রাগ**— চিকিৎসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নারকোটিক ড্রাগস্-এর অর্থ হল সেইসব ওষুধ যা শরীরকে অবশ

করে আর নিদ্রার উদ্রেক ঘটায়। ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয় না এমন পদার্থগুলিকে চিকিৎসা বহির্ভূত বা স্বাস্থ্য বহির্ভূত কাজে লাগালে তাদের প্রচলিত শব্দে ড্রাগ বলা হবে, যেমন—মদ, গাঁজা, তামাক ও কোকেন। ওষুধ নয় এমন অধিকাংশ ড্রাগগুলি নিলে মানসিক পরিবর্তন আসে। মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম ড্রাগগুলি মস্তিষ্ককে প্রধানত তিনভাবে প্রভাবিত করে—(i) **উত্তেজক বা উত্তোলোক ড্রাগ** যা দেহের কার্যক্ষমতাকে বাড়ায়। (ii) **উপশম কারক বা দমনকারী ড্রাগ** যা দেহের কার্যক্ষমতাকে কমায়। এই রকম ড্রাগ মতিভ্রম ঘটায় বলে এদের **হ্যালুসিনোজেন** বলে। (iii) **নেশা উৎপন্নকারী ড্রাগ** যা মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে কারণ এদের গ্রহণ করলে সহজেই নেশা হয়। এরা দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলিকে এমনভাবে পাল্টে দেয় যে দেহ আকুল হয়ে এদের 'আশায় বসে থাকে'। অতএব যেসব লোক নেশাগ্রস্ত বা ড্রাগের প্রতি আসক্ত এর দৈনিক ড্রাগের চাহিদা থাকে তাদের **মাদকাসক্তি** লোক বলে। একজন ড্রাগ-আসক্ত ব্যক্তিকে তার চাহিদার মাদক-দ্রব্যটি না দিলে, সে তৎক্ষণাৎ মরে না কিন্তু তার অবস্থা মৃত্যুর চেয়ে খুব একটা উন্নততর হয় না।

2. **সিডেটিভ এবং ট্রান্‌কুইলাইজার (Sedatives and Tranquilisers)** ঃ এই প্রকার মাদক দ্রব্য (ড্রাগ) গ্রহণ করলে মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের প্রধানত মস্তিষ্কের কার্যাবলিকে অবদমিত করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন উত্তেজনাকে শান্ত করে ফলে দেহ শান্ত ও শ্লথ অবস্থায় পরিণত হয়ে ঘুমঘুম ভাব (Drowsiness) ঘটায়। **উদাহরণ**— ক্যাম্পোজ, ভ্যালিয়াম (ডায়াজাপ্যাম), ইকুয়ানিল লিব্রিয়াম (ক্লোরো-ডায়াজাপোক্সাইড), লুমিনিল এবং বারবিটুয়েট। এই সব মাদক দ্রব্য যদি নিয়মিত বেশ কিছুদিন খাওয়া যায় তাহলে ড্রাগের প্রতি আসক্তি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

3. **অপিয়েট নারকোটিক (Opiate Narcotics)** ঃ এই প্রকার মাদক দ্রব্য দেহের প্রবেশের পর মস্তিষ্কের সক্রিয়তাকে অবদমিত করে ফলে শরীর অবশ হয়ে নিদ্রা অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়, ফলে হতচেতন অবস্থা (Narcosis) ঘটে। উদাহরণ— আফিম এবং তার থেকে উপজাত গৌণ কয়েকটি উপাদান।

চিত্র 12.6. A. আফিম গাছ, B. কুঁড়ি এবং C. ফল।

○ **আফিম** (Opium) ঃ পেপাভার সোম্‌নিফেরাম (*Papaver somniferum*) ও পেপাভার এলবাম (*P. album*) দুটি গুল্ম জাতীয় প্রজাতি থেকে আফিম পাওয়া যায়। এর মধ্যে পেপাভার সোম্‌নিফেরাম হল প্রধান। এদের কাঁচা বীজ বা ফলের উপর চিরে দিলে যে দুধের মতো সাদা তরুক্ষীর পাওয়া যায়— তাকে বাতাসে শুকিয়ে নিলে আফিম পাওয়া যায়। আফিম সরাসরি খাওয়া যায় বা আগুনে জ্বালিয়ে এর ধোঁয়া মুখ দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। আফিমে নেশাগ্রস্ত লোকের দেহে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, যেমন— দেহের ওজন কমে যায়, প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়, কাজে মনঃসংযোগের অভাব অবসাদ ইত্যাদি লক্ষণাবলি দেখা যায়।

(i) **মরফিন** (Morphin)— এটি আফিমের প্রধান উপক্ষার। এটি ব্যথা-বেদনার উপশম করে, দ্রুত ঘুম এনে দেয়। মরফিন নিলে এক অদ্ভুত আনন্দ ও তৃপ্তির অনুভূতি আসে, একে 'ইউফোরিয়া' বলে। প্রথমাবস্থায় বেশি মাত্রায় (200 mg) এই মাদক দ্রব্যের গ্রহণে মৃত্যুও হতে পারে। দীর্ঘদিন মরফিন গ্রহণে রোগী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। (ii) **নারকোটিন** (Narcotine)— এটি আফিম থেকে প্রাপ্ত অন্য একটি উপক্ষার। কাঁচা আফিমে 2-8% থাকে। নারকোটিন গ্রহণে অবসাদ আসে। (iii) **কোডিন** (Codein)— এটিও আফিমের অন্য একপ্রকার (প্রায় 0·3%) উপক্ষার। সর্দিকাশির উপশম করতে পারে বলে অধিকাংশ কাশির ওষুধে কোডিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে সাহায্য করে।

○ **হেরোইন** (Heroin) ঃ হেরোইন সাদা রঙের স্ফটিকের মতো দেখাত যা আফিম থেকে তৈরি করা হয়। এটি প্রচণ্ডভাবে আসক্তির উদ্রেক করে। একমাত্র গবেষণার কাজ ছাড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজেও এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। হেরোইন অবৈধভাবে তৈরি ও বিক্রি হয়। হেরোইনের অবৈধ ব্যাবসা বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। হেরোইন মুখে খাওয়া চলে অথবা তামাকের মতো ব্যবহার করা হয় অথবা ইঞ্জেকশন হিসাবেও নেওয়া যায়। হেরোইন একটি অত্যন্ত বিপদজনক উচ্চমানের নেশার মাদক দ্রব্য।

4. **উত্তেজক মাদক দ্রব্য (Stimulant drugs)** ঃ এইপ্রকার মাদক দ্রব্য গ্রহণে সাময়িক মানসিক সতর্ক, আত্মবিশ্বাস এবং উত্তেজনা ঘটায়। এই কারণে এই রকম মাদক দ্রব্যকে **মনন উন্নত মাদক** (Mood elevators drug) বলে।

(i) **কোকেন** (Cocaine)—কোকেন একপ্রকার 'নারকোটিক ড্রাগ'। কোকেন নাকের মাধ্যমে বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করলে শরীরে উত্তেজনা ও নেশা ঘটে। এই মাদকদ্রব্যের নেশার ফলে অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য অলীক কিছু অস্তিত্বে বিশ্বাস অর্জন (Hallucination), এমনকি মানসিক বিকার ঘটতে দেখা যায়। কোকেন বেশি মাত্রায় নিলে তীব্র মাথাধরা, কাঁপুনি, হৃৎশ্বাস প্রক্রিয়ার বিরতি (Cardio-respiratory failure), ফলে মৃত্যু ঘটে।

(ii) **ক্যাফিন** (Caffeine)—ক্যাফিন একপ্রকার মৃদু প্রকৃতির উদ্দীপক মাদক দ্রব্য। রাসায়নিকভাবে এটি এক রকমের উপক্ষার যা চায়ের পাতায় অথবা শুষ্ক কফি বীজে থাকে। চা, কফি বা কোলা জাতীয় পানীয় (Cola drink)-এর মাধ্যমে আমরা ক্যাফিন গ্রহণ করি। ক্যাফিন স্নায়ুকোশে বিপাক ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দেহে সতেজতা, মৃদু উত্তেজনা ইত্যাদি ঘটায়। অধিক ক্যাফিন গ্রহণে নেশা হয় না, কারণ এর অভাবে দেহে প্রত্যাহরণের লক্ষণগুলি দেখা যায় না তবে শারীরবৃত্তীয় নির্ভরশীলতা দেখা যায়।

(iii) **অ্যাম্ফিটামাইন্‌স** (Amphetamines)— অ্যাম্ফিটামাইনের রাসায়নিক নাম α-মিথাইল ফেনিথাইলামিন। এটি অনেকগুলো যৌগ নিয়ে গঠিত মাদক উদ্দীপক। কারণ এই মাদকদ্রব্য দেহে উত্তেজনা, আত্মবিশ্বাস, জাগরণ, কল্পনা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এই মাদকদ্রব্য হৃদ্‌স্পন্দনের হারকে এবং রক্তের চাপকে অত্যধিক বাড়ায় ফলে অন্তঃরক্তক্ষরণ বা হেমারেজের মাধ্যমে মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণ—বেঞ্জিড্রিন, ডেক্সিড্রিন এবং মেথিড্রিন। অ্যাম্ফিটামাইনস হাঁপানি, ঠান্ডা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।

চিত্র 12.7. গাঁজা গাছ (*Cannabis sativa*)।

5. **বিভ্রম উৎপাদক মাদক দ্রব্য বা হ্যালুসিনোজেন** (Hallucinogens) ঃ এই প্রকার মাদক দ্রব্য বা ড্রাগ গ্রহণ করলে চিন্তা, ভাবনা, উপলব্ধি ইত্যাদি পরিবর্তন ঘটে এবং **অলীক কিছু অস্তিত্বে বিশ্বাস** (Hallucination) ঘটায়। এই প্রকার মাদক দ্রব্য মস্তিষ্কে বিভিন্ন অংশকে প্রায় বিকল করে দেয় ফলে মতিভ্রম ঘটায়, অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শের অনুভূতি অলীক বস্তুর উপস্থিতিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকে। **উদাহরণ**— LSD, মেসক্যালাইন, ভাং, চরস, গাঁজা ইত্যাদি।

(i) **LSD** (Lysergic acid diethylamide) —একপ্রকার অত্যন্ত শক্তিশালী বিভ্রম উদ্রেককারী মাদক দ্রব্য গোষ্ঠীভুক্ত যা মানুষকে অলীক জগতে পাড়ি দিতে সাহায্য করে। LSD মানুষের অনুভূতি আর পরিবেশকে বোঝার স্বাভাবিক ক্ষমতাকে পরিবর্তন করে। এটি সেবন করার পর অন্তত আট থেকে দশ ঘণ্টা ঘুম আসে না। অনেকের মনে একটা আতঙ্কের অনুভূতি চলে আসে। হঠাৎ করে মুখ লাল হয় আর উত্তেজনার চোটে শরীর কাঁপতে থাকে। অনেক সময় এই প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে সম্পূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্ত (বিকৃত মস্তিষ্ক) ঘটে এবং আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

(ii) **মেসক্যালাইন** (Mescaline)— এটি একপ্রকার সাদা রঙের চূর্ণ (Powder) প্রকৃতির উপক্ষার যা একপ্রকার কাঁটাবিহীন ক্যাকটাস (লোফোফেরা ইউলিয়ামসি) থেকে উৎপন্ন হয়। এই মাদক দ্রব্যটি বিভ্রম উৎপাদক মাদক দ্রব্য গোষ্ঠীভুক্ত যা অলীক কিছু অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে।

(iii).**ভাং (হ্যাসিশ), চরস, গাঁজা**— ক্যানাবিস ইন্ডিকা (*Cannabis indica*) নামে গুল্ম থেকে হ্যাসিশ, চরস ও গাঁজা পাওয়া যায়। **ম্যারিজুয়ানা** নামে অন্য একপ্রকার নেশার বস্তু ক্যানাবিস স্যাটিভা (*Cannabis sativa*) থেকে পাওয়া যায়। এই রকম মাদক দ্রব্য সাধারণত তামাক কিংবা ধোঁয়ার মাধ্যমে নেওয়া হয়। এরা সবগুলিই হেরোইনের মতো আসক্তি ঘটাতে পারে। এদের গ্রহণে তার চেখের রন্ধ্রের প্রসারণ, রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি, বারে বারে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ইত্যাদি ঘটে।

◘ (c) **নেশার কারণ (Causes of Drug Addiction)** ঃ বহু কারণ আছে যা মানুষকে মাদকাসক্তির পথে নিয়ে যায়।

(i) **বন্ধু-বান্ধবের কুসংসর্গ**— বন্ধু-বান্ধবের কাছে সবসময় মাদক সেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা শুনতে শুনতে অনেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাদক গ্রহণ শুরু করে। এই কুসংসর্গ থেকে আর ফিরে আসার কোনো পথ থাকে না।

(ii) **পরাজয় বা নৈরাশ্য এবং অবসাদ**— পরাজয় ও নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পেতে অনেকে মাদক দ্রব্যের গ্রহণ শুরু করে।

(iii) **অন্য জগতের সন্ধানে**— মাদক সেবনে অন্য এক নতুন জগতে প্রবেশ করা যায়, এমন এক ভ্রান্ত ধারণায় অনভিজ্ঞ স্বপ্নদর্শী অনেক তরুণ এই নেশা আরম্ভ করে।

(iv) পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মাদক সেবন করতে দেখে ও অল্প বয়স্কেরা অনেক সময় এই বদ অভ্যাসটি শুরু করে।

(v) **উত্তেজনা ও দুঃসাহসিকতা**— উত্তেজনা ও দুঃসাহসিকতার সহজাত আকর্ষণ মেটাতে তরুণেরা মাদক সেবন শুরু করে।

(vi) **কৌতূহল**—সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যম ঘন ঘন ড্রাগ সম্পর্কে সোচ্চার থাকে বলে ড্রাগ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের একটা কৌতুক অনেক সময় জাগ্রত হয়।

■ (d) **ড্রাগ নেশার প্রতিকারের উপায় :** ড্রাগের নেশা থেকেপরিত্রাণ পাওয়ার বিভিন্ন উপায়গুলি হল—(i) জীবনধারার পরিবর্তন আনা ও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার করা। (ii) ড্রাগথেরাপি প্রবর্তন করা। (iii) ড্রাগসেবীদের সাইকোথেরাপি বা মানসিক চিকিৎসা করা। (iv) ড্রাগের বিরুদ্ধে নিয়মিত ও ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থা করা। (v) ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা। (vi) চিকিৎসা অন্তে ড্রাগমুক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

✪ 12.3. বিশ্ব অনাক্রমীকরণ (Global Immunization) ✪

❖ (a) **বিশ্ব অনাক্রমীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Global Immunization) : যে সব প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষ সব সংক্রামক রোগ থেকে মুক্তি পায় তাকে বিশ্ব অনাক্রমীকরণ বলে।**

■ (b) **বিশ্ব অনাক্রমীকরণ কর্মসূচি (Global Immunization programme) :** বিশেষ কতকগুলি সংক্রামক রোগ সারা বিশ্বের মানুষের একটা বিরাট সমস্যা বলা যায়। কয়েকটি প্রধান রোগগুলি হল **পোলিও, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত** প্রভৃতি। এই রোগগুলি প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য বিশ্ব অনাক্রমীকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হলে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতে এসব সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করা যায়। আবার অনেকগুলি সংক্রামক রোগ, যেমন—**কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পীতজ্বর** প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে মহামারির মতো হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগগুলি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সব সমস্যা দূর করার জন্য স্থান ও সমস্যা অনুযায়ী প্রথম থেকে অনাক্রমীকরণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয়। **বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation = WHO)** পরামর্শ অনুযায়ী পৃথিবীর সব দেশ তাদের নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি পালন করে 1977 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বসন্ত ও অন্যান্য কয়েকটি রোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়েছে।

1974 খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সব শিশুদের বিশেষ কতকগুলি রোগ মুক্ত করার একটি অনাক্রমীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিকে **এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাজেশন** (Expanded Programme on Immunization) বলে। এই কর্মসূচিতে **পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাফ, টিটেনাস, হাম ও যক্ষ্মা** রোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছিল 2000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা পৃথিবীর সব শিশুদের এই রোগগুলি নির্মূল করা যাবে। এখন এই কর্মসূচির সময় সীমা 2005 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে এই কর্মসূচি **ইউনিভার্সাল চাইল্ড ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম** (Universal Child Immunization Programme) নামে পরিচিত। ভারতে এই কর্মসূচি 1985 খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করা হয়েছে।

কিছু দিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে শিশু ছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও যুবক-যুবতীদের কতকগুলি বিশেষ রোগ নির্মূল করার জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচিতে **হেপাটাইটিস-বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জাপানি এনকেফেলাইটিস, রুবেলা** (জার্মান হাম) ইত্যাদি রোগ মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে এসব রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগগুলি নির্মূল হবে। শিশু ও মহিলাদের রোগ প্রতিষেধক টিকা সম্বন্ধে একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

✪ জাতীয়-প্রতিষেধক টিকাদান কর্মসূচি ✪

প্রাপক ও বয়স	টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	প্রয়োগ পদ্ধতি
1. নবজাত শিশু			
(i) জন্ম থেকে $1\frac{1}{2}$ মাসে	বি. সি. জি. (ব্যাসিলাস ক্যালমেট গুরিন ভ্যাকসিন) (যক্ষ্মা)	1	সাবকিউটেনিয়াস

প্রাপক ও বয়স	টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	প্রয়োগ পদ্ধতি
(ii) একই সময়ে ($1\frac{1}{2}$ মাসে)	ডি. পি. টি (ডিপথেরিয়া পারটুসিস ও টিটেনাস)	1	ইনট্রামাসকুলার
(iii) একই সময়ে ($1\frac{1}{2}$ মাসে)	ডিপথেরিয়া, হুপিং কাফ,	1	"
(iv) "	টিটেনাস		"
(v) "	পোলিও	1	ওরাল
(vi) $1\frac{1}{2}$ মাসে	ডি. পি. টি.	1	ইনট্রামাসকুলার,
(vii) $3\frac{1}{2}$ মাসে	ডি. পি. টি	1	ইনট্রামাসকুলার
(viii) "	পোলিও	1	ওরাল
(ix) 9.মাসে	হাম	1	সাবকিউটেনিয়াস
(x) 16-24 মাসে	ডি. পি. টি.	1	ইনট্রামাসকুলার
(xi) "	পোলিও (বুস্টার ডোজ)	1	ওরাল
2. বাড়ন্ত শিশু (5 থেকে 6 বছর)			
5 থেকে 6 বছর	ডি. টি. (ডিপথেরিয়া ও টিটেনাস)	1	ইনট্রামাসকুলার
"	টাইফয়েড	1	সাবকিউটেনিয়াস
10 বছর	টি. টি (টিটেনাস) বা ধনুষ্টঙ্কার	1	ইনট্রামাসকুলার
"	টাইফয়েড	1	সাবকিউটেনিয়াস
16 বছর	টি. টি. (টিটেনাস টক্সয়েড)	1	ইনট্রামাসকুলার
"	টাইফয়েড	1	সাবকিউটেনিয়াস
3. গর্ভবতী মহিলা			
16 থেকে 36 সপ্তাহ	টি. টি. (টিটেনাস টক্সয়েড) (ধনুষ্টঙ্কার বা (টিটেনাস)	2	ইনট্রামাসকুলার

(উৎস মূল ঃ জার্নাল অব ইন্ডিয়ান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স, ভলিয়্যুম 25)

(c) আমাদের দেশে কোথায় অনাক্রমীকরণ বা ইমিউনাইজেশান করার সুবিধা পাওয়া যায় ?

ভারত সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের রোগ প্রতিষেধক টিকা দান কর্মসূচি রূপায়িত করবার জন্য বর্তমানে দেশের বহু জায়গায় সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। শহর অঞ্চলে এ সব সুযোগ পাওয়া যায় সরকারি ও বে-সরকারি হাসপাতাল, ডিস্‌পেনসারি, নার্সিং হোম ও বিভিন্ন প্রকার আরোগ্যশালায়। কোনো কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে তাদের ডাক্তারখানায় ও টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আছে শিল্প ও কারখানা কর্মীদের জন্য কর্মচারী-বিমা হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারি, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম ইত্যাদি। মফস্‌সলে ও গ্রামীণ এলাকায় এই সুযোগ পাওয়া যায় সাবসেন্টার, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার প্রভৃতি সরকারি সংস্থায়। আজকাল অনেক জায়গায় কয়েকটি বেসরকারি ডিস্‌পেনসারি ও হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।

০ অ নু শী ল নী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) :

1. জনসংখ্যা কাকে বলে? জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি সংক্ষেপে লেখো।
2. ধারণ ক্ষমতা কী? ধারণ ক্ষমতা ব্যাখ্যা করো।
3. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ সংক্ষেপে আলোচনা করো।
4. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাগুলি উল্লেখ করো।
5. মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে? একজন মানসিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
6. মানসিক রোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। মানসিক রোগের প্রকারভেদগুলি উল্লেখ করো।
7. মানুষের দেহে নিকোটিনের প্রভাবগুলি উল্লেখ করো।
8. তামাকের ধোঁয়া ও তামাক চিবানোর জন্য বিভিন্ন ব্যাধি উপসর্গের বিবরণ দাও।
9. কেন মানুষ মদ্যপানে আসক্ত হয়?
10. মাদকাসক্তি কাকে বলে? কয়েকটি মাদক দ্রব্যের নাম লেখো।
11. পোলিও কী? ওই জাতীয় অনাক্রমীকরণ কর্মসূচি উল্লেখ করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions) :

1. জনসংখ্যার সংজ্ঞা লেখো। 2. প্রচরণশীল কার্যকলাপ কাকে বলে? 3. ধারণক্ষমতা কী? 4. সিগময়েড গ্রাফ কাকে বলে? 5. 'J' আকারের গ্রাফ কখন হয়? 6. জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করো। 7. মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে? 8. মানসিক রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 9. সাইকোসিস কী? 10. সাইকোথেরাপি কাকে বলা হয়? 11. তামাকের ধোঁয়ার উপাদানগুলি কী কী? 12. এম্ফিসেমা কাকে বলে? 13. অ্যালকোহল পান করলে তাৎক্ষণিক কী ঘটে? 14. মাদকাসক্তি কী? 15. নারকোটিক ড্রাগ কাকে বলে? 16. হেরোইন কী? 17. কোকেন কাকে বলা হয়? 18. বিশ্ব অনাক্রমীকরণ কর্মসূচি কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা কত? 2. ভারতে এখন জনসংখ্যা কত? 3. 1970 সালের পর থেকে প্রতি বছর মানুষের গড় আয়ু কত বেড়েছে? 4. দেশ ত্যাগ কী? 5. বহন ক্ষমতা কী কী শর্তের উপর নির্ভর করে? 5. জনসংখ্যা বৃদ্ধির গ্রাফ কী কী প্রকারের হয়? 6. একটি মানসিক রোগের নাম করো। 7. তামাক গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো। 8. তামাক পাতায় নিকোটিনের পরিমাণ কত? 9. হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নানা প্রকার সংবহন সংক্রান্ত রোগ কেন হয়? 10. তামাকের ধোঁয়া ও তামাক চিবানোতে কোন্ রোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে? 11. ধূমপানের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিবছর কত জনের মৃত্যু ঘটে? 12. ফ্যাটি লিভার সিনড্রোম কেন হয়? 13. কোন্ ড্রাগ শরীরকে অবশ করে? 14. আফিম গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম কী? 15. আফিম কোথা থেকে পাওয়া যায়? 16. কোকেন কী ধরনের ড্রাগ? 17. একটি মৃদু প্রকৃতির মাদকদ্রব্যের নাম লেখো। 18. মানুষের দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে কী বলে? 19. ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্যে প্রথম পোলিও ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. পপুলেশন বা জনসংখ্যা; 2. মরণশীলতা; 3. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা; 4. মানসিক রোগের বৈশিষ্ট্য; 5. সাইকোসিস; 6. এপিলেপসি; 7. ড্রাগথেরাপি; 8. নিকোটিন; 9. নারকোটিক ড্রাগ; 10. হিরোইন; 11. হ্যাসিশ; 12. পালস্ পোলিও।

পরিবেশ সংক্রান্ত জীববিজ্ঞান
[ENVIRONMENTAL BIOLOGY]

সূচনা (Introduction) ঃ জীব যেখানে বসবাস করে তার চারপাশের সব কিছু নিয়ে গঠিত হয় তার পরিবেশ। পরিবেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**ভৌত পরিবেশ** (Physical Environment) এবং **জৈব পরিবেশ** (Biotic Environment)। জল, বাতাস, মাটি প্রভৃতি নিয়ে জীবের চারপাশে ভৌত পরিবেশ গঠিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় জৈব পরিবেশ। উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভর করে পরিবেশে বেঁচে থাকে। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের ভৌত পরিবেশের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব এবং তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে **বাস্তুসংস্থান** বা **ইকোলজি** বলে। ইকোলজি (Ecology) কথাটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। (*'Oikos'* হল বাসস্থান (House) এবং *'logos'* হল জ্ঞান)। **সুতরাং ইকোলজি কথার অর্থ হল বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান।** 1869 খ্রিস্টাব্দে হেকেল (Haeckel) প্রথম ইকোলজি কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। তার মতে জড় ও জীবজগৎ নিয়ে বাস্তুসংস্থান গঠিত হয়।

তাই একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে জড় বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে একটি বসতিস্থান গড়ে ওঠে। এর কোনো একটি উপাদানের অভাব হলে ওই নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এর ফল হয় মারাত্মক। এর ফলে জীবের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

13.1.A বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং এর গতিশীলতা (Definition of Ecosystem and its Dynamics)

(a) **বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ecosystem)** ঃ **কোনো স্থানের জীব উপাদানগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের জড় উপাদানগুলির সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া করে, যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তি প্রবাহিত হয় এবং পদার্থের চক্রাকার আবর্তন ঘটে তখন জীব ও জড় উপাদানগুলি একত্রে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।**

(b) **বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের উপাদান** ঃ বাস্তুতন্ত্রের মূল উপাদানগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—**অজীব উপাদান বা জড় উপাদান ও সজীব উপাদান।**

A. অজীব উপাদান (Abiotic components) ঃ অজীব উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—

1. **অজৈব পদার্থ** (Inorganic compound)—নানাপ্রকার খনিজ লবণ, (যেমন— ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার, ফসফরাস) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি।

2. **জৈব পদার্থ** (Organic compound)—মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাংশের বিভিন্ন রকমের জৈব বস্তুর পচনের ফলে উৎপন্ন সব পদার্থ হলো পরিবেশের জৈব উপাদান।

3. **ভৌত উপাদান** (Physical component)— সূর্যালোক, উষ্ণতা, বায়ু, জল, মাটি প্রভৃতি।

B. সজীব উপাদান (Biotic components) ঃ বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জীবই সজীব উপাদানের অন্তর্গত। সাধারণভাবে সজীব উপাদানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—1. **উৎপাদক**, 2. **খাদক**, 3. **বিয়োজক**।

1. **উৎপাদক** (Producer) ঃ **যেসব ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলোক-শক্তির সাহায্যে পরিবেশ থেকে CO_2 ও মূলের সাহায্যে জল নিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে, তাদের উৎপাদক বলে।**

উৎপাদক প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আবধ্ব হয়। উৎপাদকদের **স্বভোজীও** বলা হয়। সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া, কেমোসিন্থেটিক জীবাণু ইত্যাদিও উৎপাদক।

2. **খাদক** (Consumer) ঃ **যেসব জীব পরিবেশের উপাদান কাজে লাগিয়ে খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে না, বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক যেসব খাদ্য সংশ্লেষ করে, সেই খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের খাদক বলে।**

সব প্রাণী খাদকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হয়, যেমন—

(i) **প্রাথমিক বা প্রথম সারির খাদক** (Primary consumer)— বিভিন্ন শ্রেণির তৃণভোজী এবং শাকাশী প্রাণী সরাসরি উদ্ভিদকেখাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের প্রথম **সারির খাদক** বলে। **উদাহরণ**—গোরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, ইঁদুর, পায়রা প্রভৃতি।

(ii) **গৌণ বা দ্বিতীয় সারির খাদক** (Secondary consumer)— প্রথম সারির খাদকদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে, তাদের **দ্বিতীয় সারির খাদক** বলে। **উদাহরণ**— বাঘ, সিংহ, সাপ, ব্যাং প্রভৃতি।

চিত্র 13.1 ঃ বাস্তুতন্ত্রের মূল উপাদানগুলির চিত্ররূপ।

(iii) **প্রোগৌণ বা তৃতীয় সারির খাদক** (Tertiary consumer)— দ্বিতীয় সারির খাদকদের যারা খায়, তাদের **তৃতীয় সারির খাদক** বলে। **উদাহরণ**—বাজপাখি, পেঁচা ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণির খাদক শীর্ষশ্রেণির খাদক হতে পারে। আবার কোনো কোনো সময় চতুর্থ শ্রেণির খাদককে **শীর্ষশ্রেণির খাদক** (Top consumer) বলা হয়।

প্রাণী ছাড়া বাস্তুতন্ত্রে বা ইকোসিস্টেমে **পরজীবী** ও **মৃতজীবী** জীবেরাও খাদক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার মৃতজীবীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে।

3. **বিয়োজক (Decomposer) বা অণুখাদক (Microconsumer) ঃ যেসব অণুজীব (Microorganism) মৃত জীবদেহ থেকে পুষ্টি লাভ করে, এবং মৃত জীবকোশের প্রোটোপ্লাজম ও কোশপ্রাচীরের জটিল জৈব অণু ভেঙে প্রাথমিক উৎপাদক গ্রহণযোগ্য সরল জৈব ও অজৈব অণুতে পরিণত করে এবং যার ফলে পরিপোষকের (Nutrient) চক্রাকার আবর্তন ঘটে, সেই সব অণুজীবদের বিয়োজক বলে।** **উদাহরণ**—বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া। এইসব অণুখাদক জটিল জীবকোশকে ভেঙে সরল অজৈব উপাদানে পরিবর্তিত করে বলে এদের **পরিবর্তক বা রূপান্তরক**ও বলা হয়।

□ (c) **বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব (Importance of Ecosystem) ঃ** (i) বাস্তুতন্ত্র অধ্যয়ন করলে পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশ ও তাদের জীব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। (ii) বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর O_2 ও CO_2-এর ভারসাম্য বজায় থাকে। (iii) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থানের সুরক্ষা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও ভূমি ক্ষয় রোধের জন্য বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন। (iv) আদর্শ ইকোসিস্টেম বজায় রাখতে পারলে অনেক সময় খরা ও বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (v) আদর্শ ইকোসিস্টেমে ভূ-রাসায়নিক চক্রের বিভিন্ন মৌল উপাদানগুলির আবর্তন সহজভাবে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমা করে। (vi) জল, বায়ু ও মৃত্তিকাদূষণ বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (vii) বনাঞ্চল গঠন, বনাঞ্চল রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতিও সুষ্ঠু ইকোসিস্টেমের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। (viii) পরিবেশের উপাদানগুলির ভারসাম্য বজায় থাকলে বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন প্রজাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাহায্য করে।

● **উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Producer and Consumer) ঃ**

উৎপাদক	খাদক
1. স্বভোজী।	1. পরভোজী।
2. পরিবেশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।	2. উৎপাদকের খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে।
3. সূর্যালোক থেকে শক্তি সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ করে।	3. বিভিন্ন খাদ্য থেকে শক্তি অর্জন করে।
4. উৎপাদকের দেহে ক্লোরোফিল থাকে।	4. খাদকের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না।

উৎপাদক	খাদক
5. প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল।	5. বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল।
6. অক্সিজেন উৎপাদনে সক্ষম।	6. অক্সিজেন উৎপাদনে অক্ষম।
7. উদাহরণ—সবুজ উদ্ভিদ।	7. উদাহরণ— তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণী।

● **উৎপাদক ও বিয়োজকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Producer and Decomposer) ঃ**

উৎপাদক	বিয়োজক
1. সবুজ উদ্ভিদ হল উৎপাদক। এরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে। তাই এরা স্বভোজী।	1. বিয়োজক মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পুষ্টি লাভ করে। তাই এরা পরভোজী (মৃতজীবী)।
2. দেহে ক্লোরোফিল থাকে বলে খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে।	2. দেহে ক্লোরোফিল নেই বলে খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে না।
3. এরা উৎপাদক বলে প্রথম সারির খাদকের খাদ্য।	3. এরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের জটিল জৈব যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে সরল জৈব যৌগ বা উপাদান গঠন করে।
4. উদাহরণ—সবুজ উদ্ভিদ।	4. উদাহরণ— বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক।

● **খাদক ও বিয়োজকের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Consumer and Decomposer) ঃ**

খাদক	বিয়োজক
1. উৎপাদকের তৈরি খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করে।	1. মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পুষ্টি রস গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করে।
2. শাকাশী বা মাংসাশী প্রকৃতির হয়।	2. এরা প্রধানত মৃতজীবী।
3. জটিল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।	3. জটিল খাদ্যকে সরল অজৈব উপাদানে পরিণত করে।
4. উদাহরণ—প্রাণীকুল।	4. উদাহরণ—মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক।

▲ বাস্তুতন্ত্রে গতিশীলতা (Dynamics in Ecosystem)

শক্তির বিনাশ হয় না। শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে স্থানান্তরিত হয়। প্রধানত শক্তির দুটি রূপ পাওয়া যায়, যেমন—**স্থৈতিক শক্তি** (Potential energy) এবং **গতিশক্তি** (Kinetic energy)। স্বভোজী উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় স্থৈতিকশক্তি রূপে সঞ্চয় করে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের সাহায্যে এই শক্তি বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে চলাচল করে। প্রতিটি জীবগোষ্ঠী স্থৈতিক শক্তির কিছু অংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে, যার সাহায্যে জীব তার বিভিন্ন জৈবিক কাজ সমাধা করে। **একটি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তির চলাচলকেই বাস্তুতন্ত্রের গতিশীলতা বলে।**

একটি বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ও অজৈব উপাদান নিয়ে গঠিত হয়। এই সমস্ত উপাদান একটি সুসংবদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করে। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সুস্পষ্ট খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ফলে জৈববস্তুর সঙ্গে পদার্থ ও শক্তি একগোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীতে যায়। যেমন—(1) সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেহে স্থৈতিক জৈবশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি উদ্ভিদ নিজেদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ শ্বাসকার্য, জনন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট শক্তিকে তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য রেখে দেয়। (2) তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদদেহ ভক্ষণ করে এবং উদ্ভিদদেহের শক্তিকে নিজদেহে স্থৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। তৃণভোজী প্রাণীরা এই শক্তি দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শ্বাসকার্য, জনন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট শক্তি মাংসাশী প্রাণীদের জন্য রেখে দেয়। (3) সবশেষে মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের দেহ ভক্ষণ করে তাদের দেহের স্থৈতিক শক্তিকে নিজেদের দেহে সঞ্চয় করে। এই শক্তি মাংসাশী প্রাণীরা তাদের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শ্বাসকার্য, জনন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে। (4) পরিশেষে সমস্ত স্তরের মৃত জীবদেহ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার অণুজীব, যেমন—ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যাদের বিয়োজক বলে। এইভাবে উৎপাদক থেকে তৃণভোজী, মাংসাশী হয়ে বিয়োজকে এসে শক্তির প্রবাহ শেষ হয়। বিয়োজক সমস্ত মৃত জীবদেহকে সরল অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে একটি খাদ্য ভাণ্ডার (Nutrient pool) গঠন করে। উদ্ভিদ এই খাদ্য ভাণ্ডার দেহের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে এবং নিজেদের দেহে সঞ্চয় করে। উদ্ভিদদেহ থেকে এই খাদ্য ভাণ্ডার তৃণভোজী, মাংসাশী ও বিয়োজক হয়ে পুনরায় চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এইভাবে পদার্থ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

▲ খাদ্যশৃঙ্খল (Food chain)

● **খাদ্যশৃঙ্খলের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্য (Definition, Types and Characteristics of Food chain) ঃ**

❖ (a) **খাদ্যশৃঙ্খলের সংজ্ঞা (Definition of Food chain) ঃ** একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক যখন একটি সরল শৃঙ্খলের আকার ধারণ করে, খাদ্যখাদক সম্পর্কের ক্রম অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে সাজানো বিভিন্ন জীব দিয়ে তৈরি শৃঙ্খলকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

একটি জীব যখন শুধুমাত্র অন্য একটি জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তখনই খাদ্যশৃঙ্খল গঠিত হয়।

চিত্র 13.2 ঃ একটি খাদ্যশৃঙ্খলের চিত্ররূপ।

■ (b) **খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকারভেদ (Different types of Food chain) ঃ** বাস্তুতন্ত্রে সাধারণত তিন রকমের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়, যেমন—

1. **গ্রেজিং বা শিকারিজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing or Predator Food chain)**— এই শৃঙ্খল উৎপাদক থেকে আরম্ভ হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জীবের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায়।
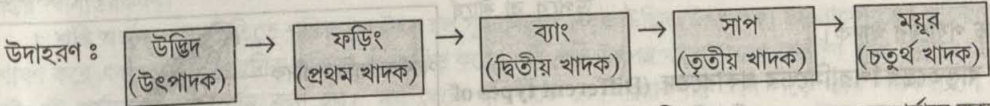
2. **পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Parasitic Food chain) ঃ** এই শৃঙ্খল বৃহৎ জীব থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমপর্যায়ে ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ হয়।

উদাহরণ ঃ উদ্ভিদ → শূকর → কৃমি
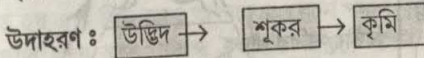
● **ডেট্রিটাল বা মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Detrital or Saprophytic Food chain) ঃ**

এই শৃঙ্খল মৃতজীবী থেকে আরম্ভ হয়ে বৃহৎ খাদকে শেষ হয়।
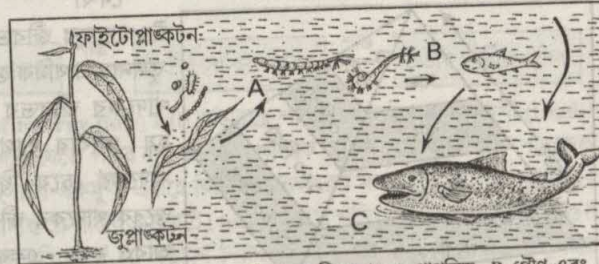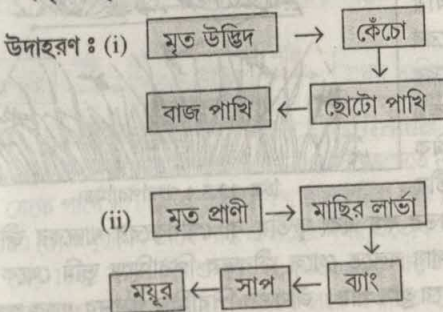
চিত্র 13.3 ঃ ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খলের চিত্ররূপ। A-প্রাথমিক, B-গৌণ এবং C-প্রগৌণ খাদক।

▲ খাদ্যজালক (Food web)

❖ **খাদ্যজালকের সংজ্ঞা (Definition of Food web) ঃ** বিভিন্ন প্রজাতির জীব নিয়ে গঠিত আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অনেকগুলি খাদ্যশৃঙ্খলকে একসঙ্গে খাদ্যজালক বলে।

একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি জীব শুধুমাত্র অপর একটি জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জীব বেঁচে থাকে না। এই অবস্থায় খাদ

খাদক সম্পর্ক সরলরেখায় না হয়ে একটি জালকের আকার ধারণ করে এবং একেই খাদ্যজাল বলে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তুতন্ত্রে আদর্শ খাদ্যশৃঙ্খলের অস্তিত্ব থাকে না। বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে খাদ্য জালক গঠন করে।

খাদ্যজালককে অনেক সময় **খাদ্যপ্রবাহ** বলে।

চিত্র **13.4** ঃ কতকগুলি খাদ্যশৃঙ্খল এবং এদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা খাদ্যজালক।

▲ খাদ্যপিরামিড (Food Pyramids)

● বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Ecological Pyramid) ঃ

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের সামগ্রিক গঠনকে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক পর্যন্ত পরপর সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বলে।**

বিজ্ঞানী এলটনের (Elton, 1927) মতানুসারে উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের **সংখ্যা, শক্তি** এবং **ওজন** ক্রমশ কমতে থাকে এবং এদের পরিমাণ যদি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করা হয় তা হলে ছকটি পিরামিডের আকার ধারণ করে। এই পিরামিডের সবচেয়ে নীচে থাকে উৎপাদক এবং সবচেয়ে উপরে বা শীর্ষে

থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক।

চিত্র **13.5** ঃ খাদ্যপিরামিড।

◻ (b) **বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডের প্রকারভেদ (Different types of Ecological Pyramid)** ঃ বাস্তুতন্ত্রের পিরামিডকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**জীবভরের পিরামিড, শক্তির পিরামিড** ও **সংখ্যার পিরামিড**।

● 1. **জীবভরের পিরামিড (Pyramid of Biomass)** — একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে **জীবভর** বলা হয়। খাদ্যশৃঙ্খলে জীবভরের পিরামিডে প্রত্যেক খাদ্যস্তরে জীবভরের পরিমাণ উপরের দিকে ক্রমশ কমতে থাকে।
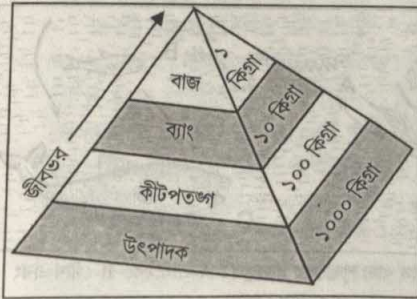
চিত্র **13.6** ঃ জীবভরের পিরামিড।

দেখা যায় উৎপাদকের জীবভরের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের খাদকের জীবভর কম হয়। আবার প্রাথমিক খাদকের চেয়ে দ্বিতীয় স্তরের খাদকের জীবভর কম এবং তৃতীয় বা গৌণস্তরের খাদকের জীবভর আরও কম। এককথায় বলতে গেলে জীবভর পিরামিডে ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত জীবভর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। জীবভর পিরামিড গঠনের একক হল — গ্রাম / বর্গমিটার / বছর।
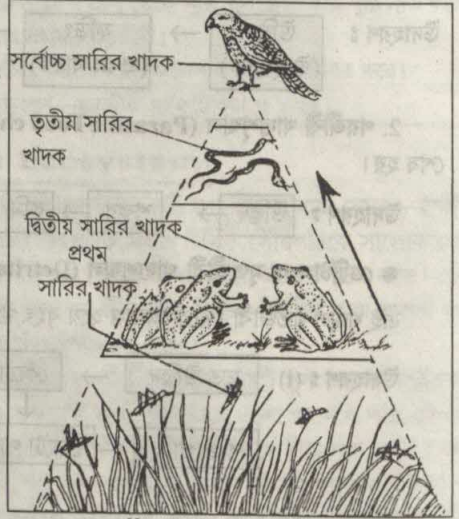
● 2. **শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)** — বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদক সবুজ উদ্ভিদ যে পরিমাণ শক্তি জৈব খাদ্যে আবদ্ধ করে তা পরবর্তী স্তরে সবটাই সঞ্চারিত করতে পারে না, কিছু পরিমাণ বিনষ্ট হয়। প্রাথমিক খাদক স্তর থেকে শক্তি যখন দ্বিতীয় স্তরের খাদকে যায় তখন নানা কারণে, যেমন— শ্বসন ও অন্যান্য কাজে কিছু পরিমাণ শক্তি বিনষ্ট হয়। দেখা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত খাদকের খাদ্যস্তরে শক্তিপ্রবাহ ক্রমশ কমতে থাকে। এইভাবে শক্তি স্থানান্তরের সময়

স্থৈতিক শক্তির প্রায় 80–90 শতাংশই তাপশক্তি হিসাবে হ্রাস পায়। শক্তির পিরামিড গঠনের একক হল — কিলোক্যালোরি / বর্গমিটার / বছর।

● 3. **সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Number)** — কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও বিভিন্ন সারির খাদ্য ও খাদক অনুক্রমিকভাবে সাজালে (ভূমি থেকে শীর্ষ) দেখা যাবে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক পর্যন্ত জীবগুলির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। নিম্নশ্রেণির খাদকের সংখ্যা উচ্চশ্রেণির খাদকের তুলনায় অনেক বেশি হয়। জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমলেও জীবের আকৃতি অনুক্রমিকভাবে বাড়ে। একটি তৃণভূমিতে তৃণপ্রজাতির উদ্ভিদের তুলনায় তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কম। আবার তৃণভোজী প্রাণীর তুলনায় পরবর্তী মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা আরও কমে যায় এবং সর্বোচ্চ মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা সব চেয়ে কম হয়। সংখ্যার পিরামিড গঠনের একক হল— সংখ্যা / বর্গমিটার / বছর।
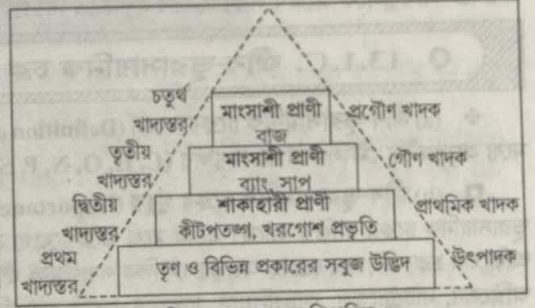
চিত্র 13.7 : সংখ্যার পিরামিড।

▲ বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ (Energy flow in Ecosystem) :

❖ (a) **বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহের সংজ্ঞা (Definition of Energy flow) :** ইকোসিস্টেমে রূপান্তরিত সৌরশক্তি উৎপাদক থেকে বিভিন্ন খাদকের দেহে স্থানান্তরকরণকে **শক্তিপ্রবাহ** বা **এনার্জি ফ্লো** (Energy flow) বলে।

◘ (b) **বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ প্রক্রিয়া :** বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ তিনটি পর্যায়ে ঘটে, যেমন—শক্তি অর্জন, শক্তির ব্যবহার এবং শক্তির স্থানান্তরকরণ।

1. **শক্তি অর্জন**—বাস্তুরীতিতে শক্তির মূল উৎস হল সূর্যালোক। সবুজ উদ্ভিদ (উৎপাদক) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি শোষণ করে এবং তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ওই শক্তি উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তি হিসাবে আবদ্ধ থাকে। তাই এই পর্যায়কে **শক্তি অর্জন** বলা হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে আলোকশক্তি এসে পড়ে তার শতকরা 0·1 অংশ মাত্র উৎপাদকেরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ করতে পারে।

2. **শক্তির ব্যবহার**—উৎপাদকের সংশ্লেষিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি আবদ্ধ হয় তার কিছু অংশ নিজের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু অংশ অপাচ্য ও রেচন পদার্থ রূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদখাদ্য গ্রহণ করে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিভিন্ন জৈবনিক কাজগুলি সমাধা করে।

3. **শক্তির স্থানান্তরকরণ**—উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথম সারির খাদকে এবং পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় সারির ও তৃতীয় সারির খাদকের দেহে প্রবাহিত বা স্থানান্তরিত হয়। শক্তির স্থানান্তরকরণ নীচে দেখানো হল —
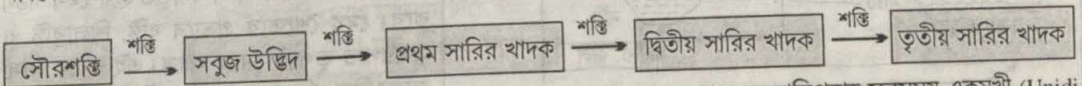
◘ (c) **শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Energy flow) :** (i) বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ সবসময় একমুখী (Unidirectional)। উৎপাদকে আবদ্ধ শক্তি কখনও সৌরজগতে ফিরে যেতে পারে না। তা ছাড়া খাদকে আবদ্ধ শক্তি আবার উৎপাদকেও ফিরে যেতে পারে না। সৌরশক্তি আবদ্ধ রাসায়নিক শক্তি হিসাবে একমুখী প্রবাহে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরে পৌঁছায়। (ii) অনুক্রমিকভাবে শক্তি প্রবাহের সময় প্রত্যেক খাদ্যস্তরে শক্তির হ্রাস ঘটে। (iii) প্রবাহিত শক্তির ধ্বংস নেই, শুধু রূপান্তর ঘটে। (iv) 1942 সালে লিন্ডেম্যান (Lindemann) বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ 10 শতাংশ নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাঁর মত অনুসারে শক্তিপ্রবাহ প্রত্যেক খাদ্যস্তরে 10 শতাংশ হারে প্রবাহিত হয়।

✪ 13.1.B. ডেট্রিটাস (Detritus) ✪

❖ **ডেট্রিটাসের সংজ্ঞা (Definition of Detritus) : জীবদেহ থেকে উৎপন্ন মৃত বস্তু বা আবর্জনাদি, যা প্রধানত পরিত্যক্ত পাতা, মল, পালক ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে ডেট্রিটাস বলে।**

যেসব জীব ডেট্রিটাস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ডেট্রিভোর বা ডেট্রিটাস-খাদক বলে। যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক

এবং অ্যাকটিনোমাইসিটিস ইত্যাদি। এইসব জীব প্রোটোপ্লাজমের জটিল জৈব বস্তুকে বিয়োজিত করে কিছু অংশ গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট পদার্থগুলিকে অজৈব লবণ হিসাবে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়, যা উৎপাদক গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে।

13.1.C. জীব-ভূরাসায়নিক চক্র (Bio-Geochemical Cycles)

❖ **(a) জীব-ভূরাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা (Definition of Bio-Geochemical cycle) ঃ জীবজগৎ ও তাদের পরিবেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলির (C, H, O, N, P, S, Ca প্রভৃতি) চক্রাকার আবর্তনকে জীব-ভূরাসায়নিক চক্র বলে।**

■ **(b) জীব-ভূরাসায়নিক চক্রের গুরুত্ব (Importance of Bio-Geochemical cycle) ঃ** পৃথিবীতে নানা প্রকার জীব-ভূরাসায়নিক চক্রের অস্তিত্ব আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—জলচক্র, হাইড্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ও অক্সিজেন চক্র। এই সব চক্রের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক পদার্থগুলি জীবের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, সালফার প্রভৃতি হল জীবকোশের অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের প্রাথমিক উপাদান। এই সব উপাদান না পেলে জীবকোশ গঠিত হয় না। তাই জীবদেহে এই মৌলিক উপাদানগুলির সবসময় প্রয়োজন। জীব পরিবেশ থেকে মৌলিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করে। জীব মৌলিক উপাদানগুলি একদিকে সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। তাই জীব-ভূরাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে মৌলিক উপাদানগুলির ভারসাম্য বজায় থাকে।

জল চক্র (Water cycle)

❖ **(a) সংজ্ঞা (Definition) ঃ বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে আবর্তিত জলের আবর্তনকে জল চক্র (Water cycle) বলে।**

■ **(b) জল চক্রের ব্যাখ্যা (Explanation of Water cycle) ঃ** জলের চক্রাবর্তন প্রধানত তিনটি প্রক্রিয়ায় ঘটে, যেমন—বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন ও অধঃক্ষেপণ। এই প্রক্রিয়াগুলির যে-কোনো একটির বিঘ্ন ঘটলে জলচক্রের ভারসাম্য ব্যাহত হয়। পুকুর, হ্রদ, নদী, সমুদ্র থেকে জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যায়। উদ্ভিদের শোষিত জলের বেশির ভাগ অংশ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রাণীদের গৃহীত জলের বেশির ভাগ ঘাম বা মূত্রত্যাগের ফলে প্রকৃতিতে ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ গঠন করে। মেঘ শৈত্যের প্রভাবে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এই নেমে আসা জলের কিছু পরিমাণ জলাধারে সঞ্চিত হয় এবং কিছু অংশ নীচে স্থায়ীভাবে জলভাণ্ডার গড়ে তোলে। উদ্ভিদ মাটি থেকে জল শোষণ করে। অতিরিক্ত জল নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে সঞ্চিত হয়। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ জল ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে যায় তা অধঃক্ষেপণের ফলে আবার পুরণ হয়ে যায়। এইভাবে জলচক্র প্রকৃতিতে চলতে থাকে।
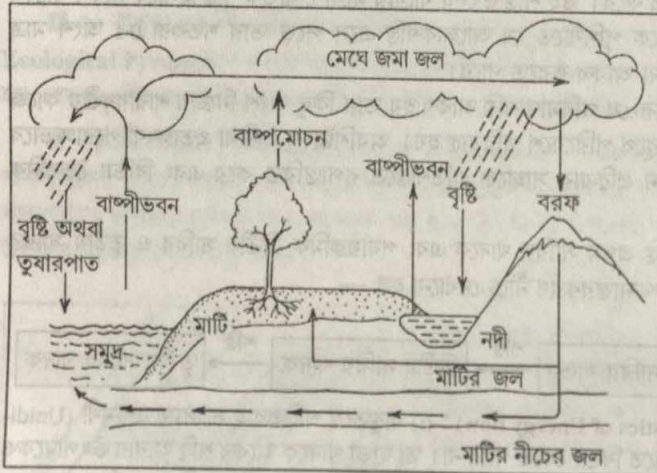
চিত্র 13.8 ঃ জল চক্র।

■ **(c) জলচক্রের গুরুত্ব (Importance of Water Cycle) ঃ** জলচক্রের গুরুত্বগুলি হল— (i) জলচক্র না থাকলে জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জলই হল জীবের জীবন। (ii) মৃত্তিকা গঠন ও উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করার জন্যও জল একান্তভাবে প্রয়োজন। (iii) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মূল দিয়ে জল শোষণ করে জলের হাইড্রোজেন (H) খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করে এবং অক্সিজেন পরিবেশে নির্গত করে। (iv) মানুষ খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ, সুলভ পরিবহন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিভিন্ন সাংসারিক কাজে জল ব্যবহার করে। (v) তা ছাড়া বাস্তুতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

❁ অক্সিজেন চক্র (Oxygen cycle) ❁

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে চক্রাকার প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক অক্সিজেন পরিবেশ ও জীবের মধ্যে আবর্তিত হয় এবং পরিবেশে অক্সিজেনের সমতা বজায় রাখে, তাকে অক্সিজেন চক্র (Oxygen cycle) বলে।**

চিত্র 13.9 ঃ অক্সিজেন চক্র।

■ (b) **অক্সিজেন চক্রের ব্যাখ্যা (Explanation of Oxygen Cycle) ঃ** অক্সিজেন চক্রকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, যেমন— পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারণ এবং পরিবেশে অক্সিজেনের অভাব পূরণ।

1. **পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারণ**—পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন শোষিত হয়, যেমন—(i) সবাত শ্বসনকারী জীব শ্বসনের সময় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাই পরিবেশের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। (ii) কয়লা, কাঠ, পেট্রোল প্রভৃতি দহনের সময় অক্সিজেন শোষিত হয় এবং পরিবেশের অক্সিজেন হ্রাস পায়। (iii) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় পরিবেশের অক্সিজেন শোষিত হয় বলে পরিবেশে অক্সিজেন কমে যায়। (iv) বিভিন্ন প্রকার খনিজ বস্তুর (লোহা, সিসা প্রভৃতি) অক্সাইড গঠনের সময় পরিবেশের অক্সিজেন শোষিত হয়।

2. **পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ**— বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হয়, যেমন— (i) বাতাসে অক্সিজেনের প্রধান উৎস হল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন (H^-) ও হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নে পরিণত হয়। হাইড্রক্সিল আয়ন হাইড্রক্সিল মূলকে পরিণত হলে তার থেকে আবার জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

$$H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} H^+ + OH^- ; \quad 4OH \longrightarrow H_2O + O_2$$
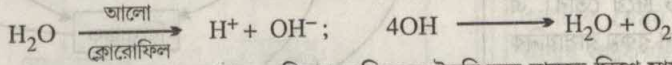
(ii) সমুদ্রোপকূলের ওজোন গ্যাস থেকে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হয়ে বায়ুতে মিশে যায়।

$$2O_3 \longrightarrow 3O_2$$
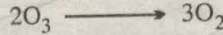
(iii) বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে জলীয় বাষ্প বিশ্লিষ্ট হয়ে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। অক্সিজেন বায়ুতে মিশে যায়।

(iv) শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় বাতাস থেকে নেওয়া অক্সিজেন প্রাণীদেহের জলের মধ্যে থাকে। এই জল রেচনের সময় প্রাণীর দেহ থেকে মাটিতে মেশে। উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোম দিয়ে জল শোষণ করে এবং সালোকসংশ্লেষের সময় এই জল বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন পরিবেশে মুক্ত হয়। সুতরাং দেখা যায়, জীবের শ্বসন এবং কাঠ ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থের দহনের ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার, জলীয় বাষ্প বিশ্লিষ্ট হয়ে এবং ওজোন গ্যাস থেকে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হয় ও অক্সিজেনের সমতা বজায় থাকে। দেখা যায়, বাতাস → প্রাণী → মাটি → উদ্ভিদ → বাতাস— এভাবে অক্সিজেন, চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

■ (c) **অক্সিজেন চক্রের গুরুত্ব (Importance of Oxygen Cycle) ঃ**

(i) অক্সিজেন চক্র প্রকৃতিতে অক্সিজেনের সমতা বজায় রাখে। (ii) অক্সিজেন জৈব বস্তুকে জারিত করে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। এর ফলে পরিবেশে CO_2-এর পরিমাণ হ্রাস পায় না। (iii) অক্সিজেনের প্রভাবে কোশের খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (iv) পরিবেশে অক্সিজেনের কিছু অংশ ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের উপরে ওজনোস্ফিয়ার নামে এক ধরনের স্তর গঠন করে। এই স্তর মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। (v) প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজন।

❁ কার্বন চক্র (Carbon cycle) ❁

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) ঃ জীবজগৎ ও পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদানের ফলে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখার আবর্তন প্রক্রিয়াকে কার্বন চক্র (Carbon cycle) বলে।**

(b) কার্বন চক্রের ব্যাখ্যা (Explanation of Carbon cycle) ঃ জীবজগৎ ও পরিবেশের মধ্যে সবসময় CO_2-এর আদান-প্রদানের মাধ্যমে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখার চক্রাকার আবর্তন প্রক্রিয়া চলছে। কার্বন চক্রটি প্রকৃতিতে দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যেমন— (1) ভৌত এবং জৈব প্রক্রিয়ায় জীবদেহ এবং অন্যান্য স্থান থেকে কার্বনের পরিবেশে ফিরে আসার পদ্ধতি। (2) ভৌত এবং জৈব প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং অন্যান্য স্থানে কার্বনের প্রবেশ।

চিত্র 13.10 ঃ কার্বন চক্র।

1. বিভিন্ন স্থান থেকে CO_2-এর পরিবেশে প্রবেশ — ভৌত এবং জৈব প্রক্রিয়ায় জীবদেহ এবং অন্যান্য স্থান থেকে কার্বনের পরিবেশে ফিরে আসার (অপসারণ) পদ্ধতিগুলি হল ঃ

(a) **ভৌত প্রক্রিয়া** — (i) কল-কারখানায় কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালানির দহনে CO_2 গ্যাস পরিবেশে মুক্ত হয়। (ii) উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। (iii) চুনাপাথর অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে ও বায়ুতে সরবরাহ করে। (iv) জলজ প্রাণীদের মধ্যে শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির খোলক কার্বনেট দিয়ে তৈরি। এ সব প্রাণীর মৃত্যুর পর নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় তা বাতাসে মিশে যায়।

(b) **জৈব প্রক্রিয়া** — (i) উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। এই CO_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। (ii) মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের উপর মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন রকম ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়ার ফলে দেহগুলির পচন ঘটে। এর ফলে, জৈব পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে বেশির ভাগ 'কার্বন', CO_2 হিসাবে পরিবেশে মিশে যায়।

2. পরিবেশ থেকে CO_2-এর জীবদেহে প্রবেশ — ভৌত এবং জৈব প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং অন্যান্য স্থানে কার্বনের প্রবেশ (সংযোজন) পদ্ধতিগুলি হল ঃ

(a) **ভৌত প্রক্রিয়া** — ফেলস্পার (Felspar) পাথর বায়ুমণ্ডলের CO_2 শোষণ করে ধাতব কার্বনেট তৈরি করে।

(b) **জৈব প্রক্রিয়া** — (i) স্থলজ উদ্ভিদ বায়ু থেকে এবং জলজ উদ্ভিদ জল থেকে CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে সূর্যালোকের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের CO_2-এর পরিমাণ হ্রাস পায়। (ii) শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি কম্বোজ প্রাণী CO_2 শোষণ করে কার্বনেটে রূপান্তরিত করে দেহ খোলক গঠনে ব্যবহার করে। (iii) অনেকগুলি সালোকসংশ্লেষকারী ও রসায়নসংশ্লেষকারী জীবাণু মাটিতে থাকে এবং মাটির CO_2-এর পরিমাণ কমায়। (iv) কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন চক্রাকারে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে যাতায়াত করে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসন, কাঠ ও খনিজ পদার্থের দহন, জীবের মৃতদেহের পচন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কম্বোজ প্রাণীর খোলকের রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভৃতি প্রকৃতিতে কার্বনের সংযোজন ঘটায়। আবার সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় CO_2 প্রকৃতি থেকে শোষণ করে। এর ফলে প্রকৃতির CO_2 গ্যাসের ভারসাম্য বজায় থাকে।
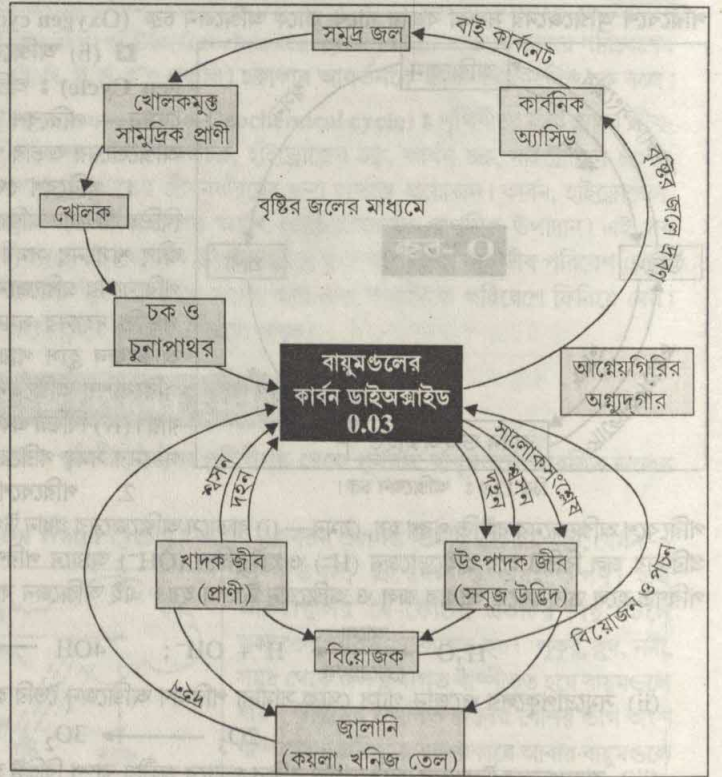
(c) কার্বন চক্রের গুরুত্ব (Importance of Carbon cycle) :

(i) কার্বন চক্র আবর্তনের ফলে প্রকৃতিতে CO_2-এর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং এর ফলে জীবকুলের অস্তিত্ব বজায় থাকে। (ii) সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশের CO_2 শোষণ করে শর্করা খাদ্য উৎপন্ন করে। প্রাণীকুল উদ্ভিদজাত খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খেয়ে বেঁচে থাকে। (iii) জীবদেহের শর্করা প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের প্রধান সংগঠক উপাদান হল কার্বন।

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে এবং মাটির নাইট্রোজেন বায়ুতে অবিরাম আবর্তিত হয়ে পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে তাকে নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle) বলে।**

চিত্র 13.11 : নাইট্রোজেন চক্র।

(b) নাইট্রোজেন চক্রের ব্যাখ্যা (Explanation of Nitrogen cycle) : প্রোটিন, প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিক অ্যাসিড, ক্লোরোফিল প্রভৃতির একটি প্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন। বায়ুতে 77·17% নাইট্রোজেন থাকলেও উদ্ভিদ বায়ু থেকে এই গ্যাস সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। বায়ুর নাইট্রোজেন বিশেষ উপায়ে মাটিতে মিশলে, তবেই তা উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। উদ্ভিদকুল মাটি থেকে ক্রমাগত নাইট্রোজেন শোষণের ফলে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ একদিকে যেমন কমতে থাকে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বিভিন্ন যৌগ হিসাবে মাটিতে জমা হতে থাকে। এর ফলে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় থাকে। দুটি উপায়ে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় থাকে, যেমন— বায়ুর নাইট্রোজেন সংবন্ধন এবং মাটির নাইট্রোজেন বায়ুতে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ নাইট্রোজেন মোচন।

1. **নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ :** বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বিভিন্ন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন যৌগ গঠন করে মাটিতে জমা হয়, এই প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বলে। নিম্নলিখিত উপায়ে নাইট্রোজেন মাটিতে জমা হয় —

(i) **বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎক্ষরণ ও বৃষ্টিপাত** — বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেন, অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে। $N_2 + O_2 = 2NO$

এই নাইট্রিক অক্সাইড আবার অক্সিজেন দিয়ে জারিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গঠন করে।

$$2NO + O_2 = 2NO_2$$
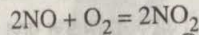
আবার নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জল অথবা জলীয় বাষ্পে দ্রবীভূত হয়ে নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। $2NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$

এই নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে পড়ে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম লবণের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওই ধাতুগুলির নাইট্রাইট ও নাইট্রেট যৌগ গঠন করে। নাইট্রেট লবণ উদ্ভিদ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নাইট্রাইট লবণ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে নাইট্রেটে পরিণত হলে তবেই উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

(ii) **নাইট্রোজেন স্থিতিকারী স্বাধীন ব্যাকটেরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবাল** — স্বাধীন ব্যাকটেরিয়া (অ্যাজোটোব্যাক্টর, ক্লসট্রিডিয়াম) ও নীলাভ সবুজ শৈবাল (অ্যানাবিনা, নস্টক প্রভৃতি) বায়ু থেকে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেন যৌগ গঠন করে। এইসব জীবের মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেন যৌগগুলি মাটিতে থেকে যায় এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে।

(iii) **নাইট্রোজেন স্থিতিকারী মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া** — মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (রাইজোবিয়াম) ছোলা, মটর প্রভৃতি শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ গঠন করে বসবাস করে। এই ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে নানাপ্রকার নাইট্রোজেন যৌগ গঠন করে। পরে ওই সব নাইট্রোজেন যৌগের কিছুটা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে দেয় এবং বাকি অংশ নিজের দেহে থাকে। এই সব ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেন যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায়।

(iv) **অ্যামোনিফিকেশন ও নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া** — উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এবং বর্জ্য পদার্থের নাইট্রোজেন যৌগগুলি কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে (ব্যাসিলাস, মাইক্রোকক্কাস প্রভৃতি) অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **অ্যামোনিফিকেশন** (Ammonification) বলে এবং এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াদের **অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া** (Ammonifying bacteria) বলে। কয়েকপ্রকার উদ্ভিদ এই অ্যামোনিয়াকে সরাসরি মাটি থেকে গ্রহণ করে। এই অ্যামোনিয়া ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে জারিত হয়ে নাইট্রেটে পরিণত হলে অধিকাংশ উদ্ভিদ তা গ্রহণ করে। প্রথমে নাইট্রোসোমোনাস, নাইট্রোসোকক্কাস প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রাইটে পরিণত করে। পরে এই নাইট্রাইট নাইট্রোব্যাক্টার ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে জারিত হয়ে নাইট্রেটে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রেট তৈরির প্রক্রিয়াকে **নাইট্রিফিকেশন** (Nitrification) বলে এবং এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াদের **নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া** (Nitrifying bacteria) বলে।

(v) **সার প্রয়োগ** — আজকাল জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য অজৈব সার ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়। এতে মাটির নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করা যায়।

● 2. **নাইট্রোজেন মোচন ঃ** যে প্রক্রিয়ায় মাটির নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তাকে **ডিনাইট্রিফিকেশন** (Denitrification) বলে। মাটির নাইট্রেট **সিউডোমোনাস** ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রথমে অ্যামোনিয়া এবং পরে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াগুলিকে **ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া** (Denitrifying bacteria) বলে।

নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ পদ্ধতিতে বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ হয়। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদের দেহে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষে এই নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় এবং ওই সব জৈব যৌগে এরা আবদ্ধ হয়। তৃণভোজী প্রাণীরা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদদেহ থেকে প্রোটিন গ্রহণ করে এবং মাংসাশী প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণীর দেহ থেকে প্রোটিন গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহের বিয়োজন ঘটে, প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয় এবং অবশেষে নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

এইভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ থেকে আবার মাটিতে এবং মাটি থেকে অবশেষে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

◘ (c) নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব (Importance of Nitrogen Cycle) ঃ

(i) নাইট্রোজেন চক্রের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন ও নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলির সমতা বজায় থাকে। (ii) জীবকোশের প্রোটোপ্লাজম নাইট্রোজেন ছাড়া গঠিত হতে পারে না। (iii) DNA ও RNA গঠনের প্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন। (iv) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজন। কারণ প্রোটিনের প্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন।

✪ 13.1.D. জীবমণ্ডল সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Biosphere) ✪

পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকে গ্যাসীয় আবরণ। একে **বায়ুমণ্ডল** বলে। পৃথিবীর উপরে তৈরি শিলাস্তরকে **শিলামণ্ডল** বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর গঠিত সাগর-নদনদী প্রভৃতি জলাশয়কে একসঙ্গে **বারিমণ্ডল** বলে। এই তিনটির সীমিত অংশ জুড়ে গঠিত হয় জীবমণ্ডল। জীবমণ্ডলের প্রাথমিক ধারণার জনক হল ফরাসি বিজ্ঞানী **জ্যাঁ লামার্ক** (Jean Lamack)। সম্ভবত 1873 খ্রিস্টাব্দে জীবমণ্ডল কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অস্ট্রিয়ার ভূতত্ত্ববিদ **এডোয়ার্ড সুয়েস** (Edward Suess)। জীবমণ্ডলের আধুনিক তত্ত্বের উদ্ভাবক রাশিয়ান বিজ্ঞানী **ভ্লাদিমির ভার্নাদস্কি** (Vladimir Vernadsky)। 1929 খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত বই **'জীবমণ্ডল'** প্রকাশিত হয়।

❖ (a) **জীবমণ্ডলের সংজ্ঞা (Definition of Biosphere)** : **পৃথিবীর যে অঞ্চলটি জুড়ে জীব বসবাস করে অর্থাৎ, যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় তাকে জীবমণ্ডল বলে।**

চিত্র 13.12 : জীবমণ্ডলের উপাদানসমূহ।

◘ (b) **জীবমণ্ডলের সীমানা (Area of Biosphere)**— ভূপৃষ্ঠের 6000 মিটার উচ্চতা থেকে সমুদ্রের 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত হল জীবমণ্ডল। জীবমণ্ডলের পাহাড়-পর্বত, নদনদী, হ্রদ, সমুদ্র, পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, সমতলভূমি, মরুভূমি, তুন্দ্রা অঞ্চল সর্বত্র নানা রকম পোকা মাকড়, পশুপাখি, উদ্ভিদ, মাছ, সরীসৃপ ইত্যাদি বসবাস করে। জীবমণ্ডলে মোট কত জীব বসবাস করে তা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। একটি আনুমানিক ধারণা হল জীবমণ্ডলে 12 লক্ষেরও বেশি প্রজাতির প্রাণী ও 4 লক্ষেরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ বসবাস করে।

◘ (c) **জীবমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Biosphere)**— (i) জীবমণ্ডলের তিনটি প্রধান বিভাগ—**বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere), **জলমণ্ডল** (Hydrosphere) এবং **স্থলমণ্ডল** (Lithosphere)। (ii) এই পরিমণ্ডলে জীব তার অস্তিত্বের মাধ্যমে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলকে আবর্তনে রাখে এবং জীবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে। (iii) জীবমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের নিজেদের মধ্যে ও পরিবেশের সঙ্গে যে আন্তঃসম্পর্কে জড়িয়ে থাকে তাকে **বাস্তুতন্ত্র** (Ecosystem) বলে। (iv) জীবমণ্ডলের জীবদের পারস্পরিক ও পরিবেশের সম্পর্কও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জীবনধারণের সমস্ত শক্তির মূল উৎস হল সূর্য। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনধারণের শক্তি সঞ্চয় করে সবুজ উদ্ভিদ। অন্যান্য সব প্রাণী উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

✪ 13.1.E. সুন্দরবন—জীবমণ্ডলের বিশেষ গুরুত্ব ✪ (Special Emphasis on Biosphere of Sundarban)

⊙ 1. **সুন্দরবনের অবস্থান (Location of Sundarban)**—পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো **ম্যানগ্রোভ অরণ্য**। এর অবস্থান 21°30´´ থেকে 22°30´´ উত্তর অক্ষাংশ ও 88°40´´ থেকে 90° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সুন্দরবনের মোট আয়তন হল প্রায় 9630 বর্গ কিলোমিটার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর 1947 সালে বাংলা বিভক্ত হবার পর সুন্দরবনও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এই অরণ্যের দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে ও এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ও বাংলাদেশের খুলনা জেলার দক্ষিণ প্রান্ত জুড়ে এই অরণ্যের বিস্তার। পশ্চিমে মাতলা নদী ও পূর্বে হরিণঘাটা নদী এর দুটি প্রান্ত বলে ধরা যায়। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বের জন্য এই অরণ্যকে **বিশ্ব ঐতিহ্য** তালিকার (World Heritage list) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র 13.13 : সুন্দরবনের মানচিত্র।

⊙ 2. **মৃত্তিকা বা মাটি** (Soil)— সুন্দরবনের উত্তর দিকের পলিযুক্ত এঁটেল মাটি (Silty clay) দিয়ে গঠিত। মধ্যভাগে ও জলাভূমির মাটিতে জৈব উপাদানের আচ্ছাদন দেখা যায়। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল বালিমাটিতে আবৃত। মাটির রং হালকা বাদামি অথবা ধূসর বর্ণের হয়। মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম।

মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকলেও বেশি পরিমাণে লবণ, যেমন—ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) দ্রবীভূত থাকায় উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় জলশোষণ করতে পারে না। তাই এই মাটিকে **শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা** (Physiologically dry soil) বলা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণও খুব কম । মাটি স্থান অনুসারে pH 5·4-7·8-এর মধ্যে রয়েছে। pH-7-এর কম হলে মৃত্তিকাকে আম্লিক এবং বেশি হলে ক্ষারীয় মৃত্তিকা বলা হয়।
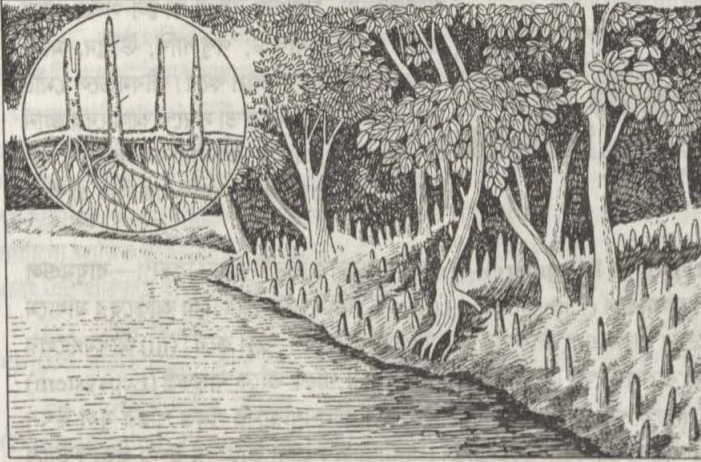
চিত্র 13.14 ঃ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

⊙ 3. **বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ঃ**

(a) **উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ** (Important plants)— সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রকার ছোটো-বড়ো সপুষ্পক উদ্ভিদ ও ঘাস জন্মায়। তা ছাড়া শৈবাল ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে। এই উদ্ভিদগুলি বিশেষ শ্রেণির যা লবণ সহ্য করতে পারে, নরম কাদায় বেড়ে ওঠে ও মূলের সাহায্যে প্রবল হাওয়া ও জলস্রোতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সুন্দরবনের কয়েকটি প্রধান উদ্ভিদ হল—রাইজোফোরা মিউক্রোনেটা (বোড়া) (*Rhizophora mucronata*), সিরিওপ্স রক্সবার্ঘিয়ানা (গরান) (*Ceriops roxburghiana*) ব্রুগিয়েরা জিমনোরাইজা—ক্যাংড়া (*Bruguiera gymnorhiza*), ক্যান্ডেলিয়া কেন্ডেল (*Kandelia candel*), সোনেরেটিয়া আপেটালা—সুন্দরী (*Sonneratia apetala*), সোনেরেটিয়া অ্যাসিডা—সুন্দরী (*Sonneratia acida*), এজিসেরাস মাজুস (*Aegiceras majus*), অ্যাকান্থাস ইলিসিফোলিয়াস—হারগোজা (*Acanthus ilicifolius*), অ্যাভিসেনিয়া অফিসিনালিস—বিন্দা (*Avicennia officinalis*), নিপা ফ্রুটিক্যান্স্—গোলপাতা (*Nypa fruticans*), ফনিক্স পেলুডোসা—খেজুর (*Phoenix paludosa*) ইত্যাদি। সুন্দরবনে প্রায় 70 রকমের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

(i) **শ্বাসমূল** (Pneumatophores)— মাটিতে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকায় শ্বাসকার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি উদ্ভিদের শাখামূল মাটি ভেদ করে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এই মূলের উপরের দিকে অসংখ্য রন্ধ্র থাকে। রন্ধ্র দিয়ে মূলগুলি শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। এই মূলগুলিকে **শ্বাসমূল** বলে।

(ii) **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (Viviparous germination)— মাটি লবণাক্ত এবং কম মাত্রায় অক্সিজেন থাকে বলে এখানকার উদ্ভিদে ফলগুলি উদ্ভিদ শাখায় যুক্ত থাকা অবস্থায় ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় ভ্রূণমূলটি প্রথমে বাড়ে এবং লম্বা, শক্ত সবল ও সুঁচালো হয়ে বীজপত্রাবকাণ্ডে পরিণত হয়। পরিণত হলে ফল থেকে বীজ খসে পড়ে এবং বীজপত্রাবকাণ্ডের সাহায্যে মাটিতে ঢুকে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। এর পর ভ্রূণ মুকুল বর্ধিত হয়। এই ধরনের অঙ্কুরোদ্গমকে **জরায়ু অঙ্কুরোদ্গম** বলে।

চিত্র 13.15 ঃ জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম।

❖ **ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সংজ্ঞা (Definition of Mangrove forest) ঃ সমুদ্রতীরবর্তী, নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ (Delta) অঞ্চলে লবণাক্ত মাটিতে যে ঘন জঙ্গল দেখা যায় এবং যেখানে জোয়ারের জলে নিয়মিত প্লাবিত হয় তাকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য বা বাদাবন বলে।**

● (b) **সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী** (Important Animals)—**সুন্দরবনে প্রায়** 106 প্রকার প্রোটোজোয়া, 993 রকমের অমেরুদণ্ডী, 262 রকমের সন্ধিপদ 3481 প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—**অঙ্গুরীমাল** (*Dendronereis sp., Morphysa mossambica, Diptera cuprea* ইত্যাদি), **ক্রাস্টেসিয়া** (*Thalassima uca, Sesarma, Balanus, Cibanarius*) প্রভৃতি।

চিত্র 13.16 : বাঘ (Royal Bengal tiger)।

সুন্দরবনে প্রায় 106 প্রকার প্রোটোজোয়া, 998 রকমের অমেরুদণ্ডী, 262 রকমের সন্ধিপদ ও 481 প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী সনাক্ত করা হয়েছে।

সরীসৃপ (Raptiles)— কচ্ছপ (*Lepids chelysolivacea*), হলদে গোসাপ (*Varanus salvar*), ভারতী গোসাপ (*Varanus bengalensis*), কুমির (*Crocodylus porosus*) ইত্যাদি। **মাছ** (Pisces)— ইলিশ (*Hilsa ilisha*), ভেটকি (*Lates calcarifer*), ভাঙ্গন (*Liza tada*), পার্শে (*Liza parsia*), প্রভৃতি। **পাখি** (Aves)— হিরণ পাখি (*Ardea goliath*), পেলিকেন (*Pelecanus philippensis*) প্রভৃতি। **স্তন্যপায়ী** (Mammals)— বনবেড়াল (*Felis bengalensis*), মেছো বেড়াল (*Felis viverina*), ডলফিন (*Platanista gangetica*), চিতল হরিণ (*Cervus axis*) এবং বাঘ (*Panthera tigris*) ইত্যাদি।

⊙ 4. **বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য**— সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র একটি গতিশীল অবস্থায় থাকে। সমুদ্রের জোয়ারভাটার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের প্লাবিত অঞ্চলের তারতম্য ঘটে, তারতম্য ঘটে লবণতার। এই অরণ্যের কতকগুলি বিশেষ অবদান হল—

(i) সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলে ভূমিক্ষয় থেকে রক্ষা করা। (ii) সমুদ্রের ঝড়ের প্রাবল্য থেকে রক্ষা করা। (iii) পুষ্টিদায়ক বস্তুর ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করা। (iv) মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করা, যেমন—কাঠ যা গৃহ নির্মাণ ও জ্বালানির কাজে লাগে, মধু ও ফল সংগ্রহ। (v) এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ (পার্শে, ভেটকি ইত্যাদি), চিংড়ি, কাঁকড়া পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের কয়েকটি অভয়ারণ্য ও প্রকল্প

অভয়ারণ্য :	
● সজনেখালি	362·80 বর্গ কিলোমিটার।
● লুথিয়ান দ্বীপ	38·00 বর্গ কিলোমিটার।
● হলিডে দ্বীপ	5·00 বর্গ কিলোমিটার।
প্রকল্প :	
● ব্যাঘ্র প্রকল্প	1973 সাল থেকে ।
● ভরতপুর কুমির প্রকল্প	পাথর প্রতিমার কাছে।
● সজনেখালি পাখিরালয়	145 বর্গমাইল।
● জাতীয় অরণ্য (কোর এরিয়া)	1984 সাল থেকে।

⊙ 5. **বাস্তুতন্ত্রের অবণতির কারণ**—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে পরিবেশ সমস্যা সুন্দরবনকে গ্রাস করছে। গৃহনির্মাণ, চাষআবাদ, জ্বালানি কাঠের চাহিদা ইত্যাদি সুন্দর বনের অরণ্যকে ধ্বংস করছে। ব্যাপক ভাবে চিংড়ি চাষও এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি করছে। চিংড়ি মীন (চারা) সংগ্রহের সময় অন্যান্য মাছের ডিম ও চারা বিনষ্ট হয়, ফলে অনেক প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটছে। ভূমি ক্ষয়ের ফলে নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে এবং মোহানা অঞ্চলে স্রোতও আগের মতো নেই। নোনা পলি জমে খাঁড়িগুলির গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রের নোনা জল চাষের জমিকে প্লাবিত করছে। এর ফলে চাষআবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতি বছর। বালি জমে চাষের জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের জন্য বন্য প্রাণীদের বাসস্থানের অভাব দেখা যাচ্ছে। বন্য প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে এবং মানুষের হাতে নির্বিচারে নিহত হচ্ছে। খাঁড়ির গভীরতা কমে যাওয়ায় মাছ খাঁড়িতে আসছে না। ফলে মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গার দূষিত জল ছোটো ছোটো নদী ও খালের মাধ্যমে মোহানায় চলে আসছে এবং জল দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে জীব বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

চিত্র 13.17 : সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্ররূপ।

অরণ্য কমে যাওয়ার জন্য জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অনেকটা কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া ঝড়, বাতাস ও সাইক্লোন থেকে রক্ষা পাওয়ারও কোনো উপায় থাকছে না।

বর্তমানে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য বহু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অরণ্যকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের স্বার্থে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

13.1.F. অট্ইকোলজি ও সিন্ইকোলজি (Autecology and Synecology)

ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যাকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন— (i) অট্ইকোলজি এবং (ii) সিন্ইকোলজি।

1. **অট্ইকোলজি (Autecology)—❖ সংজ্ঞা : বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী কোনো একটি প্রজাতির জীবগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অধ্যয়নকে অট্ইকোলজি বলে।**

উদাহরণ—একটি বাস্তুতন্ত্রের, যেমন সুন্দরবনের সব সুন্দরী গাছের পারস্পরিক সম্পর্কও তাদের পরিবেশের সম্পর্কে অধ্যয়ন।

2. **সিন্ইকোলজি (Synecology)—❖ সংজ্ঞা : বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী সব প্রজাতির জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অধ্যয়ন করাকে সিন্ইকোলজি বলা হয়।**

উদাহরণ—সুন্দরবনের সব উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক ও তাদের পরিবেশের সম্পর্কে অধ্যয়ন।

13.2.A. পরিবেশদূষণ (Environmental Pollution)

পরিবেশে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে যখন এর ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। বর্তমানে মানুষের বহু সমস্যার মধ্যে পরিবেশদূষণ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। এর ফলে একদিকে যেমন উন্নতি সাধিত হচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ইচ্ছামত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। অত্যধিক জনসংখ্যা, শিল্প প্রসারণ, যথেচ্ছ বনভূমি ধ্বংসের ফলে বায়ু, জল ও স্থলের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে। এর ফলে, পরিবেশ মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে। সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশ কী করে দূষণমুক্ত রাখা যায় তার জন্য সর্বস্তরে চলছে বিরাট কর্মযজ্ঞ।

❖ (a) **দূষণের সংজ্ঞা (Definition of Pollution) : পরিবেশে বহিরাগত কোনো জৈব, অজৈব বা তেজস্ক্রিয় বস্তুর অনুপ্রবেশের ফলে অথবা পরিবেশের জল, স্থল বা বায়ুর ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে যখন মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুখ ও স্বাভাবিক জীবনধারণ ব্যাহত হয়, পরিবেশের সেই বিশেষ অবস্থাকে দূষণ বলে।**

চিত্র 13.18 : পরিবেশ দূষণের চিত্ররূপ।

◘ (b) **সাধারণ দূষণকারী পদার্থ (Common Pollutants) : ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত পদার্থ যা দূষণ সৃষ্টি করে তাকে দূষণকারী পদার্থ বা দূষক (Pollutant) বলে।** এটি সাধারণত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই দূষক পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করে। পরিবেশে কয়েকটি দূষণকারী পদার্থ নীচে উল্লেখ করা হল : (i) **সঞ্চিত পদার্থ**—ধুলো-বালি, ময়লা, ঝুল-কালি, ধোঁয়া, ধোঁয়াশা, আলকাতরা প্রভৃতি। (ii) **গ্যাসীয় পদার্থ**—কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লোরিন ও ফ্লোরাইড, ক্লোরিন, ব্রোমিন আইয়োডিন প্রভৃতি। (iii) **ধাতু**—সিসা, লৌহ, তামা, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি। (iv) **রাসায়নিক পদার্থ**—কীটনাশক (Insecticides), আগাছানাশক (Herbicides), ছত্রাকনাশক (Fungicides), রাসায়নিক সার (Chemical Fertiliser) প্রভৃতি। (v) **শিল্পজাত জটিল জৈব যৌগ**— ইথার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বেঞ্জিন, বেঞ্জপাইরিন্‌স্ ইত্যাদি। (vi) **রাসায়নিক যৌগ**—ইথিলিন, অ্যালডিহাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট প্রভৃতি। (vii) বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

(c) **দূষণকারী পদার্থের প্রকারভেদ (Types of Pollutants) :** ওডাম 1971 খ্রিস্টাব্দে বাস্তুতন্ত্রের দূষণকারী পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করেন, যেমন—

1. **অভঙ্গুর** (Non-degradable)— সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় যেসব ধাতু বা বিষাক্ত পদার্থ ভাঙে না বা ধীরে ধীরে ভাঙে তাদের **অভঙ্গুর দূষণকারী** পদার্থ বলে। বাস্তুতন্ত্রে এইসব পদার্থ চক্রাকারে আবর্তিত হয় না, যেমন—অ্যালুমিনিয়াম, মারকিউরিক লবণ, দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফেনলযৌগ, DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) প্রভৃতি। 2. **ভঙ্গুর** (Degradable)— প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব জৈব পদার্থ সহজে ভেঙে যায় এবং বাস্তুতন্ত্রে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাদের **ভঙ্গুর দূষণকারী** পদার্থ বলে। সাধারণত গৃহস্থের পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ এর অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশে এদের আধিক্য ঘটলে বহু সমস্যা দেখা দেয়।

(d) **দূষণের প্রতিক্রিয়া (Effects of pollution) :** 1. ফুসফুসে ক্যানসার, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি। 2. মনুষ্যশক্তি ও অর্থের অপচয়। 3. অযথা অপচয়ের ফলে সম্পদের ক্ষতি।

13.2A-1. জল, মাটি এবং বায়ুদূষণ সম্বন্ধে ধারণা (Concept of pollution of Water, Soil and Air)

A. জলদূষণ সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Water pollution) :

(a) **সংজ্ঞা (Definition) :** **কোনোভাবে জলে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত জীবাণু বা বস্তু মিশে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণমান নষ্ট করলে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর গ্রহণের অযোগ্য হলে তাকে জলদূষণ বলে।**

(b) **জলদূষক পদার্থ (Water pollutant) :** নানা প্রকার উৎস থেকে অজৈব, জৈব ও জীবাণু জলকে দূষিত করে। দূষণ সৃষ্টিকারী বস্তুগুলি হল—

1. **অজৈব পদার্থ**— (i) দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত ধূলিকণা, (ii) অম্ল পদার্থ, (iii) ক্ষারীয় পদার্থ, (iv) ধাতব পদার্থ, যেমন—পারদ, আর্সেনিক, সিসা, ক্রোমিয়াম, (v) বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, যেমন—অ্যামোনিয়া, মুক্ত ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, (vi) কীটনাশক, (vii) তেল জাতীয় পদার্থ, (viii) ডিটারজেন্ট; (ix) বিভিন্ন প্রকার রং, (x) নাইট্রেট জাতীয় পদার্থ, (xi) মৃতদেহ, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি, (xii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

2. **জৈব-পদার্থ**— (i) কৃষিকাজের আবর্জনা, (ii) পচনশীল জৈব-বস্তু, (iii) শহরাঞ্চলের আবর্জনা, (iv) শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, কচুরিপানা ইত্যাদি।

3. **জীবাণু**— (i) প্রোটোজোয়া, (ii) নেমাটোড, (iii) ব্যাকটেরিয়া, (iv) বিষাক্ত জলজ পোকা।

চিত্র 13.19 : শিল্পদ্রব্য থেকে জলদূষণ।

(c) **জলদূষকের উৎস ও প্রকৃতি (Sources and Nature of water pollutants) :** নানা কারণে জল দূষিত হয়। জলদূষণের কারণগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

(i) **শিল্পঘটিত দূষণ**—বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বর্জ্য পদার্থ থেকে নানা রকম জৈব ও অজৈব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—অ্যামোনিয়া, অ্যালকালি, ফেনল, ক্লোরিন, আর্সেনিক, সায়ানাইড ইত্যাদি নির্গত হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থ, যেমন—পারদ, সিসা, ক্রোমিয়াম, কপার প্রভৃতিও বর্জ্য হিসাবে বের হয়। এই সব দূষিত বর্জ্য পদার্থ নর্দমা বা নালা দিয়ে বাহিত হয়ে নদনদী ও অন্যান্য জলাশয়ে মিশে জলের দূষণ ঘটায়। (ii) **গৃহস্থালীর দৈনন্দিন আবর্জনার দূষণ**— বাড়ির বিভিন্ন রকমের আবর্জনা দীর্ঘদিন ধরে জমে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু জলাশয় ও জলাধারগুলির জল দূষিত করে। (iii) **তাপীয় দূষণ**—শিল্প ও কারখানা থেকে অনেক সময় বর্জ্য গরম জল নদীতে ফেলায় জলের দূষণ ঘটে।

(iv) **কৃষিজাত দূষণ**— কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক, নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ যা কৃষিভূমিতে ব্যবহার করা হয় তা বিভিন্ন জলাশয়ে যায় এবং জল কলুষিত করে। (v) **শহর অঞ্চলের বৃষ্টির সময় জলদূষণ**— বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টির সময় শহরের রাস্তাঘাট ডুবে যায়। এর ফলে নর্দমা, ডাস্টবিন, খাটাল, ভাগাড় প্রভৃতির দূষিত জল বিভিন্ন জলাশয়ে মেশে এবং দূষণ ঘটায়। (vi) **নর্দমার নিষ্কাশিত আবর্জনার জন্য দূষণ**— স্নানাগার, শৌচাগার প্রভৃতির নোংরা জল ও আবর্জনা জলাশয়ে যায় ও দূষণ ঘটে। নোংরা জলের মধ্যে মল-মূত্র, গার্হস্থ্য বর্জ্য, ডিটারজেন্ট প্রভৃতি থাকে। (vii) **অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দূষণ**— বিভিন্ন অঞ্চলে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য জল দূষিত হয়। (viii) **তেল দূষণ**— বিভিন্ন প্রকার শিল্প, যেমন— তেল শোধনাগার, পেট্রোরাসায়নিক শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে তেল নির্গত হয়। তা ছাড়া সমুদ্রে তেল পরিবহনের সময় এবং তেল তোলবার সময় বর্জ্যের সঙ্গে তেল নির্গত হয়। তা ছাড়া সামুদ্রিক দুর্ঘটনায়ও তেল জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জলের দূষণ ঘটায়। এতে জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয় ও জলের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। (ix) **জীবাণু-দূষণ**—রোগীর মলমূত্র, গার্হস্থ্য বর্জ্য, চামড়ার কারখানা, কসাইখানা প্রভৃতির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি জলবাহিত জীবাণু, কলেরা, টাইফয়েড ও পেটের বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটায়। (x) **পলি ও তলানির দূষণ**—প্রাকৃতির কারণে ও অরণ্য ধ্বংসের জন্য পাহাড় ও অন্যান্য স্থানের ভূমিক্ষয়, কৃষিভূমির মাটি, খনির জল ইত্যাদি জলাশয়ে মিশে জলকে দূষিত করে। এতে জলাশয়ের ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং জীব বেচে থাকার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।
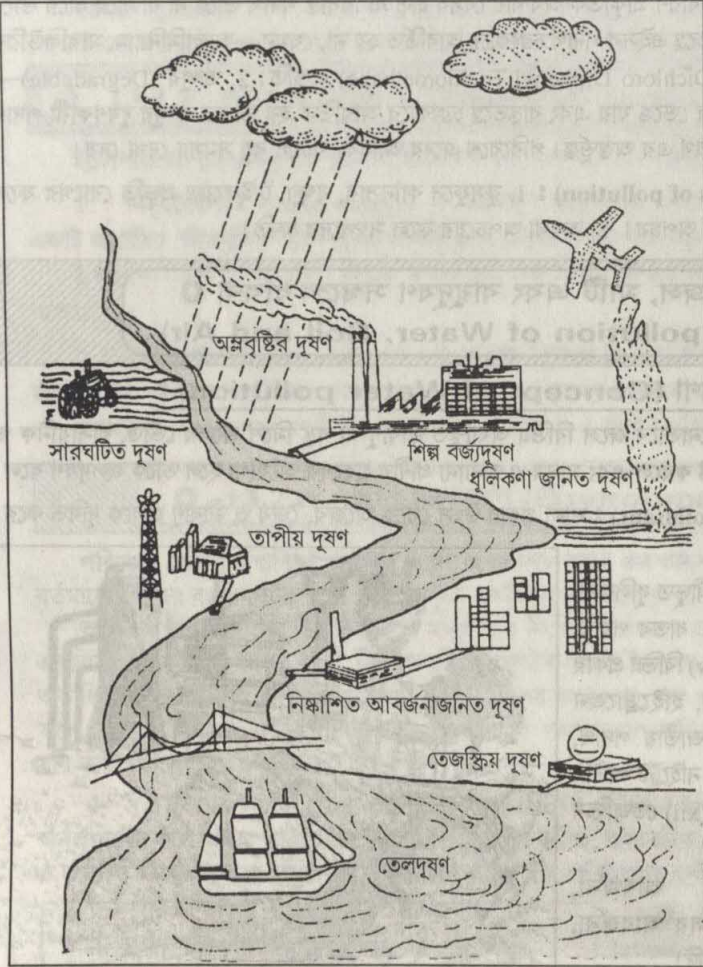
চিত্র 13.20 : জলদূষণের প্রধান প্রধান কারণ।

▲ B. মাটিদূষণ সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Soil pollution) :

মাটি হল ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তরে সবসময় পরিবর্তনশীল এক ধরনের মিশ্র পদার্থ যা বিভিন্ন রকম জৈব ও অজৈব পদার্থ, জল, বায়ু, অণুজীব, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত এবং যার উপর উদ্ভিদ জন্মায়।

❖ (a) **মাটিদূষণের সংজ্ঞা (Definition of Soil pollution) : ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার অবাঞ্ছিত দূষক পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে জীবের স্বাভাবিক জীবন ধারণ বিঘ্নিত হলে তাকে মাটিদূষণ বলে।**

◘ (b) **মাটিদূষকের উৎস (Sources of Soil pollutant) :** মাটির দূষককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন— **সজীব দূষক, অজীব দূষক ও জৈব দূষক।**

● মাটির বিভিন্ন প্রকার দূষক এবং তাদের উৎস (Different types of Pollutants with their sources) :

1. **সজীব বস্তু :** রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, কৃমি প্রভৃতি। পৌর প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, মানুষ ও প্রাণীর মলমূত্র প্রভৃতি থেকে আসে।

2. **অজীব বস্তু :** পারদ, সিসা, সালফেট, ফসফেট, ক্যাডমিয়াম, লবণ, অ্যাসিড প্রভৃতি। এই প্রকার দূষক কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, পেট্রোল দহন, কারখানার ছাই, অম্লবৃষ্টি প্রভৃতি থেকে আসে।

3. **জৈব দূষক :** প্লাস্টিক দ্রব্য, পলিথিন দ্রব্য ও কীটনাশক—কৃষিকার্য এবং কারখানা প্রভৃতি থেকে আসে।

চিত্র 13.21 : পৌর কঠিন বর্জ্য থেকে মাটির দূষণ।

□ (c) **মাটির দূষকের প্রকৃতি (Nature of Soil Pollutant)** : বিভিন্ন প্রকার মাটি দূষকের প্রকৃতি নীচে আলোচনা করা হল—(i) **জীবঘটিত দূষণ** — মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর নিষ্ক্রান্ত মল ও তাতে বসবাসকারী বিভিন্ন পরজীবী ও অণুজীবী মাটির দূষণ ঘটায়। (ii) **গৃহস্থালী বর্জ্যঘটিত দূষণ** — গৃহপালিত পশুর মলমূত্রের সঙ্গে বিভিন্ন জীবাণু মাটির দূষণ ঘটায়। (iii) **অজৈব পদার্থ ঘটিত দূষণ**—শিল্পসংস্থা এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য পদার্থের অপরিকল্পিতভাবে স্তূপীকরণ থেকে অনেক সময় মাটির দূষণ ঘটে। প্লাস্টিক, রং উৎপাদনের কারখানা, কয়লা ও খনিজাত শিল্প, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি সংস্থার বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে সিসা, পারদ, দস্তা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ মাটিতে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া অজৈব রাসায়নিক, ভারী ধাতু মাটিতে সংক্রমিত হয়। (iv) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘটিত দূষণ**—শিল্পসংস্থা এবং গবেষণাগার থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে সংক্রামিত হয়। (v) **প্লাস্টিকঘটিত দূষণ**—প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু মাটির উপরে থেকে যায়, কিন্তু কখনোই বিনষ্ট হয় না। তাছাড়া দীর্ঘদিন জলবায়ুর মধ্যে এভাবে থাকলে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান মাটিকে দূষিত করে। এতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ ও পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি হয়। (vi) **কীট ও পতঙ্গনাশক দূষণ**—কীট ও পতঙ্গনাশক ব্যবহার করার ফলে আপাত দৃষ্টিতে বেশি ফসল উৎপন্ন হলেও পরিবেশ ও মাটি দূষিত হচ্ছে। তা ছাড়া জমির শাকসবজি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে কীটনাশক মানুষের দেহে প্রবেশ করে বহু রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

□ (d) **মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Soil-pollution) :** মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি নীচে আলোচনা করা হল— (i) আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস করা। (ii) একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবর্জনা সংগ্রহ করে দূরবর্তী জায়গায় নিক্ষেপ করা। (iii) বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত ময়লা বড়ো গর্তে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়ে দূষণ মুক্ত করা। অনেক সময় নীচু জমি ভরাটের কাজে বর্জ্য পদার্থগুলি ব্যবহার করা। (iv) বর্জ্য বা আবর্জনাগুলি সংগ্রহ করে ভস্মীভূত করে দূষণ কমানো। (v) কাগজ, কাচ ও বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য বর্জ্য থেকে মূল উপাদান আবার উৎপাদন করা। (vi) উন্মুক্ত জমিতে মল না ত্যাগ করা। স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা। (vii) কীটনাশকের ব্যবহার কমানো এবং জৈবিক নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। (viii) শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে দূষণমুক্ত করা। (ix) মাটি দূষণ সম্বন্ধে গণচেতনা বৃদ্ধি করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া।

▲ C. বায়ুদূষণ সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Air pollution) :

➤ বায়ুদূষণের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন প্রকার বায়ু-দূষক (Definition of Air pollution and different types of Air Pollutants) :

❖ (a) বায়ুদূষণের সংজ্ঞা (Definition of Air pollution) : প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের ফলে বায়ু পরিবেশে উদ্ভূত সূক্ষ্ম কঠিন বর্জ্য পদার্থ অথবা অপ্রয়োজনীয় উপাদানের ঘনত্ব যদি স্বাভাবিক অনুপাতের থেকে বেশি বা কম হয় যার ফলে জীবের স্বাভাবিক জীবনধারণ ব্যাহত হয়, বায়ুর সেই অস্বাভাবিক অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে।

(b) **বায়ু-দূষকের উৎস ও প্রকৃতি (Sources and Nature of Air Pollutants)** — উৎসের উপর নির্ভর করে বায়ু-দূষককে মোট দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।
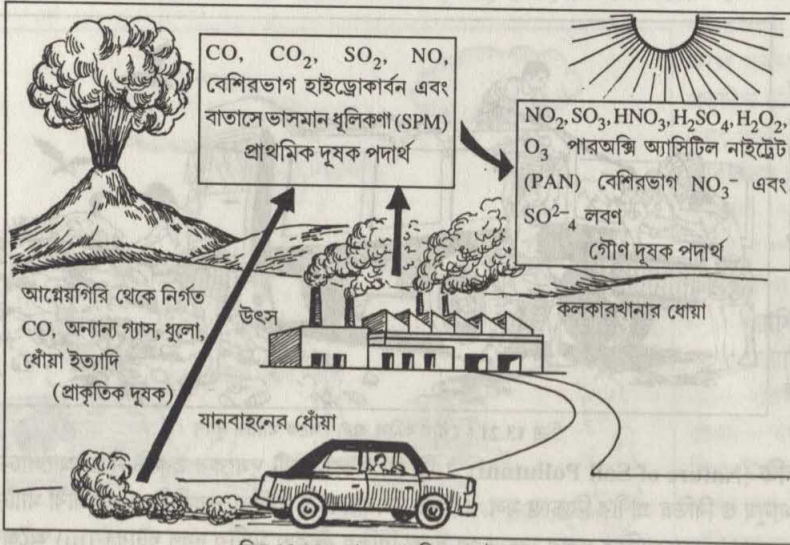
চিত্র 13.22 : বায়ুর প্রাথমিক ও গৌণ দূষক।

● **1. প্রাকৃতিক বায়ু-দূষকের উৎস ও প্রকৃতি (Sources and Nature of Natural Air Pollutants) :** (i) **উদ্ভিদ**— রেণু, পচনশীল উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ও উদ্ভিদ দাবানল থেকে সৃষ্ট কার্বন মনোক্সাইড। (ii) **এরোসল**— ধুলো, ধোঁয়া, কুয়াশা ও বাষ্প। (iii) **মাটি**—ধুলো, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। (iv) **সমুদ্র**—লবণ কণা। (v) **আগ্নেয়গিরি**—কার্বন-মনোক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস, ছাই, ধুলো, ধোঁয়া প্রভৃতি। (vi) **মহাজাগতিক বস্তু**— মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কা, ধূমকেতু থেকে নিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

● **2. মনুষ্যসৃষ্ট বায়ু-দূষকের উৎস (Man-made sources of Air Pollutants) :** (i) **গ্যাসীয় পদার্থ**— বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা, যানবাহন, কয়লা, পেট্রোল থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়া। (ii) **কঠিন বর্জ্য**— কলকারখানা থেকে নির্গত পদার্থ। (iii) **তাপ**— শিল্প, কলকারখানা ও নানা ধরনের প্রকল্প থেকে নির্গত তাপ। (iv) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ**— পারমাণবিক জ্বালানি, বিস্ফোরণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র।

● **বায়ুদূষণের প্রধান কারণ (Main Causes of Air pollution) :** নানাকারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে, যেমন— (i) কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়া, (ii) যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া এবং শহর ও লোকালয় থেকে নির্গত গ্যাস।

✪ 13.2A-2. জল ও বায়ুদূষণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের উপায় ✪ (Effect and Probable control strategies of Water and Air pollution)

▲ A. জলদূষণের প্রভাব (Effect of water Pollution) :

জল দূষিত হলে মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বহু ক্ষতি হয়।

(a) **প্রত্যক্ষ প্রভাব**—(i) দূষিত জলে নানা প্রকার রোগ জীবাণু থেকে মানুষের নানা রকম রোগের সৃষ্টি, হয়, যেমন— কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, জন্ডিস, আন্ত্রিক ইত্যাদি। (ii) সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতু জলকে বিষাক্ত করে। অতিরিক্ত মাত্রায় বিষাক্ত ধাতু থেকে মানুষ ও অন্যান্য জলজ জীবদেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। (iii) কীটনাশক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলকে দূষিত করলে সেই জল পান করলে চর্মরোগ, স্নায়ুঘটিত রোগ অন্যান্য কঠিন রোগের উপসর্গ দেখা যায়।

(b) **পরোক্ষ প্রভাব**—শৈবাল ও কচুরিপানার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটলে জল দূষিত হয় এবং জলজ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়। অনেক সময় অক্সিজেনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় (Biological Oxygen Demand = BOD)। ফলে জলজ প্রাণী ও মাছের অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয় এবং এদের মৃত্যু ঘটে।

▲ B. জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of water pollution) :

জলদূষণ প্রতিকারের জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা যায়, যেমন—প্রযুক্তিগত, আইনসম্মত ও ব্যক্তিগত।

(a) **প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (i) কলকারখানার দূষিত জল পরিস্রুত করে নদীতে ফেলা প্রয়োজন। (ii) মানুষের মলমূত্র, কাগজ, সাবান ও অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু সরাসরি জলাশয়ে না ফেলে আবর্জনা অপসারণ করে পরিস্রুত নির্বীজকৃত সেই জল জলাশয়ে (নদী, সমুদ্র প্রভৃতি) ফেলা উচিত। (iii) জমিতে কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। (iv) সমুদ্রে তৈলবাহী জাহাজ থেকে তেল সমুদ্রের জলে নির্গত হলে যথাসম্ভব তুলে নিতে হবে। অবশিষ্ট তেল রাসায়নিক বস্তু ও জীবাণুর সাহায্যে নষ্ট করা উচিত।

(b) **ব্যক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (i) অপ্রয়োজনীয় পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করা। (ii) কঠিন বর্জ্য পদার্থ জলে না ফেলা। (iii) সমুদ্রের জলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ না ফেলার ব্যবস্থা করা। (iv) মলমূত্র ও চিকিৎসা সংক্রান্ত আবর্জনা জলে ফেলা নিষিদ্ধ করা। (v) কাপড় কাচার জন্য কম ফসফেটযুক্ত বা ফসফেটবিহীন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা। (vi) বাড়ির আশেপাশের জলাশয়ে কচুরিপানা বা শৈবাল না জন্মাতে দেওয়া।

(c) **আইনসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ** 1974 এবং 1977 সালে 'জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রক' আইন চালু করা হয়। এই আইন বলে কয়েকটি শর্ত বাধ্যতামূলক করা হয়। দুটি সংস্থা জলদূষণের ব্যাপারে দেখাশোনা করে, যেমন— কেন্দ্রীয় জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এদের প্রধান কাজগুলি হল— (i) বর্জ্য পদার্থ নির্গত করার নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ণয় করা। (ii) দূষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। (iii) দূষণের পরিমাণ পরিমাপ করা। (iv) অধ্যয়ন, গবেষণা, পদ্ধতির উদ্ভাবন, গণচেতনা জাগরণ প্রভৃতি এই পর্ষদদ্বয়ের কাজ। (v) 1974 সালের আইন বলে নদী, পুকুর, কূপ ও খালি জমিতে আবর্জনা নিক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (vi) বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় ব্যবহৃত জলের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মিটার থাকা বাধ্যতামূলক। (vii) কোনো শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের জন্য নতুন কোনো ইউনিট স্থাপন বা প্রসারণ করা নিষিদ্ধ।

▲ C. বায়ুদূষণের প্রভাব (Effects of Air Pollutant) ঃ

সব রকম বায়ু-দূষণই যে মারাত্মক তা নয়। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নিম্নলিখিত বায়ু-দূষকগুলি প্রভাব বিস্তার করে ঃ

1. **কার্বন মনোক্সাইড** (CO)— এই ভয়ংকর গ্যাস ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তে মিশে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন নামে একটি স্থায়ী যৌগ গঠন করে। এই কারণে রক্তে O_2-এর অভাব হয় ফলে বমিভাব, মাথাধরা, মাথা ঝিমঝিম প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। অনেক সময় চোখের অনুভূতি, সচেতনতা ও বিচার বুদ্ধি কমে। বায়ুতে বেশি পরিমাণে এই গ্যাস থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

2. **সালফার ডাইঅক্সাইড**—শ্বাসনালিতে কষ্ট, চোখ জ্বালা, গলা ব্যথা, নাক জ্বালা, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, ফুসফুসে ক্যানসার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। তাছাড়া বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড সালফার ডাইঅক্সাইড অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষতিকারক। সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড বৃষ্টি ও ধোঁয়াশা সৃষ্টির প্রধান উপাদান।

চিত্র 13.23 ঃ A. যানবাহনের গ্যাস ও ধোঁয়া এবং B. কারখানার ধোঁয়া।

3. **নাইট্রোজেন অক্সাইড**— ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তা ছাড়া নাইট্রিক অক্সাইড অন্যান্য জৈবযোগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে PAN (পারঅক্সি অ্যাসিটিল নাইট্রেট), কার্বোনিল যৌগ তৈরি করে। এরা আমাদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে, যেমন— শ্বসন, পরিপাক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে।

4. **নাইট্রিক অক্সাইড**— দেহে NO (নাইট্রিক অক্সাইড) প্রবেশ করলে রক্তে এই যৌগটি উৎপন্ন হয়ে দেহে বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের উপর বিরূপ ক্রিয়া ঘটায়। বিভিন্ন প্রকার ফুসফুসের রোগ দেখা যায়।

5. **হাইড্রোজেন সালফাইড** — বমিভাব, মাথাধরা ও শারীরিক বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

6. **হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড** — দেহে ফ্লুরোসিস রোগ ঘটায়।

7. **ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড** — ক্লোরিন বিষাক্ত গ্যাস। এই গ্যাসের প্রভাবে শ্বাসনালির জ্বালাভাব ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। চোখে কনজাংটিভাইটিস্ রোগ হতে পারে। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উদ্ভিদ ও সম্পত্তির ক্ষতি করে।
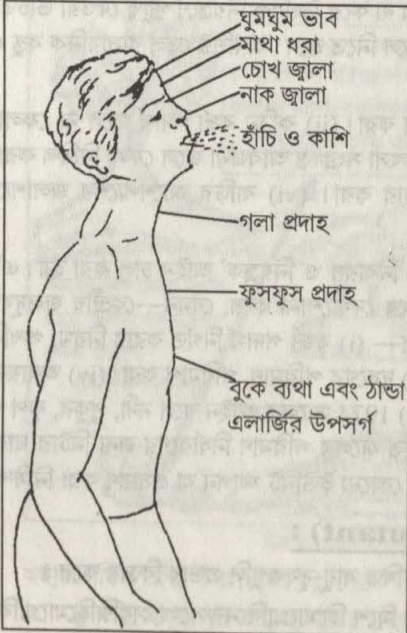
চিত্র 13.24 : মানুষের দেহে বায়ুদূষণের কয়েকটি প্রভাবের চিত্ররূপ।

8. **হাইড্রোকার্বনসমূহ** —বায়ুর হাইড্রোকার্বন সরাসরি কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু সূর্যালোক ও নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া করে আলোক রাসায়নিক জারক যৌগ গঠন করে। এদের মধ্যে প্রধান হল ওজোন গ্যাস। শিল্পাঞ্চলে ও শহরের বায়ুতে হাইড্রোকার্বনের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই হল মিথেন গ্যাস। এছাড়া অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন, প্রপেন, অলিফিন প্রভৃতি গ্যাসও থাকে। মিথেন ছাড়া অন্যান্য গ্যাসগুলিও বায়ুদূষণ ঘটায়।

বায়ুতে বেশি পরিমাণে হাইড্রোকার্বন থাকলে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্ষতি, ক্যানসার প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

9. **ওজোন** — এই গ্যাসের মাত্রা বেশি হলে মাথা ধরা, ফুসফুসের রক্তক্ষরণ, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসার প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। অনেক সময় নানা রকম চোখের অসুখের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

10. **সূক্ষ্ম ধূলিকণা** — বাতাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাড়লে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের সমস্যা, চোখ, নাক, গলার নানাপ্রকার রোগ দেখা যায়।

▲ D. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Air pollution) :

আজকাল বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনটি উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—প্রযুক্তি, আইনসম্মত ও ব্যক্তিগত উপায়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল —

○ (a) প্রযুক্তিগত উপায়ে বায়ুদূষণ রোধ :

1. **দূষক পদার্থের উৎপাদন হ্রাস** — বায়ুদূষণ রোধ করার প্রধান উপায় হল ধোঁয়া, গ্যাস প্রভৃতির উৎপাদন হ্রাস করা। এর জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন, যেমন—

(i) যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া যাতে বায়ুতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে পরিস্রুত করা উচিত। আজকাল ব্যবহারকারী **কুঞ্চন বাতায়ন** (Crankage Ventilation) বা **অনুঘটক কনভার্টার** (Catalytic Converter) ব্যবহার করা হচ্ছে।

(ii) যে জ্বালানি থেকে কম ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব কয়লা, ডিজেল প্রভৃতির পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ধোঁয়াহীন কয়লা ব্যবহার করা উচিত।

2. **আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ :** কলকারখানা ও বিভিন্ন শিল্পে পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তন করে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে বায়ুদূষণ অনেকটা কমানো যায়। রাসায়নিক শিল্পগুলি থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস পুনর্ব্যবহার করে বায়ু-দূষণ হ্রাস করা যায়।

খনিজ তেল শোধনাগারের প্রধান দূষক হল হাইড্রোজেন সালফাইড। এই গ্যাস পুনর্ব্যবহার করে সালফার নিষ্কাশন করা হয়। তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পে (কাগজ, ইস্পাত প্রভৃতি) পুরোনো পদ্ধতি পরিবর্তন করে অনেকটা সুফল পাওয়া গেছে।

3. **কীটনাশক পদার্থের বিকল্প ব্যবস্থা :** কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে কীট-পতঙ্গ দমন করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

4. **পুরানো যন্ত্রপাতির পরিবর্তন :** বিভিন্ন শিল্পে পুরানো যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ঘটিয়ে দূষণ অনেকটা কমানো যায়। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারকারী ইঞ্জিনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ অনেকটা কমে যায়।

5. **নির্গত ক্ষতিকারক শোধন :** আধুনিক নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—মাধ্যাকর্ষণজনিত সঞ্চয়কারী প্রকোষ্ঠ, ইলেকট্রোস্ট্যাটি প্রেসিপিটার, তন্তুজ ফিলটার, সাইক্লোন সেপারেটার ইত্যাদি।

6. **উদ্ভিদের সাহায্যে দূষক রোধ :** অনেকগুলি গাছ বায়ু দূষণ প্রতিরোধকারী প্রমাণিত হয়েছে। সেসব গাছ পুঁতলে দূষণ অনেকটা কমানো যায়। উদাহরণ—বট, নারকেল, তেঁতুল, নিম প্রভৃতি।

(b) **আইনসম্মত উপায়ে বায়ু দূষণ রোধ ঃ** প্রযুক্তিক উপায়ে বায়ুদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। 1981 সালে ভারতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করা হয়।

এই আইনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হল গুরুত্বপূর্ণ — (i) কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোনো নতুন শিল্প স্থাপন করতে পারবে না। (ii) কোনো শিল্প বা কারখানা দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন সীমার বেশি ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ুতে নিক্ষেপ করতে পারবে না। (iii) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের স্থান নির্ধারণের সময় রাজ্য দূষণ পর্ষদের অনুমতি বাধ্যতামূলক। (iv) গ্রামাঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ও বসতি অঞ্চলের বায়ুর উৎকর্ষ মানের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। (v) অটোমোবাইল ইঞ্জিনের ধোঁয়া নির্ধারিত সীমায় রাখার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(c) **ব্যক্তিগত উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করলেও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। (i) অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহার ও উৎপাদন হ্রাস করা। (ii) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো। (iii) শিল্পাঞ্চল থেকে বসতি অঞ্চল নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা। (iv) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিতে ধূমপান না করা।

13.2A-3. শব্দদূষণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের উপায় (Effect and Probable control strategies of sound Pollution)

শব্দদূষণ সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Sound pollution) ঃ

(a) **শব্দদূষণের সংজ্ঞা (Definition of Sound pollution) ঃ মাত্রাতিরিক্ত অনিয়ন্ত্রিত শব্দ যা মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাকে শব্দদূষণ বলে।**

শব্দের তীব্রতার পরিমাপ (Measurement of Intensity of Sound) ঃ

শব্দের তীব্রতা (Intensity) প্রকাশ করার একক হল **ডেসিবেল** (Decibel) এবং **সংক্ষেপে db** বলে। শব্দের ডেসিবেল স্কেলকে 0—140 ভাগে বিভক্ত করা যায়। সব থেকে ক্ষীণ শ্রাব্য শব্দকে এই স্কেলে একক হিসাবে বা '0' হিসাবে ধরা যায়। শব্দের তীব্রতা বাড়লে db বাড়ে, এবং যখন শব্দের তীব্রতা 120 db পৌঁছায় তখন তা যন্ত্রণাদায়ক হয়। আগের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন শব্দের তীব্রতা ডেসিবেলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দের উৎস	ডেসিবেলের পরিমাপ
1. সব থেকে ক্ষীণ শ্রাব্য শব্দ	0 ডেসিবেল
2. ফিসফিস কথা বলার শব্দ	20 "
3. কোলাহলশূন্য রাস্তাঘাটের শব্দ	40 "
4. স্বাভাবিক কথোপকথনে উৎপন্ন শব্দ	60 "
5. বড়ো শহরে যানবহুল রাস্তায় উৎপন্ন শব্দ	80 "
6. লাউডস্পিকার, রেল স্টেশনের কোলাহলের শব্দ	90 "
7. বাস, লরি, ইলেকট্রিক হর্নের শব্দ	100 "
8. বাজ পড়ার ফলে উৎপন্ন শব্দ	120 "
9. সাইরেন, জেটপ্লেন ইত্যাদির যন্ত্রণাদায়ক উৎপন্ন শব্দ	140 "

80 ডেসিবেলের বা এর থেকে বেশি তীব্রতার শব্দকে কোলাহল (Sound) বা শব্দদূষণ বলে।

(b) **শব্দদূষণের কারণ (Causes of Sound pollution) ঃ**

(i) **পরিবহন** — শব্দদূষণের একটি প্রধান উৎস হল যানবাহন। মোটর গাড়ি, বাস, লরি, মোটর সাইকেল, ট্রাম, টেম্পো প্রভৃতি চলাচলে অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিকারী শব্দ এবং বৈদ্যুতিক হর্নের তীব্রতা শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ।

(ii) **স্টেশন ও রেল পরিবহনের শব্দের দূষণ** — শহরের বড়ো বড়ো স্টেশনের প্লাটফর্মের কোলাহল শব্দদূষণের একটি উৎস। ট্রেন চলাচলের শব্দ ও ট্রেনের হুইসেলের বিকট শব্দও শব্দদূষণ ঘটায়।

(iii) **শিল্পাঞ্চলের শব্দ** — বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে কলকারখানার বিভিন্ন যন্ত্রের আওয়াজ শব্দদূষণের একটি প্রধান কারণ। বিশেষ করে প্রেসের মেসিন, টেক্সটাইল লুম, পাঞ্চিং মেশিন, গাড়ি সারাই, সাইরেন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(iv) **যান্ত্রিক ক্রিয়ার দূষণ** — ডিজেল চালিত জেনারেটার, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কুলার, ভ্যাকুম ক্লিনার প্রভৃতি থেকেও দূষণ সৃষ্টি হয়।

(v) **বিমান পরিবহনের দূষণ** — দেখা যায় বিমান ছাড়ার সময় এবং আকাশ পথে উড়বার সময় বিকট শব্দ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া জেট ও সুপারসোনিক দ্রুত গতিসম্পন্ন বিমানের সৃষ্ট শব্দ থেকে দূষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

(vi) **নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দোকানপাট থেকে দূষণ** — প্রতিবেশীর বাড়ি ও আশেপাশের দোকান থেকে জোরে চালানো টিভি, টেপ রেকর্ডার ও লাউড স্পিকার প্রভৃতি থেকে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়।

(vii) **কোলাহল থেকে দূষণ** — শেয়ার বাজারে, অফিসে বা কোনো জমায়েতে, রেস্টুরেন্টে ও শিক্ষায়তনে (স্কুল, কলেজ প্রভৃতি) উচ্চস্বরের কথা-বার্তা কোলাহল (Noise) সৃষ্টি করে যা শব্দদূষণের আওতায় পড়ে।

(viii) **সামাজিক কারণে দূষণ** — পুজো-পার্বন, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজি ও মাইকের তীব্র আওয়াজ শব্দ-দূষণ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া মিটিং ও মিছিলে মাইক ব্যবহারও অনেক সময় দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

▲ শব্দদূষণের কুপ্রভাব (Effects of Sound Pollution) :

অত্যধিক শব্দ বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু ক্রমাগত শব্দাধিক্য মানুষের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। শব্দদূষণের প্রভাবে মানুষের নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ দেখা যায়, যেমন—

চিত্র **13.25** : সামাজিক উৎসবের সময় শব্দদূষণের চিত্ররূপ।

1. **শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব** — অনেকদিন 100 dB শব্দের মধ্যে কাটালে বধিরতা দেখা দেয়। কারণ কানের অর্গান **অফ কর্টির** কোশগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 160 dB মাত্রার বিকট শব্দে কানের পর্দা (কর্ণপটহ) ছিঁড়ে যায় এবং এর ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে শ্রবণ ক্ষমতা হারায়।

2. **রক্ত-সংবহনতন্ত্রের উপর প্রভাব**— (i) দীর্ঘস্থায়ী জোরালো আওয়াজ মানুষের হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হৃদ-স্পন্দনের হার সাধারণত অনেক বেড়ে যায় বা কমে যায়। রক্তে হাইপোক্যালসিমিয়া অর্থাৎ রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে যায়, **হাইপোগ্লাইসেমিয়া**— রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস ও ইওসিনোফিলিয়া অর্থাৎ শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। (ii) শব্দদূষণে ধমনির রক্তচাপ (BP) অনেক বেড়ে যায় (হাইপারটেনসন)।

3. **শ্বাসক্রিয়ার উপর প্রভাব**—শব্দদূষণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের হার পরিবর্তন হয় এবং শ্বাসক্রিয়ার হার এবং গভীরতা বেড়ে যায়।

4. **মস্তিষ্কের উপর প্রভাব**—শব্দদূষণের প্রভাবে (i) অনিদ্রা রোগ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন কাজের একাগ্রতা নষ্ট হয় ফলে কর্মদক্ষতা কমে যায়। (ii) বিকট শব্দে মাথাধরা ও উত্তেজনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। (iii) শব্দ দূষণের ফলে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় ও মানসিক অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। (iv) শব্দ-দূষণের ফলে স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার বৃদ্ধি ও চেষ্টীয় নার্ভের ক্রিয়ার হ্রাস ঘটে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংহতি নষ্ট হয় এবং হাঁটতে ও চলতে অসুবিধে দেখা দেয়।

6. **অন্যান্য প্রভাব**—মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় তন্ত্রের ক্ষতি ছাড়াও পরিবেশের বিভিন্ন রকম প্রাণীর উপরও এর প্রভাব পরে। কলকাতার আশেপাশের জলাশয়ে শীতকালে যেসব বিদেশি পাখি আশ্রয় নিত দূষণ সমস্যার জন্য আজকাল তাদের কম দেখা যায়। এছাড়া বোম, পটকা, আতসবাজি ও সুপারসনিকের বিকট শব্দে পুরোনো বাড়িতে ফাটল ধরে এবং অনেক সময় জানলা ও দরজার কাচ ভেঙে যায়।

▲ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Noise pollution) :

1. **প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ :** বিভিন্ন উপায়ে আমরা শব্দদূষণের উৎসস্থানই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, যেমন—(i) নানা প্রকার শিল্পে মেশিনের পুরোনো যন্ত্রাংশ বদলে বা প্রযুক্তি দিয়ে শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে শব্দের তীব্রতা কমানো সম্ভব। (ii) বিমান,

ট্রাক ও মোটর সাইকেল প্রভৃতির ইঞ্জিনকে **শব্দ অপরিবাহী** বা **শব্দ অভেদ্য** বস্তু দিয়ে আচ্ছাদিত করে শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা যায়। (iii) বিভিন্ন শিল্পে বা অন্য স্থানে যারা 40 ডেসিবেল বা তার বেশি শব্দের প্রভাব রয়েছে এমন পরিবেশে কাজ করেন তাঁদের **শব্দ প্রতিরোধক** ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। শব্দ প্রতিরোধক হিসাবে **ইয়ার প্লাগ** (Ear plugs) ও **ইয়ার মাফ** (Ear muff) পাওয়া যায়। ইয়ার প্লাগ কম কম্পনযুক্ত শব্দে এবং ইয়ার মাফ বেশি কম্পনযুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। এই শ্রবণ প্রতিরক্ষা কৌশলে শব্দের তীব্রতা কম অনুভব হয় এবং শরীরের ক্ষতি হয় না। (iv) বাড়িতে আমরা বিভিন্ন রকম যন্ত্র ব্যবহার করি, যেমন—ওয়াশিং মেশিন, গ্রাইন্ডার, ভ্যাকুম ক্লিনার প্রভৃতি। এদের ব্যবহারের সময় শব্দদূষণ ঘটতে পারে, তাই প্রযুক্তির মাধ্যমে কম শব্দ উৎপাদনকারী সরঞ্জাম তৈরি করে দূষণ কমাতে হবে। (v) রেল পরিবহনে উন্নত মানের কম শব্দ উৎপাদনকারী ইঞ্জিন তৈরি করা উচিত।

2. **আইনসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ** শব্দদূষণ কমানোর জন্য নিম্নলিখিত আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন—(i) ঘনবসতি অঞ্চলে শব্দ-উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ করা। (ii) ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকারের শব্দ নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা। (iii) যানবাহনের ইঞ্জিনের মান উন্নত করা এবং এগ্‌জস্ট পাইপে সাইলেন্সার ব্যবহার করা। (iv) যানবাহনের গতি হ্রাস করা। (v) স্কুল, কলেজ, আদালত, অফিস, হাসপাতাল অঞ্চলে শব্দ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা, অর্থাৎ গাড়ির হর্ন বাজানো বা লাউড স্পিকার চালানো বন্ধ করা। (vi) সামাজিক অনুষ্ঠানে ও পুজো-পার্বনে মাইক ব্যবহার ও বাজি নিষিদ্ধ করা। (vii) বিমান বন্দরের কাছে বসতি স্থাপন না করা। (viii) নতুন নগর তৈরির ব্যাপারে শব্দদূষণ আইন কঠোর করা। (ix) জনবহুল অঞ্চল থেকে অনেক দূরে **হাইওয়েগুলির** রুট প্রবর্তন করা।

3. **পরিশুদ্ধ পরিবেশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (i) শহর অঞ্চলের রাস্তার দু'পাশে গাছ পুঁতে শব্দ-দূষণ কমানো যায়। গাছপালা শব্দ শোষণ করে এবং শব্দকে বায়ুমন্ডলের উপরের দিকে পাঠায়। দেখা যায় নারকেল, নিম, অশোক, তেঁতুল, বট প্রভৃতি উদ্ভিদ শব্দ বেশি মাত্রায় শোষণ করে। (ii) শব্দদূষণ থেকে বাঁচার জন্য ঘরের প্রাচীর, মেঝে এবং ছাদ প্রভৃতি শব্দ-নিরোধক কাচ বা অন্য বস্তু দিয়ে শব্দ-নিরোধক করা সম্ভব।

4. **জনশিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (i) প্রতিটি নাগরিক যাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া। (ii) রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচারের মাধ্যমে শব্দ দূষণের কুফল সম্বন্ধে মানুষকে জানানো একান্ত প্রয়োজন।

▲ তেজস্ক্রিয় দূষণের কুপ্রভাবের ধারণা (Concept of Radioactive Pollution Hazards) ঃ

ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি ব্যাকারেল প্রথম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তেজস্ক্রিয়তা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলেও পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীর বাইরে অর্থাৎ সৌর জগৎ থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি ও ভূত্বকের ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মৌলের তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে ছিল। বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক বোমা, পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর নানা পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বাড়ছে। এর ফলে তেজস্ক্রিয় দূষণ ঘটছে। এর প্রভাবে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের চরম ক্ষতি হচ্ছে।

❖ (a) **তেজস্ক্রিয় দূষণের সংজ্ঞা (Definition of Radioactive Pollution) ঃ মানুষের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবাধ ব্যবহার ও উৎপাদনের ফলে পরিবেশে বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে তেজস্ক্রিয় দূষণ বলে।**

◘ (b) **তেজস্ক্রিয় দূষণের উৎস (Sources of Radioactive pollution) ঃ** প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্টি উভয় উৎসকে তেজস্ক্রিয় দূষণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। নীচে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উৎস ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের নাম উল্লেখ করা হল।

◘ (c) **তেজস্ক্রিয় দূষণের কুপ্রভাব (Radioactive Pollution Hazards) ঃ**

চিত্র 13.26 ঃ একটি বাঁদরের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের কুপ্রভাবের চিত্ররূপ।

পেশাগত ও পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় ও মানুষের দেহ কোশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ শোষিত হয়। পানীয় জল ও খাদ্যের মাধ্যমে সর্তকতার জন্য তেজস্ক্রিয় সংক্রামক পদার্থ মানুষের শরীরে সরাসরি প্রবেশ করে। মানুষের

স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। (i) তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণে কোশের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। একে মিউটেশান বলে। দেহ কোশের মিউটেশানের ফলে ত্বক, অস্থি, জরায়ু ইত্যাদি অঙ্গে ক্যানসার দেখা যায়। (ii) ফুসফুস ও যকৃতের আলসার (ক্ষত) সৃষ্টি হয়। (iii) অপূর্ণাঙ্গ ও অস্বাভাবিক শিশুর জন্ম হয়। (iv) পেশির দৌর্বল্য ও অক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। (v) দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটে। (vi) ত্বকের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন ঘটে (অ্যাট্রফি, ইরাইথিমা, রঞ্জক পরিবর্তন ইত্যাদি)। (vii) থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। (viii) বন্ধ্যাত্ব, গর্ভত্রুটি স্নায়বিক বৈকল্য ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি ঘটে।

◘ **(e) তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Radioactive pollution)** : বিভিন্ন উপায়ে তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন—1. **আইনসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ** : (i) পানীয় জল ও খাদ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনুমোদিত সীমার মধ্যে রাখা। (ii) সক্রিয় তেজস্ক্রিয় পদার্থসম্পন্ন বর্জ্য পরিবেশে নিক্ষেপের আগে প্রক্রিয়াকরণ করা বা নিক্ষেপের পূর্বে পৃথক করা। (iii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী শিল্পসংস্থা স্থাপনের আগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি নেওয়া। (iv) গবেষণাগার ও হাসপাতাল প্রভৃতিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। 2. **প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ** : (i) উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সঞ্চিত স্থানের মাটিতে তড়িৎ প্রবাহিত করে সক্রিয় তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কাচ বা সিরামিকের মতো পদার্থে রূপান্তরিত করা। এর ফলে কাচ বা সিরামিক পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মুক্ত হয়ে মাটি বা জলে সংক্রামিত হতে পারে না। (ii) আকরিকের মাইনিং ও আণবিক প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা। উঁচু চিমনি ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণ হ্রাস করা। (iii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করার সময় তেজস্ক্রিয়তা প্রতিহত করার বর্ম ব্যবহার করে সংক্রমণ রোধ করা যায়। (iv) তেজস্ক্রিয়তার উৎস থেকে কাজ করার দূরত্ব বৃদ্ধি করা। 3. **ব্যক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ** : (i) তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে যে ঘরে কাজ করা হয় সেই ঘর নিয়মিত পরিষ্কার ও বায়ু নিষ্কাশন প্রয়োজন। (ii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় মাস্ক (মুখোস), দেহাবরণ, বুট, টুপি, গ্লাভস ব্যবহার করা উচিত।

13.2.B. জীববিবর্ধন ও জীবসঞ্চয় (Biomagnification and Bioaccumulation)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর সব দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে। ফসলের পোকা-মাকড় দমন করার জন্য বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে পরিবর্তিত হয় না, আর হলেও এত ধীরে হয় যে এটা তাৎপর্যহীন। এই বিষাক্ত পদার্থগুলি পরিবেশ থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং প্রতি খাদ্যস্তরে ঘনত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।

▲ জীব বিবর্ধন (Biomagnification) :

❖ **সংজ্ঞা (Definition) : যে পদ্ধতিতে পরিবর্তনহীন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং প্রতিটি খাদ্যস্তরে এর ঘনত্বের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তাকে জীববিবর্ধন বলে।**

এসব জৈব যৌগগুলি খুব ধীরে বিশ্লেষিত হয় অথবা এগুলি প্রায় অবিশ্লেষ্য। শিল্প ও কৃষিকার্যে ব্যবহারের ফলে এই সব বস্তুগুলি পরিবেশে বর্জিত হয়। এসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রধান হল **পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB), পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেন্জে ডাইঅক্সিন (PCDD), ডিডিটি (DDT), অ্যালড্রিন, ডাইঅ্যালড্রিন, পাইরিন** প্রভৃতি। এরা জলে অদ্রবণীয় এবং এদের বাষ্প চাপ অত্যন্ত কম। তা ছাড়া ভারী ধাতু, যেমন— পারদ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি। বিষাক্ত যৌগগুলি জলে অদ্রবণীয়।
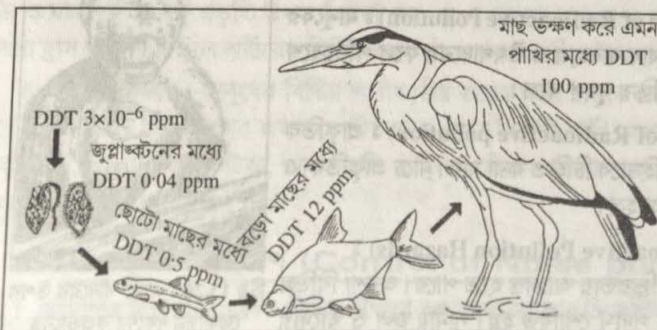
চিত্র 13.27 : জীববিবর্ধনের চিত্ররূপ।

এই দূষক পদার্থগুলি পরিবেশ থেকে জলের সঙ্গে উদ্ভিদ শোষণ করে। তারপর জুপ্লাঙ্কটন যারা

উদ্ভিদ ভক্ষণ করে তাদের দেহে যায়। তারপর জুপ্লাঙ্কটন থেকে ছোটো ছোটো বিভিন্ন প্রজাতির মাছে যায়। এর পর ছোটো মাছ থেকে বড়ো মাছে এবং পরে পাখিতে যায়। মানুষ যখন এসব বড়ো মাছ খায় তখন তাদের দেহে প্রবেশ করে। এসব পদার্থ প্রত্যেকটি প্রাণীর কলায় ও চর্বিতে আবদ্ধ হয় এবং ক্রমশ সঞ্চিত হতে থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রত্যেক খাদ্যস্তরে এর ঘনত্ব পরপর বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে জীবদেহের বিভিন্ন কলায় খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে বিষাক্ত পদার্থ ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় হওয়াকে **জীববিবর্ধন** বলে।

▲ জীবসঞ্চয় (Bioaccumulation) :

❖ **সংজ্ঞা : পরিবর্তনহীন বিষাক্ত পদার্থ ও ভারী ধাতু উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহকোশে সঞ্চিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে জীবসঞ্চয় বলে।**

জীবসঞ্চয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। উদ্ভিদের বায়োঅ্যাকুমুলেশনের ক্ষমতা অনেক বেশি। উদ্ভিদ বিষাক্ত পরিবর্তনহীন বিষাক্ত পদার্থ ও ভারী ধাতুকে কোশ প্রাচীরে, বল্কল, ফলত্বক ও পাতায় সঞ্চিত করে। অনেক সময় উদ্ভিদ বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি করে। এই প্রোটিনে বিষাক্ত পদার্থ ও ভারী ধাতুগুলি যুক্ত হয়। এদের **ফাইটোচিলেটিন** (Phytochelatin) বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ, যেমন—শৈবাল ও ছত্রাকের দেহেও এই ধাতুগুলি সঞ্চিত হয়। প্রাণীদেহে এই বস্তুগুলি প্রবেশ করার পর চর্বিতে আবদ্ধ হয় এবং ক্রমশ সঞ্চিত হতে থাকে। যেসব জীবে সঞ্চিত দূষক পদার্থগুলি থাকে, তাদের যদি অন্য প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তবে সেই খাদক প্রাণীর দেহেও দীর্ঘস্থায়ী দূষকগুলি সঞ্চিত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন প্রাণীদেহে বিষাক্ত ভারী ধাতুগুলি এক বিশেষ ধরনের মেটালোথিয়োনিনস (Metallothioneins) প্রোটিনের সাহায্যে সঞ্চিত হয়। মুর্তি (Murty, 1986) পরীক্ষা করে দেখেছেন দ্রবীভূত কীটনাশক মেরুদণ্ডী প্রাণীর চর্বিজাতীয় দেহ কলায় সঞ্চিত হয়। একেই **জীবসঞ্চয়** বলে। এই প্রক্রিয়াটি দূষক বস্তু গ্রহণের হার, দূষক পদার্থে উন্মুক্ত হওয়ার সময়ের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণার কাজ চলছে। তবে দেখা গেছে উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণীতে জীবসঞ্চয়ের হার অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

✪ 13.3. রক্তে অতিরিক্ত ধাতব যৌগ শোষণের ফলে তিনটি রোগ ✪ (Three diseases due to excess absorption of metallic compounds in blood)

সাধারণত একশোর বেশি পারমাণবিক ভর সম্পন্ন ধাতুগুলিকে ভারী ধাতু বলে। এরা তাপ-বিদ্যুৎ পরিবাহী, সাধারণ অবস্থায় কঠিন, নমনীয় ও প্রসারণশীল হয়। রসায়নগতভাবে যে সব ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব 4 বা 5- এর বেশি তাদের ভারী ধাতু বলে। উদাহরণ হিসাবে সিসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, পারদ ইত্যাদি হল ভারী ধাতু। এরা মানুষের দেহে পেশি সঞ্চিত হলে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা যায়। নীচে কয়েকটি ভারী ধাতু দেহে সঞ্চিত হওয়ার ফলে যে সব যোগ উপসর্গ দেখা যায় তা আলোচনা করা হল।

● 1. সিসা ঘটিত ডিসলেক্সিয়া রোগ (Dislexia due to Lead Poisoning) :

শরীরের পক্ষে সিসা একটি ক্ষতিকর ধাতু। মানুষের শরীরে সিসা দুটি পথে প্রবেশ করে। প্রথম হল জল ও খাদ্যের সঙ্গে সিসা প্রত্যেকদিন শরীরে ঢোকে তার পরিমাণ 0·2 মিলিগ্রাম থেকে 2 মিলিগ্রাম। তবে এর নব্বই শতাংশই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, দশ শতাংশ শোষিত হয়ে শরীরে মেশে। দ্বিতীয় যে পথে শরীরে প্রবেশ করে তা হল শ্বাস-প্রশ্বাস। বিভিন্ন ধরনের রং, গাড়ির ধোঁয়া ও বহু শিল্পজাত পদার্থ থেকে সিসা ঘটিত যৌগের সূক্ষ্ম কণা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। সিসা থেকে **ডাইলেক্সিয়া রোগ** দেখা যায়। এই রোগের উপসর্গগুলি হল—

(i) মস্তিষ্ক বা শিরদাঁড়ার কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের বিকাশকে সিসা বাধা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি দেখা যায়।

(ii) শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির কিছুটা ঘাটতি থাকে। এই রোগগ্রস্ত শিশুরা কথা বলতে, লিখতে, সহজে কোনো কিছু মনে রাখতে বা অঙ্ক করতে পারে না। শিশুদের বুদ্ধির যথাযথ বিকাশের অন্তরায় হিসাবে সিসার এই বিপজ্জনক ভূমিকা বহু দেশেই সরকার, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে ডাইলেক্সিয়া রোগগ্রস্ত শিশুদের বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও গবেষণার কাজ চলছে।

● 2. পারদ ঘটিত মিনামাটা রোগ (Minamata disease due to Mercury Poisoning) :

যেসব ধাতু জলের দূষণ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পারদ সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত। 1955 সালে জাপানের মিনামাটা উপসাগরের

কূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা পারদ সংক্রামিত মাছ খেয়ে **মিনামাটা ব্যাধিতে** আক্রান্ত হন। এই ব্যাধিতে বহু মানুষ মারা যায় এবং কয়েক হাজার মানুষ চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। এছাড়া নব জাতকদের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি লক্ষ করা গিয়েছিল। এই রোগের প্রধান উপসর্গ ছিল—পেশির অক্রিয়তা, হাত, পা, ঠোঁট এবং জিবের অসাড়তা, দৃষ্টিভ্রম, বধিরত্ব, স্মৃতিবৈকল্য ও উত্তেজিতা।

মিনামাটা রোগের কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় জাপানের ওই অঞ্চলে **চিসো কেমিক্যাল** নামে একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরি প্লাস্টিক পেন্ট তৈরি করত। এই ফ্যাক্টরির সমুদ্রের নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে পারদযুক্ত যৌগ ছিল। এই পারদযুক্ত যৌগ সাগরের জলকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে উৎপাদক শৈবাল থেকে আণুবীক্ষণিক প্রাণীদেহে, সেখান থেকে মাছ এবং মাছ থেকে মানুষের দেহে ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়। পরে আইনের সাহায্যে এই প্রকার দূষণ বন্ধ করা হয়।

3. ক্যাডমিয়ামজনিত ইটাই-ইটাই রোগ (Itai-Itai Disease due to Cadmium Poisoning) ঃ

1968 খ্রিস্টাব্দে জাপানের জিন্টুস নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসকারী গরিব স্ত্রীলোকের অর্থাৎ যাদের সন্তান সংখ্যা বেশি এবং খাদ্যমান অতি নিম্ন মানের তাদের মধ্যে ক্যাডমিয়াম দূষণজনিত এক বিশেষ সংক্রামক রোগ দেখা যায়। এই রোগকে **ইটাই-ইটাই রোগ** বলে। শতাধিক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জিন্টুস উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ধান। জিন্টুস নদীর জল ধান চাষে ব্যবহার করা হত। এই নদীর পার্শ্ববর্তী জিঙ্ক খনি এবং জিঙ্ক নিষ্কাশন কারখানা থেকে নিঃসৃত ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণে জিন্টুস নদীর জল দূষিত হয়। তাই ক্যাডমিয়াম দূষিত সেচের জলে উৎপন্ন ধানে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ ঘটে। জিন্টুস উপত্যকার অধিবাসীদের অজান্তে চালের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম দেহের রক্তকে দূষিত করে। তাদের দেহে সংগৃহীত ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ ছিল প্রায় 600 মাইক্রোগ্রাম। এর ফলে ইটাই-ইটাই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের প্রধান উপসর্গ হল—(i) অস্থিক্ষয় এবং ভঙ্গুরতা, (ii) সন্ধিতে যন্ত্রণা, (iii) রেচন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন, (iv) অনিয়মিত শ্বসন, (v) উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করে এই কারখানার বর্জ্য জল নদীতে ফেলা বন্ধ করা হয়েছিল।

13.3.A. জৈবতন্ত্রের উপর গ্রিন হাউস প্রভাব (Green House Effect on Biological system)

❖ (a) **গ্রিন হাউস প্রভাবের সংজ্ঞা (Definition of Green house effect) ঃ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রিন হাউস প্রভাব বলে।**

◘ (b) **গ্রিন হাউস প্রভাব (Effect of Green House)** ঃ পৃথিবীর পক্ষে যেসব জটিল পরিবেশ সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে একটি হল **গ্রিন হাউস এফেক্ট**। এই সমস্যাটি বোঝবার জন্য নামটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। গ্রিন হাউস কথাটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলে চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়। কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যালোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাপ সৃষ্টি করে। এই ঘরের তাপ কাচের স্বচ্ছ আবরণের প্রাচীর ভেদ করে খুব একটা বেরিয়ে আসতে পারে না। এর ফলে কাচের ঘরে যে পরিমাণ তাপ প্রবেশ করে তার চেয়ে কম পরিমাণ তাপ বাইরে আসে। এই ধরনের কাচের ঘরকে **গ্রিন হাউস** বলে। শীতপ্রধান অঞ্চলে চারাগাছ বেড়ে ওঠার জন্য গ্রিন হাউস ব্যবহার করা হয়।
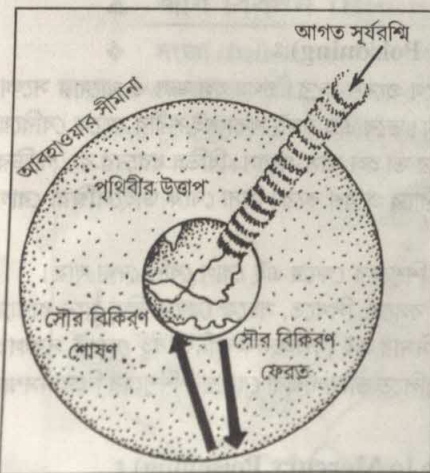
চিত্র 13.28 ঃ গ্রিন হাউসের প্রভাবের চিত্ররূপ।

বর্তমানে পৃথিবী একটি গ্রিন হাউসে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কাচের ঘরের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করছেন। পৃথিবীতে সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো ও তাপ আসে তার 51 শতাংশ ভূমি শোষণ করে এবং বাকি অংশ নানা পদ্ধতিতে প্রতিফলিত ও বিক্ষেপিত হয়। এর ফলে পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ ধরে রাখতে পারছিল। বায়ুমণ্ডলে বিশেষ কতকগুলি গ্যাস, যেমন—কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি বর্তমানে বেশি বেড়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর গ্রিন হাউসের মতো কাজ করছে। সৌর বিকিরণ যতটা ফেরত যাচ্ছিল ততটা আর

যেতে পারছে না, এর ফলে পৃথিবীতে বেশি উত্তাপ আটকা পড়ছে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। এই ঘটনাকে গ্রিন **হাউস এফেক্ট** বা প্রভাব বলে।

◘ (c) **বিভিন্ন প্রকার গ্রিন হাউস গ্যাস (Different types of Green House Gases)** ঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ও নিম্ন স্তরের ওজোন হল গ্রিন হাউস গ্যাস। এই গ্যাস নানা কারণে বেড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে। এটা শুধুমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা না বলে সারা পৃথিবীর সমস্যা বলা যায়।

1. **কার্বন ডাইঅক্সাইড** (Carbon di-oxide)— বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। কিন্তু বর্তমানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সভ্যতা বিকাশের পর থেকে বিশেষ করে বিগত 100 বছরে জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানির (খনিজ তেল, কয়লা প্রভৃতি) ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে শিল্প কারখানা, মোটরগাড়ি প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে গিয়ে মিশছে।
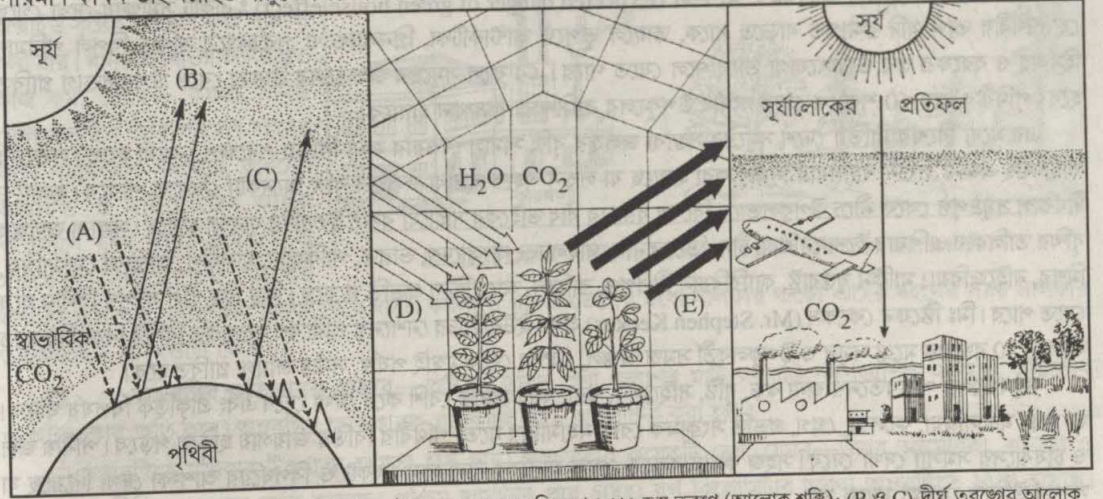
চিত্র 13.29 ঃ গ্রিন হাউসের প্রভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার চিত্ররূপ ঃ (A)-হ্রস্ব তরঙ্গ (আলোক শক্তি); (B ও C)-দীর্ঘ তরঙ্গের আলোক শক্তি; (D)-হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মির প্রবেশ; (E)-ইনফ্রারেড আলোক রশ্মির নির্গমন।

উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অরণ্য ধ্বংসের জন্যও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। যদি আবহাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপ প্রায় 3·6° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে।

2. **মিথেন** (Methane)— জলাভূমি ও কৃষিক্ষেত্রে গাছপালা প্রভৃতি পচনের ফলে, বিভিন্ন জৈব বর্জ্যে, কিছু জীবজন্তুর সাহায্যে এবং তেল খনিতে মিথেনের সৃষ্টি হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় এর তাপ ধারণ ক্ষমতা 21 গুণ বেশি। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে মিথেনের পরিমাণ অনেকটা বেড়েছে। এই বিশ্বে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে, বিশেষত মলমূত্র ইত্যাদি জৈব বর্জ্য, কয়লা ও তেলখনি, জলমগ্ন ধানখেত, পশুপালন প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত মিথেনের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে মিথেনের একটা বড়ো রকম প্রভাব আছে।

চিত্র 13.30 ঃ বিভিন্নপ্রকার গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ।

3. **নাইট্রাস অক্সাইড** (Nitrous oxide)— মাটি, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়া ও গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার ইত্যাদি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড সৃষ্টি হয়। এছাড়া কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এর সৃষ্টি হয়। তাই বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

4. **ক্লোরোফ্লুরো কার্বন** (Clorofluro carbon)— ক্লোরিন ও ফ্লোরিন মিলে এক বিশেষ ধরনের গ্যাসের নাম ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, যার সংক্ষিপ্ত নাম হল **সি. এফ. সি.**। প্রকৃতিতে এ গ্যাস পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শিল্পে, যেমন রেফ্রিজারেটার ও শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র তৈরির জন্য; প্লাস্টিক, ফোম ফাঁপিয়ে তোলার জন্য ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ব্যবহার করা হয়। ক্রমশ এর ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। সি. এফ. সি.-কে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন সি. এফ. সি-11 ও সি. এফ. সি.- 12। এই গ্যাসগুলি বায়ু স্তরের 10-50 কিলোমিটার উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে অনেক দিন থেকে যায়। তাপ ধারণের ক্ষেত্রে এই গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে 7,000 গুণ থেকে 14,000 গুণ শক্তিশালী।

5. **নিম্নস্তরের ওজোন** (Low layer of Ozone)— নিম্নস্তরের ওজোন ভূপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধির জন্য অনেকটা দায়ী, কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় এর তাপধারণ ক্ষমতা প্রায় 2,000 গুণ বেশি।

■ (d) **গ্রিন হাউস এফেক্টের আশঙ্কা** (Expected danger of green house effect) ঃ একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পৃথিবীর তাপ যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাহলে ভূপৃষ্ঠে আন্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড ও পর্বতগাত্রে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ হিমবাহ ও বরফের স্তর উল্লেখযোগ্য ভাবে গলে যেতে পারে। এর ফলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বেড়ে উপকূলভাগ প্লাবিত হবে। পৃথিবীর প্রায় 60 শতাংশ লোক অর্থাৎ উপকূলের বাসিন্দারা বাসস্থান হারাবে।

এর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমুদ্রের সম্ভাব্য জলস্তর বৃদ্ধি সামাল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। লন্ডনের কাছাকাছি এজন্য লন্ডন ব্যারিয়ার নির্মাণ করা হয়েছে যা লন্ডন শহরে সম্ভাব্য জলস্তর বৃদ্ধি অনেকটা ঠেকাতে পারবে। হল্যান্ডে দীর্ঘকাল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নীচে উপকূলভাগে বিশেষ ধরনের বাঁধ ডাইকের সাহায্যে বসত ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভাব্য জলস্তর বৃদ্ধির তালিকায় এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ; আফ্রিকা মোজাম্বিক, মিশর, নাইজেরিয়া; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি রয়েছে। কিছু কিছু দ্বীপ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারে। মিঃ স্টিফেন কেকেস (Mr. Stephen Keekes) প্রমুখ ইউনাইডের নেশনের পরিবেশ সম্পর্কিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মতে আগামী 30 বছরের মধ্যে সমুদ্র ও উপকূলবর্তী সমস্ত অঞ্চল, বোস্টন থেকে মুম্বাই পর্যন্ত, সমস্ত জায়গা প্লাবিত হবে।

বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের জন্য ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন, খরা, বন্যা প্রভৃতি বেশি করে দেখা দেবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, প্রভৃতি সংক্রামক রোগ মহামারির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। পানীয় জল ও চাষবাসের সমস্যা দেখা দেবে। সহজ কথায় বলতে গেলে মানুষের নানারকম সংকট ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

■ (e) **গ্রিন হাউস প্রভাব কমানোর উপায়** (Procedure to minimise the Green house gas) ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদেরা গ্রিন হাউস প্রভাব কমানোর কয়েকটি উপায় নির্ধারণ করেছেন, যেমন— (i) ডিজেল, পেট্রোলিয়াম, কয়লা প্রভৃতির ব্যবহার কমানো। (ii) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি প্রভৃতি) বাড়ানো। (iii) ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের ব্যবহার সীমিত করা। (iv) অরণ্য রক্ষা করা। (v) নতুন নতুন বনসৃজন করা। (vi) স্থিতিশীল উন্নয়নের 'এজেন্ডা 21' মেনে চলা। (vii) ডিজেল ও পেট্রোল চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার কমানো। (viii) জনসাধারণকে গ্রিন হাউস প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক করা।

✪ 13.3.B. অম্ল বৃষ্টি (Acid Rain) ✪

❖ (a) **অম্ল বৃষ্টির সংজ্ঞা (Definition of Acid Rain) ঃ বায়ুমণ্ডলে শিশির, তুষার ও জলের সঙ্গে মিশে বাতাসে ভাসমান সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলের সঙ্গে পৃথিবীতে নেমে আসার ঘটনাকে অম্ল বৃষ্টি বলে।**

■ (b) **অম্ল বৃষ্টির কারণ (Causes of Acid rain)** ঃ বৃষ্টির জল সামান্য অম্লধর্মী হয়। এর প্রধান কারণ হল বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে বৃষ্টির জলকে মৃদু অম্লধর্মী করে। বৃষ্টির জল সামান্য অম্লধর্মী হলেও একে অম্ল বৃষ্টি বলে না।

অম্ল বৃষ্টি মানে অ্যাসিড বৃষ্টির জলে থাকা। এটা বায়ুদূষণের জন্য ঘটে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও ভাসমান ধূলিকণাগুলি জলের সঙ্গে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে **সালফার ডাইঅক্সাইড** এবং **সালফিউরিক অ্যাসিড** (H_2SO_4) তৈরি করে। আবার বিভিন্ন নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত অক্সাইড আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে **নাইট্রিক অ্যাসিড** (NHO_3) এবং **সালফিউরিক অ্যাসিড** তৈরি করে। নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডে বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকা হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড (প্রধানত মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ফলেও কিছুটা প্রাকৃতিকভাবে নির্গত)-এর সঙ্গে মিশে বৃষ্টির সময় অ্যাসিড বৃষ্টি বা অম্ল বৃষ্টি ঘটায়। সোজা কথায় বলতে হয় বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটা হল অম্ল বৃষ্টি।

কয়েকটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে আম্লিক গ্যাস মেশে। এর মধ্যে প্রধান হল অগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত ধোঁয়া বা বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অক্সাইডে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া। তবে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টের পরিমাণ খুবই সামান্য বলা যায়। মানুষের বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত কাজ কর্ম, যেমন— কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণ দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার, কার্বনের অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে সালফার, নাইট্রোজেন মৌলের অক্সাইডগুলি অম্ল বৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কয়লা ও খনিজ তেলের মধ্যে সালফার থাকে। এদের দহনের সময় সালফার ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মেশে।

চিত্র **13.31** ঃ সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডের জন্য অম্লবৃষ্টি।

◘ (c) **অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব**— অম্ল বৃষ্টি উদ্ভিদ, প্রাণী, জলাশয়, মাটি, ঘরবাড়ি, স্থাপত্যশিল্প, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতি করে। অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি নীচে আলোচনা করা হল ঃ

(i) অম্লবৃষ্টিতে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ, যেমন—উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বিভিন্ন অরণ্যের ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির প্রায় 5000 বর্গ কিলোমিটার অরণ্য অম্লবৃষ্টিতে ধ্বংস হয়েছে। জাপানে অম্লবৃষ্টির জন্য বিশাল অরণ্য নষ্ট হয়ে উষর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার সবজি, মটর, বিন, আলু, গাজর প্রভৃতির ফলনও কমে যায়। তা ছাড়া পাইন, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(ii) অম্লবৃষ্টির জন্য পুকুর, নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে অম্লভাগ বেড়ে যায়। এর ফলে মাছের ডিম সম্পূর্ণ নষ্ট হয় বলে মাছের উৎপাদন কমে যায়। ম্যাঙ্গানিজ ও অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি অম্লজলে দ্রবীভূত হয়ে জলজ প্রাণীর চরম ক্ষতি ঘটায় এবং মরে যায়।

(iii) পৃথিবীর অনেক দেশে (নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি) অম্লবৃষ্টির জন্য পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ভরতপুর পক্ষিরালয়ের হ্রদের জলে সালফার ডাইঅক্সাইডের জন্য অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ায় যাযাবর পাখির সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে।

(iv) মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপর অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায়। অম্ল বৃষ্টিতে দুটি প্রধান অ্যাসিড থাকে, যেমন— সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড। এরা ফুসফুস ও শ্বাসকার্যের ক্ষতি করে। অনেক সময় মানুষ ক্যানসার রোগের স্বীকার হয়। তা ছাড়া পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি ঘটায়।

(v) অম্লবৃষ্টি স্থাপত্যশিল্প, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষয় ঘটায়। আমাদের ভারতের আগ্রার তাজমহলের ও দিল্লির লালকেল্লার পাথর ক্ষয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় মার্বেলের তৈরি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

(vi) অম্লধর্মী মৃত্তিকার বিভিন্ন ধাতু (তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি) মাটির গভীরে প্রবেশ করে জলকে দূষিত করে। দেখা যায় যেসব অঞ্চলে অম্লবৃষ্টি হয় সেখানে জলে ভারী ধাতুর পরিমাণ বেড়ে যায়।

(vii) ভারতবর্ষে যেসব জায়গায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে তার চার পাশে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে বলে ওই অঞ্চলগুলিতে অম্লবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

13.3.C. ওজোন গহ্বর (Ozone hole)

(a) ওজোন স্তর কী ? (What is Ozone layer ?) ঃ ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার ওপর থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলটিকে **স্ট্রাটোস্ফিয়ার** বলে। এখানেই ওজোন গ্যাসের আস্তরণ একটি ফাঁপা গোলকের মতো পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবজগতের উপর এই স্তরের একটা বিশেষ প্রভাবমূলক ভূমিকা আছে।
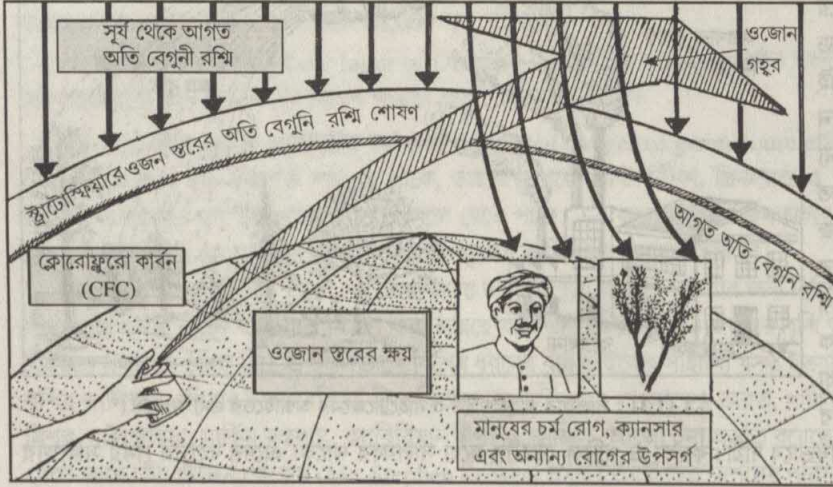
চিত্র 13.32 ঃ ওজোন গহ্বরের সৃষ্টির চিত্ররূপ।

এই স্তরে ওজোনের ঘনত্ব সাধারণ অক্সিজেনের প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। এই উচ্চতার উপরে ও নীচে ওজোন অবশ্য বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন সমৃদ্ধ এই অঞ্চল **ওজোন স্তর** হিসাবে গণ্য। ওজোনের ভৌত ধর্ম অক্সিজেন থেকে আলাদা বলে ওজোন স্তর সূর্যরশ্মির **অতিবেগুনি রশ্মির** অনেকটা শোষণ করে জীবকুলকে রক্ষা করে। এই ঘটনা অব্যাহত থাকলে ওজোন স্তরের ঘাটতি বা ক্ষয়ের কোনো প্রশ্ন থাকত না। অর্থাৎ জীবজগতের কাছে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির মারাত্মক কিছু অংশ পৃথিবীতে আসতে পারত না। এই কারণে এতদিন ধরে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ অনেকটা নিরাপদে বিকশিত হয়েছে।

(b) ওজোন আবরণের ক্ষয় বা গহ্বর (Ozone hole) ঃ 1982 সালে অক্টোবরের দিকে আন্টার্কটিকা অঞ্চলে সমীক্ষারত একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লক্ষ করেন উর্ধ্বাকাশে একটা বড়ো অংশ জুড়ে ওজোনের পরিমাণ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। এই অভূতপূর্ব বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরবর্তী বছরগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তারা দেখতে পান এই ওজোনের ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে গহ্বরের মতো হয়েছে। একেই বলা হয় **ওজোন গহ্বর বা ওজোন হোল**। 1987 সালে দেখা গেল সেখানে ওজোন ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। এই গহ্বরটি এত বড়ো যে গোটা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এবং গভীরতা হিমালয়ের এভারেস্টের চূড়ার মতো।

(c) ওজোন গহ্বর সৃষ্টির কারণ (Causes leading to creation of Ozone hole) ঃ

ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হবার কারণগুলি হল—

1. বিভিন্ন প্রকার গবেষণা থেকে দেখা গেছে নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO ও NO_2) যখন ওজোনের (O_3) সংস্পর্শে আসে, ওজোন ভেঙে অক্সিজেন তৈরি হয়। তা ছাড়া খুব দ্রুতগামী এরোপ্লেন (Supersonic) যখন স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, তখন প্রচুর পরিমাণে NO এবং NO_2 নির্গত হয়, যা ওজোন স্তরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

2. বিজ্ঞানীরা মনে করেন ক্লোরোফ্লুরো কার্বন অর্থাৎ ফ্রিয়োন জাতীয় কিছু রাসায়নিক পদার্থ ওজোন গহ্বরের প্রধান কারণ। এই গ্যাস মানুষের সৃষ্ট, প্রকৃতিতে যার কোনো উৎস নেই। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন জাতীয় গ্যাসগুলি চল্লিশের দশক থেকে ক্রমশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে থাকে। CFC-11 (Trichloro-fluro methane), CFC-12 (Dichloro trifluoro-methane) ফ্রিজ প্রভৃতি নিঃসরণ যন্ত্রে, বাতানুকুল যন্ত্রে, বিচ্ছুরক হিসাবে ও খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহার হয়। CFC-113 (Trichloro-trifluoro-ethane) দ্রাবক হিসাবে ইলেকট্রনিক ও কমপিউটার শিল্পে ব্যবহার হয়। Halon 1301 (Bromo-trifluoro-ethane) অগ্নি নির্বাপণে ক্রমশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জাতীয় রাসায়নিক ও গ্যাস অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। ক্লোরোফ্লুরো কার্বন জাতীয় গ্যাসগুলি প্রচুর ওজোন অণু বিনাশ করে।

3. দেখা গেছে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড যা প্রধানত শুষ্ক ধোলাই ও পরিষ্কার করার তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাও ওজোন বিনাশী। ইথাইল ক্লোরোফর্ম, যার দ্রাবক পরিষ্কার করার তরল হিসাবে ব্যবহার হয় তাও ওজোন বিনাশী।

অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য CFCS-র কার্বন জাতীয় রাসায়নিকগুলি বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলে CFC-11-এর আয়ুষ্কাল প্রায় 65 বছর, CFC-12-এর আয়ুষ্কাল প্রায় 130 বছর, CFC-13-এর আয়ুষ্কাল প্রায় 400 বছর, CFC-113-এর আয়ুষ্কাল প্রায় 90 বছর, কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের আয়ুষ্কাল প্রায় 25-5 বছর। এদের ব্যবহার ক্রমশ বন্ধ হয়ে এলেও ইতিমধ্যে যা ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রভাবে থেকে যাবে দীর্ঘদীন।

• দক্ষিণমেরুর ওজোন আবরণে গহ্বর, কিন্তু উত্তর মেরুতে নয় কেন? •

এর প্রথম এবং প্রাথমিক উত্তর হচ্ছে দক্ষিণমেরুতে তাপমাত্রা উত্তর মেরুর থেকে কম। শীতের সময় প্রায় – 40° ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। এ সম্বধে আগের অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে। এত নিম্ন তাপমাত্রা বরফকণা তৈরিতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ ওজোন আবরণে গহ্বরের সৃষ্টি করে। যতদূর জানা গিয়েছে উত্তরমেরুতেও এই অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর মেরুতে এর মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি অনুভব করা গেছে, যা ওজোন স্তর ধ্বংস করে ওজোন স্তরে গহ্বর গঠন করতে সমর্থ।

■ (d) **জীবের উপর ক্ষয়প্রাপ্ত ওজোন স্তরের প্রভাব :**

এর আগেই বলা হয়েছে, যদি স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের ক্ষয় হয়, তবে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে কোনো আবরণে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে, সোজাসুজি পৃথিবীতে আসবে।

মানুষের পক্ষে এই রশ্মি খুবই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। এর ফলে ত্বকে ক্যানসার (Skin cancer) এবং চোখে ছানি (Cataract) প্রভৃতি হতে পারে। এই রশ্মির প্রভাবে অন্যান্য পশুপাখিদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা (Immunity power) কমে এবং বিভিন্ন প্রকার ভয়ংকর অসুখের সম্মুখীন হয়।

এই রশ্মির প্রভাবে বংশগত অবক্ষয়ও অনেকাংশে দেখা গিয়েছে। এতে সামগ্রিকভাবে অনেক সময় ভারসাম্য বিনষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। সবুজ শ্যাওলা, মাছ এবং অন্যান্য জীবকুলেও এই রশ্মির প্রভাবে পরিবর্তন উপলব্ধি করা গেছে। শাকসবজি, তরিতরকারি এবং অন্যান্য বহু বস্তুতেও এর প্রভাব দেখা গিয়েছে।

বিশ্বসংস্থার পরিবেশ সমীক্ষার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যদি আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে সমস্ত জীবজন্তু বিলুপ্ত হবে।

■ (e) **ওজোন স্তর রক্ষার উপায় :** ওজোন স্তর রক্ষার উপায় হল— 1. আন্তর্জাতিক স্তরে হ্যালোন গ্যাস CFC-র উৎপাদন কমানো। 2. CFC-র জায়গায় অন্য কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। 3. কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইল ক্লোরোফর্ম এর উৎপাদন বন্ধ করা।

ওজোন স্তরে বিপর্যয় বুঝতে অবশেষে 1987 সালের সেপ্টেম্বরে কানাডার মন্ট্রিলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মন্ট্রিল প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে। এতে ওজোন স্তরে ওজোন বিনাশকারী সমস্ত রাসায়নিকের ব্যবহার সারা বিশ্বে ক্রমশ নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে হাইড্রোক্লোরোফ্লুরো কার্বন (HCFC), যার ওজোনবিনাশী ক্ষমতা খুব কম, তা সম্পূর্ণ বন্ধ করার সীমা 2030 সাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে।

✪ 13.3.D. জৈব অক্সিজেন চাহিদা বা বি. ও. ডি. ✪ (Biological Oxygen Demand or B. O. D.)

❖ **জৈব অক্সিজেন চাহিদার সংজ্ঞা (Definition of Biological Oxygen Demand) : যে প্রক্রিয়ায় কোনো জলাশয়কে (পুকুর, নদী, হ্রদ ইত্যাদি) জলজ জীবাণুরা উপস্থিত জৈব খাদ্য উপাদানকে বিয়োজিত করে এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রার হ্রাস ঘটায় তাকে জৈব অক্সিজেন চাহিদা বা সংক্ষেপে বি. ও. ডি. (B. O. D.) বলে।**

পরিপোষক জৈব খাদ্যগুলি সাধারণত শর্করা, প্রোটিন, অ্যালডিহাইড, এস্টার প্রভৃতি। এছাড়া গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেও জৈব খাদ্যগুলি জলাশয়ে জমা হয়। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জৈব অক্সিজেন চাহিদা বেশি হলে মনে করা হয় ওই জলাশয়ে জৈব উপাদান বেশি অর্থাৎ দূষণের পরিমাণ বেশি। বিভিন্ন শিল্পের বা পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য জল ও পৌর বাহিত জল যখন কোনো নদী বা অন্য জলাশয়ে ফেলা হয় জলের দূষণ বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেনগ্রাহী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুরা জলের দূষিত পদার্থকে বিয়োজিত করে, ফলে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জলে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রেট ও ফসফেট যৌগের পরিমাণ বেশি হলে

জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি বেশি মাত্রায় ঘটে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের বৃহদংশ জীবাণুরা ব্যবহার করে। এর ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

জলাশয় কতটা দূষিত হয়েছে দেখার জন্য জৈব অক্সিজেনের চাহিদা মাপা হয়। জৈব অক্সিজেন চাহিদা দেখে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ওই মান অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। আজও আমাদের দেশের অনেক জায়গায় বর্জ্য জল বিভিন্ন জলাশয়ে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

সাধারণত জলে 4-5 ppm অক্সিজেন থাকলে মাছ ও অন্যান্য প্রাণী জলে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে। জলে অক্সিজেনের মাত্রা আরও কম হলে অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে । কোনো নির্দিষ্ট জলাশয়ের জলের নমুনা পাঁচদিন 20°C তাপমাত্রায় রেখে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যতটা কমে তা দিয়ে জৈব অক্সিজেন চাহিদার পরিমাপ করা হয়। জৈব রাসায়নিক চাহিদা লিটার প্রতি মিলিগ্রাম এককে প্রকাশ করা হয়।

13.3.E. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand — C. O. D.)

❖ **রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদার সংজ্ঞা (Definition of Chemical Oxygen Demand) : জৈব ক্ষয় হয় না এরকম রাসায়নিক পদার্থকে জারিত করতে যত পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে, প্রতি লিটার জলে 33 মিলিগ্রাম অক্সিজেনকে ওই জলের রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা COD বলা হয়।**

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশকযুক্ত বর্জ্য জল এবং শিল্প অঞ্চলের বর্জিত জল তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই বর্জ্য জল খুব ধীরে অথবা বিশেষ জীবাণুর সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়। অনেকগুলি এইরূপ জৈব যৌগ আছে যারা বহু বছর অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এইগুলি জীবের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ক্লোরিনযুক্ত যৌগ, ফেনল, কিছু সাবান জাতীয় পদার্থ, কীটনাশক প্রভৃতি হল এদের উদাহরণ। সহজে বিনষ্ট হয় না এরকম পদার্থের সার্বিক পরিমাপকে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand) বা সংক্ষেপে COD বলে।

13.3.F. তাপদূষণ (Thermal Pollution)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে ও জীবকুলের ক্ষতি হয়। জীবজগতের উপর তাপদূষণের বিরাট প্রভাব আছে। বায়ুমণ্ডলের ও জলের উভয়ের তাপদূষণ ঘটে।

চিত্র 13.33 : কলকারখানার পরিত্যক্ত উত্তপ্ত জলের সাহায্যে তাপদূষণ।

❖ **(a) তাপদূষণের সংজ্ঞা (Definition of Thermal Pollution) : মানুষের তৈরি বিভিন্ন শিল্প ও তাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে উষ্ণ বায়ু ও জল যা পরিবেশের তাপের পরিবর্তন ঘটায় তাকে তাপীয় দূষণ বলে।**

◘ **(b) তাপদূষণের কারণ (Causes of Thermal pollution) :**

1. শিল্পাঞ্চলে কারখানার চিমনি নিঃসৃত ধোঁয়া ও মেশিনের ঘর্ষণজনিত তাপ বায়ুমণ্ডলের তাপদূষণ ঘটায়।

2. গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অফিস, আদালত, গবেষণাগার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ঘরের বাইরে তাপীয় দূষণ সৃষ্টি হয়।

3. কুলার নিঃসৃত উষ্ণ জলীয় বাষ্প তাপদূষণ ঘটায়।

4. শিল্প প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত বস্তুকে ঠান্ডা করার জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন। বর্জ্য উষ্ণ জল নদ-নদী বা হ্রদে নিক্ষেপের ফলে তাপদূষণ ঘটে। জলের তাপীয়

দূষণের প্রধান উৎস হল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এছাড়া ইস্পাত মিল, তেল-শোধনাগার, পেপার মিল ইত্যাদিও জলের তাপদূষণ ঘটায়।

(c) তাপদূষণের প্রভাব (Effects of Thermal pollution) ঃ

1. বায়ুমন্ডলের তাপীয় দূষণে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিপুল ক্ষতি হয়।

2. জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা যায়।

3. জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। কারণ উষ্ণতার জন্য অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনও কমে যায়। জলজ জীব অক্সিজেনের অভাবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

4. জলের উষ্ণতা বাড়ার ফলে জীবের বিপাকীয় সক্রিয়তা বাড়ে। এই বিপাকীয় সক্রিয়তা বাড়ার কারণে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ে। অতিরিক্ত অক্সিজেন চাহিদার জন্য জলে দ্রবীভূত কম অক্সিজেন দেহের O_2-এর চাহিদা মেটাতে পারেনা। এর ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

(d) তাপদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of thermal pollution) ঃ

1. আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের তাপীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

2. শিল্প সংস্থার উত্তপ্ত জল নদীতে নিক্ষেপের আগে ঠান্ডা করার জন্য কৃত্রিম জলাশয়ে সঞ্চয় করে নেওয়া উচিত।

13.3.G. গ্রিন বেঞ্চ (Green Bench)

(a) গ্রিন বেঞ্চের সংজ্ঞা (Definition of green bench) ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 1986 সালে কলকাতা হাইকোর্টে পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য যে নতুন বেঞ্চ গঠন করেন তা গ্রিন বেঞ্চ নামে পরিচিত।

গ্রিন (Green) মানে সবুজ। সবুজায়ন নিয়ে আজ সমগ্র পৃথিবীতে তোলপাড় হচ্ছে। সবাই আজ সবুজ বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত। দিন দিন যে হারে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা বিশেষ ভাবে চিন্তিত। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের গ্রিন বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1996 সালের জুন মাস থেকে। সপ্তাহে অন্তত একদিন এই বেঞ্চ বসে। প্রতি বছরেই বেশ কিছু মামলার নিষ্পত্তি হয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সমস্যার উপর গ্রিন বেঞ্চ কাজ করে, যেমন— (i) যেসব শিল্পে বা কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই, যারা দূষণ বিধি লঙ্ঘন করে। (ii) জলাশয় ও পুকুর বে-আইনিভাবে ভরাট করে। (iii) গাছপালা নির্বিচারে ধ্বংস করে। (iv) যানবাহন থেকে দূষিতবায়ু নির্গত হয়। (v) স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যে সব বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত হয়। (vi) জঞ্জাল ও জঞ্জালের কেন্দ্রবিন্দু যদি পরিষ্কৃত না হয়। (vii) শব-সংরক্ষণ বা শব-ব্যবচ্ছেদ কেন্দ্র থেকে যেসব দূষণ বের হয়। (viii) হ্রদ, জলাশয় ও পার্কের পুনর্গঠন করা এবং পরিবেশ অনুযায়ী তাদের বন্দোবস্ত করা।

দেশকে সবুজায়ন করতে হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। পরিবেশের উপর কোনোরূপ অবিচার দেখলেই গ্রিন বেঞ্চ-এ আবেদন করার পথ প্রদর্শক এরাই। এখন যে-কোনো নাগরিক পরিবেশ নিয়ে গ্রিন বেঞ্চে আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজন হলে সওয়াল করতেও পারেন। গ্রিন বেঞ্চএখন খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বহু প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিও এখন এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে।

13.3.H. দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড ও তার ভূমিকা (Pollution Control Board and its role)

পরিবেশ সুরক্ষার ও দূষণ প্রতিরোধের জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় স্তরে 1989 সালে **কেন্দ্রীয় দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড** (Central Pollution Board) এবং এর সহযোগী হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যস্তরে **রাজ্য দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড** (State Pollution Board) গঠন করে।

A. কেন্দ্রীয় দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড (Central Pollution Board) ঃ

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রধান কাজগুলি হল— (i) বিভিন্ন জলাশয় ও সরবরাহ নল ও নলকূপগুলিকে দূষণ মুক্ত রাখা। (ii) জলদূষণ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। (iii) রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলির কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখা। (iv) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলির মধ্যে কোনো বিরোধ থাকলে তা মেটানো। (v) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলিকে

প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও গবেষণায় সাহায্য করা। (vi) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলিকে জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ বা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। বিভিন্ন সংস্থাকে এই বিষয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। (vii) দেশের বিভিন্ন স্থানের জলদূষণ সম্বন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান তৈরি করা। সেই তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের নিয়ম বিধি তৈরি করা, কলকারখানার নির্গত বর্জ্য বা পৌর আবর্জনার দূষণহীন অপসারণ ও জল শোধন করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং উপযুক্ত নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করা। (viii) পরিকল্পনার মাধ্যমে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ বা কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া। (ix) রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র বা অন্যান্য গণমাধ্যমের সাহায্যে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতন করা। (x) বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারযোগ্য জলের উৎকর্ষমান ঠিক করা। প্রয়োজন হলে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলির সঙ্গে আলোচনা করে পানীয় জল বা অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জলের নতুন উৎকর্ষ মান ঠিক করা।

◘ B. রাজ্য দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড (State Pollution Board) ঃ

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রধান কাজগুলি হল—

(i) নলকূপ ও বিভিন্ন জলাধারের জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা কমানো। (ii) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দেওয়া। (iii) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা। (vi) জলদূষণের কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়া। (v) বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (vi) নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। (vii) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ ও দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা। (viii) মৃত্তিকায় নিঃসৃত বর্জ্যপদার্থের অপসারণের নীতি প্রণয়ন করা। (ix) পয়ঃপ্রণালী ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের কাজে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি অপসারণের আগে শোধন করার মাত্রা নির্ধারণ করা। (x) কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ নীতি প্রণয়নে ভূমিকা গ্রহণ করা।

✪ 13.3.I. বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) ✪

ব্রাজিলের রিও-দ্য-জেনিরিও (Rio de Janeiro) শহরে 1992 সালের 3-14 জুন বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এক সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন **বসুন্ধরা সম্মেলন** নামে পরিচিত। সরকারি ভাবে এটি ছিল রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development বা UNCED)। এই সম্মেলনে 178টি রাষ্ট্র যোগদান করে। সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল 7000 জন। এছাড়াও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার (NGO) প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে 130টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানেরা বিশ্ব পরিবেশ সংকট এবং আগামী কুড়ি বছরে তা মোকাবিলা করার পন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া মূল সম্মেলন স্থান থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে সারা বিশ্ব থেকে আগত প্রায় 15000 বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা গ্লোবেল ফোরাম (বিশ্বচক্র) আলোচনা চক্রে মিলিত হন।

◘ সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ঃ

(i) পরিবেশের ক্ষতিসাধন কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। গ্রিন হাউস এফেক্টজনিত কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, অরণ্য ধ্বংস, জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে ধনী ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এই সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ii) ধনী দেশগুলি, বিশেষত, আমেরিকা তাদের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করায় এবং দরিদ্র দেশগুলির নাগরিকেরা প্রয়োজনে পরিবেশের ক্ষতি করেই জীবন-ধারণ করবে এই জাতীয় মনোভাব ফুটে ওঠায় এই সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

(iii) এই সম্মেলনে আগত দেশগুলি একটি ঘোষণাপত্র পেশ করে যা পরিবেশ ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে রিও ঘোষণা (Rio Declaration on Environment and Development) হিসাবে পরিচিত। 27টি নীতির কথা এই ঘোষণায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

(iv) এছাড়া এই সম্মেলনে সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট বা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে 21টি বিষয় আছে বলে এই কর্মসূচিকে এজেন্ডা 21 বলা হয়।

● 21 দফা কর্মসূচি

1. বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা। 2. অরণ্য বিলোপ বন্ধ করা। 3. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। 4. স্বাস্থ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থা। 5. জনবসতির উন্নয়নের স্থিতিশীল ব্যবস্থা। 6. দারিদ্র্য দূরীকরণ। 7. উন্নতিশীল দেশগুলির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সহযোগিতা।

8. জনসংখ্যা সম্পর্কিত উন্নয়ন। 9. ভূমি-সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। 10. পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জৈব-প্রযুক্তির ব্যবহার। 11. ভঙ্গুর (Vulnceable) বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ঃ মরুভূমির সম্প্রসারণ ও খরার প্রতিরোধ। 12. পাহাড়ি / পার্বত্য এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ। 13. গ্রামীন ও কৃষি উন্নয়ন। 14. সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়ন। 15. জল-সম্পদ উন্নয়ন (Water Resources)। 16. মানুষের ভোগের পরিবর্তন। 17. পরিবেশের ভারসাম্য (Equilibrium) রক্ষা করে উন্নয়ন। 18. পরিবেশ রক্ষা করে বিষাক্ত বর্জ্য (Toxic waste) নষ্ট করা। 19. বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের আন্তর্জাতিক পাচার বন্ধ করা। 20. তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের (Nuclear waste, fly ash, etc.) নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত বন্দোবস্ত করা। 21. দূষিত জল ও কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ / পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা।

✪ 13.3.J. শিল্পঘটিত বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়া ✪ (Toxicology of Industrial Wastes)

পৃথিবীর সব দেশে দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ জল, স্থল ও বায়ুতে নির্গত হয়ে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। কারখানার বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ, নির্গত গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থে নানা ধরনের ধাতু ও যৌগ থাকে। শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে রাসায়নিক শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি থেকে নির্গত গ্যাসে ও নোংরা জলে নানান ধরনের বিষাক্ত ভারী ধাতু, যেমন—সিসা, পারদ, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, টিন, দস্তা প্রভৃতি থাকে। এই সব বর্জ্য ভারী ধাতু বায়ুতে মিশে বা নদী ও সমুদ্রের জলে বাহিত হয়ে দূষণ সৃষ্টি করে। এই ধাতুগুলি অতি সামান্য পরিমাণে মানুষের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এর মাত্রা বেশি হলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

❖ (a) **বিষক্রিয়ার সংজ্ঞা (Definition of Toxicology) ঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশের বিভিন্ন দূষিত রাসায়নিক পদার্থ যা জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং বিষতুল্য তাকে বিষক্রিয়া বলে।**

◘ (b) **পরিবেশে বিষাক্ত বর্জ্য কীভাবে ছড়ায়? ঃ** বিষাক্ত ধাতু নানাভাবে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশকে বিষাক্ত করতে পারে, যেমন—(i) কলকারখানার নির্গত গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থে নানাপ্রকার বিষাক্ত ধাতু থাকে। এইসব ধাতব পদার্থ জলাশয়ে বাহিত হয়। (ii) যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া, তেল প্রভৃতি বাতাস ও জলের দূষণ ঘটায়। (iii) জমিতে যেসব কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা মাটির দূষণ ঘটায়। (iv) অনেক সময় মাটির গভীরে থাকা বিষাক্ত ধাতু নলকূপের পানীয় জলের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

উপরে বর্ণিত কারণগুলি বেশিরভাগ সময় মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পরিবেশকে কলুষিত করে।

◘ (c) **ভারী ধাতু ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ঃ** সাধারণত একশোর বেশি পারমাণবিক ভরসম্পন্ন ধাতুগুলিকে ভারী ধাতু বলে। এরা তাপবিদ্যুৎ পরিবাহী, সাধারণ অবস্থায় কঠিন, নমনীয় ও প্রসারণশীল হয়। রসায়নগতভাবে যেসব ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব 4 বা 5-এর বেশি তাদের ভারী ধাতু বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে সিসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, লোহা, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, পারদ, নিকেল, বেরিলিয়াম, রুপো, টিন, নিকেল, দস্তা, তামা প্রভৃতি হল ভারী ধাতু।

1. **বায়ুর বিষতুল্য দূষক রাসায়নিক পদার্থ**— আমেরিকার EPA (Environmental Protection Agency) বায়ুর 24টি বিষতুল্য রাসায়নিক পদার্থের কথা বলেছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ক্যাডমিয়াম, সিসা, পারদ, বেরিলিয়াম, অ্যাসবেস্টস্, বেনজিন, ওজন, সালফার ডাইঅক্সাইড, ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড ইত্যাদি।

2. **জলের বিষতুল্য রাসায়নিক পদার্থ**— জলের প্রধান বিষতুল্য দূষক পদার্থ হল আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম, ক্রোমিয়াম, পারদ, দস্তা, মলিবডেনাম, ক্লোরিন ইত্যাদি। যেসব দূষক রাসায়নিক পদার্থ মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কয়েকটির উৎস ও বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ নীচে আলোচনা করা হল।

▲ 1. ক্যাডমিয়াম (Cadmium) ঃ

● (a) **ক্যাডমিয়ামের উৎস (Source of Cadmium)**— (i) আকরিক দস্তা নিষ্কাশনে, কয়লা দহনে, ধাতু শোধনে ক্যাডমিয়াম নির্গত হয়। (ii) কৃষি জমিতে ব্যবহৃত সুপার ফসফেট সার প্রয়োগ করলে ক্যাডমিয়াম দূষণ ঘটে। (iii) ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা, কাপড়ের কল, রাসায়নিক কারখানা, রং তৈরির কারখানা ও মেটালার্জি শিল্পের বর্জ্য জলে ক্যাডমিয়াম দূষণ ঘটে। (vi) নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের কন্ট্রোল রড তৈরিতে ক্যাডমিয়াম দূষণ দেখা যায়। (v) প্লাস্টিকের থলি ও বর্জ্য নিকাড ব্যাটারি (ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা ক্যালকুলেটরের ব্যাটারি) পোড়ালে ক্যাডমিয়াম বায়ুতে নির্গত হয়।

(b) মানুষের শরীরে ক্যাডমিয়াম কীভাবে প্রবেশ করে (How Cadmium enters into human system) ঃ ?
বায়ু থেকে শ্বাস গ্রহণের সময় এবং খাদ্যের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

(i) **শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে**— তামাক পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যাডমিয়াম থাকে। তামাক গাছ মূল দিয়ে মাটি থেকে ক্যাডমিয়াম শোষণ করে পাতায় সঞ্চিত রাখে। ধূমপান করার সময় দেহে ক্যাডমিয়াম সংক্রামিত হয়।

(ii) **খাদ্যের মাধ্যমে**— সাধারণত মাছ, মাংস ও বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও আলুতে ক্যাডমিয়াম থাকে। দূষিত সেচের জলের সঙ্গে প্রচুর ক্যাডমিয়াম মাটিতে যায়। এই ক্যাডমিয়াম উদ্ভিদ মূল দিয়ে শোষণ করে বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চিত করে। ক্যাডমিয়াম সংক্রামিত উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে মানুষের দেহে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ ঘটে।

(iii) **পানীয় জলের মাধ্যমে**— বায়ুর ক্যাডমিয়াম বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে প্রবেশ করে। ক্যাডমিয়াম মিশ্রিত পানীয় জল খেলে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে।
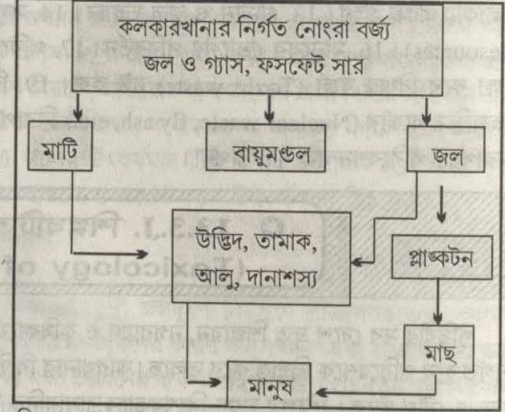
চিত্র 13.33A ঃ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম সংক্রমণের চিত্র।

(c) খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ— খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম এক জীব থেকে অন্য জীবে সংক্রমণ ঘটায়। খাদ্যশৃঙ্খলে ক্যাডমিয়াম পরিবহন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

(d) ক্যাডমিয়ামের বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ ঃ

(i) অ্যানিমিয়া, হৃৎপিণ্ডের গোলমাল ও রক্তচাপ বৃদ্ধি ঘটে।
(ii) বহু মানুষের হাড়ের ক্ষয় বা ভঙ্গুরতা দেখা দেয়।
(iii) কিডনিতে পাথর জমে ও কাজ বিঘ্নিত হয়।
(iv) বিপাক ক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি এবং ক্যানসার রোগ হতেও দেখা যায়।
(v) ফুসফুসের কাজে বিঘ্ন ঘটে।
(vi) টক খাবার ক্যাডমিয়ামের তৈরি পাত্রে খেলে 10 মিনিটের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির পাতলা পায়খানা, বমি অথবা বমিভাব এবং দুর্বলতা প্রায় 24 ঘন্টা থাকে।

▲ 2. আর্সেনিক (Arsenic) ঃ

থাইল্যান্ড ও মেক্সিকোয় আর্সেনিক দূষণ মহামারি আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পানীয় জলে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে।

(a) আর্সেনিকের উৎস (Source of Arsenic) ঃ (i) বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশকে আর্সেনিক থাকে। লেড আর্সেনেট (As-v) কীটনাশক হিসাবে, আগাছানাশক হিসাবে ক্যালসিয়াম আর্সেনেট (As-v), সোডিয়াম আর্সেনাইট (As-III) ও কপার অ্যাসিটো আর্সেনাইট (copper aceto-arsenite) ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় প্যারিসগ্রিন (As-III) কীটনাশক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিক যৌগগুলির মধ্যে AS-III সবচেয়ে বিষাক্ত বলা যায়। এইসব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য আর্সেনিক দূষণ দেখা যাচ্ছে। (ii) কলকারখানায় আকরিক থেকে সোনা ও সিসা নিষ্কাশনের সময় ও কয়লার দহনে আর্সেনিক পরিবেশে নির্গত হয়। (iii) বেআইনিভাবে অ্যালকোহল তৈরি করার সময় আর্সেনিক ব্যবহার করা হয়। এই অ্যালকোহল গর্ভপাত ঘটায়। (iv) যে সমস্ত কারখানায় তামা গলানো হয়, সেখানে একটি ধাপে উপজাত পদার্থ হিসাবে আর্সেনিক পাওয়া যায়। (v) একসময়ে বিভিন্ন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ তৈরিতে

চিত্র 13.34 ঃ আর্সেনিকের উৎস—A. নলকূপের জল এবং B. সেচের জল।

আর্সেনিক ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন আর আর্সেনিক ব্যবহার করা হয় না। (vi) কাঠ সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিকে আর্সেনিক থাকে। (vii) অগভীর নলকূপের জলে সহনীয় মাত্রার বেশি আর্সেনিক থাকে। (viii) ইলিশ ও পমফ্রেট মাছে অন্য মাছের তুলনায় বেশি মাত্রায় আর্সেনিক থাকে। (ix) আমেরিকা ও আর্জেন্টিনার কয়েকটি নদীর জলে মাত্রাধিক আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। (x) বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির স্তরে সহনীয় মাত্রার বেশি আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। এই আর্সেনিক জলে মিশে দূষণ ঘটাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নীতি অনুসারে পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতির সর্বোচ্চ মাত্রা 0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে।

(b) **আর্সেনিকদূষণজনিত উপসর্গ** (Symptoms of Arsenic Pollution) ঃ (i) আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক খসখসে ও অনুজ্জ্বল হয়। পেট, কাঁধ, বুক, হাতের তালু ও পায়ের তলায় কালচে দাগ দেখা যায়। পায়ের পাতায় কালো দাগ সৃষ্টি হওয়াকে ব্ল্যাকফুট ডিজিজ (Black foot disease) বলে।

চিত্র 13.35 ঃ পায়ের তলায় ও হাতের তালুতে আর্সেনিক-দূষণজনিত উপসর্গ।

(ii) আর্সেনিকদূষণ থেকে যকৃতে সিরোসিস, বৃক্কে, ফুসফুসে ও অন্ত্রে ক্ষত দেখা যায়। তা ছাড়া ওই সব অঙ্গে ক্যানসার হতে পারে। সাধারণত ত্বকে ক্যানসার কম দেখা যায়।

(iii) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ বা আক্রান্ত ব্যক্তির দাঁড়াতে, চলতে, কোনো কিছু ধরতে, হাত দিয়ে অনুভব করতে অসুবিধে হয়।

(iv) আর্সেনিক সরাসরি খেলে বমি, বারবার পায়খানা, পেটে যন্ত্রণা, বমিভাব প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। অনেক সময় বমির সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। রুগির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে।

▲ 3. সিসা (Lead) ঃ

(a) **সিসাদূষণের উৎস** (Source of Lead) ঃ (i) প্রায় দুশোটি শিল্পে সিসা ব্যবহার করা হয়, যেমন স্টোরেজ ব্যাটারি তৈরির কারখানা, ছাপাখানা, জাহাজ তৈরির কারখানা, রবার শিল্প, লেড পেন্ট, পোরসিলিন শিল্প, কাচ তৈরির কারখানা প্রভৃতি। শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ থেকে সিসা-দূষণ ঘটে। (ii) যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া থেকে সিসা-দূষণ ঘটে। পেট্রোল ও গ্যাসোলিনে সিসা থাকে। এদের দহনে সিসা বাতাসে মিশে যায়। (iii) সিসার পাইপ বাহিত জলে সিসা দূষণ ঘটে। (iv) সিসার প্রলেপ দেওয়া টিনের পাত্রে আম্লিক পানীয় রাখলে তাতে সিসা যুক্ত হয়। এই তরল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করলে সিসার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। (v) কীটনাশক হিসাবে লেড আর্সেনেট ব্যবহার করা হয়। এর থেকে পরিবেশে সিসার দূষণ ঘটায়। (vi) বাচ্চাদের খেলনায় অনেক সময় সিসা থাকে। (vii) পোরসিলিনের বাসনপত্রের চকচকে ভাব আনার জন্য ও নানা প্রকার নক্‌শা করার জন্য সিসা প্রাইমার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (viii) শিল্পাঞ্চলে সিসা গলানোর সময় কিছু সিসা রাস্তায়, পার্শ্ববর্তী এলাকায়, উদ্ভিদে, শাকসবজি ও পরিবেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দূষণ ঘটায়।

(b) **মানুষের শরীরে সিসা কীভাবে প্রবেশ করে?** (**How lead enters into human system?**) ঃ

(i) **নিশ্বাসের মাধ্যমে**—কলকারখানার শ্রমিকরা সিসা বা সিসার যৌগগুলি ধোঁয়া বা ধূলিকণা নিশ্বাসের মাধ্যমে দেহে গ্রহণ করে।

(ii) **খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে**— খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে সিসা দেহে প্রবেশ করে। বাতাসের সিসা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে জমা হয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে সিসা বাহিত হয়ে জলাশয়ে অর্থাৎ পুকুর, নদী ও সমুদ্রে মেশে। অনেক সময় কলকারখানা বর্জ্য জলের সঙ্গে সিসা জলাশয়ে মেশে। এর পর সিসা খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়।

(c) **সিসার বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ** (**Symptoms of Lead poisoning**) ঃ

(i) **পাক-অন্ত্রীয় সমস্যা**— ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, তলপেটে ব্যথা প্রভৃতি।

(ii) **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে প্রভাব**— অনিদ্রা, মাথাব্যথা, মানসিক অসঙ্গতি, বিকার, কনভালসন, কোমা প্রভৃতি দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(iii) **রক্তে সিসার বিষক্রিয়া**— সিসার বিষক্রিয়া অ্যামিনো লিভিলিনিক অ্যাসিড সিন্থেজ উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে। এতে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন স্বাভাবিক ভাবে হয় না এবং অ্যানিমিয়া রোগের লক্ষণ দেখা যায়। সিসার পরিমাণ রক্তে বাড়লে রক্তচাপ বৃদ্ধি, বৃক্কের কাজ ব্যাহত ও মস্তিষ্কের কোশ নষ্ট হয়।

(iv) **অন্যান্য উপসর্গ**— সিসার বিষক্রিয়ায় অনেক সময় গর্ভপাত ঘটে। মানুষের মুখ ফ্যাকাশে হয় ও মাড়িতে নীল দাগ পড়ে। অনেক সময় মৃত সন্তান প্রসব হয়।

(v) **শিশুদের উপর সিসার বিষক্রিয়া**— সিসার বিষক্রিয়ায় শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না এবং মস্তিষ্কের কাজ বিঘ্নিত হয়।

▲ 4. পারদ (Mercury) :

যেসব ধাতু জলের দূষণ ঘটায় এবং মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পারদ হল প্রধান। 1955 সাল পর্যন্ত পারদের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। 'মিনামাটা' বিপর্যয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পারদের বিষক্রিয়া প্রমাণিত হয়।

চিত্র 13.35A : খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পারদ সংক্রমণের চিত্ররূপ।

● (a) **পারদজনিত দূষণের উৎস** : মনুষ্যসৃষ্ট উৎস থেকে পারদ দূষণ ঘটে। প্রতি বছর জলে ও স্থলে 10,000 মেট্রিক টন পারদ জলে ও বায়ুতে নির্গত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে পারদজনিত দূষণ ঘটে। (i) ভিনাইল ক্লোরাইড প্লাস্টিক পেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে পারদ উপজাত হিসাবে পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে জলাশয়ে (নদী, হ্রদ প্রভৃতি) নির্গত হয়। (ii) ক্লোর অ্যালক্যালি প্লান্ট, পাওয়ার প্লান্ট, গবেষণাগার ও হাসপাতালের বর্জ্য জলের সঙ্গে পারদ জলাশয়ে মেশে। (iii) খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, কাগজ তৈরি শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, ওষুধ তৈরির শিল্প প্রভৃতি থেকে পারদ দূষণ ঘটে। (iv) কৃষিকার্যে ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হয়। এতে পারদ যৌগ, যেমন— মিথাইল মারকারি নাইট্রেট (Methyl mercury nitrate), মিথাইল মারকারি ডাইসায়ানাইড (Methyl mercury dicynide) মারকারি অ্যাসিটেট প্রভৃতি ছত্রাক নাশক বীজ পরিস্রুত করতে ব্যবহার করা হয়।

● (b) **জলজ বা স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলে পারদ বিবর্ধন**— মিথাইল মারকারি প্লাঙ্কটনের মাধ্যমে (জলজ ভাসমান উদ্ভিদ ও প্রাণী) খাদ্য শৃঙ্খলে যায়। মাছ প্লাঙ্কটন খাওয়ার ফলে পারদ মাছের দেহে সংক্রামিত হয়। মাছের দেহে পারদ প্রায় 1000 গুণ জীব বিবর্ধিত (Biomagnification) হয়। পরে মাছ থেকে অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটে।

● (c) **মানুষের দেহে বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ** : (i) সাধারণভাবে পেটের অসুখ ও মাড়ি ফোলা প্রভৃতি প্রথমে ঘটে। (ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে স্নায়ুর নানা প্রকার উপসর্গ, যেমন—হাত, পা, জিভ ও ঠোঁটের অসারতা দেখা যায়। এর ফলে মানসিক দুর্বলতা, কাজে অনীহা ও অকারণে উত্তেজনা প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়। (iii) দৃষ্টিহীনত্ব ও বধিরত্ব ধরা পরে। (iv) গর্ভবতী মায়ের দেহে পারদদূষণ ঘটলে শিশুর জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। (v) পারদের জিন প্রভাবের জন্য বংশগতি প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা যায়। (vi) ভ্রূণ মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে।

▲ 5. ক্লোরিন (Chlorine) :

ক্লোরিন একটি সক্রিয় অজৈব রাসায়নিক পদার্থ। পৌর প্রতিষ্ঠানের পানীয় জলে বেশি ক্লোরিন থাকলে মানুষের ক্লোরিনজনিত বিষক্রিয়া ঘটে।

● (a) **ক্লোরিনজনিত দূষণের উৎস**—(i) আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের বর্জ্যপদার্থযুক্ত জল জীবাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। এই সময় অতিরিক্ত ক্লোরিন জলাশয়কে দূষিত করে। (ii) পাওয়ার প্লান্টের শীতল করার কাজে ব্যবহৃত পাইপের ভিতরে ও বাইরে যেসব ছত্রাক, শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া জন্মায় তাদের ধ্বংস করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। এই সময় কিছু ক্লোরিন কারখানার নিঃসৃত জলের সঙ্গে নির্গত হয় এবং জলাশয়কে দূষিত করে।

● (b) **মানুষের দেহে বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ**—পানীয় জলে বেশি মাত্রায় ক্লোরিন যকৃৎ ও অন্ত্রে ক্যানসারের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

▲ 6. অ্যান্টিমনি (Antimony) :

● (a) **অ্যান্টিমনির উৎস (Source of Antimony)** : সস্তা এনামেল বাসনপত্র তৈরি করার জন্য অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয়। টক খাবার এসব পাত্রে খেলে অ্যান্টিমনির বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ম্যালেরিয়ার ওষুধে অ্যান্টিমনি থাকে। বেশি মাত্রায় এই ওষুধ খেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

● (b) **অ্যান্টিমনির বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ**—অ্যান্টিমনির বিষক্রিয়া অনেকটা আর্সেনিকের মতো বলা যায়।

▲ 7. বেরিলিয়াম (Berrilium) ঃ

● (a) **বেরিলিয়ামের উৎস (Source of berrilium) ঃ** উড়োজাহাজ শিল্পে ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বেরিলিয়াম ব্যবহার করা হয়। তাই এই কেন্দ্রগুলি বেরিলিয়াম দূষণের উপসর্গ।

● (b) **বেরিলিয়ামের বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ** — (i) বেরিলিয়াম থেকে বেরিলিওসিস রোগ দেখা দেয়। এই রোগে ফুসফুসের সমস্যা ও চোখের ক্ষতি হয়। (ii) অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তির অন্ত্রে ক্ষত ও টিউমার দেখা যায়।

▲ 8. রুপা (Silver) ঃ

● (a) **রুপার উৎস (Source of Silver)**— (i) বিভিন্ন ওযুধপত্রে রুপা ব্যবহার করা হয়। (ii) ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্পে ও ফটোগ্রাফি শিল্পের বর্জ্য জলের মাধ্যমে রুপার দূষণ ঘটে।

● (b) **রুপার বিষজনিত উপসর্গ** — (i) রুপার বিষক্রিয়ায় ত্বক বর্ণহীন হয়। (ii) কেউ ভুল করে সিলভার নাইট্রেট খেলে অল্প সময়ের মধ্যে বমি, পাতলা পায়খানা ও অস্থিরভাব দেখা দেয়। আবার অনেক সময় মৃত্যুও ঘটতে পারে।

● ক্রোমিয়াম, বেরিয়াম, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, সেলিয়াম প্রভৃতিও মানুষের দেহে অতিরিক্ত প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া জনিত উপসর্গ দেখা যায়। নীচে কয়েকটি ভারী ধাতু, উৎস ও মানুষের বিষক্রিয়া ঘটিত উপসর্গ দেখানো হল।

ধাতু	ব্যবহার	মানুষের রোগলক্ষণ সংক্রান্ত পরিণতি
1. আর্সেনিক	যাবতীয় কীটনাশকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কাঠ সংরক্ষণে ও ওযুধ প্রস্তুতিতেও ব্যবহার হয়।	চর্মের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, মানসিক বিকৃতি, যকৃতে সিরোসিস, ফুসফুসে ক্যানসার, বৃক্কের ক্ষতি এবং অন্ত্রে ক্ষত দেখা যায়।
2. ক্যাডমিয়াম	সংকর ধাতু প্রস্তুতি, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এবং নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারের রডে ব্যবহৃত হয়।	উদরাময়, বৃদ্ধিতে বাধা, হাড়ের বিকৃতি, রক্তশূন্যতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি (হাইপারটেনশন), বৃক্কের ক্ষতি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে, যকৃতে ও হৃদযন্ত্রে রোগ সৃষ্টি হয়।
3. সায়ানাইড	ধাতব চাকতি শিল্পে (অন্য ধাতুর উপর ধাতব আবরণীর জন্য) এবং কোনো কোনো কীটনাশকে ব্যবহৃত হয়।	শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে শরীরে প্রবেশের ফলে বমি বমি ভাব, মাথার যন্ত্রণা এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে।
4. পারদ	প্লাস্টিক ও রাসায়নিক শিল্পে প্রচণ্ডভাবে ব্যবহৃত হয়।	পেটব্যথা, মাথাধরা, উদরাময়, অন্ত্রের কাজের ক্ষতি এবং বুক ব্যথা হয়।
5. তামা	অ্যামোনিয়া, অ্যালকোহল ও অন্যান্য জৈব যৌগ প্রস্তুতিতে এবং অতি উষ্ম সংকর ধাতু এবং স্থায়ী চুম্বক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।	হাইপারটেনশন, মূত্রকৃচ্ছ, কোমা, হঠাৎ জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।
6. দস্তা	শুষ্ক ব্যাটারি শিল্পে, অনেক বস্তু প্রস্তুতি, রং এবং ছাপার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়।	বমি, বৃক্কের কাজে ক্ষতি, ফুসফুসে ক্যানসার এবং খিঁচুনি ইত্যাদি দেখা যায়।
7. কোবাল্ট	প্রধানত রং, সিরামিক্স এবং কোনো কোনো কীটনাশক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।	ডাইরিয়া, রক্তচাপের হ্রাস, ফুসফুসের অস্বস্তি, হাড়ের বিকৃতি, পক্ষাঘাত ইত্যাদি ঘটে।
8. বেরিয়াম	ভ্যাকুয়াম সিস্টেমে, সিরামিক্স শিল্পে, রবার শিল্পে, লুব্রিকেটিং তেল, আঠালো পদার্থ ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।	অত্যধিক লালা নিঃসরণ, বমি, উদরাময়, পক্ষাঘাত ও শূলবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।
9. সেলেনিয়াম	সংকর ধাতু প্রস্তুতি, Photo copies, রবার শিল্প এবং সিরামিক্স (কাচ) শিল্পে, শ্যাম্পুতে খুসকি নিবারণে ও নীচে ভল্টেজ রেক্টিফায়ারে ব্যবহৃত হয়।	যকৃতের পীড়া, বৃক্ক ও প্লিহার ক্ষতি, বমি, নীচু রক্তচাপ, অন্ধত্ব ও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

13.3.K. জলাভূমি যেন প্রকৃতির বৃক্ক (Wetland an Nature's Kidney)

❖ (a) **জলাভূমির সংজ্ঞা (Definition of Wetland) ঃ অগভীর জলাশয় যেখানে বছরের বেশির ভাগ সময়েই জল থাকে তাকে জলাভূমি বলা হয়।**

চিত্র 13.36 ঃ একটি জলাভূমি।

◘ **(b) জলাভূমির প্রকারভেদ (Different types of Wetland)** ঃ খাল, বিল, দিঘি, নদী, পুকুর, ভেড়ি, খাঁড়ি, ঝিল, পরিত্যক্ত নদীগর্ভ, কর্দমাক্ত অঞ্চল, ময়লা জলের নীচু জমি প্রভৃতি হল বিভিন্ন প্রকার জলাভূমি। আগে আমাদের ধারণা ছিল জলাভূমি হল **পরিত্যক্ত জমি** বা **ওয়েস্ট ল্যান্ড** (Waste land)। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিশ্বের সব দেশে জলাভূমি সংস্কার ও সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

জলাভূমি ধ্বংসের ব্যাপকতা গত কয়েক দশক জুড়ে সারা পৃথিবীতে চলছে। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে, যেমন—নতুন শহর তৈরি, কলকারখানা, চাষবাস ও বসতির চাহিদা, কৃষি বর্জ্যের দূষণ, আগাছা বৃদ্ধি প্রভৃতি। 1971 সালে ইরানের রামসার শহরে জলাভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা **রামসার কনভেনশন** নামে খ্যাত। 1975 সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ওয়েট ল্যান্ড চুক্তি (Wet Land Treaty) সম্পাদিত হয়েছে।

❖ (c) **বৃক্কের সংজ্ঞা (Definition of Kidney) ঃ প্রাণীর দেহকোশের বিপাকীয় কাজের ফলে উৎপন্ন অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থগুলি যে অঙ্গ দিয়ে দেহ থেকে নির্গত হয় তাকে বৃক্ক বলে।**

বৃক্ক মানুষের দেহের প্রধান রেচন অঙ্গ। কারণ এই অঙ্গের মাধ্যমে দেহের প্রায় 70-75 শতাংশ বর্জ্য পদার্থ রেচিত হয়। জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলার প্রধান কারণ হল জীবদেহে বিপাকের সময় নানা প্রকার বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলি যাতে দেহে কোনো প্রকার বিষক্রিয়া ঘটাতে না পারে অর্থাৎ দেহের সমতা বজায় রাখতে পারে তার জন্য বৃক্ক যথাসম্ভব দ্রুত দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে।

◘ **(d) জলাভূমির গুরুত্ব (Importance of wetland)** ঃ এইসব কাজের ফলে বৃক্ক মানুষের দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলাভূমির গুরুত্বের সঙ্গে বৃক্কের কাজের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নীচে জলাভূমির **গুরুত্বগুলি হল—**

(i) জলাভূমি সমুদ্র উপকূলের ও অন্যান্য অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে।

(ii) জলসঞ্চয় করে বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়ে জলাভূমির সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। জলাভূমির জল মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তরে জমা হয়। এতে মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে।

(iv) পয়ঃপ্রণালীর দূষিত বর্জ্য জল পরিশোধনে জলাভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(v) জলজ শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ দূষিত জলের ক্ষতিকারক ধাতু শোষণ করে জলাশয়ের দূষণ মুক্ত করে।

(vi) জলাভূমিতে সংরক্ষিত বৃষ্টির জল পানীয় হিসাবে অথবা চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(vii) জলাভূমি মানুষের খাদ্য জোগায় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মাছ ও শাকসবজি সরবরাহ করে। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায়।

(viii) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণেও জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ। এতে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে। জলজ প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া বহু রকমের কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ করে।

(ix) মশা দমনেও জলাভূমির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জলাভূমির কয়েকটি মাছ মশার লার্ভা ভক্ষণ করে। এতে মশার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(x) জলপথে পরিভ্রমণে ও শক্তি উৎপাদনেও জলাভূমি ব্যবহার করা যায়।

জলাভূমির গুরুত্বগুলি আলোচনা করলে বৃক্কের কাজের সঙ্গে বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জলাভূমি একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাস্তু-তন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া মানব সম্পদের উন্নয়নে বহু কাজ করে, যেমন—দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলসরবরাহ, খাদ্যের জোগান ইত্যাদি। বৃক্ক মানুষের দেহের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, দূষিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নির্গত করে রোগ থেকে রক্ষা করে, জল শোষণ করে প্রভৃতি। এককথায় বলতে গেলে দেহের ক্রিয়াকলাপের সমতা বজায় রাখে। সুতরাং "জলাভূমি হল প্রাকৃতিক বৃক্ক" উক্তিটি যথাযথ এবং যুক্তিপূর্ণ।

০ অ নু শী ল নী ০

A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions):

1. (a) বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? (b) বাস্তুতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
2. (a) উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (b) ইকোসিস্টেমের বা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বগুলি সংক্ষেপে লেখো।
3. (a) খাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
4. (a) খাদ্যপিরামিড কাকে বলে? (b) বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পিরামিডের বিবরণ দাও।
5. (a) বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ বলতে কী বোঝো? (b) শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
6. (a) জীব-ভূ রাসায়নিক চক্র কী? (b) জল চক্র সংক্ষেপে লেখো।
7. (a) অক্সিজেন চক্র কাকে বলে? (b) অক্সিজেন চক্র ও অক্সিজেন চক্রের গুরুত্ব লেখো।
8. (a) কার্বন চক্রের সংজ্ঞা লেখো। (b) কার্বন চক্র ছকের মাধ্যমে দেখাও।
9. (a) নাইট্রোজেন চক্র কী? (b) নাইট্রোজেন চক্রের বিবরণ দাও। 10. সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
11. (a) জীবমণ্ডল কাকে বলে? (b) জীবমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
12. (a) দূষণ কাকে বলে? (b) সাধারণ দূষণকারী পদার্থগুলির নাম লেখো।
13. (a) জলদূষণের কারণগুলি কী কী? (b) জলদূষণ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
14. (a) মাটিদূষণ বলতে কী বোঝো? (b) মাটির দূষক পদার্থ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি লেখো।
15. (a) বায়ু-দূষক পদার্থগুলির নাম লেখো। (b) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু-দূষকের প্রভাব আলোচনা করো।
16. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি লেখো।
17. (a) শব্দদূষণ কী? (b) শব্দদূষণের কারণগুলি ও নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
18. (a) গ্রিন হাউস প্রভাব কী? (b) বিভিন্ন প্রকার গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির নাম লেখো। (c) গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়লে কী কী ক্ষতি হতে পারে?
19. (a) ওজোন আবরণের ক্ষয় বলতে কী বোঝো? (b) এর প্রধান কারণগুলি কী কী?
20. (a) ক্যাডমিয়াম ও আর্সেনিক কী? (b) মানুষের শরীরে এরা কীভাবে প্রবেশ করে? (c) এদের বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গগুলি লেখো।
21. (a) জলাভূমির সংজ্ঞা দাও। "জলাভূমি যে প্রকৃতির বৃক্ক"—এই উক্তিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type questions):

1. বাস্তুতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলি কী কী? 2. বিয়োজক ও পরিবর্তক কী? 3. ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে? 4. খাদ্যজালক কী? 5. জীবভর পিরামিড কাকে বলা হয়? 6. বাস্তুতন্ত্রে কীভাবে শক্তি প্রবাহ হয়? 7. জলচক্রের গুরুত্ব লেখো। 8. ছকের মাধ্যমে অক্সিজেন চক্র আঁকো। 9. নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব উল্লেখ করো। 10. ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কী? 11. সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবনতির কারণগুলি কী কী? 12. বায়োস্ফিয়ার কী? 13. অট্‌ইকোলজি কাকে বলা হয়? 14. সিন্‌ইকোলজি কী? 15. মাটির দূষক পদার্থ ও এদের উৎসগুলির নাম লেখো। 16. তেজস্ক্রিয় দূষণ কাকে বলে?

17. তেজস্ক্রিয় দূষণে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কী কী প্রভাব দেখা যায়? 18. জৈব বিবর্ধন কী? 19. ডিসলেক্সিয়া রোগ কী? 20. মিনামাটা রোগের কারণ কী? 21. গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নাম লেখো। 22. অম্লবৃষ্টি কী? 23. ওজোনস্তর রক্ষার কারণগুলি লেখো। 24. গ্রিনবেঞ্চ কী কী সমস্যার জন্য তৈরি করা হয়েছে? 25. কেন্দ্রীয় দূষণ প্রতিরোধ বোর্ড কী কী কাজ করে? 26. পরিবেশে বিষাক্ত বর্জ্য কীভাবে ছড়ায়? 27. জলাভূমির গুরুত্বগুলি কী কী?

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) ঃ

1. ইকোলজি শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? 2. দুটি বিয়োজকের উদাহরণ দাও। 3. বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ কীভাবে ঘটে? 4. লিন্ডেম্যান কী নিয়ম প্রবর্তন করেন? 5. সুন্দরবনের আয়তন কত? 6. সুন্দরবনের দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদের নাম লেখো। 7. সুন্দরবনের দুটি প্রাণীর নাম লেখো। 8. জীবমণ্ডলের সীমানা উল্লেখ করো। 9. ডেসিবেল কী? 10. ডাইলেক্সিয়া রোগ কেন হয়? 11. ইটাই ইটাই কোথায় প্রথম দেখা যায়? 12. দুটি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো। 13. অম্লবৃষ্টিতে কী থাকে? 14. ওজোন গহ্বর প্রথম কোথায় দেখা যায়? 15. বসুন্ধরা সম্মেলন কোথায় হয়েছিল? 16. দুটি ভারী ধাতুর নাম লেখো। 17. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতি অনুসারে পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা কত? 17. পারদের উৎসগুলি কী কী? 18. পশ্চিমবঙ্গের দুটি বড়ো জলাশয়ের নাম লেখো।

D. টীকা লেখো (Write short notes on) ঃ

1. উৎপাদক 2. খাদক 3. পরিবর্তক 4. খাদ্যশৃঙ্খল 5. খাদ্যজালক 6. সংখ্যা পিরামিড 7. ফসফরাস চক্র 8. জীবমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য 9. শব্দ-দূষণের কারণ 10. তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ 11. জৈববিবর্ধন 12. ডিসলেক্সিয়া রোগ 13. মিনামাটা রোগ 14. ক্লোরোফ্লুরো কার্বন 15. অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাব 16. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা 17. গ্রিন বেঞ্চ 18. আর্সেনিক 19. সিসার বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ 20. জলাভূমির গুরুত্ব।

ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনিস্টিটিউট (Indian Agricultural Research Institute) বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন এই অণুজৈব সার জমিতে প্রয়োগ করলে তুলো, জোয়ার ও শিম্বক জাতীয় উদ্ভিদের ফলন অনেক বেড়ে যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে গম, বার্লি, আলু, কপি ইত্যাদিতে অণুজৈব সার প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

3. **ফসফেট দ্রবণীয়কারী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া**— ফসফেট অণুজৈব সার মাটিতে ফসফেটের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। *সিউডোমোনাস* (*Pseudomonas*) নামে ব্যাকটেরিয়া এবং *অ্যাসপারজিলাস* (*Aspergillus*) নামে ছত্রাক ফসফেট অণুজৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এদের পোষণ পদ্ধতি এবং জমিতে প্রয়োগ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী স্বাধীন ব্যাকটেরিয়ার মতো।

4. **সায়ানো ব্যাকটেরিয়া ঘটিত জৈব সার (নীলাভ সবুজ শৈবাল)**—নীলাভ সবুজ শৈবালের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার মতো বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য এদের *সায়ানোব্যাকটেরিয়া* (*Cyanobacteria*) বলে। বায়ুর নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা থাকার জন্য এদের অণুজীবসার হিসাবে গণ্য করা হয়। কয়েকটি নীলাভ সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়া হল *নস্টক* (*Nostoc*), *অ্যানাবিনা* (*Anabaena*), *সিলিন্ড্রোস্পারমাম* (*Cylindrospermum*), *স্পাইরুলিনা* (*Spirulina*), *অসিলেটোরিয়া* (*Oscillatoria*) ইত্যাদি। এ সমস্ত শৈবালে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জিন (Gene) বা নিফ্‌জিন (NIF gene) থাকে বলে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে সক্ষম।

5. **অণুজৈব সার হিসাবে অ্যাজোলার ব্যবহার** (Use of Azolla as Biofertilizer)—*অ্যাজোলা* (*Azolla*) হল এক প্রকার জলজ ফার্ন। সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের স্বাদু জলে জন্মায়। ভারতে অ্যাজোলার দুটি প্রজাতি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান হল *অ্যাজোলা পিনটা* (*A. pinnata*)। এটি জলের উপরিতলে ভেসে থাকে। এর পাতার গহ্বরে *অ্যানাবিনা অ্যাজোলি* (*Anabaena azollae*) নামে একপ্রকার **নীলাভ সবুজ শৈবাল** মিথোজীবী হিসাবে বাস করে। এই শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। তাই অ্যাজোলা অণুজৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অ্যাজোলা জমিতে প্রয়োগ করলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে। অ্যাজোলা চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন। এছাড়া উপযুক্ত তাপমাত্রা ছাড়া অ্যাজোলার বৃদ্ধি ঘটে না।
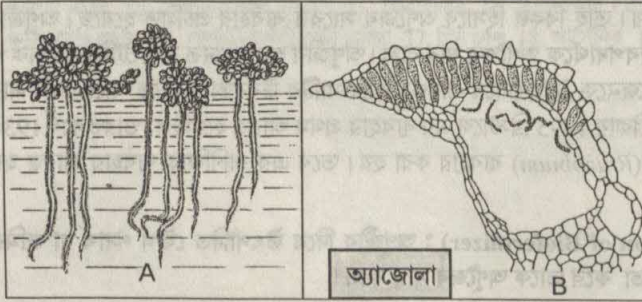
চিত্র **14.2** : A-জলজ ফার্ন অ্যাজোলা এবং B-পাতার গহ্বরে অ্যানাবিনা অ্যাজোলি।

6. **অণুজৈব সার হিসাবে মাইকোরাইজা** (Mycorrhiza as biofertilizer)— **স্থলজ ছত্রাকের অণুসূত্র (Hyphae) ও বনজ উদ্ভিদের মিথোজীবী সম্পর্ককে মাইকোরাইজা বলে।** উদ্ভিদের মূলে কিছু ছত্রাক, যেমন— *অ্যামানিটা* (*Amanita*), *বলিটাস* (*Bolitus*), *ফ্যালাস* (*Phalus*) অণুসূত্রের আচ্ছাদন গঠন করে। এই ছত্রাকগুলি মাটির উপরের বস্তু ও পাতার বিয়োজন ঘটায় এবং জমির উর্বরতা বাড়ায়। দেখা যায় ফসফরাস, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পদার্থ ছত্রাকের অণুসূত্র মাটি থেকে শোষণ করে এবং বৃক্ষ-মূলকোশের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে পাঠায়। দেখা গেছে উদ্ভিদের মূলে মাইকোরাইজা গঠিত হলে দুই বা তিন গুণ বেশি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম শোষণ করতে পারে। ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রায় 70 ভাগ উদ্ভিদে মাইকোরাইজা গঠিত হয়। ছত্রাক অণুসূত্র বনজ উদ্ভিদের কোনো ক্ষতি করে না। এমন কয়েকটি অর্কিড প্রজাতি আছে যারা মাইকোরাইজা গঠিত না হলে বাঁচতে পারে না। সাধারণত মাইকোরাইজা (বহুবচনে মাইকোরাইজি) তিন প্রকারের হয়, যেমন— (i) **এক্টোমাইকোরাইজি** (Ectomycorrhizae)— বৃক্ষমূলের বাইরে ছত্রাক কলার একটি আবরণ গঠন করে। এই আবরণে একাধিক কলাস্তর থাকে। ছত্রাক অণুসূত্র ত্বক কোশের মধ্য দিয়ে মজ্জাকোশের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে অণুসূত্রের একটি জালিকা তৈরি করে। উদাহরণ—**পাইন** (Pine), **ওক** (Oak) প্রভৃতি উদ্ভিদে বেশি দেখা যায়।
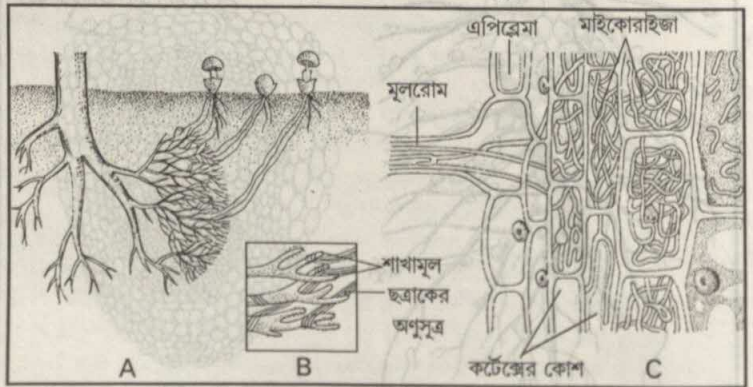
চিত্র **14.3** : A-মাইকোরাইজাযুক্ত মূল, B-এক্টোমাইকোরাইজি এবং C-এন্ডোমাইকোরাইজি।

(ii) **এন্ডোমাইকোরাইজি** (Endomycorrhizae)— এইক্ষেত্রে ছত্রাক অণুসূত্র সরাসরি বৃক্ষমূলের কোশে প্রবেশ করে বহিস্ত্বকের মধ্যে বিস্তারিত হয়। মূলের বাইরে এরা কম পরিমাণে থাকে। উদাহরণ—**অর্কিড ও সপুষ্পক ছোটো ছোটো উদ্ভিদে** বেশি দেখা যায়।

◘ (c) **অণুজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা** (Advantages of the application of biofertilizer) : নিম্নলিখিতগুলি নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য অণুজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা, যেমন—(i) রাসায়নিক সার অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। (ii) অণুজৈব সার ব্যবহার করে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সীমিত করা যায়। (iii) মাটির জল ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয় না এবং পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে। (iv) কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া মাটিতে অ্যান্টিবায়োটিক নিঃসৃত করে যা কীটনাশকের মতো কাজ করে। (v) ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। (vi) অ্যাজোলা জলের ভারী ধাতু শোষণ করে জমির দূষণ মাত্রা কমায়। (vii) অণুজৈব সার উষর জমিকে চাষযোগ্য করে। (viii) মাইকোরাইজা ও অণুজৈব সার হিসাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটায় ও ফলন বাড়ায়। (ix) পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির যা রাসায়নিক সার তৈরি করতে প্রয়োজন হয়, জৈবসারে তার সাশ্রয় হয়।

◎ 14.1A. কীটনাশক এবং পেস্টের জৈব নিয়ন্ত্রণ—সুবিধা ও বিপদ ◎ (Pesticides and Biological Pest control—Benefits and Hazards)

পৃথিবীর সবদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমিকে বারবার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে। আবার জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর জন্য ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়ছে। তা ছাড়া বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে ফসলকে বাঁচানোর জন্য নানা প্রকার কীটনাশক ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। **কীট (Pest) বলতে এখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পতঙ্গ, মাকড়শা, এঁটুলি, শামুক তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণী (ইঁদুর), ছত্রাক ও আগাছা যারা মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায়, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ক্ষতি করে ও রোগ বিস্তার করে তাদের বোঝায়।** যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ এদের দমন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাদের **কীটনাশক** বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 1990 সালের হিসেব থেকে দেখা যায় পৃথিবীতে উৎপন্ন কীটনাশকের নব্বই শতাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে অর্থাৎ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি অংশ জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে লাগে।

চিত্র 14.4 : রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করার পদ্ধতির চিত্ররূপ।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শতকরা আশিভাগ কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আজকাল প্রায় 1,000 রকমের কীটনাশক সারা বিশ্বে কৃষিকার্যে, বাগানে, অরণ্যে, বাড়িতে, শিল্পে, মালপত্র রাখার গুদামে ও দোকানপাটে ব্যবহার করা হচ্ছে।

❖ **পেস্টের সংজ্ঞা (Definition of Pest) : যেসব জীব (প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা ব্যাহত করে তাদের পেস্ট বলে।**

▲ কীটনাশক (Pesticides)

❖ (a) **কীটনাশকের সংজ্ঞা (Definition of Pesticide) : যেসব রাসায়নিক পদার্থ কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলে তাদের কীটনাশক (Pesticides) বলে।**

◘ (b) **বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক (Different types of Pesticides)** : কীট দমন করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে বেশিরভাগ কীটনাশক খুবই বিষাক্ত। এরা শুধু কীট দমন করে না; মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য উপকারী প্রাণীর এবং পরিবেশেরও ক্ষতি করে। আজকাল অনেকগুলি কীটনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের বিষক্রিয়া নেই। পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন প্রকার কীটনাশকের প্রকারভেদগুলি দেখানো হল।

1. **মৌল পদার্থ** (Elements)—ফসফরাস, গন্ধক, পারদ ও থ্যালিয়াম প্রভৃতি।

2. **অজৈব যৌগ** (Inorganic compounds)—অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড, ব্রোমোমিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, প্যারিস গ্রিন, জিঙ্ক ফসফাইড ইত্যাদি।

3. **জৈব যৌগ** (Organic compound) ঃ (a) **হাইড্রোকার্বন** (Hydrocarbon)— কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি।

4. **সংশ্লেষিত জীব যৌগ** (Synthesised organic compounds) ঃ (i) **ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন**—ডিডিটি (DDT), এনড্রিন (Endrine), অলড্রিন, বি. এইচ. সি. বা গ্যামেক্সেন (B. H. C. or Gammexane), ইত্যাদি। (ii) **অর্গানো ফসফরাস যৌগ**—ডেমেটন (Demeton), ডেমেফিয়ন (Demephion), ব্রোমোফস (Bromophos), প্যারাথিয়ন (Parathion) প্রভৃতি। (iii) **কার্বামেট যৌগ**—এই শ্রেণির বিষাক্ত যৌগ হল— কার্বারিল (Carbaryl), কার্বোফিউরান (Carbofuron), অক্সামিল (Oxamil), প্রোপোক্সার (Propoxur) ইত্যাদি। (iv) **পাইরেথ্রয়েড যৌগ**—অ্যালেথ্রিন (Allethrin), বায়োঅ্যালেথ্রিন (Bioallethrin), প্রোথ্রিন (Prothrin) ইত্যাদি।

5. **উদ্ভিদজাত**—পাইরেথ্রিন (ক্রিসেনথিমাম প্রজাতির ফুল থেকে তৈরি হয়); নিকোটিন (তামাক পাতা থেকে তৈরি হয়); রেটিনোন (ডেরিস প্রজাতির মূল থেকে প্রস্তুত হয়); অ্যাজাডাইরাকটিন (নিম পাতা ও ফল থেকে তৈরি হয়)।

6. **জীবযৌগ** (Biological compounds)—থুরিসাইড (*ব্যাসিলাস থুরিজেনসিস—Bacillus thuringiensis*) নামে ব্যাকটেরিয়ার রেণু দিয়ে তৈরি করা হয়); ফেরোমোন (জীবদেহ নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ) ইত্যাদি।

▲ পেস্টের জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control of Pests)

দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বাড়ছে। এই খাদ্য উৎপাদন করতে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে সাময়িক লাভ হলেও দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকের জন্য বিষক্রিয়া উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা নিবারণের একমাত্র উপায় কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব নিয়ন্ত্রণ। আজকাল ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য জৈব নিয়ন্ত্রণে অনেক সুফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, খাদক প্রাণী, পরজীবীদের ব্যবহার করা হয়। এই সব জীবদের সনাক্তকরণের পর গবেষণাগারে বংশ বৃদ্ধি করিয়ে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের পরে কীটদের আক্রান্ত করিয়ে খাদক হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কীটকে ধ্বংস করাই হল **জৈব নিয়ন্ত্রণ**। এরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। কয়েকটি জৈবনিয়ন্ত্রণের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

● **1. জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Insects and other Animals in Biological control) ঃ**

(i) অনেকগুলি ভাইরাস পতঙ্গ ধ্বংস করতে পারে, এদের **নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস** সংক্ষেপে NPV ভাইরাস (Nuclear polyhedrosis virus) বলে। এরা পতঙ্গ ধ্বংস করে ফসল বাঁচাতে পারে। **বায়োট্রোল** নামে এক ধরনের ভাইরাস কটন বল, টোবাকো বার্ড, কর্ণ ওয়ার্ম প্রভৃতি কীটকে নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) *ব্যাসিলাস থুরিজেনসিস* (*Bacillus thuringiensis*) নামে ব্যাকটেরিয়া জমিতে পতঙ্গ ও শুঁয়োপোকা মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। কৃষিক্ষেত্রকে পঙ্গপাল দমনের জন্য একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া *কক্কোব্যাসিলাস অ্যাসিডিওরাম* (*Coccobacillus acidiorum*) ব্যবহার করা হয়। চিংবাগ নামে পতঙ্গ শস্যকে বাঁচাতে একটি বিশেষ ছত্রাক প্রজাতি *বিউভেরিয়া ব্র্যাসিয়ানা* (*Beauveria braciana*) ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। (iii) আজকাল বহু পরজীবীকে কীট ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন—*স্পালানজিয়া এনডিয়াস* (*Spalangia endius*) মাছ ও সাদা পতঙ্গকে (White fly) ধ্বংসের জন্য এবং আপেল গাছের ক্ষতিকারক পতঙ্গ *ইরিওসোমা লেজিজেরাম* (*Eriosoma lagigerum*)-কে দমন করার জন্য *এ্যাফিলিনাস মেলিকে* (*Aphelinus mali*) ব্যবহার করা হয়। (iv) একধরনের পোকা, অর্থাৎ *লেডিবার্ড বাগসের* (*Vovius cardinales*) সাহায্যে অনেকগুলি পতঙ্গকে ধ্বংস করা যায়। (v) কতকগুলি কণ্টকযুক্ত আগাছা যারা মাটির ক্ষতি করে তাদের নষ্ট করার জন্য এক ধরনের মথ *ক্যাকটোব্লাসটিস ক্যাকটোরাম* (*Cactoblastis cactorum*) প্রয়োগ করে জমি আগাছা থেকে মুক্ত করা হয়। (vi) ব্যাং মানুষের ক্ষতিকারক পতঙ্গদের ভক্ষণ করে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। (vii) বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গের রোগ-সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু আবিষ্কার করে যেখানে পতঙ্গের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে সেখানে ছড়ানোর ফলে নির্দিষ্ট পতঙ্গ ধ্বংস হচ্ছে। এই রোগজীবাণু অন্য প্রাণী ও মানুষের ক্ষতি করে না। (viii) বিভিন্ন প্রকার পাখি যেমন—রবিন, ক্যাটবার্ড, কাঠঠোকরা, ক্রিপার জাতীয় পাখি বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ ভক্ষণ করে পতঙ্গের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। (ix) *ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি* (*Trichoderma viridae*) নামে জীবাণু থেকে বিষ পাওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রে বীজ ও মাটি ছত্রাক থেকে রক্ষা করার জন্য এই বিষ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়।

● 2. **জৈব-প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Biotechnological control)** ঃ বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার জৈব-প্রযুক্তি অবলম্বন করে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এগুলি হল—

(i) পুং পতঙ্গকে বন্ধ্যাকরণ করে পতঙ্গের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে।

(ii) বৃটিশ বিজ্ঞানীরা **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রথায় ভাইরাস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যা পতঙ্গ ধ্বংস করতে সমর্থ।

(iii) অধ্যাপক **ডেভিড বিসপ** পাইন গাছের শুয়োঁপোকা দমন করার জন্য বিশেষ ধরনের ভাইরাস তৈরি করেন।

(iv) বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে, যেগুলি কীটনাশকের পরিবর্তে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ব্যাঙ্গালোরের একটি প্রতিষ্ঠানে (Commonwealth Institute of Biology) এধরনের গবেষণার প্রচেষ্টা চলছে।

● 3. **হরমোনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Hormonal control)** ঃ কীটপতঙ্গের এক ধরনের যৌন হরমোন হল **ফেরোমোন**। বিশেষভাবে তৈরি ফাঁদে পুরুষ বা স্ত্রী হরমোন ব্যবহার করে পুরুষ ও স্ত্রী পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলে। ফুলকপি ও বাঁধাকপির পোকা মারার জন্য ফেরোমোন ব্যবহার করা হয়।

● 4. **ভেষজ জৈব-রাসায়নিকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Control by herbal organic chemicals)** ঃ (i) বিজ্ঞানীরা **কেনিয়ার এক প্রকার ফুল** থেকে **পাইরিথ্রাম** (Pyrethrum) নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এটি এক প্রকার প্রাকৃতিক কীটনাশক, যা কোনো দূষণ ঘটায় না অর্থাৎ পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় পাইরিথ্রাম চাষের প্রচেষ্টা চলছে। তা ছাড়া আমাদের দেশে **নিম গাছ নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থও** অনেক দিন ধরে পোকামাকড় দমনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। (ii) নিম গাছ থেকে **অ্যাজাডিরাকটিন** নামে এক ধরনের উপক্ষার পাওয়া যায়। এই অ্যালকালয়েড প্রয়োগ করে **মেরী পোকা** (Aphids), **সাদা মাছি** (White fly) ও **শ্যামা পোকা** (Jassids) নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

● 5. **কর্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ (Cultural control methods)** ঃ (i) পতঙ্গ দমন করার একটি প্রধান উপায় হল **চাষ-চক্র**। এ বছর জমিতে যে ফসলের চাষ হল, পরের বছর অন্য ফসল চাষ করাকেই **চাষ-চক্র** (crops rotation) বলে। (ii) জীবাণু-আক্রান্ত আগাছা মাঠ থেকে নির্মূল করে রোগের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। (iii) জলসেচ, জলনিকাশ, উপযুক্ত সার প্রয়োগ ও আগাছা পরিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্রের উদ্ভিদগুলিকে সবল ও সুস্থ রাখা যায়। (iv) ফসল কাটার পর জমির আক্রান্ত মূলগুলি ও গোড়াগুলি অপসারণ ও পরিষ্কার করলে রোগের তীব্রতা হ্রাস পায়। (v) রোগপ্রতিরোধক্ষম বিভিন্ন ফসল প্রজাতি চাষ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব।

● 6. **ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Control by Integrated Pest Management—IPM)** ঃ **সুসংহত বা ইনটিগ্রেটেড উপায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Integrated Pest Management)—ফসল চাষের প্রারম্ভ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ব্যবহৃত সব প্রযুক্তি গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ফসলের ক্ষতিকারক রোগ ও কীটের সংখ্যা ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোকে ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনা বলা হয়।**
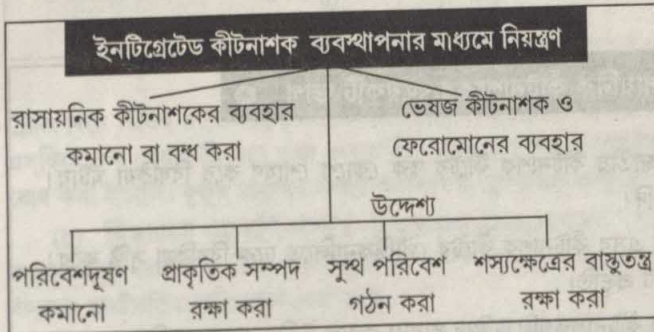
আজকাল বিজ্ঞানীরা ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনার কথা বলছেন। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকার ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনার দিকে নজর দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার। কীটনাশক মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশের অত্যন্ত ক্ষতি করে। তাই ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনায় ন্যূনতম রাসায়নিক কীটনাশকের সঙ্গে কীটপতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ, ভেষজ জৈব রাসায়নিকের ব্যবহার, কর্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন, কীটপতঙ্গে ফেরামোন প্রয়োগ ও জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য ভারত সরকার হায়দ্রাবাদে একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

● **জৈব কীটনাশক ব্যবহারের সুবিধা (Benefits of Biological Pest Control)** ঃ

1. অণুজৈব সার রাসায়নিক সার থেকে কম দামে পাওয়া যায়। 2. কম খরচে কীটপতঙ্গ দমন করা। 3. মাটি ও জল দূষণ-মুক্ত রাখা যায়। 4. খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল খেয়ে বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নির্মূল করা সম্ভব। 5. মানুষের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য

জীবের জীবন বিপন্নের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। 6. জৈব বিবর্ধক প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায়। 7. উষর জমিকে চাষযোগ্য করা সম্ভব। 8. জমির গঠন, উর্বরতা ও জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। 9. উদ্ভিদের ফলন বাড়ে। 10. অনেক সময় মাটির ভারী ধাতু শোষণ করে জমিকে দূষণমুক্ত রাখে।

- **কীটনাশক ব্যবহারের কুফল বা বিপদ (Hazards of Pesticides) :**

কীটনাশক বেশিরভাগই বিষাক্ত। এই রাসায়নিক পদার্থ মানুষ গৃহপালিত পশুপক্ষী, মাছ, উদ্ভিদ ও পরিবেশের অত্যন্ত ক্ষতি করে। কীটনাশকের কুফলগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

1. **জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর প্রভাব**—(i) কৃষিজমিতে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক প্রয়োগ করার ফলে বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে জলাশয়, পুকুর, নদনদী, হ্রদ ও সাগরের জলে মিশে মারাত্মক জল দূষণ ঘটাচ্ছে। এর ফলে জলজ মাছ, চিংড়ি ও বিভিন্ন জলজ প্রাণীর প্রাণহানি ঘটছে। (ii) জলজ ভাসমান উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

2. **মাটির উপর প্রভাব**—মাটিতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী (কেঁচো) ইত্যাদি বসবাস করে। মাটিতে কীটনাশক প্রয়োগ করার ফলে এদের মৃত্যু ঘটে। কেঁচো ও নানা প্রকার নাইট্রোজেন সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়। এদের মৃত্যুর ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

3. **জৈব বিবর্ধক প্রক্রিয়ার প্রভাব**— (i) মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, জল ইত্যাদি থেকে নানা উপায়ে কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থগুলি খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং ফ্যাটজাতীয় কলায় ও বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চিত হয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে। একে **জৈব বিবর্ধক প্রক্রিয়া** (Biological magnification) বলা হয়। এর ফলে জীবদেহে রক্তসংবহনের মাধ্যমে দেহের নানা জায়গায় পৌঁছায়, বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে জীবের মৃত্যু ঘটে। (ii) কীট ধ্বংসকারী পরজীবীদের সংখ্যা কমে যায়। এর ফলে নতুন অজানা কীটের আবির্ভাব ঘটে। (iii) কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগযোগী পতঙ্গের সংখ্যা কমে যায়, এর ফলে ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। (iv) কীটনাশক যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফলে কীটদের কীটনাশক সহ্যক্ষমতা বেড়ে যায়। কীট অনেক সময় ধ্বংস হয় না। এতে ফসলের আরও ক্ষতি হয়।

4. **বন্যপ্রাণীর উপর প্রভাব**—কীটনাশকের বহু ব্যবহার, যেমন— মানুষের উপর কুফল ঘটাচ্ছে তেমনি বিভিন্ন প্রাণী এমনকি বন্য প্রাণীর উপরও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। যেসব প্রাণী (পাখি) মাটি থেকে দানা শস্য খায় তাদের বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু ঘটছে। আবার এই সব পাখি যেসব প্রাণী খায় তাদের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়।

5. **মানুষের শরীরের উপর প্রভাব**—পৃথিবীর স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে নানারকমের কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে গিয়ে টিউমার, ক্যানসার সহ বহু রোগ সৃষ্টি করছে। যেমন— মানুষের দেহে পেস্টিসাইডের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে স্নায়ুতন্ত্র, যকৃৎ, পেশি, গ্রন্থির নানা প্রকার রোগ দেখা যায়।

❁ কাজ অনুসারে রাসায়নিক কীটনাশকের কয়েকটি ভাগ ❁

1. **স্পর্শবিষ** (Contact poison) : এক জাতীয় কীটনাশক কীটের ত্বক কোশে শোষণ করে বিষক্রিয়া ঘটায়। উদাহরণ—ডিডিটি, বি. এইচ. সি. ইত্যাদি।
2. **পাকস্থলী বিষ** (Stomach poison) : এসব কীটনাশক কীটের পৌষ্টিকনালিতে ঢুকে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদাহরণ—প্যারিস গ্রিন, লেড আর্সেনেট প্রভৃতি।
3. **সংবাহী বিষ** (Systemic poison) : এই কীটনাশকগুলি উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ কলায় শোষিত হয় এবং দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। কীট এই উদ্ভিদকলার রস শোষণ করলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। উদাহরণ—ডেমেটন, ডেমেফিরণ, কার্বোফিউরান প্রভৃতি।
4. **ধূপন** (Fumigant) : এই জাতীয় কীটনাশক থেকে উৎপন্ন বিষবাষ্প বায়ুর সঙ্গে কীটের শ্বাসতন্ত্রে যায় এবং বিষক্রিয়া ঘটায়।

14.1B. প্রাণী ও উদ্ভিদের গৃহপালিতকরণ (Domestication of Animals and Plants)

▲ প্রাণী গৃহপালিতকরণ (Domestication of Animals) ঃ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে অনেক বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে— গোরু, মোষ, গাধা, হাতি ইত্যাদি প্রাণীকে ভারী বোঝা বহন করার কাজে লাগিয়েছে এবং কয়েকটি প্রাণী থেকে দুধ, মাংস, চামড়া, লোম ইত্যাদি সংগ্রহ করে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। আবার মানুষ যখন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করে তখন থেকেই গবাদি পশুকে জমি চাষের কাজে লাগিয়েছে।

❖ 1. **সংজ্ঞা (Definition) ঃ যে পদ্ধতির সাহায্যে বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে বাড়ির পরিবেশে রেখে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায় সেই পদ্ধতিকে গৃহপালিতকরণ (Domestication) বলে।**

◘ 2. **বিভিন্ন প্রাণীর গৃহপালিতকরণ (Domestication of different Animal) ঃ**

(a) **কুকুরের গৃহপালিতকরণ (Domestication of Dog)**—মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে বুনো কুকুরকে মানুষ পোষ মানিয়ে তার জীবনের বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছে। আদিম মানুষকে কুকুর শিকার ধরার কাজে লাগিয়েছে। এছাড়া কুকুরকে বিশেষভাবে

চিত্র 14.5 ঃ পরিচিত কয়েকটি গৃহপালিত পশু।

ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন কাজে মানুষ লাগিয়েছে, যেমন— গোরু বা ভেড়ার পালকে বাইরের কোনো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, এস্কিমোদের স্লেজ গাড়ি বহন করা, অপরাধীকে খুঁজে বের করা, ঘরবাড়িকে কোনো বহিরাগত অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষের অনুপ্রবেশ রোধ করা ইত্যাদি। কুকুর মানুষের একটি অতিবিশ্বস্ত গৃহপালিত প্রাণী।

(b) **বিড়ালের গৃহপালিতকরণ (Domestication of Cat) ঃ** মানুষ বুনো বিড়ালকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করেছে প্রধানত ইঁদুর ধরার জন্য। ধান, গম ইত্যাদি ফসল নষ্ট করে ইঁদুর মানুষের বহু ক্ষতি সাধন করে এবং ইঁদুরকে ধ্বংস করে বিড়াল মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন রোধ করে।

(c) **প্রাণীজ সম্পদ (Livestock) ঃ যেসব গৃহপালিত জীব মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে তাদের এককথায় প্রাণীজ সম্পদ বলে।** এই জীবগুলির মধ্যে গবাদিপশু— গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, ঘোড়া ও উট প্রধান। এছাড়া হাঁস-মুরগি, মাছ ইত্যাদি প্রাণী মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন অনেকটা মেটায়।

1. **গবাদি পশু ও মোষ (Cattle and Buffaloes) ঃ** ভারতবর্ষের প্রধান প্রাণীজ সম্পদ বলতে গবাদি পশু ও মোষকে বোঝায়। ভারতবর্ষের অর্থনীতি গোরু (*Bos indicus*) ও মোষের (*Bos bubalus*) উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই প্রাণীদের উৎপাদিত বস্তুগুলির বর্ণনা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল—

(i) **দুধ** (Milk)—গোরু ও মোষ প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপাদন করে। দুধ হল একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য। দুধ থেকে দই, মাখন, ঘি, পনির ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত হয়।

(ii) **কৃষিকাজ** (Agriculture)—বলদ ও মোষ মানুষের কৃষি উপযোগী জমি প্রস্তুত করে।

(iii) **পরিবহন** (Transport)—বলদ ও মোষ বিশেষ ধরনের গাড়ি টেনে নিয়ে যায় এবং পরিবহনে সহায়তা করে।

(iv) **সার ও জ্বালানি** (Manure and fuel)—গবাদি পশু ও মোষের মল জৈব সার হিসাবে কৃষিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এদের মল পচিয়ে গোবর গ্যাস তৈরি করা হয়, যা জ্বালানির কাজ করে।

(v) **মাংস** (Meat)—মানুষের খাদ্য হিসাবে এরা মাংসের জোগান দেয় এবং মানুষের প্রোটিনের চাহিদা মেটায়।

(vi) **চামড়া** (Leather)—এই প্রাণীজ সম্পদ থেকে মানুষ চামড়া সংগ্রহ করে যার থেকে জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়।

2. **ভেড়া ও ছাগল (Sheep and Goat)** ঃ ভেড়ার (*Ovis* sp) লোম থেকে পশম বস্ত্র তৈরি হয়। ছাগলের (*Capra hircus*) দুধ খুবই উন্নত মানের। এছাড়া ভেড়া ও ছাগল থেকে মানুষ মাংস ও চামড়া সংগ্রহ করে।

3. **শূকর (Pig)** ঃ শূকর (*Sus serofa*) মানুষকে সবচেয়ে অর্থনৈতিক লাভজনক মাংস জোগান দেয়। শূকরের মাংস (Pork) থেকে **হ্যাম** (Ham), **বেকন** (Bacon) এবং **সসেজ** (Sausage) তৈরি করা যায়।
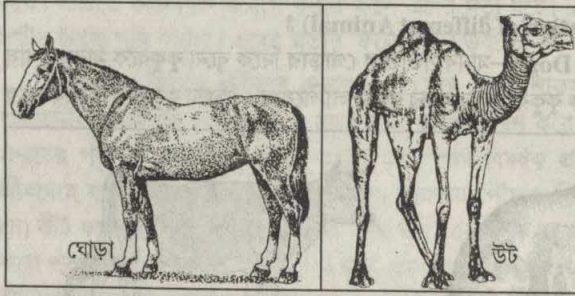
চিত্র **14.6** ঃ গৃহপালিত পশু।

4. **ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর (Horses, Donkey and Mules)** ঃ এই পশুগুলিকে প্রধানত ভারবাহী পশু বলে। ওই প্রাণীরা বিভিন্ন সামগ্রী বহন করে এবং মানুষও পরিবহন করে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে এই প্রাণীদের পরিবহনের কাজে লাগানো হয়। (i) ঘোড়া (Horses)—দ্রুতগতিসম্পন্ন এই প্রাণীর সাহায্যে মানুষ যাতায়াতের কাজ করে। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীতে ঘোড়াকে কাজে লাগানো হয়। (ii) **গাধা** (Donkey)— গাধা প্রতিপালন করা খুব সহজ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও এরা কাজ করতে পারে। গাধার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন সামগ্রী বহন করে। (iii) **খচ্চর** (Mule)—পুরুষ গাধা ও স্ত্রী ঘোড়ার প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জীব হল **খচ্চর** (Mule)। বিপরীত প্রজনন,
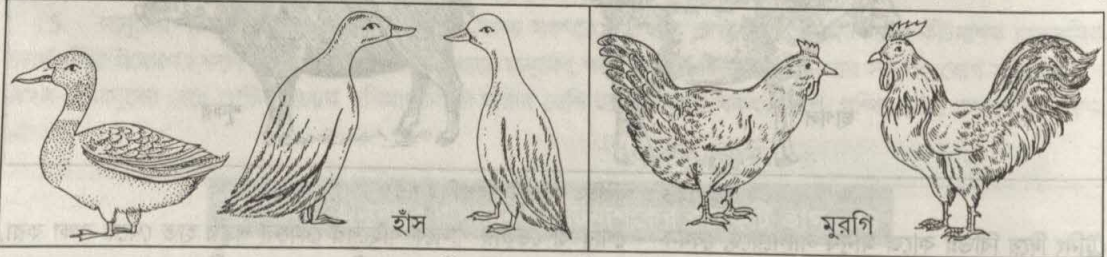
চিত্র **14.7** ঃ গৃহপালিত পাখি।

অর্থাৎ স্ত্রী গাধা ও পুরুষ ঘোড়ার প্রজননে সৃষ্ট সংকর জীবটিকে **হেন্নি** (Henny) বলে। এই সংকর জীবগুলি প্রজননে অক্ষম কিন্তু মাল পরিবহনে মানুষকে প্রভূত সাহায্য করে।

5. **উট (Camel)** ঃ উট (*Camelus dromidarus*)-কে মরুভূমির জাহাজ বলে। উত্তপ্ত মরুভূমির পরিবেশে উট মানুষ ও মাল পরিবহনে প্রভূত সহায়তা করে। দেহগত ও শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন অভিযোজনের ফলে উট মরুভূমিতে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

6. **পোলট্রি পাখি (Poultry birds)** ঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ডিম ও মাংসের জন্য যেসব গৃহপালিত পাখি পালন করা হয়, তাদের **পোলট্রি পাখি** বলে। পোলট্রি পাখিদের মধ্যে প্রধান হল মুরগি ও হাঁস। আজকাল সংকরায়ণ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্যবান, রোগপ্রতিরোধক্ষম এবং বেশি পরিমাণে বড়ো আকারের ডিম উৎপাদনকারী মুরগি উৎপন্ন করা হচ্ছে। উদাহরণ—**লেগহর্ন** (Leghorn), **প্লিমাউথ রক** (Plymouth Rock), **অস্ট্রালর্প** (Australorp) ইত্যাদি। তা ছাড়া সংকরায়ণ পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত মানের হাঁস, যেমন—**খাকী ক্যাম্পবেল, রানার** ইত্যাদি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

7. **মৎস্য চাষ (Pisciculture) ঃ** যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জলজ প্রাণীদের (মাছ, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া প্রভৃতি) প্রতিপালন, বৃদ্ধি, আহরণ এবং সংরক্ষণ করা হয় তাকে মৎস্য চাষ বলে। মৎস্য চাষকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(i) **সামুদ্রিক মাছ চাষ**—সমুদ্র মাছের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। সমুদ্রে

চিত্র **14.8** ঃ বিভিন্ন ধরনের মাছ।

মাছ চাষ করা হয় না, মাছ ধরা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য চাষ দু'প্রকার, যেমন—**উপকূলবর্তী মৎস্য চাষ** এবং **গভীর সমুদ্রে মৎস্য চাষ**। সমুদ্র থেকে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি প্রধান মাছের নাম **সার্ডিন, ম্যাকারেল, পমফ্রেট, বোম্বাই ডাক** এবং **কয়েকপ্রকার চিংড়ি** প্রভৃতি। (ii) **স্বাদু জলে মাছ চাষ**—নদী, পুকুর, হ্রদ, খাল, বিল প্রভৃতির মাছকে **স্বাদু জলের মাছ** বলে। **রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, শিঙি, মাগুর** ইত্যাদি মাছ স্বাদু জলে প্রচুর চাষ করা হয়। (iii) **ঈষৎ লবণাক্ত জলে মাছ চাষ**—সামান্য লবণাক্ত জলে মাছ চাষকে **ঈষৎ লবণাক্ত জলে মাছ** চাষ বলে। সাধারণত এই প্রকার মাছ চাষ খাঁড়ি ও ভেড়িতে হয়। এখানে **ভেটকি, ট্যাংরা, পার্সে, তপসে, ভাঙ্গন, আড়, ইলিশ, চিংড়ি** প্রভৃতি পাওয়া যায়।

আজকাল মিশ্রচাষ, প্রণোদিত প্রজনন, সংকর জাতীয় মাছের চাষের ফলে মৎস্য চাষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং বেশি পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

▲ উদ্ভিদ গৃহপালিতকরণ (Domestication of Plants)

সব রকম বিজ্ঞানের মধ্যে মানুষের প্রথম পরিচয় হয় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে। কৃষিকার্য ও উদ্ভিদ গৃহপালিতকরণ সম্ভবত 7,000 থেকে 13,000 বছর আগে মানুষ শিখেছিল। মনে করা হয় জলাশয়ের কাছাকাছি অর্থাৎ সিন্ধু, ইউফ্রাটিস, টাইগ্রিস ও নীল নদীর ধারে কৃষিকাজ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। তা ছাড়া আধুনিক মেক্সিকোর টেহুয়াকান উপত্যকা ও চীনের ইলো নদীর ধারে ও প্রাচীন মানুষের কৃষিকাজের পরিচয় পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে সব রকম প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর নানা স্থানে চাষ ও গৃহপালিতকরণ করা হচ্ছে।

● **উদ্ভিদ গৃহপালিতকরণের প্রথম স্থান ঃ** মানুষ প্রথমদিকে যে শস্যগুলি চাষ করত তাদের মধ্যে প্রধান ছিল গম ও যব। সেই সময় তারা ধান চাষ করত না বলে মনে হয়। কারণ প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে ধান বা চালের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। ধান চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে চীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মিশর ও সিন্ধু সভ্যতার অনেক পরে চীন সভ্যতার ইতিহাস। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগে মানব সভ্যতার আদিরূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

● **আধুনিক যুগে উদ্ভিদ গৃহপালিতকরণ ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে আখ ও বীট থেকে চিনি, উদ্ভিদের আঠা থেকে রবার, নানা রকম গন্ধ দ্রব্য, বিভিন্ন রকম তন্তু ও নানা প্রকার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এসব উদ্ভিদ এখন প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর নানা দেশে চাষ করা হয়। খাদ্যশস্য, তেল উৎপাদনকারী বীজ, তুলা, পাট, কফি, চা, তামাক প্রভৃতিও ব্যাপকভাবে অনেক দেশে চাষ হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সব উদ্ভিদ সহজেই উৎপন্ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে ফসলি উদ্ভিদের উন্নতজাত উদ্ভাবনের আধুনিক প্রজনন পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেমন— (i) **নির্বাচন** (Selection), (ii) **সংকরায়ণ** (Hybridization), (iii) **নতুন জাত প্রকরণ আনয়ন ও পরিবেশে অভ্যস্তকরণ** (Plant Introduction and acclimatization), (iv) **পরিব্যক্তি প্রজনন** (Mutation Breading), (v) **কলা পালন** (Tissue Culture) ইত্যাদি। এর ফলে অর্থকরী উদ্ভিদের চাষ বেড়েছে। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধে প্রয়োজন অনেকটাই মিটেছে। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় উন্নতমানের বহু অর্থকরী উদ্ভিদ পাওয়া যাচ্ছে।

▲ অর্থকরী উদ্ভিদের গৃহপালিতকরণ (Domesticated Economic Plants)

1. **শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (i) ধান (Rice)— *Oryza sativa*, (ii) গম (Wheat)— *Triticum aestivum*, (iii) ভুট্টা (Maize)— *Zea mays*, (iv) বার্লি বা যব (Barley)— *Hordium vulgare*, (v) ওট (Oat)— *Avena sativa*, (vi) জোয়ার (Sorghum)— *Sorghum vulgare*, এবং (vii) বাজরা (Pearl milet)— *Pennisetum glacum.*
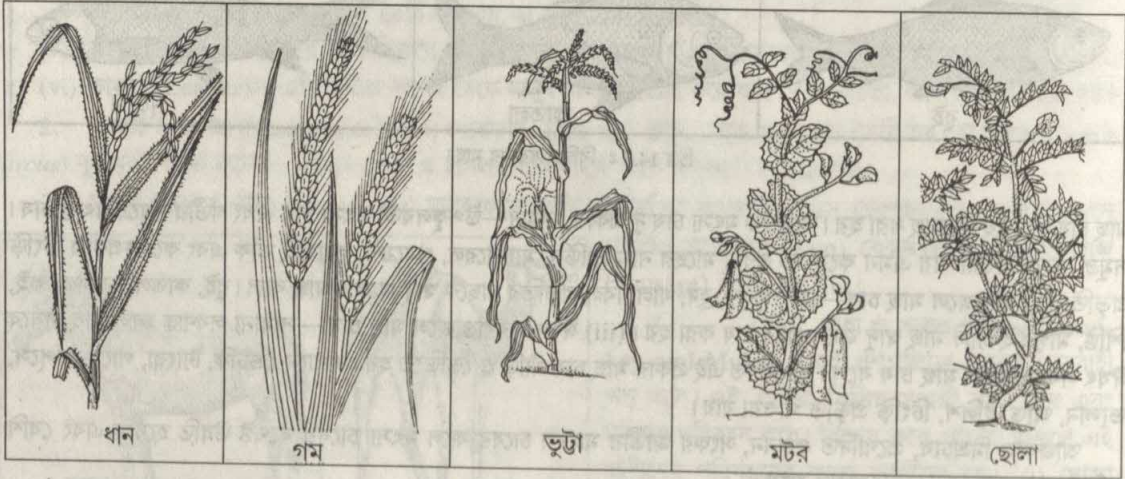
চিত্র 14.9 : কয়েকটি অর্থকরী উদ্ভিদ।

2. **ডাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (i) মশুর (Lentil)— *Lens culinaris*, (ii) মুগ (Green gram)— *Phaseolus mungo*, (iii) ছোলা (Gram)— *Cicer arietinum*, (iv) অড়হর (Pigeon Pea)— *Cajanas cajan*, (v) মটর (Pea)— *Pisum sativum*, (vi) সয়াবিন (Sayabean)— *Glycin max.*
3. **বাদাম বা নাট জাতীয় ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (a) **স্নেহজাতপদার্থযুক্ত ফল :** (i) কাজু (Cashewnut)— *Anacardium occidentale*, (ii) নারকেল (Coconut)— *Cocos nucifera*, (iii) আখরোট (Walnut)— *Juglans regia.* (b) **প্রোটিনযুক্ত ফল :** (i) বাদাম (Almond)— *Prunus amygdalus*, (ii) পেস্তা (Green almond)— *Pistacea vera.* (c) **কার্বোহাইড্রেটযুক্ত ফল :** চেস্টনাট (Chest nut)— *Castanea sativa.*
4. **সবজি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** (i) কুমড়ো (Gourd)— *Cucurbita maxima* (ii) লাউ (Bottle gourd)— *Lagenaria siceraria* (iii) পটল — *Trichosanthes dioica* (iv) ঝিঙা — *Luffa acutangnla* (v) বেগুন (Brinjal)— *Solanum melongena* (vi) ঢেঁড়স (Lady's finger)— *Abelmoschus esculantus* (vii) মুলো (Radish)— *Raphanus sativus* (viii) গাজর (Carrot)— *Daucus carota* (ix) বিট (Beat)— *Beta vulgaris* (x) আলু (Potato)— *Solanum tuberosum.*
5. **মশলা দ্রব্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** (i) আদা (Ginger)—*Zingiber officinale*, (ii) হলুদ (Turmeric)— *Curcuma longa*, (iii) দারুচিনি— *Cinnamomum zeylanicum* (iv) লবঙ্গ — *Sygygium arometicum*, লংকা — *Capsicum frutescens*, গোলমরিচ — *Piper nigrum*, জিরা— *Cuminum cymium* , ধনে— *Coriandrum sativum.*
6. **তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (i) তুলা (cotton)—*Gossypium herbaceum*, (ii) পাট (Jute)— *Corchorus capsularis C. olitorius*, (iii) নারকেল— (Coconut)—*Cocos nuscifera.*
7. **কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (i) শাল —*Shorea robusta*, (ii) সেগুন— *Tectona grandis*, (iii) মেহগনি— *Swietenia mahogani.*
8. **ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ :** — (i) সর্পগন্ধা—*Rauvolfia serpentina*, (ii) ইপিকাক— *Cephalis ipecacuanha*, (iii) অ্যাকোনাইট— *Aconitum napellus*, (iv) অশোক —*Sarca indica*, (v) অর্জুন— *Terminalia arjuna*, (vi) কালমেঘ—*Andrographis paniculata*, (vii) বাসক—*Adhatoda vasica*, (viii) ধুতুরা— *Datura metal.*

❂ 14.1C. বিপদগ্রস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ ❂
(Conservation of Endangered Animals and Plants)

পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার হলেও অফুরন্ত নয়। কিন্তু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে ওইসব সম্পদ যথেচ্ছ অপব্যবহার করার ফলে আধুনিক সভ্যজগৎ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অপরিমিত খনিজ পদার্থ আহরণ ও ব্যবহার, নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা, বনজঙ্গল কাটা প্রভৃতি অসাধু ও অদূরদর্শী কাজের ফলে মানুষ আজ খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন। প্রাকৃতিক সম্পদের এইরূপ অপচয় ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলস্বরূপ ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এর ফলে মানুষ অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। তাই মানবজাতির সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য সম্পদের বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার, অপচয়রোধ ও ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

❖ (a) **সংরক্ষণের সংজ্ঞা (Definition of Conservation) ঃ সুপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, রক্ষণ, অপচয় রোধ ও ক্ষয়পূরণের পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলে।**

◘ (b) **সংরক্ষণের উদ্দেশ্য (Aim of Conservations)** ঃ (1) মানুষকে নির্মল আনন্দ দান। (2) প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা, অপচয়রোধ ও ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা। (3) বিরল ও মূল্যবান উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখা। (4) মানবকল্যাণ ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার। (5) বাস্তুতন্ত্রকে স্বাভাবিক রাখা ও বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলের জীবদের আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখা।

◘ (c) **প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Natural Resources)** ঃ প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন— 1. **পুনর্গঠনযোগ্য** (Renewable)—যেসব সম্পদ একবার ব্যবহারে শেষ হয়ে যায় না এবং পুনরায় গঠিত হতে পারে তাদের **পুনর্গঠনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ** বলে। উদাহরণ— ভূমি বা মৃত্তিকা, বন, বন্যপ্রাণী, জল, শস্য প্রভৃতি। 2. **পুনর্গঠন-অযোগ্য** (Non-renewable)—যেসব সম্পদ একবার ব্যবহারেই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাদের পুনর্গঠন-অযোগ্য **প্রাকৃতিক সম্পদ** বলে। উদাহরণ— কয়লা, তেল, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি। 3. **অপরিবর্তনীয়** (Unalterable)—যেসব প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার বহুল ব্যবহারের ফলেও কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না তাদের অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। উদাহরণ— জলাশয়, নদী, সূর্যালোক, নৈসর্গিক দৃশ্য প্রভৃতি।

▲ বিপদগ্রস্ত প্রজাতি (Endangered Species)

❖ (a) **সংজ্ঞা ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের কার্যকলাপের জন্য কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশ ধ্বংস বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং ওই পরিবেশ থেকে তারা প্রায় অপসারিত বা বিলুপ্ত হলে তাদের বিপদগ্রস্ত প্রজাতি (Endangered species) বলা হয়।**

◘ (b) **উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণ (Causes of Endangered Plant and Animal species)** ঃ উদ্ভিদ বা প্রাণীর নির্দিষ্ট পরিবেশ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন মতো খাদ্য, উপযুক্ত পরিবেশ, জননের সুবিধা ইত্যাদি। পরিবেশ ধ্বংস, শিকার, দূষণ, কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পস্থাপন, চাষের জমি বৃদ্ধি, অরণ্যধ্বংস, অত্যধিক পশুচারণ, বসতিস্থাপন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কারণে সারা পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে হারিয়ে গেছে এবং বহু প্রজাতি বিপদগ্রস্ত। নীচে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করা হল।

1. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ** (Causes of natural calamities) ঃ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জীব প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি হল—(i) **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত**—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আশেপাশের পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বহু প্রাণীর বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ii) **ভূমিকম্প**—কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের ফলে এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং অনেক জীব বিপদগ্রস্ত হয়। (iii) **দাবানল**—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অরণ্যে প্রায়ই দাবানলের ঘটনা ঘটে। এর ফলে জীবের ব্যাপক ক্ষতি হয়। দাবানলের ফলে বহু দুর্লভ উদ্ভিদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। (iv) **হিমবাহ**— হিমবাহে পুরু বরফের স্তরের প্রবাহে বহু জীব বিপন্ন ও বিলুপ্ত হয়। (v) **ভূমির ধ্বস ও নদীর ভাঙন**—ধ্বস ও নদীর ভাঙনে বহু দুর্লভ প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। (vi) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ**— হারিকেন, সাইক্লোন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জীব প্রজাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

2. **মানুষের কার্যকলাপের কারণ** (Causes of human activities) ঃ জীব প্রজাতি বিলুপ্ত এবং বিপদগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণগুলি হল—(i) **মানুষের বাসস্থান নির্মাণ**— বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য নতুন নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে

মানুষকে অরণ্য ধ্বংস করতে হচ্ছে, ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। তা ছাড়া আশেপাশের পুকুর, খাল ভরাট করে গৃহ নির্মাণ হচ্ছে। এতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর চরম ক্ষতি হচ্ছে। (ii) **নগরায়ণ**—বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে ক্রমেই গড়ে উঠছে শহর, নগর, বন্দর ইত্যাদি। এতেও অরণ্য, কৃষিজমি, পতিত জমি সবই শহর ও নগর বানানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। (iii) **কৃষিজমির সম্প্রসারণ**—বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য বন ধ্বংস করে এবং জলাশয় ভরাট করে ওই জমি কৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। এতে জীবের বাসভূমি ধ্বংস হচ্ছে, বহু জীব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (iv) **কীটনাশকের ব্যবহার**— বিষাক্ত কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে বহু জীব চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং বহুজীব মৃত্যুপথযাত্রী। (v) **শিকার ও ব্যাবসা**—ব্যবসায়ীদের চামড়া, শিং, মাংস, চর্বি, পশম প্রভৃতির চাহিদার জন্য এবং মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে নির্মমভাবে অসংখ্য বন্যপ্রাণী হত্যা করা হচ্ছে। এর ফলে অসংখ্য প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। হিসেব থেকে দেখা যায় আরও অসংখ্য বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। (vi) **অত্যধিক আহরণ**—মানুষের চাহিদা মেটাতে নানা দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য, ওষুধ, কাঠ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য গুপ্তবীজী, নগ্নবীজী, ফার্ন, মস্ প্রভৃতি বহু রকম প্রজাতির উদ্ভিদ অত্যধিক আহরণ করা হচ্ছে, আজ এদের অনেকে বিপদগ্রস্ত। (vii) **দূষণ সমস্যা**—শিল্পপ্রসারণ, যানবাহন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য জল, বায়ু ও স্থলজ পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী অদৃশ্য ও বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। (viii) **অন্যান্য কারণ**—বাঁধ নির্মাণ, যুদ্ধবিগ্রহ, পারমাণবিক পরীক্ষা ইত্যাদি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এতে জীবের চরম ক্ষতি হচ্ছে।

চিত্র 14.10 : বিপন্ন প্রজাতি—A. সর্পগন্ধার (*Rauvolfia serpentina*) বিটপ অংশ এবং B. সর্পগন্ধার মূল।

সবুজ উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর সুষম অনুপাত হল 99 : 1 অর্থাৎ 99 ভাগ উদ্ভিদ থাকলে তবে সেখানে একটিমাত্র প্রাণী স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। প্রথম শ্রেণির খাদক প্রাণী উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উদ্ভিদ না থাকলে স্বাভাবিক ভাবে খাদক প্রাণীদের সংখ্যা কমবে। মাংসাশী প্রাণী যারা শাকাশী প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। খাদ্য, জল, বাসস্থান— এই তিনটির সমস্যা হল জীব বিপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ।

● **বিপদগ্রস্ত কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি (Some endangered species of Plants and Animals) :**

চিত্র 14.11 : কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতি উদ্ভিদ।

○ **A. উদ্ভিদ (Plants) : 1. *রাউওলফিয়া সার্পেন্টিনা (Rauvolfia serpentina)* :** উদ্ভিদটির বাংলা নাম **সর্পগন্ধা**। বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসক **লিওনার্ড রাউওলফ্**-এর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয়েছে। মূলের ছাল উচ্চ রক্ত চাপ কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া স্নায়ুর উত্তেজনা কমানো ও অনিদ্রায় ঘুম পাড়ানোর ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারত থেকে বিদেশেও সর্পগন্ধার মূল রপ্তানি হয়। এই উদ্ভিদটি ভারতের একটি বিপদগ্রস্ত ভেষজ উদ্ভিদ।

2. *নিপেন্থিস খাসিয়ানা (Nepenthes khasiana)* ঃ এই উদ্ভিদটির বাংলা নাম **কলসপত্রী**। আসামের খাসিয়া পাহাড়ে এই পতঙ্গভুক উদ্ভিদটি প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ল্যাবরেটারিতে সংগ্রহ করার জন্য এবং ব্যাপকভাবে বিদেশে বিক্রি করার জন্য কলসপত্রী উদ্ভিদটির অস্তিত্ব ক্রমশ হারাতে বসেছে।

3. *অ্যাব্রোমা আন্‌গাস্টা (Abroma angusta)* ঃ এই উদ্ভিদটির বাংলা নাম **ওলট কম্বল**। উদ্ভিদটির মূলের ছাল স্ত্রীরোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজ উদ্ভিদটি অবলুপ্তির পথে।

4. *টেরোকার্পাস স্যান্টালিনাস (Pterocarpus santalinus)* ঃ রক্তচন্দন অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যের জঙ্গলে জন্মায়। এই মূল্যবান উদ্ভিদটি ওষুধ প্রস্তুতে, বাদ্যযন্ত্রে ও পুজোপার্বনে ব্যবহারের জন্য দুষ্প্রাপ্য ও বিপদগ্রস্ত হয়েছে।

5. *গিঙ্গো বাইলোবা (Ginkgo biloba)* ঃ জিঙ্গো হল এক ধরনের প্রাচীন ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ এক সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র জন্মাত। কিন্তু এখন এদের পশ্চিম চীনের পাহাড়ি অঞ্চলে শুধু দেখা যায়। একেও বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদ বলা যায়।

B. প্রাণী (Animals) ঃ 1. *পিথিকোফেগা জেফরি (Pithecophaga jefferyi)*—এই বিশাল ঈগল পাখিটি ছোটো ম্যাকাও বানর ও কাঠবিড়ালি ধরে খায়। আজ এই বানরভোজী ঈগলপাখি অবলুপ্তপ্রায়।

চিত্র 14.12 ঃ কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী।

2. *চরিওটিস নিগ্রিসেপ (Choriotis nigricep)*—গুজরাটের গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড নিজস্ব পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার ফলে বিপদগ্রস্ত।

3. *রাইনোসেরস ইউনিকরনিস (Rhinoceros unicornis)* —ভারতে গন্ডার পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া ও অসমের কাজিরাঙ্গা অঞ্চলে। ভারতীয় গন্ডার একশৃঙ্গযুক্ত। চোরাশিকারি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের অর্থের লোভ ও অরণ্য কেটে বসতি গড়ে ওঠার জন্য গন্ডারের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই শাকাশী প্রাণীটি এখন বিপন্ন।

4. *পেন্থেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris)* —ভারতীয় বাঘের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আকারে ও সৌন্দর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এদের সুন্দরবনে বেশি পাওয়া যায়। অরণ্য ধ্বংস, চোরাশিকারি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য এই প্রজাতিটিও বিপদগ্রস্ত। ভারতীয় বাঘের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

14.1C-1. রেড ডাটা বুক (Red Data Book)

❖ (a) **রেড ডাটা বুকের সংজ্ঞা (Definition of Red data book)** ঃ **যে পুস্তকে পৃথিবীর বিলুপ্ত অথবা বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর তথ্য সম্বলিত থাকে সেই পুস্তককে রেড ডাটা বুক বলে।**

■ (b) **রেড ডাটা বুকের ব্যাখ্যা (Explanation of Red Data Book)** ঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে এই গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়। **টি. পি. সি.** (T. P. C. = Threatened Plant Committee)-এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে **ডাব্লু. ডাব্লু. এফ.** (WWF = World Wild Life Fund)-এর অর্থানুকূল্যে **আই. ইউ. সি. এন.** (IUCN = International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) পুস্তকটি (Red data book) প্রকাশ করে। প্রথম পর্যায়ে এই পুস্তকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ইতিহাস, বিপন্ন হবার কারণ, নাম, বর্তমান অবস্থান, বিস্তৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থান, প্রস্তাবিত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, ব্যবহারোপযোগিতা, বর্ণনা, চাষপদ্ধতি ও তথ্যনির্দেশিকা (Reference) থাকে। টিপিসি প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেড ডাটা বুক সম্পূর্ণ আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা অর্থাৎ আই. ইউ. সি. এন. (IUCN) উদ্ভিদের মতো লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর নাম তালিকাভুক্ত করে রেড ডাটা বুক নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। তাছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তি ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশিত হয়।

■ (c) **রেড ডাটা বুকের শ্রেণি (Category of Red data book)** : প্রত্যেক বছর 'রেড ডাটা বুক' পুস্তকে নতুন তথ্য সংযোজন হয়। বিলুপ্ত ও বিপদগ্রস্ত বা লুপ্তপ্রায় প্রজাতির অবস্থানিক মান (Status) প্রকাশের জন্য এই পুস্তকে 9 রকমের শ্রেণি ব্যবহার করা হয়। এসব শ্রেণি উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। শ্রেণিগুলি হল—

1. **অবলুপ্ত (Extinct)** : যে প্রজাতি বার বার খুঁজে তার নিজস্ব (টাইপ এলাকা) এলাকা বা অন্য কোনো এলাকা থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এরকম অবস্থার জন্য এই ক্যাটাগরি (Ex) ব্যবহৃত হয়। বন্য পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি যদি একটিও খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে সেই প্রজাতিকে বন্য পরিবেশে অবলুপ্ত বলে।
2. **বন্য পরিবেশে অবলুপ্ত (Extinct in the Wild Environment)** : কোনো জীবকে তার নিজস্ব বন্য পরিবেশে খুঁজে পাওয়া না গেলে তাকে বন্য পরিবেশে অবলুপ্ত বলা হয়।
3. **ভীষণভাবে বিপন্ন (Critically Endangered)** : বন্য পরিবেশে যে সব জীবের আসন্ন ভবিষ্যতে অবলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ভীষণভাবে বিপন্ন বলা হয়।
4. **বিপন্ন (Endangered)** : যে সব প্রজাতি আগামী 20 বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তাদের বিপন্ন প্রজাতি বলে। এসব প্রজাতির প্রাকৃতিক অবস্থায় বংশবিস্তার সীমিত হয়ে যাচ্ছে।
5. **বিপদগ্রস্ত (Vulnerable)** : পরিবেশ ধ্বংসের কারণে ক্রমান্বয়ে যেসব প্রাণী বিপদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে।
6. **কম বিপদগ্রস্ত (Lower risk)** : যেসব প্রজাতি এখনো বিপদগ্রস্ত হয়নি, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।
7. **ইন্টারমেডিয়েট (Intermediate)** : কোনো প্রজাতিকে অবলুপ্ত, বিপদগ্রস্ত, বিপজ্জনক, সীমিত ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানা নেই।
8. **তথ্য অসম্পূর্ণ (Data deficient)** : কোনো প্রজাতি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্যের জন্য উপরিউক্ত কোনো পর্যায়ভুক্তই করা যায় না তাদের তথ্য অসম্পূর্ণ বলে।
9. **বিপদমুক্ত (Out of Danger)** : কোনো প্রজাতির যা পূর্বে উপরিল্লিখিত কোনো পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে পর্যাপ্ত বংশবৃদ্ধির ফলে বিপদমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের বিপদমুক্ত বলা হয়।

1963 খ্রিস্টাব্দে রেড ডাটা বা লাল তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে সারা পৃথিবী ব্যাপী লুপ্তপ্রায়, বিপদগ্রস্ত জীবের তথ্য (সংখ্যা, অবস্থান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি) সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর পর লাল তালিকার সংস্করণ আরও প্রকাশিত হয়েছে। 2000 সালের লাল তালিকায় 18000 প্রজাতির নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে 11,096টি প্রজাতি ভীষণভাবে বিপন্ন অথবা বিপন্ন প্রায় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত। দেখানো হয়েছে 11,096 প্রজাতির মধ্যে 5,485টি প্রাণী এবং 5,611টি উদ্ভিদ, এদের মধ্যে 1939টি প্রজাতি ভীষণভাবে বিপন্ন (925টি প্রাণী এবং 1014 টি উদ্ভিদ)।

2000 সালের লাল তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ভারতের 18টি প্রাণী ও 44টি উদ্ভিদ ভীষণভাবে বিপন্ন, 54টি প্রাণী ও 113টি উদ্ভিদ প্রায় বিপন্ন এবং 145টি প্রাণী ও 87টি উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতের বিপন্ন প্রাণীদের মধ্যে বাঘ, সিংহ, এক শৃঙ্গ গন্ডার, তুষার চিতা, লাল পান্ডা কস্তুরী মৃগ, ডলফিন, কুমিড়, ঘড়িয়াল, কচ্ছপ, ধনেশ পাখি, ঈগল প্রভৃতি আছে। উদ্ভিদের মধ্যে বিপন্ন হল—সর্পগন্ধা, বেলাডোনা, ডাইসকোরিয়া ডেলটয়ডিয়া, ড্রসেরা, কলসপত্রী, কলচিকাম লুটিয়াম, ট্রি ফার্ন, রক্ত চন্দন, সাইকাস, নিটাম প্রভৃতি।

পৃথিবীর বহুদেশের লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য সংগ্রহ করে নিজস্ব রেড ডাটা বুক তৈরি করেছে। আমাদের দেশে এই ধরনের কাজ এখনও অসমাপ্ত। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া ভারতের বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের তিন খণ্ড রেড ডাটাযুক্ত প্রকাশ করেছে। চতুর্থ খন্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রথম খণ্ডে 235 টি এবং দ্বিতীয় খন্ডে 200 টি বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের নাম রয়েছে। এসব উদ্ভিদের অনেকগুলি বোটানিক্যাল গার্ডেনে এ জাতীয় পার্কে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একইভাবে জুলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রেড ডাটা বুকের তালিকা প্রস্তুত করছে। এখন পর্যন্ত 81 টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, 47 টি পাখি, 15 টি সরীসৃপ, 3 টি উভচর এবং অনেকগুলি বিপদগ্রস্ত প্রজাতির নাম রয়েছে।

রেডডাটা বুকে রয়েছে এমন কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদাহরণ হল— উদ্ভিদ—(i) সর্পগন্ধা (*Rauvolfia serpentina*); (ii) চন্দন (*Santala album*)। প্রাণী— (i) গণ্ডার (*Rhinoceros unicornis*) ; (ii) ভারতীয় বাঘ (*Panthera tigris*)।

◘ (d) **রেড ডাটা বুকের উদ্দেশ্য (Objective of Red Data Book) ঃ**

1. বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধি করা।
2. বিপন্ন ও বিপন্নপ্রায় প্রাণীদের সনাক্ত করণ, সংরক্ষণ ও তাদের বিবরণ দেওয়া।
3. জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রসঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করা।
4. স্থানীয় স্তরে সংরক্ষণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সংরক্ষণে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা।

✪ 14.1C-2. গ্রিন ডাটা বুক (Green Data Book) ✪

❖ (a) **গ্রিন ডাটা বুকের সংজ্ঞা (Definition of Green Data book) ঃ যে পুস্তকে নির্দিষ্ট এলাকায় সংরক্ষিত বিরল বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের নাম ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাকে গ্রিন ডাটা বুক বলে।**

◘ (b) **ব্যাখ্যা (Explanation)** ঃ রেড ডাটা বুক পৃথিবীর সবদেশের বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকাভুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ সুপরিচিত পুস্তক বলা যায়। কিন্তু **গ্রিন ডাটা বুক হল বিপদগ্রস্ত বিরল উদ্ভিদ সংক্রান্ত পুস্তক**। 1987 খ্রিস্টাব্দে **ইউক্রেনের জাতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের** (Institute of Botany of the National Academy of Science of Ukraine) বিজ্ঞানীরা গ্রিন ডাটা বুক প্রথম প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বিরল লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ গোষ্ঠীর রক্ষণ ও সংরক্ষণের তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে 1997 খ্রিস্টাব্দের প্রথমে এই পুস্তকটি আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করে। এই পুস্তকে তালিকাভুক্ত বিরল লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদগুলির সঠিক বিবরণ, আইনগত ও ন্যায়সংগত রক্ষণাবেক্ষণ আলোচিত হয়েছে। তাদের বংশানুক্রমিক পর্যায়ে সঠিক শ্রেণিভুক্তকরণ এবং যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই পুস্তকে মোট 126টি বিরল লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের তথ্য রয়েছে। গ্রিন ডাটা বুককে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য এটি একটি সঠিক ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেমন— (i) অরণ্য বা বনাঞ্চলের উদ্ভিদ। (ii) তৃণভূমির উদ্ভিদ। (iii) জলজ উদ্ভিদ। (iv) পঙ্কিল জলাভূমির উদ্ভিদ। (v) শুষ্ক ও তৃণাবৃত এবং উদ্ভিদহীন প্রান্তরের উদ্ভিদ। (vi) গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

এই পুস্তকে প্রথমে **ইউক্রেনের** বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের তত্ত্ব ও সংরক্ষণের তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে এই পুস্তকের একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে। ভারতে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অনেকগুলি বিরল উদ্ভিদসমৃদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেনকে একইভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এই পুস্তকে ইউক্রেনের বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের তত্ত্ব ও সংরক্ষণের তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে এই পুস্তকটির আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে। ভারতে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অনেকগুলি বিরল উদ্ভিদ বোটানিক্যাল গার্ডেনে একইভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

✪ 14.1C-3. পতঙ্গ ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্য— ✪ রেশমমথ, মৌমাছি ও লাক্ষারচাষ (Insects and their products— Sericulture, Apiculture, and Lac culture)

সমগ্র প্রাণীজগতের প্রায় $^3/_4$ অংশ জুড়ে রয়েছে পতঙ্গশ্রেণির প্রাণী। পতঙ্গ একশ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সন্ধিপদ পর্বের (Phylum —Arthropoda) অন্তর্গত। এই বিশাল সংখ্যার প্রাণীরা খাদ্যের জন্য প্রধানত উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড এবং উদ্ভিদজাত শস্যের উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো পতঙ্গ শস্য উৎপাদনে মানুষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং এদের **পেস্ট** (pest) বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া কিছু পতঙ্গ মানুষের উপকারে লাগে এবং এদের **উপকারী পতঙ্গ** (Beneficial insects) বলা হয়। এইসব পতঙ্গ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য, মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগায়। উপকারী পতঙ্গের মধ্যে রেশমমথ রেশম উৎপাদন করে, মৌমাছি মধু ও মোম উৎপাদন করে এবং লাক্ষাকীট লাক্ষা রেজিন উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই পতঙ্গ গুলির লালনপালন করে এবং এদের উৎপাদিত বস্তু বাজারে বিক্রি করে বহুমানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করে এবং বেকারি সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পায়।

□ (a) **পতঙ্গশ্রেণির প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Principal characteristics of animals of class insecta) ঃ**

1. দেহ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়, যেমন—মস্তক, বক্ষ ও উদর। 2. বক্ষের তিনটি খণ্ড থেকে তিনজোড়া উপাঙ্গের সৃষ্টি হয়। 3. শ্বসন অঙ্গ হিসাবে শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Trachea) দেখা যায়। 4. একজোড়া অ্যান্টেনা (Antenna) থাকে।

□ (b) **কয়েকটি উপকারী পতঙ্গ (Some beneficial insects) ঃ যেসব পতঙ্গ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য তৈরির সাহায্যে মানুষের উপকার করে তাদের উপকারী পতঙ্গ বলে।** যেমন—আমরা রেশমমথ, মৌমাছি, লাক্ষাকীট ইত্যাদি।

▲ রেশমমথের চাষ (Sericulture)

❖ (a) **রেশম চাষের সংজ্ঞা—1. যে কৃষিজ শিল্পে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রেশম মথের প্রতিপালন, রেশম কীটের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং রেশমগুটি থেকে রেশম উৎপাদিত হয় তাকে রেশমচাষ (Sericulture) বলে।**

❖ 2. **রেশমের সংজ্ঞা ঃ রেশম হল একপ্রকার প্রাণীজ তন্তু যা রেশমমথের পিউপার বাইরে শক্ত গুটি বা খোলক থেকে নিষ্কাশিত করা হয়।**

চিত্র 14.13 ঃ বিভিন্ন প্রজাতির রেশমমথ।

রেশম মথ থেকে রেশম বা রেশম তন্তু দিয়ে রেশমবস্ত্র তৈরি করা হয়। রেশমমথের জীবনচক্রে রূপান্তর দেখা যায়, অর্থাৎ রেশমমথের ডিম থেকে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা এবং সবশেষে পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ রেশমমথ সৃষ্টি হয়। রেশমমথের লার্ভা মোট চারবার খোলস বদলায় এবং শেষে পঞ্চম দশায় পরিণত হয়। **এই পঞ্চম দশার পরিণত লার্ভা তার একজোড়া রেশমগ্রন্থি থেকে মুখউপাঙ্গ স্পিনারেটের মাধ্যমে তরল অবস্থায় রেশম নির্গত করে যা বায়ুর সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে রেশমতন্তুতে পরিণত হয়।** রেশম তন্তু পিউপার বাইরে গুটি গঠন করে এবং পিউপাকে সুরক্ষিত করে। রেশমতন্তু দু'ধরনের প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয়, যেমন— তন্তুর ভিতরের অংশে **ফাইব্রয়েন** (fibroin) এবং বাইরের অংশে **সেরিসিন** (Sericine) থাকে।

□ (a) **বিভিন্ন প্রকার রেশম ও রেশমমথ (Different types of silk and silk moth)** ঃ সর্বমোট চার প্রকার রেশম চারটি ভিন্ন প্রজাতির রেশমমথ থেকে উৎপাদিত হয়। এগুলির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল—

(i) **তুঁতজাত রেশম (Mulberry Silk)** —সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত এই রেশম *বম্বিক্স মরি* (*Bombyx mori*) নামে রেশমমথ থেকে পাওয়া যায়। এই রেশমমথের লার্ভা তুঁতগাছের পাতা খেয়ে বাড়ে।

(ii) **তসর (Tassar Silk)**—এই রেশম *অ্যান্থেরিয়া মাইলিটা* (*Antheraea mylitta*) নামে রেশমমথ থেকে পাওয়া যায়। তসর রেশমমথের লার্ভা প্রধানত আসান, অর্জুন ইত্যাদি গাছের পাতা খেয়ে বড়ো হয়।

(iii) **মুগা রেশম (Muga Silk)** —এই রেশম *অ্যান্থেরিয়া অ্যাসামেনসিস* (*Antheraea assamensis*) নামে রেশমমথ থেকে মুগা উৎপাদিত হয়। সোম, সোয়ালু ইত্যাদি গাছের পাতা খেয়ে এই রেশমমথের লার্ভা বাড়ে।

(iv) **এরি, এন্ডি বা এরান্ডি রেশম (Eri, Endi or Errandi Silk)** — এই রেশম *অ্যাটাকাস রিসিনি* (*Attacus ricinii*) নামে রেশমমথ থেকে উৎপাদিত হয়। রেড়ি (castor) গাছের পাতা খেয়ে এই রেশমমথের লার্ভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চার ধরনের রেশমমথের মধ্যে শুধুমাত্র তুঁতজাত রেশমমথের চাষ বাড়ির কৃত্রিম পরিবেশে করা সম্ভব। অন্যান্য রেশমমথের চাষ উদ্যানে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে করা হয়।

□ (b) **রেশমের ব্যবহার (Use of silk)** ঃ রেশমতন্তু হালকা, টেকসই ও খুব সুন্দর রং নিতে পারে বলে খুবই আদরণীয় তন্তু। রেশম তন্তু থেকে রেশমবস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করা হয়। এছাড়া মাছ ধরার সুতো তৈরিতে, প্যারাস্যুট নির্মাণে, বিদ্যুৎ অপরিবাহী আবরণ তৈরি ইত্যাদিতে রেশমের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

▲ মৌমাছি পালন (Apiculture)

❖ (a) **সংজ্ঞা—বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৃত্রিম বাক্সে মৌমাছি রেখে সেখানকার মৌচাক থেকে মধু ও মোম উৎপাদন করার পদ্ধতিকে মৌমাছি পালন বা এপিকালচার (Apiculture) বলে।**

মৌচাক থেকে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি হল মধু ও মৌ-মোম। শ্রমিক মৌমাছি ফুলের মকরন্দ গ্রন্থি বা নেক্‌টার গ্রন্থি থেকে মিস্টি মকরন্দ বা নেকটার সংগ্রহ করে। এরপর তারা এই নেক্‌টার ক্রপে করে এনে বমি করে মৌচাকের মধুপ্রকোষ্ঠে মধু হিসাবে সঞ্চয় করে। মৌচাক থেকে মোম উৎপন্ন হয়।

■ (b) **মৌমাছির বিভিন্ন প্রজাতি (Different species of honey bee) ঃ** প্রধানত চারটি প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়, যেমন—

1. *এপিস্ ডরসাটা* (*Apis dorsata*)—এই প্রজাতির মৌমাছিকে **পাহাড়ি মৌমাছি** (Rock bee) বলে। এরা সবচেয়ে বড়ো আকারের হয় এবং বড়ো মৌচাক গঠন করে। এই মৌচাকের উপরের অংশে এরা মধু সঞ্চয় করে এবং নীচের অংশে ডিম পাড়ে। এদের পোষ মানানো যায় না।

2. *এপিস ইন্ডিকা* (*Apis indica*)—এদের সাধারণভাবে **ভারতীয় মৌমাছি** বলে। এদের আকার পাহাড়ি মৌমাছির থেকে একটু ছোটো হয়। এরা গাছের কোটর বা কোনো অন্ধকার জায়গায় 8-10 টি সমান্তরাল মৌচাক একসঙ্গে গঠন করে। এদের সহজে পোষ মানানো যায় এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাক্সের মধ্যেও লালন পালন করা যায়।

3. *এপিস্ ফ্লোরিয়া* (*Apis florea*)—এদের সাধারণভাবে **ক্ষুদে মৌমাছি** বলে। এদের আকার সব থেকে ছোটো হয়। এদের তৈরি মৌচাকও অনেকটা ছোটো হয়। এরা গাছের ডালে বা ঝোপ-ঝাড়ে মৌচাক গঠন করে।

4. *এপিস্ মেলিফেরা* (*Apis mellifera*)—এদের **ইউরোপিয়ান মৌমাছি** (European bee) বলে। এদের আকার এপিস্ ইন্ডিকা বা ভারতীয় মৌমাছির মতো হয়। এদের পোষ মানানো এবং মৌবাক্সে পালন করা যায়। এই প্রজাতির মৌমাছির বিভিন্ন জাতের মধ্যে ইতালীয় জাতটি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হয় এবং এরা প্রচুর মধু উৎপাদন করে।

■ (c) **মৌমাছির বিভিন্ন জাত (Different castes of honey bee) ঃ** একটি মৌচাকে তিন রকমের মৌমাছি থাকে। এগুলি হল— **রানি, শ্রমিক ও পুরুষ।**

1. **রানি (Queen)**—রানি হল ডিপ্লয়েড, যৌনজননে সক্ষম স্ত্রী মৌমাছি। এরা আকারে সর্বাপেক্ষা বড়ো। একটি মৌচাকে একটি মাত্র রানি মৌমাছি থাকে। রানি মৌমাছির কাজ হল যৌন জননে অংশগ্রহণ করা, ডিমপাড়া এবং মৌচাকের সব মৌমাছির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে সমন্বয় সাধন করা।

2. **শ্রমিক (Worker)**—শ্রমিক হল ডিপ্লয়েড, যৌনজননে অক্ষম অর্থাৎ বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। রানি মৌমাছির থেকে এরা আকারে ছোটো। একটি মৌচাকে কয়েক হাজার শ্রমিক বা কর্মী মৌমাছি থাকে। এদের উদরের শেষ খণ্ডে একটি হুল থাকে যা একটি বিষগ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এদের কাজ মৌচাক গঠন করা, ফুল থেকে মধু ও পরাগ আহরণ, লার্ভাকে খাদ্য সরবরাহ, মৌচাক পরিষ্কার রাখা, শত্রুর আক্রমণ থেকে মৌচাক রক্ষা করা ইত্যাদি।
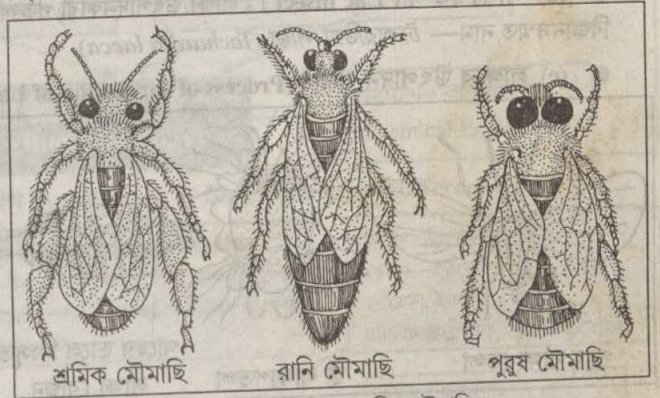
চিত্র 14.14 ঃ বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি।

3. **পুরুষ (Drone)**—এই প্রকার মৌমাছি হল হ্যাপ্লয়েড পুরুষ এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে অপুংজনি (Parthenogenesis) পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। এদের উদরের শেষ প্রান্ত ভোঁতা এবং হুল থাকে না। আকারে এরা রানি ও শ্রমিক মৌমাছির মাঝামাঝি। যৌন জননের সময় অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এরা সৃষ্টি হয় এবং যৌনজননে অংশগ্রহণ করাই এদের একমাত্র কাজ।

■ (d) **মৌমাছির আধুনিক পালন পদ্ধতি (Modern method of apiculture) ঃ** 1. আধুনিক কালে *Apis indica* প্রজাতির মৌমাছি **ল্যাঙস্ট্রথ** (Langstroth) বাক্সের মধ্যে কৃত্রিম পরিবেশে পালন করা হয়। এই বাক্সের নীচের অংশে পালন কক্ষে (Brood chamber) মৌমাছি ডিম পাড়ে এবং উপরের অংশে বা সুপার (Super) কক্ষে এরা মধু সঞ্চয় করে। 2. মৌচাকের প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরিগুলি ষড়ভুজাকৃতির (Hexagonal) হয়। পালন কক্ষে রানি, শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি জন্মগ্রহণের জন্য পৃথক পৃথক আকারের কুঠুরি থাকে। 3. সুপারের বিভিন্ন ফ্রেমে মৌচাকের কুঠুরিগুলিতে মধুপূর্ণ হলে মৌমাছি মোম দিয়ে

সেগুলি সিল (বন্ধ) করে দেয়। মধু সংগ্রহের সময় একটি ছুরি দিয়ে সেই সিল কেটে একটি নিষ্কাশন যন্ত্রের মধ্যে ফ্রেমগুলি রেখে ঘূর্ণনের সাহায্যে মৌচাক থেকে মধু নিষ্কাশন করা হয়। এই পদ্ধতিতে মৌচাক নষ্ট না করে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়।
4. কোনো অবাঞ্ছিত পতঙ্গ বা শত্রু যাতে মৌবাক্সের মধ্যে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

◘ (e) **মৌমাছি পালন থেকে উৎপাদিত বস্তু ও তার ব্যবহার (Products of apiculture and their use) ঃ** মৌমাছি পালন করে মধু এবং মৌ-মোম পাওয়া যায়।

1. **মধু (Honey) ঃ (a) সংজ্ঞা—শ্রমিক মৌমাছি ফুলের মকরন্দগ্রন্থি নিঃসৃত রস রূপে বহন করে এনে মৌচাকের কুঠুরিতে মিষ্টি তরলরূপে যা সঞ্চয় করে তাকে মধু বলে।**

(b) **কাজ**—(i) মধু একপ্রকার মিষ্টি, অস্বচ্ছ, খাদ্যগুণযুক্ত তরল। (ii) ওষুধ হিসাবে সর্দিকাশিতে, রক্তাল্পতায়, হৃদরোগে মধু ব্যবহার করা হয়। (iii) পাঁউরুটি, কেক ও বিস্কুট তৈরিতে মধু লাগে।

2. **মৌ-মোম (Beeswax) ঃ সংজ্ঞা—শ্রমিক মৌমাছির মোমগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত জলে অদ্রাব্য কিন্তু ইথারে সম্পূর্ণরূপে দ্রাব্য পদার্থ, যা পাতলা, কঠিন স্তর হিসাবে মৌচাক গঠনে ব্যবহৃত হয় তাকে মৌ-মোম বলে।**

কাজ—মৌ-মোম বিভিন্ন প্রসাধনসামগ্রী উৎপাদনে, যেমন—ক্রিম, পালিশ, মোমবাতি, মলম, লিপস্টিক, লুব্রিক্যান্ট তরল ইত্যাদি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

▲ লাক্ষাচাষ (Lac culture)

❖ **লাক্ষা চাষের সংজ্ঞা (Definition of Lac culture) ঃ যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লাক্ষাপতঙ্গ প্রতিপালন করে লাক্ষা উৎপাদন করা হয় তাকে লাক্ষাচাষ (Lac culture) বলে।**

● (a) **লাক্ষা (Lac) ঃ লাক্ষাপতঙ্গের লার্ভাদশায় ত্বকের বিশেষ গ্রন্থি নিঃসৃত, রেজিন জাতীয় কঠিন পদার্থ যা লাক্ষাকক্ষ (cell) নির্মাণে ব্যবহৃত হয় তাকে লাক্ষা বলে।**

● (b) **লাক্ষাপতঙ্গ (Lac insect) ঃ লাক্ষা উৎপাদনকারী পতঙ্গকে লাক্ষাপতঙ্গ বলে।**
বিজ্ঞানসম্মত নাম— *টাকারডিয়া লাক্ষা (Tachardia lacca).*

● (c) **লাক্ষার উৎপাদন পদ্ধতি (Process of formation of Lac) ঃ** লাক্ষাপতঙ্গের ডিম ফুটে লার্ভা সৃষ্টি হয়। এই লার্ভাগুলি নরম কাণ্ডে অবস্থান করে ও বিশেষ মুখউপাঙ্গের সাহায্যে কলারস খেয়ে বড়ো হতে থাকে। এইসময় লার্ভার একপ্রকার ত্বকগ্রন্থি থেকে লাক্ষা নিঃসৃত হয় যা লার্ভার দেহের বাইরে একটি কক্ষ (cell) সৃষ্টি করে। এর ফলে লাক্ষা পতঙ্গের লার্ভা সুরক্ষিত থাকে। পরবর্তীকালে গাছের কাণ্ডে লাক্ষা প্রকোষ্ঠগুলি থেকে লাক্ষা নিষ্কাশন করে **শেলল্যাক** (shell lac) সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র 14.15 ঃ বিভিন্ন প্রকার লাক্ষা।

● (d) **লাক্ষার প্রকারভেদ (Types of Lac) ঃ** প্রধানত দু'ধরনের লাক্ষা পাওয়া যায়— (i) **কুসুমি লাক্ষা** যা কুসুম গাছে (*Scheichera trigura*) উৎপন্ন হয়, (ii) **রঙ্গিণী লাক্ষা**— যা পলাশ (*Butea monosperma*), বাব্‌লা (*Acacia arabica*) ও অন্যান্য গাছের কাণ্ডে জন্মায়।

● (e) **লাক্ষার ব্যবহার (Uses of lac) ঃ** 1. লাক্ষা গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করতে কাজে লাগে। 2. অলংকার শিল্পে লাক্ষার ব্যবহার দেখা যায়। 3. বিভিন্ন প্রকার পালিশ, পেস্ট ও বার্নিশ তৈরিতে কাজে লাগে। 4. খেলনা তৈরিতে, লিথোগ্রাফির কালি প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। 5. বিদ্যুৎ অপরিবাহী দ্রব্য তৈরি করতে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। 6. সিল করার দ্রব্য হিসাবে লাক্ষা বা গালা অনেকদিন থেকে প্রচলিত।

14.2 জৈবপ্রযুক্তি ও তার প্রয়োগ (Biotechnology and its Application)

বংশগতির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে জৈব প্রক্রিয়াগুলির অন্তর্নিহিত কারণ ও এগুলির নিয়ন্ত্রণের কৌশল জানা সম্ভব। জৈব প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী জিনের সুবিধাজনক পরিবর্তনের (Manipulation) সাহায্যে নতুন জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপযুক্ত জীবের সৃষ্টি করা যায়। এই জীবগুলি উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী এবং বেশি শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় কিছু বিশেষ অণু সৃষ্টি করা যায় যেগুলি মানুষের বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের কাজে লাগে। প্রথম দিকের বিজ্ঞানীরা পরিব্যক্তি (Mutation) ও পুনর্বিন্যাসের (Recombination) সাহায্যে জিনের সুবিধাজনক পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে এবং এগুলি একটি নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত হয়। 1970 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আণবিক কৌশলের (Molecular techniques) সাহায্যে কৃত্রিমভাবে জীবের জিনোটাইপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হন, যেগুলি একটি নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত দিকে ঘটতে পারে, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে। আণবিক পর্যায়ের এই কৌশলগুলি হল—**রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনোলজি** (Recombinant DNA Technology), **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** (Genetic Engineering), **জিন ক্লোনিং** (Gene Cloning) ইত্যাদি সব কৌশলগুলিকে এককথায় **জৈবপ্রযুক্তি** (Biotechnology) বলে।

❖ (a) **জৈবপ্রযুক্তির সংজ্ঞা (Definition of Biotechnology) ঃ আণুবীক্ষণিক জীবের (Microorganism) মধ্যে জিনের কারিগরি ঘটিয়ে তাদের জীবকোশে বা জীবদেহে প্রয়োগ করে যেসব শিল্পঘটিত প্রক্রিয়া মানুষের কল্যাণে অনুসৃত হয় তাদের জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) বলে।**

◘ (b) **জৈবপ্রযুক্তির উৎস (Origin of Biotechnology) ঃ** বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি সম্মিলিতভাবে জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ সৃষ্টি করেছে এবং জৈবপ্রযুক্তির সুপ্রয়োগের ফলে বিভিন্ন বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

◘ (c) **বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগ (Application of Biotechnology in different fields) ঃ**
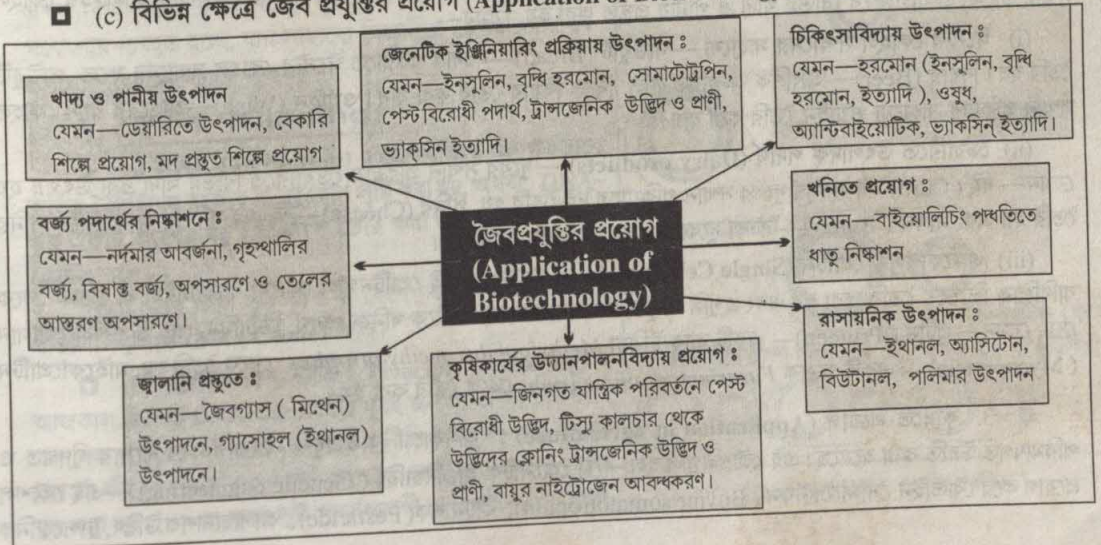
জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করা হয়, যেমন— বিভিন্ন প্রকার পানীয় মদ্য, রিকম্বিন্যান্ট ব্যাকটেরিয়া থেকে ইনসুলিন হরমোন ইত্যাদি। এছাড়া জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের সেবামূলক কাজে লাগানো যায়, যেমন— নর্দমার দূষণকারী পদার্থের অপসারণে, কারখানার বিষাক্ত উপজাত পদার্থ ও তেলের অপসারণে বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জীব ব্যবহার করা হয়।

বৃহৎ ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন জীবের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারকে জৈব প্রযুক্তি বলে। এভাবে এই কৌশলের সাহায্যে বেশি ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সৃষ্টি করা যায়; গৃহপালিত জীবজন্তু যেমন— গোরু, মোষ, ভেড়া, শূকর, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি প্রাণী থেকে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। প্রথমদিকের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ক্রশ ও প্রজননের সাহায্যে গৃহপালিত জীবজন্তুর জাতের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আণবিক পর্যায়ে গবেষণা করে প্রয়োজনীয় উপকারী জিন কোশের মধ্যে ঢুকিয়ে জিনের গুণগত পরিবর্তন ঘটান। উপকারী জিন স্বাভাবিকভাবে কাজ করে এবং মানুষের রোগমুক্তি ঘটায়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আণুবীক্ষণিক জীবকে (Micro organism) কাজে লাগিয়ে আণবিক জৈব প্রযুক্তির (Molecular Biotechnology) বিভিন্ন কৌশল, যেমন, **পুনর্সংযোগী DNA টেকনোলজি** (Recombinant DNA technology), **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** (Genetic engineering) এবং **জিন ক্লোনিং** (Gene cloning)-এর সাহায্যে মানুষের কল্যাণে নানা গবেষণা করছেন।

■ (d) **জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগ (Application of Biotechnology) :** বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাইয়োটেকনোলজি প্রয়োগ করে মানুষের কল্যাণসাধন করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ—

● 1. **চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎপাদন (Medical products) :** মানুষের চিকিৎসার কাজে বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদন করা হয়, যেমন— (i) **পেনিসিলিন** (Penicillin)— ফ্লেমিং (Fleming, 1928) *Penicillium notatum* ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন যা মানুষের নিউমোনিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে। (ii) **মোনোক্লোন্যাল অ্যান্টিবডি** (Monoclonal antibodies) —কোনো বিজাতীয় পদার্থ (সাধারণত প্রোটিন জাতীয়) মানুষের দেহে প্রবেশ করলে যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে **অ্যান্টিবডি** (Antibody) বলে এবং বিজাতীয় পদার্থকে **অ্যান্টিজেন** (Antigen) বলে। একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রভাবে যে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে তাকে **মোনোক্লোন্যাল অ্যান্টিবডি** বলে। এই অ্যান্টিবডি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন— মাতৃত্ব নির্ণয়ে, রোগ নির্ণয়ে, রোগ নিরাময়ে, প্রতিস্থাপিত অঙ্গের প্রত্যাখ্যান রোধে, ইত্যাদি। (iii) **ইনস্যুলিন ও বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদনে (Production of insulin and growth hormone)**— ইনস্যুলিন ও বৃদ্ধি হরমোনগুলি পুনর্সংযোগী DNA-যুক্ত ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপাদন করা যায় এবং এই হরমোনগুলি যথাক্রমে মধুমেহ এবং বামনত্ব রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়।

● 2. **খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনে (Production of food and drinks) :** ব্যাকটেরিয়া কালচার ও ঈস্টের কোহল সন্ধান প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়, যেমন—

(i) **ঈস্টের কোহল সন্ধানের সাহায্যে —পাউরুটি** (Bread)—ময়দার শর্করাতে ঈস্টের কোহল সন্ধানের ফলে পাউরুটি তৈরি হয়। **বিয়ার** (Beer)—আংশিক অঙ্কুরিত বার্লি থেকে বিয়ার তৈরি করা যায়। **ওয়াইন** (Wine)—আঙুরের রসে কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওয়াইন তৈরি করা যায়।

(ii) **ডেয়ারিতে উৎপাদক পদার্থ (Dairy products)** —দুধের সন্ধান প্রক্রিয়ায় ডেয়ারিতে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় যেমন— **দই** (Curd) যা সম্পূর্ণ দুধের সন্ধান প্রক্রিয়াতে দই তৈরি হয়, **পনির** (Cheese)—দই-এর ঘন শক্ত অংশ থেকে পনির তৈরি হয় এবং **মাখন** (Butter)—টাটকা দুধের সর থেকে মাখন তৈরি হয়।

(iii) **এককোশসৃষ্ট প্রোটিন (Single Cell Protein or SCP)** —এই প্রোটিনগুলি কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এবং এগুলি মানুষকে অথবা অন্যান্য প্রাণীকে খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, স্নেহ ও শর্করা জোগান দেয়, যেমন— **প্রুটীন** (Pruteen)— একটি ব্যাকটেরিয়া *Methylophilus methylotrophus* থেকে তৈরি হয়, **মাইকোপ্রোটিন** (Mycoprotein)— একটি ছত্রাক *Fusarium graminearum* থেকে তৈরি করা হয়।

● 3. **কৃষিতে প্রয়োগ (Application in agriculture) :** কৃষিকাজে জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শস্যের গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি করা হয়েছে। এই কৌশলগুলি হল—(i) **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** (Genetic engineering) —এই কৌশল প্রয়োগ করে বোভাইন সোমাটোট্রফিন (Bovine somatotrophin), কীটনাশক(Pesticide), আগাছানাশক উদ্ভিদ, ট্রান্সজেনিক

উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপন্ন করা হয়। (ii) **সিলেজ** (Silage)—নতুন পদ্ধতিতে *ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস* (*Lactobacillus*) ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ঘাসের অবাত কোহলসন্ধানের (Anaerobic fermentation) ফলে উৎপন্ন গবাদি পশুর খাদ্য সিলেজ উৎপাদন করা হয়। (iii) **নাইট্রোজেন আবন্ধকরণ** (Nitrogen fixation)—মটর, বীন ইত্যাদি শিম্বকজাতীয় উদ্ভিদের মূলে কৃত্রিম উপায়ে *রাইজোবিয়াম* (*Rhizobium*) ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট যৌগে আবন্ধ করা হয়।

● **4. বায়োমাস থেকে জ্বালানি উৎপাদন (Production of fuel from Biomass)** ঃ জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে জৈব **গ্যাস** (মিথেন) এবং **ইথানল** তৈরি করা যায় এবং যেগুলি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। কোহল সন্ধান (Fermentation) পদ্ধতির সাহায্যে গোবর থেকে **গোবর গ্যাস** এবং গুড় থেকে ইথানল উৎপাদন করা যায়।

● **5. খনিতে ধাতু নিষ্কাশন (Metal extraction in mine)** ঃ অদ্রবীভূত ধাতব যৌগকে ব্যাকটেরিয়া দ্রবীভূত ধাতব যৌগে রূপান্তরিত করে খনিতে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়। এই পদ্ধতিকে **লিচিং** (Leaching) বলে।

● **6. শিল্পে উৎসেচকের ব্যবহার (Industrial application of enzymes)** ঃ শিল্পে উৎসেচক ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ হ্রাস করা হয়। উদাহরণ— নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে বায়ুর নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন একত্রিত হয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। অপরদিকে এই বিক্রিয়াটি **হ্যাবার** (Haber) পদ্ধতিতে 500°C তাপমাত্রায় ও উচ্চচাপে ঘটে।

● **7. বাইয়োসেন্সর হিসাবে প্রয়োগ (Application as biosensor)** ঃ বিভিন্ন জীব, অণুজীব ব্যবহারের সাহায্যে কোনো রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি ও পরিমাণ জানা যায়। **উদাহরণ**— গ্লুকোজ অক্সিডেজ ব্যবহার করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ জানা যায়।

✪ 14.2A. ক্লোনিং ও ট্রান্সজেনিক—অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে প্রয়োগ ✪ (Cloning and Transgenic—Application in microbes, Plants and Animals)

পৃথিবীতে জনসংখ্যা খুব দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিরাচরিত পদ্ধতির সাহায্যে একবিংশ শতাব্দীতে এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। জৈবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের সাহায্যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় উপাদান সামগ্রী দক্ষতার সঙ্গে কম সময়ের মধ্যে উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। ক্লোনিং ও ট্রান্সজেনিক কৌশল এখন বিজ্ঞানীদের কাছে বড়ো হাতিয়ার হিসাবে জীববিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে, যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা জৈবপ্রক্রিয়ায় যে-কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

চিত্র 14.16 ঃ DNA ক্লোনিং পদ্ধতি।

▲ ক্লোনিং (Cloning)

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition)** ঃ **যে পদ্ধতিতে জিনগতভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুজীব বা বহুকোশ সৃষ্টি করা হয়, অথবা, DNA-এর একটি অংশের বহু প্রতিলিপি তৈরি করা হয়, সেই পদ্ধতিকে ক্লোনিং বলে।**

ক্লোনিং-এর ফলে সৃষ্ট জীব বা কোশগুচ্ছ অথবা DNA-এর প্রতিলিপিগুলিকে **ক্লোন** (**Clone**) বলে।

◘ (b) **ক্লোনিং-এর নীতি (Principle of cloning)** ঃ আজকাল জিন বা DNA-এর ক্লোনিং খুবই জনপ্রিয় একটি কৌশল। আণবিক পর্যায়ের এই ক্লোনিং পদ্ধতির নীতি নিম্নরূপ—(i) প্রথমে কোনো জীবের DNA-এর একটি অংশকে একটি বাহক অণুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। (ii) এর ফলে সৃষ্ট পুনর্সংযোগী বা রিকম্বিন্যান্ট DNA
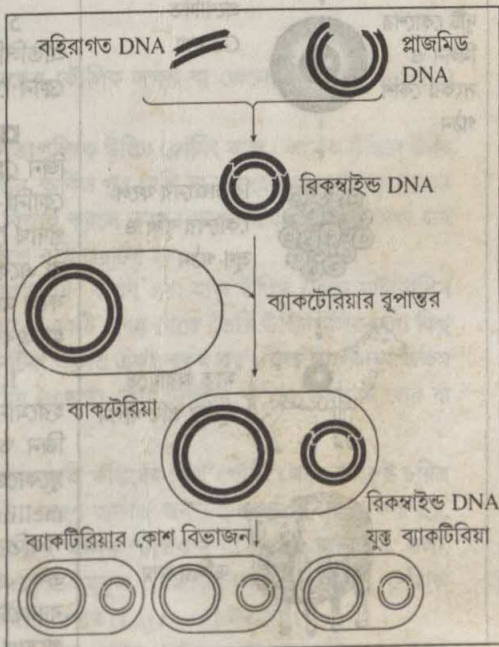
অণুর পোষক কোশে স্বাভাবিকভাবে প্রতিলিপি গঠন করতে পারে, অর্থাৎ উল্লিখিত জীবের DNA-এর অনেকগুলি কপি সৃষ্টি হয় যাদের ক্লোন বলে।

উদাহরণ ঃ মানুষের DNA-এর খণ্ডাংশ, যেমন— ইনসুলিন জিন ব্যাকটেরিওফাজ বাহকের DNA-তে যুক্ত করা হয়। এই রিকম্বিন্যান্ট অণু ফাজভাইরাসের মাধ্যমে *E. coli* কোশে প্রবেশ করিয়ে অসংখ্য প্রতিলিপি গঠিত হয়।

◘ (c) জিন ক্লোনিং পদ্ধতি (Method of Gene cloning) ঃ

1. জিন ক্লোনিং-এর জন্য নির্দিষ্ট বাহকের (Vector) প্রয়োজন হয়। এই বাহক বা ভেক্টরগুলি তিন প্রকার, যেমন— (i) **প্লাজমিড্ ক্লোনিং ভেক্টর** (Plasmid Cloning vector)—ব্যাকটেরিয়া কোশে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব DNA (ক্রোমোজোম)-এর বাইরে এই চক্রাকার ছোটো ছোটো স্বপ্রজননশীল DNA অণুগুলিকে **প্লাজমিড** (Plasmid) বলে। (ii) **ফাজ ক্লোনিং ভেক্টর** (Phage cloning vector)—ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ক্লোনিং ভেক্টরকে **ফাজ ক্লোনিং** ভেক্টর বলে। সাধারণত λ (Lambda) ব্যাকটেরিওফাজ ভেক্টর বা বাহকের কাজ করে। (iii) **কসমিড্ ক্লোনিং ভেক্টর** (Cosmid cloning vector) — প্লাজমিড DNA-এর সঙ্গে **লাম্বডা ফাজ** (λ phage) DNA-এর 'cos' অঞ্চল যুক্ত করে কসমিড (cosmid) DNA সৃষ্টি করা হয়। এই ভেক্টরটি DNA-এর বড়ো বড়ো খণ্ড বহন করতে পারে।

চিত্র 14.17 ঃ প্রাণী-ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে ডলির জন্ম।
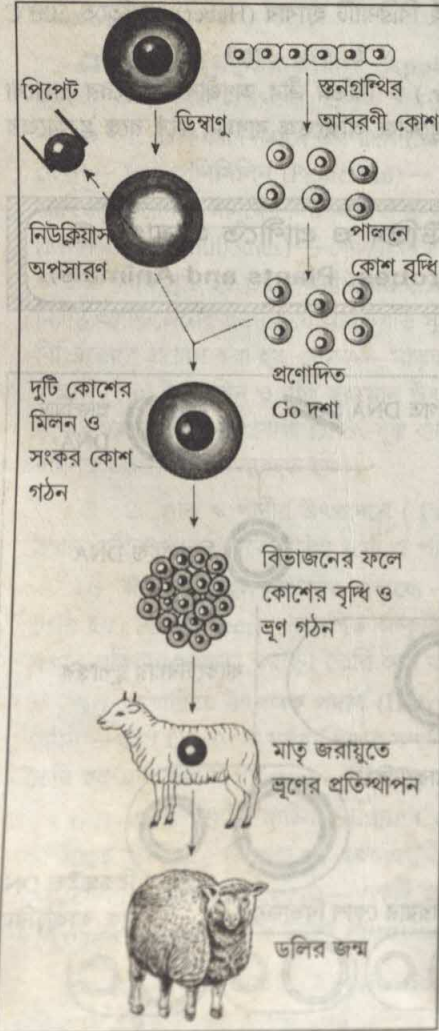
2. প্রথমে একটি জিন বা DNA-এর যে খণ্ডটিকে ক্লোন করতে হবে তাকে একটি রেসট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (Restriction endonuclease) উৎসেচক দিয়ে কাটা হয়। এর ফলে DNA-এর দু'প্রান্তে আঠালো (Staggered cut) অংশ সৃষ্টি হয়।

3. একই রেসট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দিয়ে ভেক্টর বা বাহক DNA-কে (যেমন—প্লাজমিড DNA) কেটে দেওয়া হয়।

4. এরপর **লাইগেজ** (Ligase) উৎসেচকের উপস্থিতিতে জীবের DNA ও ভেক্টর DNA-কে মিশিয়ে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। এর ফলে দুটি DNA পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয় এবং এই DNA-কে **পুনর্সংযোগী** বা **রিকম্বিন্যান্ট DNA** বলে।

5. ব্যাকটেরিয়া কোশের ভিতরে এই রিকম্বিন্যান্ট DNA স্বাভাবিকভাবে প্রতিলিপি গঠন করে, ফলে জীবটির জিন বা DNA-এর অনেকগুলি একইরকম ক্লোন তৈরি হয়।

◘ (d) জিন ক্লোনিং-এর প্রয়োগ (Application of gene cloning) ঃ

জিন ক্লোনিং-এর সাহায্যে মানুষের অনেক জিন ক্লোন করা সম্ভব হয়েছে। এই ক্লোনিং-এর উদ্দেশ্যে হল মানুষের দেহের বাইরে এই জিনগুলির উৎপাদিত পদার্থ তৈরি করা এবং যেসব মানুষের বা প্রাণীর এই পদার্থগুলি কম তৈরি হয় বা একেবারেই তৈরি হয় না, তাদের দেহে এই পদার্থগুলি প্রয়োগ করা। এর ফলে মানুষের দেহে এই পদার্থগুলির অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলি দূরীভূত হয় এবং মানুষ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে। ক্লোন করা জিনগুলি নিম্নরূপ—

1. **ইনসুলিন জিন (Insulin gene)**—ইনসুলিন জিন থেকে ইনসুলিন হরমোন তৈরি হয় যা গ্লুকোজের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কারণে ইনসুলিন জিন অস্বাভাবিক হলে স্বাভাবিক ইনসুলিন হরমোন তৈরি হয় না, ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং মানুষ **ডায়াবেটিস্ মেলিটাস** (Diabetes mellitus) বা **মধুমেহ** রোগে আক্রান্ত হয়। রিকম্বিন্যান্ট DNA ও ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে ইনসুলিন জিনের ক্লোন ব্যাকটেরিয়ার কোশে সৃষ্টি করা হয় এবং এই জিনের উৎপাদিত পদার্থ অর্থাৎ ইনসুলিন হরমোন হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে নিষ্কাশিত করে মধুমেহ রোগাক্রান্ত মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে এই রোগের উপশম হয়। ইনসুলিন জিন হল প্রথম জিন যা ক্লোনিং করে মানুষের উপকারে লাগানো হয়েছে।

2. **মানুষের বৃদ্ধি হরমোন জিন (Human Growth Hormone or HGH gene)**—ইনসুলিন জিনের পরে এটি দ্বিতীয় জিন যা ক্লোনিং করা হয়েছে। মানুষের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বৃদ্ধি হরমোনের প্রভাবে মানুষের বৃদ্ধি হয় এবং মানুষ স্বাভাবিক উচ্চতাসম্পন্ন হয়। এই হরমোনের ক্ষরণ কম হলে মানুষ বামনত্ব রোগাক্রান্ত হয়। ইনসুলিন জিনের মতো একই পদ্ধতিতে মানুষের বৃদ্ধি হরমোনের জিনকে ক্লোন করে তা থেকে বৃদ্ধি হরমোন নিষ্কাশিত করা হয় এবং রোগাক্রান্ত মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে বামন আকারপ্রাপ্ত মানুষের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।

3. **ইন্টারফেরন জিন (Interferon gene)**—যে প্রোটিনঘটিত পদার্থ মানুষের দেহে ভাইরাস ঘটিত রোগ দমনে সহায়তা করে তাকে **ইন্টারফেরন** বলে। মানুষের ইন্টারফেরন সৃষ্টি না হলে মানুষ খুব সহজে ভাইরাস ঘটিত রোগের কবলে পড়ে। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার কোশে ইন্টারফেরন জিনের ক্লোন সৃষ্টি করা হয় এবং এই ক্লোন থেকে ইন্টারফেরন নিষ্কাশিত করে মানুষের চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়।

▲ A. প্রাণী ক্লোনিং (Animal cloning) :

❖ **সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ায় অভিন্ন জিনোটাইপযুক্ত একাধিক প্রাণী সৃষ্টি করা হয় তাকে প্রাণী ক্লোনিং বলে।**

এই বৈশিষ্ট্য বিচার করলে বলা যায় যে মনোজাইগোটিক যমজ বা আইডেন্টিক্যাল যমজ (Monozygotic or Identical twins) একই জিনোটাইপের হয়। সুতরাং এরা ক্লোন। কৃত্রিমভাবে "প্রাণী ক্লোন" সৃষ্টি করা যায়। 1997 খিস্টাব্দের 27শে ফেব্রুয়ারি **"ডলি"** নামে একটি ভেড়া প্রথম প্রাণীক্লোন হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। যে পদ্ধতির সাহায্যে ডলির জন্ম হয় তা নিম্নরূপ :

1. প্রথমে একটি **স্কটিশ কালোমুখ ভেড়ির** (Scottish black face ewe) ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তার থেকে নিউক্লিয়াসটি বের করে নেওয়া হয়।

2. এরপর একটি ছ-বছর বয়সী **ফিনল্যান্ডের ডরসেট ভেড়ির** (Fine Dorset ewe) স্তনগ্রন্থির কোশের সঙ্গে নিউক্লিয়াসহীন ডিম্বাণুটির মিলন (Fusion) ঘটানো হয় এবং এর ফলে একটি সংকর বা হাইব্রিড কোশের সৃষ্টি হয়।

3. তৃতীয় ধাপে এই হাইব্রিড ডিম্বাণুটি অপর একটি **স্কটিশ কালোমুখ ভেড়ির** জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই তৃতীয় ভেড়িটি পালিকা মাতার (Surrogate mother) ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট সময় পরে ডলির জন্ম হয় এবং জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

▲ B. উদ্ভিদ ক্লোনিং (Plant cloning) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : অঙ্গজ জনন একটি অযৌন প্রক্রিয়া যার ফলে গাছের কৌলিক লক্ষণ বা জেনোটাইপ (Genotype) অপরিবর্তিত থাকে।**

একটি উদ্ভিদ থেকে অঙ্গজ জননের মাধ্যমে সৃষ্ট সব অপরিবর্তিত অপত্যগুলিকে উদ্ভিদ ক্লোনিং বলে। অনেক উদ্ভিদে উর্বর বীজ উৎপন্ন হয় না। আবার বহু উদ্ভিদ, যেমন—আম, কমলা, আপেল, আঙুর, অর্কিড খুব বেশি মাত্রায় হেটারোজাইগাস (অসম কৌলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত)। এ জাতীয় উদ্ভিদগুলি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট **প্রকরণ** দেখা যায় এবং গুণগুলির অবনমন ঘটে। সেই জন্য এদের অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করানো হয়।

একই ক্লোনের বিভিন্ন উদ্ভিদের ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ একই রকম হয়। কারণ এরা মাতৃ উদ্ভিদ থেকে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তবে পরিবেশের তারতম্যের জন্য কখনো-কখনো একটি ক্লোন থেকে তৈরি উদ্ভিদগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যেতে পারে। কিন্তু এরকম পার্থক্য বংশগত নয়। এদের জেনেটিক গঠনও একই রকম হয়। বীজ উৎপাদনে অক্ষম হেটারোজাইগাস ও পলিপ্লড উদ্ভিদকে রক্ষার জন্য কোনিং-এর প্রয়োজন হয়। এছাড়া ক্লোন নির্বাচন করেও উন্নত জাতের বা ভ্যারাইটির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

◻ (b) **ক্লোন নির্বাচন পদ্ধতি** (Selection of Clone) : **অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদের মিশ্র গোষ্ঠী থেকে উৎকৃষ্ট চরিত্র বিশিষ্ট ক্লোনের নির্বাচনকে ক্লোন নির্বাচন বলে।** বিভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অঙ্গজ জননের জন্য নির্বাচিত করা হয়, যেমন—**মিষ্টি আলু**, গোলমরিচ, **আখ** প্রভৃতির **শাখা কলম** (Stem cutting), **আলুর স্ফীতকন্দ** (Tuber), **আনারস, কলা, চন্দ্রমল্লিকা** ইত্যাদির **উর্ধ্বধারক** (Suckere), **আম, লেবু, আপেল,** গোলাপ প্রভৃতির **মুকুল** ও **জোড়কলম** (Graffing), **পেঁয়াজ ও রসুনের কন্দ** (Bulb), **কচুর গুঁড়িকন্দ** (Corm), **জুঁই** প্রভৃতি ফুল গাছের **দাবা কলম** (Layering) ইত্যাদি।

সব সময় সবল উদ্ভিদ থেকে উৎকৃষ্ট চরিত্র বিশিষ্ট ক্লোনগুলি নির্বাচিত করা হয়। অসুস্থ, দুর্বল ও কম ফলনশীল ক্লোনগুলি বাতিল করা হয়।

অনেক সময় দুটি পৃথক ক্লোনের মধ্যে সংকরায়ণ করা হয়। এই সংকরায়ণের ফলে বীজ উৎপন্ন হলে এবং ওই বীজ থেকে সংকর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। সংকর উদ্ভিদ উৎকৃষ্ট মানের হলে অঙ্গজ জননের মাধ্যমে সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্লোন চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যেমন— আখ KO11, KO22; কলা বোম্বে গ্রিন, হাই গ্রেড; আলু কুকরি রেড ও কুফরি সফেদ; কমলা যুবরাজ, ব্লাডরেড ইত্যাদি ক্লোন নির্বাচন থেকে নতুন উন্নত ভ্যারাইটি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল ক্লোনিং পদ্ধতিতে বহু উদ্ভিদের নতুন চারা অল্প সময়ে তৈরি করা হচ্ছে।

◘ (c) **ক্লোনিং-এর সুবিধা** (Merits of Cloning) ঃ (i) ক্লোন নির্বাচনের ফলে সৃষ্ট ভ্যারাইটিতে প্রকরণ দেখা যায় না। বহু বছর চাষের পরও এদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না, (ii) অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদ থেকে ক্লোন নির্বাচনের সাহায্যে অল্প সময়ে উন্নত উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। (iii) কোনো উদ্ভিদে হেটেরোসিস (সংকর উদ্ভিদে সবলতা) দেখা দিলে তা পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে অঙ্গজ জননের মাধ্যমে কেবল রক্ষা করা সম্ভব। (iv) ক্লোনের চাষ পদ্ধতি অনেক সরল ও সহজ। অনেকগুলি উদ্ভিদে ফুল-ফল আসার জন্য যে লম্বা শৈশব অবস্থা অতিক্রম করতে হয়, ক্লোনিং এর সাহায্যে সেই সময় সংক্ষিপ্ত করা যায়। তা ছাড়া উদ্যান- সজ্জায় এই পদ্ধতি অনেক সুফল এনেছে। আজকাল অল্প সময়ের মধ্যে বহু উদ্ভিদের চারা তৈরি করা হচ্ছে।

◘ (d) **ক্লোনিং-এর অসুবিধা** (Demerits of Cloning) ঃ (i) ক্লোন নির্বাচন কেবল অঙ্গাজ জননকারী উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবন্ধ। (ii) ক্লোন নির্বাচনে নতুন কোনো জেনোটাইপ সৃষ্টি হয় না। (iii) উদ্ভিদের উন্নতি সাধনে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সীমিত।

▲ ট্রান্সজেনিক প্রয়োগ (Transgenic Application)

বর্তমান আণবিক জৈবপ্রযুক্তি (Molecular biotechnology) যুগের আগে মানুষ সাধারণ প্রজনন (breeding) পদ্ধতির সহায্যে জীবের বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করত এবং এর সাহায্যে বিশেষ জাতের জীবের উন্নতিসাধন করত। কিন্তু এই পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ এবং অনেক প্রজন্ম ধরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষ কিছুটা উন্নত জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করতে পারত। যেমন ধরা যাক—কোনো মুরগি বেশি ডিম উৎপাদন করে আবার কোনো মুরগি কম ডিম উৎপাদন করে। যে মুরগিগুলি বেশি ডিম দেয় তাদের আলাদা করে ব্রিডিং করানোর হলে, বেশ কয়েকটি প্রজন্ম পরে শুধুমাত্র বেশি ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত পাওয়া যায়। আধুনিক কালে পুনর্সংযোগী DNA প্রযুক্তি ও তার প্রয়োগের ফলে কোনো নির্দিষ্ট জাতের জীব খুব তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের জিন কোশের মধ্যে বা জীবের দেহে স্থানান্তর করে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। একটি জৈবতন্ত্র থেকে অপর জৈবতন্ত্রে জিনের এই স্থানান্তর সফলতার সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘটানোকে **ট্রান্সজেনেসিস** (Transgenesis) বলে। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদের জিন উদ্ভিদে ও প্রাণীর জিন প্রাণীতে প্রয়োগ ছাড়া উদ্ভিদের জিন প্রাণীতে এবং প্রাণীর জিন উদ্ভিদেও প্রয়োগ করা যায়।

ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে প্রথম সৃষ্ট জীবটি হল একটি ইঁদুর যার দেহে ইঁদুরের বৃদ্ধি হরমোনের (Growth hormone) জিন স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

❖ (a) **কয়েকটি সংজ্ঞা (Some Definitions) ঃ 1. ট্রান্সজেনেসিস (Transgenesis)—যে পদ্ধতির সাহায্যে বহিরাগত বা পরিবর্তিত কোনো জিন জীবদেহে স্থানান্তর করা হয়, তাকে ট্রান্সজেনেসিস বলে।**
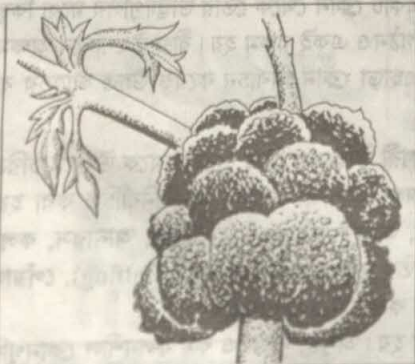
2. **ট্রান্সজিন (Transgene)— পরিবর্তিত বা বহিরাগত যে জিন জীবের দেহে কৃত্রিম উপায়ে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে ট্রান্সজিন বলে।**

3. **ট্রান্সজেনিক জীব (Transgenic organism)—যে জীবের দেহে জিন বা DNA স্থানান্ত রিতকরে জিনোটাইপের পরিবর্তন ঘটানো হয় তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।**

◘ (b) **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টির উদ্দেশ্য (Objectives of Transgenic plant and animal production) ঃ**

1. মানুষের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। 2. মানুষের খাদ্যের গুণ উন্নতিসাধন করা। 3. পেস্ট বিরোধী ও রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা। 4. প্রতিকূল পরিবেশের চাপ সহ্যকারী জীব সৃষ্টি করা। 5. আগাছা প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা। 6. শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের বৃদ্ধি বাড়িয়ে চাষের প্রয়োজনীয় সময় কমানো।

চিত্র 14.18 : ক্রাউন গলের গঠনের চিত্ররূপ।

▲ ট্রান্সজেনিক অণুজীব ও উদ্ভিদ (Transgenic Microbs and Plants)

◘ (a) **অণুজীবে ট্রান্সজিনের প্রয়োগ (Application of Transgenes in micro-organisms) :** বহিরাগত কোনো জিন ট্রান্সজেনেসিস্ পদ্ধতিতে কোনো অণুজীবের (Micro-organism) DNA-তে সংযুক্ত করা হয়। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই ট্রান্সজিনের অনেক প্রতিলিপি গঠিত হয় যেগুলি মানুষের আবশ্যকীয় বহু পদার্থ উৎপাদন করে, যেমন—1. *অ্যাসপারজিলাস ওরাইজি Aspergillus oryzae* ছত্রাক থেকে উৎসেচক উৎপাদন। 2. চিকিৎসাবিদ্যায় প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুতে প্রয়োগ করা হয়, যেমন—ইনসুলিন, সোমাটোস্ট্যাটিন, ইন্টারফেরন, লিম্ফোকাইন ইত্যাদি উৎপাদনে ট্রান্সজেনিক পদ্ধতি কাজে লাগে।

◘ (b) **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন (Production of Transgenic plants) :** আধুনিক বিজ্ঞানীরা খুব সহজ পদ্ধতিতে কোনো উদ্ভিদ প্রজাতির জিন অপর প্রজাতির উদ্ভিদের জিনোমে স্থানান্তর করেন, ফলে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদের জিনোটাইপ পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করে মানুষের জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।

চিত্র 14.19 : ট্রান্সজেনিক তামাক গাছ উৎপাদন।

◘ (c) **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদের উৎপাদন ও প্রয়োগ (Production and application of transgenic plants) :** রিকম্বিন্যান্ট DNA এবং জিন স্থানান্তরের সাহায্যে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। ট্রান্সজেনিক পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদনকারী হয়, যেমন—(i) ক্রাউন গল উৎপাদন, (ii) ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পেস্ট বিরোধী ও আগাছা দমনকারী উদ্ভিদ উৎপাদন, (iii) বায়ুর নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী উদ্ভিদ উৎপাদন, (iv) বেশি খাদ্যগুণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ ধান উৎপাদন, ইত্যাদি। উদ্ভিদে ট্রান্সজিনের এই প্রয়োগগুলি নিম্নরূপ—

1. **ক্রাউনগল উৎপাদন (Formation of Crown gall) :** একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে একটি মৃত্তিকা ব্যাকটেরিয়া *অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফ্যাসিয়েন্স (Agrobacterium tumefaciens)* ওই ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদ কোশগুলিকে দ্রুত বিভাজিত হতে প্রণোদিত করে। এর ফলে উদ্ভিদের ক্ষতস্থানে একটি উপবৃদ্ধি গঠিত হয় যাকে ক্রাউনগল বলে। প্রকৃতপক্ষে ক্রাউনগল হল উদ্ভিদের টিউমার যা কতকগুলি অবিভেদিত কোশ দিয়ে তৈরি। উচ্চতর গবেষণার সাহায্যে জানা যায় যে—ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি প্লাজমিড যার নাম T_i প্লাজমিড (Tumor inducing plasmid) ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে বেরিয়ে আসে। এই প্লাজমিড থেকে DNA-এর একটি অংশ যার নাম T- DNA, উদ্ভিদকোশে প্রবেশ করে এবং ট্রান্সজিন হিসাবে উদ্ভিদ কোশের DNA-তে স্থানান্তরিত হয়। এই T-DNA-ই প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের ক্রাউনগল সৃষ্টির কারণ। ক্রাউনগলের অবিভেদিত কোশগুলির টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

2. **পেস্ট প্রতিরোধী ইনসেক্টিসাইড উৎপাদন (Production of pest resistant insecticide) :** *ব্যাসিলাস থিউরিজিনসিস Bacillus thuringensis* নামে একটি মৃত্তিকা ব্যাকটেরিয়া একটি বিষাক্ত প্রোটিন (Toxic Protein) উৎপাদন করে যা বিভিন্ন পেস্টকে মেরে ফেলে। ব্যাকটেরিয়াতে এই প্রোটিন সৃষ্টিকারী জিন শস্যউদ্ভিদে ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে স্থানান্তর করলে ওই উদ্ভিদ বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে। এর ফলে শস্যউদ্ভিদ পেস্টের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

3. **ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (Resistance against virus) :** তামাক গাছের মোজেইক রোগ সৃষ্টিকারী (Tobacco Mosaic Virus or TMV) ভাইরাস তামাকের উৎপাদন ব্যাহত করে। এই ভাইরাসের আবরণী সৃষ্টিকারী একটি জিন

◘ (b) **নলজাত শিশুর প্রয়োজনীয়তা** (Importance of test tabe baby)—কোনো স্ত্রীলোকের দেহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিষেক প্রক্রিয়া না ঘটলে তখন IVF প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষেক প্রক্রিয়া ঘটানো হয়। যখন ডিম্বাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়া (Ovulation) স্বাভাবিক হয় কিন্তু ডিম্বনালি অবরুদ্ধ থাকে কিংবা ডিম্বনালি গঠন ত্রুটিপূর্ণ থাকে, তখন শুক্রাণু এই নালিপথের মাধ্যমে যেতে পারে না। এই কারণে নিষেক প্রক্রিয়া হয় না, ফলে স্বাভাবিক শিশুসন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। এসব অবস্থায় নলজাত শিশুর প্রয়োজন হয়।

◘ (c) **নলজাত শিশুর গঠনপ্রক্রিয়া (Process of formation of Test tube baby)** : (i) মাসিক যৌন চক্রের রজস্রাবীয় দশার (bleeding phase of menstrual cycle) শেষ হওয়ার অল্পকালের মধ্যে ফলিকল **স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) দেওয়া হয়। এর ফলে ডিম্বাশয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক **গৌণ উসাইট** (Secondary Oocytes) অর্থাৎ ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। (ii) FSH দেওয়ার পর লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) দেওয়া হয়। LH গৌণ উসাইটকে পরিণত করে। (iii) এই অবস্থায় স্ত্রীলোকের নাভির পাশে সামান্য অংশ কেটে তার মধ্য দিয়ে ডিম্বাশয় থেকে পরিণত ডিম্বাণুগুলি সংগ্রহ করে প্রথমে কাচের ডিশে নির্দিষ্ট একপ্রকার তরলের মধ্যে রাখা হয়। (iv) এরপর এই পরিণত ডিম্বাণুগুলিকে অন্য একটি কাচের ডিশে রাখা শুক্রাণু সমন্বিত দ্রবণে স্থানান্তরিত করে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মধ্যে নিষেক ঘটানো হয়। নিষেক প্রক্রিয়া হতে 12-18 ঘণ্টা সময় লাগে। (v) একবার নিষেক প্রক্রিয়া ঘটলে সেই নিষিক্ত ডিম্বাণুকে অন্য একটি দ্রবণের মধ্যে (পুষ্টিসমৃদ্ধ তরলে) রাখা হয়। এর ফলে ক্লিভেজ প্রক্রিয়া ঘটে। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত ডিম্বাণু যখন 8টি কোশে বা 16টি কোশে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে **ব্লাস্টোসিস্ট** বলে। এটিকে মায়ের জরায়ুকণ্ঠ বা সারভিক্সের মধ্য দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়। জরায়ুর অন্তঃস্থ প্রাচীরের গায়ে অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামে নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে।

✪ 14.2.C. কোশের টোটিপোটেন্সি এবং কোশপালন ✪
(Totipotency of cells and Maintenance of cell line)

◘ 1. **কোশের টোটিপোটেন্সি (Totipotency of cells)** : প্রত্যেক জীবের দেহ প্রথমে একটিমাত্র কোশ বা জাইগোট থেকে গঠন আরম্ভ করে। এই ধারণা 1839 খ্রিস্টাব্দে **শ্লেইডেন ও শোয়ানের** (Schleiden and Schwann) কোশ মতবাদ থেকে পাওয়া যায়। একটি সজীব কোশ উপযুক্ত খাদ্য ও পরিবেশের উপস্থিতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সজীব উদ্ভিদ গঠন করার ক্ষমতা ধারণ করে। উদ্ভিদকোশের এইরূপ ক্ষমতার ধারণা প্রথম 1901 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী **মর্গান** (Morgan)। তিনি কোশের এই ক্ষমতার নামকরণ করেন **টোটিপোটেন্সি**।
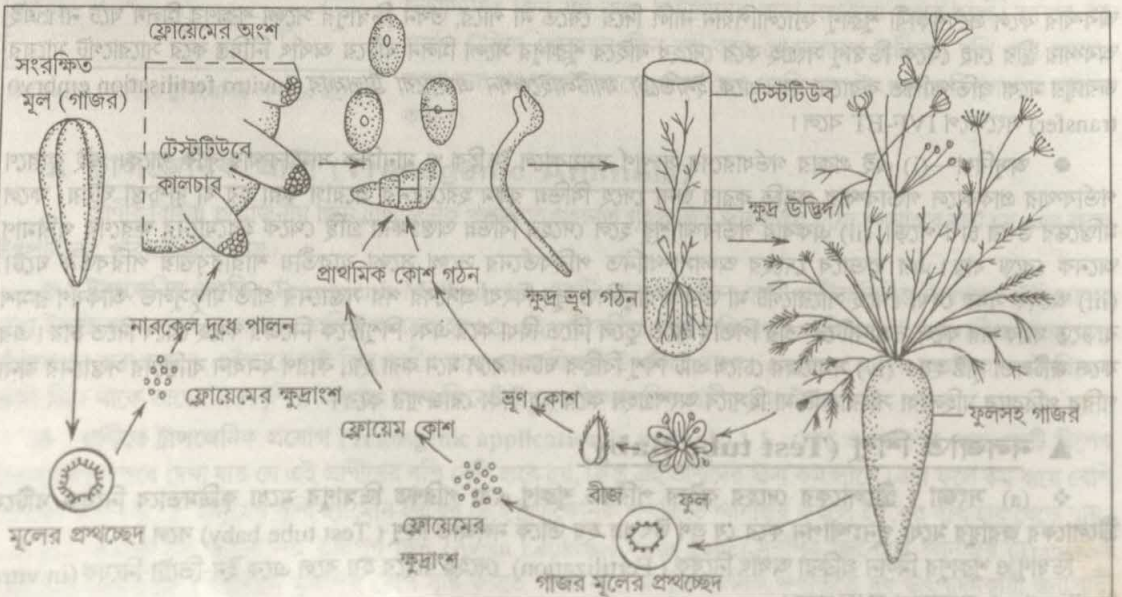
চিত্র 14.21 গাজর উদ্ভিদের কোশীয় টোটিপোটেন্সির চিত্ররূপ।

❖ **টোটিপোটেন্সির সংজ্ঞা : জীবদেহের সজীব কোশের যে ক্ষমতার দ্বারা একটি কোশ এই জীবের পূর্ণাঙ্গ দেহের যে কোনো কোশ গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে, কোশের সেই বিশেষ ক্ষমতাকে টোটিপোটেন্সি বলে।**

টোটিপোটেন্সি ক্ষমতা অর্জনকারী কোশকে **টোটিপোটেন্ট** (Totipotent) কোশ বলে। প্রাণীর ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম দিকে জাইগোট বিভাজিত হয়ে কতকগুলি **অবিভেদিত** কোশ উৎপন্ন করে। এই কোশগুলিকে **ব্লাস্টোমিয়ার** বলে। ব্লাস্টোমিয়ারগুলি অবিভেদিত হওয়ার ফলে, টোটিপোটেন্সি ক্ষমতা বলে পূর্ণাঙ্গ দেহের যে-কোনো অঙ্গের যে-কোনো কোশরূপে গঠিত হয়।

জীবদেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব **কৌলিক** বা **জিনগত তথ্য** (Genetic information) জীবদেহের প্রতিটি সজীব কোশে নিহিত থাকে। উদ্ভিদ কোশের পূর্ণজনন ক্ষমতা বহুদিন ধরে আমাদের জানা ছিল। একটি পাথরকুচির পাতা থেকে অঙ্কুরণের ফলে পূর্ণ উদ্ভিদ গঠিত হয়। তবে কলা বা কোশ পোষণ বা কালচারের মাধ্যমে একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের বিকাশ কেবলমাত্র অল্প কয়েকবছর আগেই দেখানো সম্ভব হয়েছে। যেসব সজীব কোশে কোশপর্দা ও নিউক্লিয়াস থাকে তারাই পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ গঠন করতে পারে। আবার যেসব কোশে পুরু লিগনিনযুক্ত কোশ প্রাচীর থাকে বা লিগনিন যুক্ত তন্তুকোশ বা ক্ষয়িষ্ণু ভাস্কুলার কোশ থাকে, সেইসব কোশ বিভাজিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ গঠন করতে পারে না।

1902 খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী **গটলিব হেবারল্যান্ড** (Gotleib Haberlandt) প্রথম এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যে, কোনো উদ্ভিদদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোশ উপযুক্ত পরিবেশ ও পুষ্টির উপস্থিতিতে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ গঠন করা সম্ভব হয়। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে, একটি উদ্ভিদের পাতার কোশকে কৃত্রিম উপায়ে **নপস্ দ্রবণে** (Knop's solution) বাঁচিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করানো সম্ভব। এই জন্য **হেবারলেন্ডকে** উদ্ভিদ কলা পালনের জনক বলা হয়। এরপর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নীরিক্ষার সাহায্যে এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন।

(i) তামাক গাছের কাণ্ডের মজ্জা (Pith) থেকে কোশ নিয়ে উপযুক্ত পরিবেশে কালচার বা পালন করে একটি সম্পূর্ণ চারা গাছ গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

(ii) গাজরের মূল থেকে কোশ বিচ্ছিন্ন করে একই ভাবে পালন করে নতুন গাজর গাছ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

(iii) ফুলের রেণু পালন করে নতুন হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

(iv) জীবের জীবনচক্রে দু'রকম **গ্যামেটের মিলন** (পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেট) বা **নিষেকের** ফলে **জাইগোট** গঠিত হয়। এই এককোশী **জাইগোট** থেকে মাইটোটিক বিভাজনের ফলে বহুকোশী জীবদেহ গঠিত হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এককোশী জাইগোট থেকে মাইটোটিক **বিভাজন** ও **পরিস্ফুটনের** (Differentiation) মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদের সব অঙ্গ অর্থাৎ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি গঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও জাইগোট থেকে গঠিত হয়। জাইগোট ও তার থেকে সৃষ্ট সব কোশের নিউক্লীয় ডি. এন. এ. (DNA)-তেই সব জিনগত তথ্য থাকে। জিনের কার্যকারিতা সুনিয়ন্ত্রিত বলে বিভিন্ন অঙ্গ গঠন করতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন কলাপালন পদ্ধতিতে একটি কোশ বিভাজিত হয়ে কোশ সমষ্টি গঠন করে যা থেকে নতুন উদ্ভিদ গঠিত হয়। এই নতুন উদ্ভিদটি যে উদ্ভিদের কোশ থেকে উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে জিনগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে।

মুরাসিজে ও স্কুগ (এম. এস) কালচার মিডিয়া

উপাদান	পরিমাণ
অজৈব যৌগ : অতিপুষ্টি	
NH_4NO_3	1·65 গ্রা.
KNO_3	1·90 গ্রা.
$CaCl_2$ $2H_2O$	0·44 গ্রা.
$MgSO_4$ $7H_2O$	0·37 গ্রা.
KH_2PO_4	0·17 গ্রা.
অজৈব যৌগ : অণুপুষ্টি	
$FeSO_4$ $7H_2O$	27·80 মি.গ্রা.
Na_2EDTA $2H_2O$	33·60 মি.গ্রা.
KI	0·83 মি.গ্রা.
H_3BO_4	6·20 মি.গ্রা.
$MnSO_4$ $4H_2O$	22·30 মি.গ্রা.
$ZnSO_4$ $7H_2O$	8·60 মি.গ্রা.
Na_2MoO_4 $2H_2O$	0·025 মি.গ্রা.
$CuSO_4$ $5H_2O$	0·025 মি.গ্রা.
$CoCl_2$ $6H_2O$	0·025 মি.গ্রা.
অতিরিক্ত জৈব উপাদান	
মাইয়োইনোসিটল	100·00 মি.গ্রা.
নিকোটিনিক অ্যাসিড	0·05 মি.গ্রা.
অপাইরোডক্সিন HCL	0·05 মি.গ্রা.
থায়ামিন HCL	0·05 মি.গ্রা.
গ্লাইসিন	0·20 মি.গ্রা.
সুক্রোজ	20·00 মি.গ্রা.

অজৈব ও জৈব যৌগগুলি 800 মি. লি. পাতিত জলে দ্রবীভূত করা হল এবং pH 5·7 রাখার জন্য 1M NaOH দেওয়া হল। পরে পাতিত জল এক লি. আয়তন করার জন্য কিছুটা পাতিত জল মেশানো হল।

◘ 2. **টিসু কালচার বা কোশ পালন (Maintenance of Cell line) :** 1902 খ্রিস্টাব্দে **হেবারলেন্ড** (Haberlandt) উদ্ভিদের পাতার কোশকে কৃত্রিম উপায়ে নপ্স দ্রবণে কালচার বা পালন করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। এরপর 1980 খ্রিস্টাব্দে **কিং** (King) এইপ্রকার তরল মাধ্যমে কোশ পালন পদ্ধতিকে **"সাসপেনসান কালচার"** নামকরণ করেন। বিশেষ

পদ্ধতিতে কতকগুলি কোশ এককভাবে অথবা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে তরল কালচার মিডিয়ামে ভাসমান অবস্থায় থাকে। কোশগুলিকে এই তরল মিডিয়ামে ভাসমান অবস্থায় দীর্ঘদিন পুষ্টিপদার্থ দিয়ে কালচার করলে অনেক ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভাজিত হতে পারে। এই কোশ সমস্টিকে **সেল লাইন** (Cell line) বলে। কোশগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (i) কোশগুলি বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া। (ii) হরমোন ছাড়া কোশগুলির বৃদ্ধির সক্ষমতা বজায় থাকা। (iii) কোশগুলির ক্রোমোজোমের সংখ্যা বাড়া। (iv) কোশের বহিরাগত কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা। এসব সেল লাইন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের নানা প্রকার গবেষণায় ও ফসলের উন্নতির কাজে ব্যবহৃত।

(a) **উদ্ভিদের যে-কোনো অঙ্গ থেকে কোশ পৃথকীকরণ** ঃ উদ্ভিদের যে-কোনো অঙ্গ থেকে বা কৃত্রিমভাবে পালিত কোশসমষ্টি (ক্যালাস) থেকে একটি কোশকে পৃথক করে পালন করা যায়। পৃথক করার পদ্ধতি দু'রকমের হয়, যেমন— **যান্ত্রিক পদ্ধতি ও উৎসেচক প্রয়োগ** পদ্ধতি। (i) **যান্ত্রিক পদ্ধতি**— উদ্ভিদের পাতার কোশকে এই পদ্ধতিতে সহজে আলাদা করা যায়। পেষক যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম পাতাগুলি **পিষ্ঠ** করে, **পরিস্রাবণ** ও **সেন্ট্রিফিউগেশন** পদ্ধতিতে কোশকে পৃথক করা হয়। এতে পাতার মেসোফিল কলা সহজে পৃথক করা যায়। এই কোশগুলি তরল কালচার মিডিয়ামে রেখে দিলে কোশ বিভাজিত হয়ে **একগুচ্ছ কোশ (ক্যালাস)** গঠিত হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব ধরনের কোশকে পৃথক করা যায় না। (ii) **উৎসেচক প্রয়োগ পদ্ধতি**— জাপানি বিজ্ঞানী **টাকেবি** (Takebe) উৎসেচক প্রয়োগ করে তামাক ও অন্যান্য 18 টি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ কোশকে পৃথক করে কালচার বা পালন করতে সক্ষম হয়। দেখা গেছে **ম্যাসেরোজাইম** উৎসেচক ব্যবহার করে কোশকে পৃথক করা যায়।

(b) **পালন কলা থেকে পৃথকীকরণ** ঃ সাধারণত পালন কলা থেকে কোশকে পৃথক করা যায়। তাই প্রথমে উদ্ভিদ অঙ্গের অংশ নিয়ে পোষণ করা হয়। পরে এই কলা তরল মিডিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয় এবং **শেকার** (Shaker) যন্ত্রের সাহায্যে কোশগুলি পৃথক করা যায়। এই সময় কোশগুলি তরল মাধ্যমে ভাসতে থাকে। পরে কোশগুলির বৃদ্ধি হয় ও নতুন কোশ সৃষ্টি হয়। একে **সেল সাসপেনসন কালচার** বলে। শেকার যন্ত্র আন্দোলিত হবার জন্য কলা থেকে কোশগুলি পৃথক হয় এবং মাধ্যমের মধ্যে বায়ুর আদান-প্রদান চলে। সাধারণত দু'রকমের সাস্পেনসান কালচার দেখা যায়, যেমন— **ব্যাচকালচার** এবং **অবিরাম কালচার**।

(i) **ব্যাচ কালচার** (Batch Culture) — প্রথমে কালচার থেকে ক্যালাসের কিছুটা অংশ 100 মি.লি. ফ্লাস্কে 20 মি.লি. তরল মিডিয়ামের মধ্যে রেখে শেকার যন্ত্রে রাখতে হয়। তিন সপ্তাহ পরে এই কালচার নতুন মিডিয়ামে স্থানান্তরিত করতে হয়। স্থানান্তর করার সময় অল্প সংখ্যক ভাসমান কোশসহ নতুন তরল মিডিয়ামে স্থানান্তর করা হয়।

কোশ কালচারের সময় কোশ বিভাজনের জন্য কোশের সংখ্যা ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাড়তে থাকে। পরে কোশ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। কোশ বিভাজনের জন্য কোশের সংখ্যা বাড়ে এবং খাদ্য উপাদান কমে যায় বলে কোশ বিভাজনও ক্রমশ বন্ধ হয়। এই সময় নতুন কালচার মিডিয়ামে স্থানান্তর করলে আবার কোশ বিভাজনও বৃদ্ধি ঘটে। এই বৃদ্ধির একটি লেখচিত্র আঁকলে দেখা যায়— প্রথমে পৃথক কোশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় হয় না বললে চলে। একে **ল্যাগ ফেজ** (lag phase) বলে। এর পরে বিভাজনের হার দ্রুত গতিতে ঘটে। একে **লগ্ ফেজ** (log phase)) এবং শেষে বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। একে **স্থির ফেজ বা স্টেশনারি ফেজ** (stationary phase) বলে।
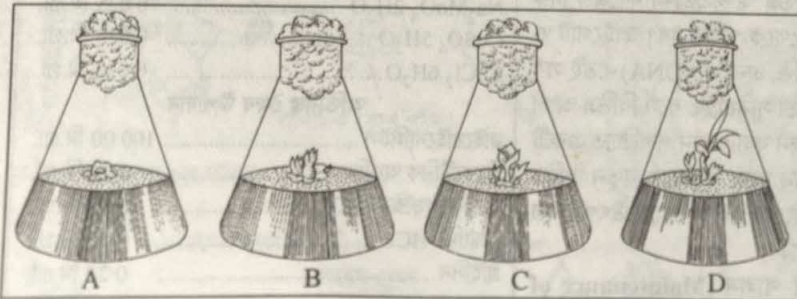
চিত্র 14.21 : কলা পালন—(A) ফ্লাস্কে এক্সপ্লান্ট বা উদ্ভিদ অংশে (B-C) কলার বিন্যাস এবং (D) অপত্য উদ্ভিদের গঠন।

(ii) **অবিরাম কালচার** (Continuous culture)—অবিরাম কালচারকে দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয়, যেমন—**বন্ধ কালচার পদ্ধতি** (Closed type of culture) ও **মুক্ত কালচার পদ্ধতি** (Open type of culture)। বন্ধ কালচার পদ্ধতিতে নতুন মিডিয়া যোগ করা এবং পুরোনো মিডিয়াম বের করে নেবার একটা সমতা রক্ষা করা হয়। এর ফলে কোশের সবসময় বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে **মুক্ত কালচার** পদ্ধতিতে নতুন মিডিয়া যোগ করার সময় পুরোনো মিডিয়া ও কিছু অতিরিক্ত কোশ বের করে একটা সমতা রক্ষা করা হয়। এর ফলে কোশের বৃদ্ধি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

(c) **সেললাইন কালচারের গুরুত্ব (Importance of Cell Line Culture) :**

(i) **নতুন মিউট্যান্ট নির্বাচন**—একক কোশে মিউটেশন উৎপাদনকারী রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে পরিবর্তিত কোশ নির্বাচন করা যায়। এই পরিব্যক্তি যুক্ত কোশ পালন করে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব।

(ii) **প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি**— তরল মিডিয়ামে কোশ পালন করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়, যেমন— উপক্ষার, ভিটামিন, উৎসেচক, খাবারে মেশানোর সুগন্ধি, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি।

(iii) **পলিপ্লয়েড তৈরি**—কোশ পালন পদ্ধতিতে আখের পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে কোশপালন পদ্ধতির এত উন্নতি হয়েছে যে প্রায় সব উদ্ভিদের কোশ পালন করা সম্ভব।

(iv) আজকাল বহু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট অনুশীলন ও সংযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য পেয়েছে।

14.2.D. উদ্ভিদের কোশ ও কলা পালন সম্বন্ধে ধারণা (Idea about Plant cell and Tissue Culture)

▲ উদ্ভিদের কলা পালন (Tissue culture of Plants)

❖ (a) **কলাপালনের সংজ্ঞা (Definition of Tissue Culture) : উদ্ভিদ অঙ্গ, কোশ, কোশগুচ্ছ, সজীব প্রোটোপ্লাস্ট, ভ্রূণ ও বীজ কৃত্রিম আধারে উপযুক্ত পুষ্টি ও পরিবেশের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ উদ্ভিদ গঠনের প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের কলা পোষণ বা পালন বলে।**

উদ্ভিদের প্রত্যেকটি সজীব কোশের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরির ক্ষমতা জানার পর থেকে কোশ ও কলা পালন বা পোষণের চিন্তাধারা আসে। বিজ্ঞানী ভকটিং (Vochting) 1878 খ্রিস্টাব্দে প্রথম দেখান যে, গাছের কলমের যে দিকটা মাটিতে বসানো হয় সেখান থেকে মূল এবং উপরের অংশ থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, উদ্ভিদের যে-কোনো অংশের কোশ মূল অথবা অঙ্কুর উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। এটা শুধু কলমটিকে (cutting) উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করার উপর নির্ভর করে। 1902 খ্রিস্টাব্দে **হেবারলেন্ড** প্রথম উদ্ভিদ পাতার কোশকে কৃত্রিম উপায়ে তরল দ্রবণে বাঁচিয়ে রাখেন। তাই **হেবারলেন্ডকে** উদ্ভিদ কলা পালনের জনক বলা হয়। **হ্যানিং** (1904) প্রথম ওই দ্রবণে সুক্রোজ মিশিয়ে সরষেজাতীয় উদ্ভিদের ভ্রূণকে বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1922 সালে আমেরিকার **রবিন্স** (Robins) ও জার্মানির **কট্টে** (Kotte) প্রথম মূলের অগ্রভাগ কেটে কৃত্রিম উপায়ে পালন করেন। 1959 খ্রিস্টাব্দে **ব্রাউন** (Brown) অনুশীলনের মাধ্যমে কোশ থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উদ্ভিদ গঠন করেন। বিগত তিন-চার দশকে উদ্ভিদ কলা অনুশীলন বা কালচার অতি দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদের এককোশ, কলা এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন—**মূল, পাতা, ভ্রূণ, শস্য, পরাগ, প্রোটোপ্লাস্ট** ইত্যাদি কালচার করা যায়। এই প্রযুক্তি কৃষি, উদ্যানবিদ্যা, বনসৃজন ও শিল্প প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। তা ছাড়া বংশগতি, জীবরসায়ন, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি মৌলিক গবেষণায় ও উদ্ভিদ কলা পোষণ পদ্ধতির বিশেষ ব্যবহার রয়েছে।

◘ (b) **কলাপালন বা অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী :**

1. **ল্যাবরেটরি** (Laboratory)—কলা পালনের জন্য একটি উপযুক্ত ল্যাবরেটরি দরকার। এই ল্যাবরেটরিতে নিম্নলিখিত সুবিধা থাকা একান্ত প্রয়োজন। (i) কাচের ও প্লাস্টিকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার ও ধোওয়ার জায়গা। (ii) মিডিয়া তৈরি করার ও রাখার ব্যবস্থা। (iii) নির্বীজ উপায়ে কলা পালনের ব্যবস্থা। (iv) একটি পৃথক কোশ পালন ঘর ইত্যাদি।

চিত্র 14.22 : মুকুল পালন থেকে কলা গাছের পুনরুদ্ভবকরণ।

2. **প্রয়োজনীয় সামগ্রী** (Essential articles)— (i) বড়ো মুখওয়ালা কাচের ফ্লাস্ক (বোরোসিল)—100 মি.লি., 250 মি.লি., 500 মি.লি। (ii) কাচের টিউব (iii) মাপক সিলিন্ডার (iv) পিপেট (v) ওভেন

(vi) অটোক্লেভ (vii) রেফ্রিজারেটর (viii) পি. এইচ. মিটার (ix) বড়ো ও ছোটো ফরসেফ (x) ছোটো ও বড়ো ছুরি (xi) তুলাদণ্ড (xii) স্পিরিট ল্যাম্প ইত্যাদি।

3. **পুষ্টিমাধ্যম** (Nutrient medium)— উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য কলা পালনের সময় যেসব পুষ্টির প্রয়োজন তা পুষ্টি মাধ্যমে দেওয়া থাকে। সব উদ্ভিদ একই রকম পুষ্টি মাধ্যমে পালন করা যায় না। তাই বিভিন্ন রকম পুষ্টি মাধ্যম তৈরি করা হয়েছে। 1934 সালে বিজ্ঞানী হোয়াইট (White) পোষক মাধ্যমে অজৈব লবণ, ভিটামিন, শর্করা এবং কয়েক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে মূল কলার বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে নানা রকম পরীক্ষার পর অনেক প্রকার পুষ্টি মাধ্যম তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রচলিত দুটি পুষ্টি মাধ্যমের বিভিন্ন উপাদান দেখানো হয়। প্রথম পুষ্টি মাধ্যমটি MS মাধ্যম (Murashige and Skoog-এর নাম অনুসারে) এবং দ্বিতীয়টি গ্রামবর্গ (Gramborg) এবং সহকর্মীবৃন্দের তৈরি B_5 মাধ্যম নামে পরিচিত। এই দুটি পুষ্টি মাধ্যমের গঠন নীচে দেওয়া হল।

4. **হরমোন (Hormone)**— পুষ্টি মাধ্যমে উদ্ভিদের তারতম্য অণুসারে কয়েক প্রকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন ব্যবহার করা হয়। নীচের হরমোনগুলির কাজ উল্লেখ করা হল।

● **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন (Some important Growth Regulating Hormones) :**

শ্রেণি	রাসায়নিক নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	কাজ
1. অক্সিন	ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড	IAA	ক্যালাস তৈরি এবং অঙ্গোৎপাদনে সাহায্য করে।
	ইন্ডোল বিউটিরিক অ্যাসিড	IBA	বিটপের মূল উৎপাদন করে।
	2, 4 ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড	2, 4-D	ক্যালাস উৎপাদন করে।
2. জিব্বারেল্লিন	জিব্বারেল্লিক অ্যাসিড-3	GA 3	বিটপের বৃদ্ধি ঘটায়।
3. সাইটোকাইনিন	কাইনেটিন	K	ক্যালাস ও অঙ্গোৎপাদন করে।
	বেনজিন অ্যামাইনো পিউরিন	BAP	ক্যালাস ও অঙ্গোৎপাদনে সহায়তা করে।
4. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড	অ্যাবসিসিক অ্যাসিড	ABA	দেহকোশজাত (Somatic) ভ্রূণ গঠন করে।

◘ (c) **উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের টিশু কালচার :** উদ্ভিদের কোশ বা যেসব অঙ্গাংশ কালচার করা হয়, তা নিম্নরূপ—

1. **অঙ্গ ও অঙ্গাংশ পালন বা অনুশীলন** (Organ culture)—এই ধরনের অনুশীলনে বা পালনে উদ্ভিদের শীর্ষ অংশ ও কাক্ষিক মুকুল, মূলের অগ্রভাগ, কচি প্রাথমিক পাতা, ফুলের কুঁড়ি, ফুল, ফলের ভাজক কলার অংশ ইত্যাদি প্রয়োজন। এই অংশগুলি পালন করে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ গঠন করা সম্ভব। কলা, অর্কিড প্রভৃতি উদ্ভিদে অঙ্গজ অনুশীলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

2. **ভ্রূণের কালচার** (Embryo culture)— বীজ থেকে নবজাত ভ্রূণকে অপসারণ করে বিশেষ আধারে পুষ্টি উপাদানে কালচার বা অনুশীলন করে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ গঠন করাকে **ভ্রূণ কালচার** বলে। অনেকগুলি প্রজাতির উদ্ভিদে ভ্রূণ কালচার করা সম্ভব হয়েছে, যেমন— লিনাম (*Linum*), বার্লি (*Hordium*), পাট (*Corchous*), স্বর্ণলতা (*Cuscuta*), আইরিস (*Iris*) ইত্যাদি।

3. **কোশপিণ্ড বা ক্যালাস পালন বা অনুশীলন** (Callus culture)— উদ্ভিদের যে-কোনো অংশের কোশগুচ্ছ নিয়ে পালন করাকে **ক্যালাস অনুশীলন** বলে। এই কোশগুচ্ছ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হতে পারে। প্রচুর চারা গাছ উৎপাদন, গাছের জিনগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা প্রভৃতির জন্য ক্যালাস কালচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
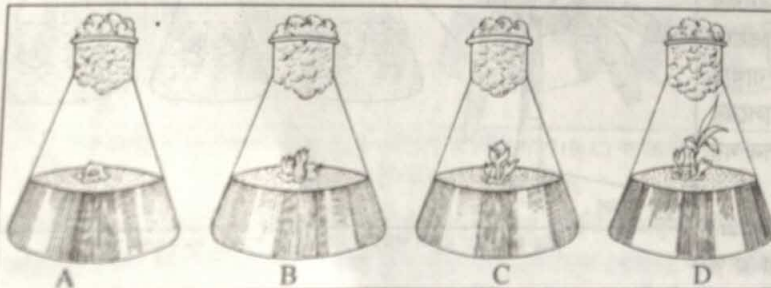
চিত্র 14.21 : কলা পালন—(A) ফ্লাস্কে এক্সপ্লান্ট, (B-C) কলার বিন্যাস এবং (D) অপত্য উদ্ভিদের গঠন।

4. **সাস্‌পেন্‌সান পালন বা অনুশীলন** (Suspension culture) — উদ্ভিদের একটি কোশ বা কোশগুচ্ছ তরল পুষ্টির মাধ্যমে অনুশীলন করার প্রক্রিয়াকে **সাস্‌পেনসান অনুশীলন** বলে। এতে অল্প সময়ে অসংখ্য উদ্ভিদ বা ক্লোন তৈরি করা যায়।

5. **প্রোটোপ্লাস্ট অনুশীলন** (Protoplast culture)—দুটি ভিন্নধর্মী উদ্ভিদের কোশপ্রাচীর উৎসেচকের সাহায্যে অপসারিত করে প্রোটোপ্লাস্ট বের করে তাদের সংযোগ ঘটিয়ে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করার প্রক্রিয়া হল **প্রোটোপ্লাস্ট অনুশীলন**। প্রোটোপ্লাস্ট অনুশীলনের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলুর প্রোটোপ্লাস্ট ও টম্যাটোর প্রোটোপ্লাস্ট পৃথক করে এবং এদের সংযোগ ঘটিয়ে সংকর উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে।

6. **পরাগধানী বা পরাগ পালন** (Pollen sac or pollen Culture)—পুংকেশরের পরাগধানীর রেণু মাতৃকোশ থেকে রেণু উৎপন্ন হয়। পরাগধানী বা রেণু কালচার করে হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। প্রথমে ধান, ধুতুরার ও তামাক পরাগ পোষণ করে ভ্রূণ গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে বহু মূল্যবান উদ্ভিদের রেণু থেকে নতুন প্রজাতির হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্ভিদের ক্রোমোজোম দ্বিগুণীকরণের মাধ্যমে **হোমোজাইগাস** (Homozygous) বা **সমপ্রকরণ** বিশিষ্ট উদ্ভিদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া জিনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এর গুরুত্ব রয়েছে।

◘ (d) **কলাপালন পদ্ধতির গুরুত্ব** (Importance of Tissue Culture)—আজকাল উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের জন্য কলা বা টিস্যু কালচার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নীচে কলা পালন বিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

1. এই প্রযুক্তিতে উদ্ভিদের যে-কোনো অংশ থেকে কলা নিয়ে কালচার করে নতুন চারা তৈরি করা যায়। একে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** বলে।

2. যে-কোনো উদ্ভিদের দ্রুত বংশ বিস্তার করানো যায়। চারা তৈরি করার জন্য কোনো বিশেষ ঋতুর প্রয়োজন হয় না।

3. উদ্ভিদের শীর্ষমুকুল থেকে কোশ পালন করে রোগ মুক্ত উদ্ভিদ তৈরি করা যায়।

4. রেণু কালচার করে হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ উৎপন্ন করা যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা কৃত্রিমভাবে দ্বিগুণ করে **হোমোজাইগাস বা সমপ্রকরণ** বিশিষ্ট উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

5. জীনগত দূরত্বের জন্য সব প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে দুটি উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজমের সংযোজন ও নিউক্লিয়াস দুটিকে সংযুক্ত করে সংকর উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব।

6. অন্য কোনো জিন বা ডি. এন. এ. প্লাসমিডের সাহায্যে বা সরাসরি প্রোটোপ্লাস্টে ঢুকিয়ে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়।

7. কলা থেকে অঙ্গ তৈরি হবার পদ্ধতি ও কৌশল জানা যায়।

8. তরল মিডিয়ামে কোশ পালন করে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়, যেমন— অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যালক্যালয়েড, ভিটামিন, খাবারে মেশানোর সুগন্ধি, উৎসেচক ইত্যাদি।

▲ মাইক্রোপ্রোপাগেশন (Micropropagation)

❖ (a) **মাইক্রোপ্রোপাগেশনের সংজ্ঞা (Definition of Micropropagation) ঃ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ অঙ্গের কলা ও কোশের কৃত্রিমভাবে পালনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ অসংখ্য অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় তাকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বা অণুবিস্তার বলে।**

◘ (b) **ব্যাখ্যা ঃ** অঙ্গজ জনন ও কলমের মাধ্যমে উদ্ভিদের পালন পদ্ধতি বহুদিন ধরে চলে আসছে। তবে এই সাধারণ পালন পদ্ধতি সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কলাপালন পদ্ধতি সব উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। মাইক্রোপ্রোপাগেশন প্রক্রিয়াতে উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে কোনো বিশেষ ঋতুর উপর নির্ভর করতে হয় না। এর ফলে বছরের যে-কোনো সময় প্রচুর সংখ্যায় উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা যায়। যেসব চারা উৎপন্ন হয় তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্যের কোনো ভিন্নতা থাকে না (Genetically identical)। এই কারণে মাইক্রোপ্রোপাগেশন গুরুত্ব লাভ করেছে।
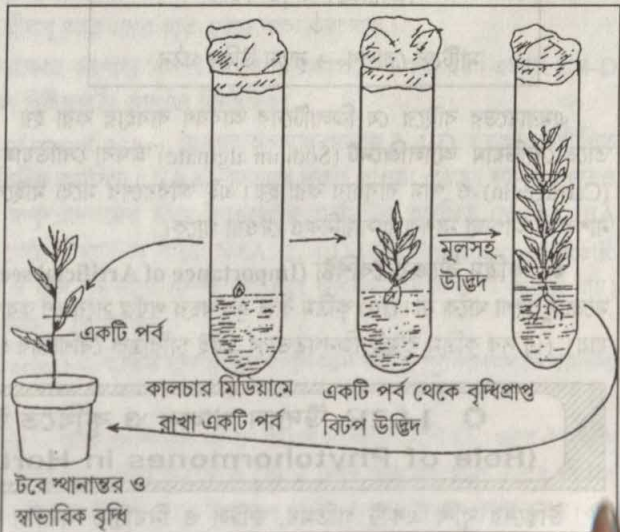
চিত্র 14.24 ঃ মাইক্রোপ্রোপাগেশান প্রক্রিয়ায় একটি পর্ব থেকে গঠিত সম্পূর্ণ উদ্

◘ (c) **মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি (Process of Micropropagation)** ঃ এই পদ্ধতির মূলনীতিগুলি হল—

(i) উপযুক্ত পাতার অংশ, মুকুলের ভাজক কলা, ভ্রূণ, কাণ্ডের তরুণ কোনো অংশ, পত্রমুকুল ইত্যাদি নির্বাচন করে পোষক মিডিয়াতে স্থানান্তরিত করা। (ii) বিশেষ মিডিয়াতে মুকুল তৈরি ও মুকুলের সংখ্যা বাড়ানো। (iii) মুকুলগুলিকে বিশেষ মিডিয়াতে পোষণ বা কালচার করে পূর্ণাঙ্গ চারা তৈরি করা।

উদ্ভিদ অঙ্গ বা একসপ্লান্ট ⟶ ভাজক কোশ (2n) ⟶ মুকুল ⟶ পরিণত উদ্ভিদ ⟶ চারাগাছ

◘ (d) **মাইক্রোপ্রোপাগেশনের গুরুত্ব (Importance of Micro-propagation)** ঃ আজকাল উদ্যান চর্চায়, কৃষি ও অরণ্য বৃক্ষের বংশবৃদ্ধিতে মাইক্রোপ্রোপাগেশন খুবই প্রয়োজনীয়। নীচে মাক্রোপ্রোপাগেশনের গুরুত্বগুলি আলোচিত হল।

1. খুব কম জায়গায় অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়। 2. চারা গাছের জিনগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা থাকে না। 3. চারা তৈরি করতে কম সময়ের প্রয়োজন। 4. কোনো ঋতুর উপর নির্ভর করতে হয় না। বছরের যে-কোনো সময় চারা তৈরি করা যায়। 5. যেসব উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হতে অনেকদিন সময়ের প্রয়োজন অর্থাৎ দীর্ঘ সুপ্ত অবস্থা, সেসব উদ্ভিদের অল্প সময়ে বংশ বিস্তার করানো যায়। 6. একসঙ্গে অনেক রোগমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। 7. প্রয়োজনীয় সংকর **উদ্ভিদ বন্ধ্যা** (Sterile) হলে, তার বংশ বিস্তার করানো যায়। 8. বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা অতি সহজে বাড়ানো যায়। 9. মূল্যবান জার্মপ্লাজমকে (কলা ও বীজ যা ভবিষ্যতে উদ্ভিদ উৎপাদনে সমর্থ) **ক্রায়োজেনিক** পদ্ধতিতে (তরল নাইট্রোজেনে – 190°C তাপে রাখা) সংরক্ষণ করা যায়।

● **কৃত্রিম বীজ (Artificial seed)** ঃ আমেরিকার টি. মুরাসেজ (T. Murashige) 1977 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়াম সিম্পোজিয়ামে প্রথম কৃত্রিম বীজ সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করেন। অঙ্গজ কলাকে কৃত্রিম উপায়ে পুষ্টি মাধ্যমে পালন করে যে **এমব্রয়েড** (নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টিকারি কোশগুচ্ছ) গঠিত হয় তাকে নিয়ে জিলাটিন পদার্থের আবরণে আবৃত করে কৃত্রিম বীজ তৈরি করা যায়। সাধারণ বীজের মতো একে মাটিতে পুঁতে জল দিলে জিলাটিন আবরণ গলে যায় এবং এমব্রায়ডটি থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম বীজ তৈরির পর্যায়গুলি নীচে দেওয়া হল।

কৃত্রিম বীজের চিত্ররূপ

জিলাটিন আবরণ

এমব্রায়ড

সংশ্লেষিত শস্য
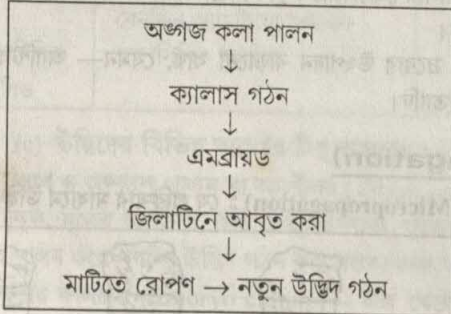
এমব্রায়ডের বাইরে যে জিলাটিনের আবরণ ব্যবহার করা হয় তাতে **সোডিয়াম অ্যালজিনেট** (Sodium alginate) অথবা **সোডিয়াম অ্যালজিনেট ও জিলাটিনের মিশ্রণ** অথবা **ক্যারাজেনিন** (Carragenin) ও গাম ব্যবহার করা হয়। এই আবরণের মধ্যে **মাইকোরাইজা** (Mycorrhiza) ছত্রাক, পতঙ্গ নাশক, ছত্রাক নাশক ও আগাছা নাশক রাসায়নিকও দেওয়া থাকে।

● **কৃত্রিম বীজের বৈশিষ্ট্য (Importance of Artificial seed)** ঃ (i) যে-কোনো ঋতুতে বপন করা যায়, (ii) বীজের মতো সুপ্তদশা থাকে না। (iii) কৃত্রিম বীজ এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। (iv) অল্প সময়ে অনেকগুলি নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। (v) সব কৃত্রিম বীজই জিনগতভাবে একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হয়।

✪ 14.2E. উদ্যান পালন ও কৃষিতে উদ্ভিদ হরমোনের ভূমিকা ✪
(Role of Phytohormones in Horticulture and Agriculture)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি একটি গতিময়, জটিল ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিশেষ জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে **হরমোন বা বৃদ্ধি**

সহায়ক পদার্থ (Growth promoting substances) বলে। সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ হরমোনকে **ফাইটোহরমোন** (Phytohormones) বলা হয়।

❖ (a) **উদ্ভিদ হরমোনের সংজ্ঞা (Definition of Phytohormone) ঃ উদ্ভিদদেহের নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ অঙ্গ নিঃসৃত প্রোটিনধর্মী জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে উদ্ভিদদেহের সীমিত বা বিস্তৃত অঞ্চলের শারীরবৃত্তীয় কাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তাকে উদ্ভিদ হরমোন বলে।**

◘ (b) **উদ্ভিদ হরমোনের প্রকারভেদ (Types of Phytohormones)** ঃ উদ্ভিদ হরমোন প্রধানত তিন প্রকারের হয়—

1. **প্রাকৃতিক হরমোন** (Natural hormones)—উদ্ভিদদেহে যেসব হরমোন সংশ্লেষিত হয় তাদের **প্রাকৃতিক হরমোন** বলা হয়। উদাহরণ—**অক্সিন, জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন** এবং **জিয়াটিন**।
2. **কৃত্রিম হরমোন** (Artificial hormones)—যেসব রাসায়নিক পদার্থ কৃত্রিমভাবে রসায়নাগারে প্রস্তুত হয় এবং প্রাকৃতিক হরমোনের মতো কাজ করে তাদের **কৃত্রিম হরমোন** বলে। উদাহরণ—**ইন্ডোল প্রোপিয়ানিক অ্যাসিড, ন্যাপথক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড** (NAA), 2, 4–**ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড** 2, 4-D ও **ইন্ডোল বেনজয়িক অ্যাসিড** (IBA)।
3. **প্রকল্পিত হরমোন** (Postulated hormones)—এই জাতীয় হরমোন উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত হলেও এদের রাসায়নিক গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তাই এদের **প্রকল্পিত হরমোন** বলে। উদাহরণ—**ফ্লোরিজেন, রাইজোকলাইন, ফাইলোকলাইন, কলোকলাইন, ভরমিন, ভারনালিন** প্রভৃতি।

◘ (c) **কৃষিকার্যে ও উদ্যানবিদ্যায় হরমোনের কাজ (Effects of Hormones in Agriculture and Horticulture)** ঃ কৃষিক্ষেত্রে, ফলোদ্যানে, বনভূমি ইত্যাদির উন্নতি বিধানে বিভিন্ন প্রকার, যেমন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হরমোনের ভূমিকা উন্নতিশীল দেশে প্রমাণিত হয়েছে।

● **I. অক্সিনের ভূমিকা (Role of Auxin)** ঃ

1. **কলম প্রস্তুতিকরণ** (Rooting of cutting)— উদ্ভিদের কলমে নূতন মূল সৃষ্টি করতে প্রধানত **অক্সিন** প্রয়োজন, এছাড়া **ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড** (IBA) , **ন্যাপ্থক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড** (NAA) প্রভৃতি হরমোন সাহায্য করে। মূল সৃষ্টি দ্রুত হলে এটিকে সহজেই কিছুদিনের মধ্যে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে আলাদাভাবে কেটে রোপণ করা হয়। এই রকম কলম তৈরি করে বিভিন্ন রকমের ফল, যেমন— আম, পেয়ারা, আঙুর, লেবু ইত্যাদি এবং ফুল, যেমন— জবা, গোলাপ, ডালিয়া ইত্যাদি গাছের বংশবৃদ্ধি সম্ভব।

2. **ক্ষতস্থান পূরণ** (Healing of wounds)— অনেক সময় প্রয়োজনবোধে চা বা অন্যান্য গাছ ছেঁটে ফেলা হয়। ছাঁটার ফলে উৎপন্ন ক্ষতস্থানে স্বাভাবিক ভাবেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু অক্সিন প্রয়োগ করলে সেই উদ্ভিদের ক্যালাস কোশের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্ষতস্থান পুরণ করে ও গাছটিকে জীবাণু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

3. **আগাছা বিনাশ** (Killing of weeds)— শস্যক্ষেত্রে আগাছা বিনাশ করতে অক্সিন প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া 2, 4-D (ডাই-ক্লোরোফেলক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড) প্রয়োগ করলে দ্বিবীজপত্রী আগাছা বিনষ্ট হয়।

4. **বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপর ক্রিয়া** (Effect of sprouting)— ছোলার অঙ্করোদ্গমকে 2, 4-D হরমোন উদ্দীপিত করে। মটর, মুগ প্রভৃতি বীজের ক্ষেত্রে **ন্যাপ্থোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড** (NAA) ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে। ধানের ক্ষেত্রেও ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA), পাটের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় ন্যাপ্থোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA), IBA প্রভৃতি হরমোনের প্রয়োগে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। টম্যাটোর বীজে NAA, 2, 4-D (Dichlorophenoxy acetic acid) প্রভৃতি হরমোনের প্রয়োগে এদের অঙ্কুরোদ্গম ও বৃদ্ধি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং অধিকমাত্রায় ফসলও পাওয়া যায়। পাটগাছে চারা অবস্থায় NAA প্রয়োগ করলে আঁশের পরিমাণ বেড়ে যায়।

5. **পুষ্পমুকুল প্রস্ফুটন নিয়ন্ত্রণ** (Control of flowering)— অক্সিন পুষ্পমুকুলের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুষ্পোদ্গমকে ত্বরান্বিত করে। এই কাজে জিব্বেরেলিনও অংশগ্রহণ করে।

6. **উদ্ভিদের ফুল ঝরানো** (Thinning of flowers)— গাছে বেশি ফুল ফুটলে ফলের সংখ্যাও বেশি হয়। এতে একদিকে যেমন অত্যধিক ফলের ভারে গাছের শাখা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে তেমনি বেশি ফলনের জন্য ফলের আকার ছোটো হবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় অক্সিন ছিটিয়ে উদ্ভিদ থেকে কিছু ফুল ঝরিয়ে ফুলের সংখ্যা কমানো হয়। এর ফলে অবশিষ্ট যে ফুল থাকে তা থেকে তুলনামূলক ভাবে বড়ো ফল পাওয়া যায়।

7. **বেশি ফসল উৎপাদন** (Enhancing fruiting) — বিভিন্ন প্রকার হরমোনের প্রয়োগে উদ্ভিদের ফল উৎপাদনে উন্নতি সাধন করা সম্ভব—(i) ফুলে মঞ্জরি আসার আগে গম গাছের পাতা কেটে IAA, NAA প্রয়োগ করলে বেশি ফসল পাওয়া যায়। (ii) তুলোগাছে NAA হরমোনের প্রয়োগে তুলোর ফল উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। (iii) আনারসের ক্ষেত্রে IAA এবং NAA প্রয়োগ করলে ফলের আকার বড়ো হয়। (iv) বিভিন্ন প্রকার ধানগাছে বিভিন্ন প্রকার হরমোন বিভিন্ন সময় প্রয়োগ করলে বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

8. **বীজবিহীন সবজি ও ফলের উৎপাদন** (Parthenocarpic vegetables and fruit formation)— নিষেকের পর গর্ভাশয় বড়ো হয়ে ফলে পরিণত হয়। কিন্তু বিভিন্ন হরমোনের (প্রধানত অক্সিনের) প্রয়োগে নিষিক্তকরণ ছাড়াই গর্ভাশয়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়ে বীজশূন্য ফল উৎপাদন সম্ভবপর হয়। ঝিঙে, বেগুন, পেঁপে, লেবু, কলা, আঙুর প্রভৃতি গাছে IAA, IBA, NAA প্রভৃতি হরমোন প্রয়োগ করে বীজবিহীন ফল (Parthenocarpic fruit) বা সবজি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

9. **অকালপতন রোধ** (Inhibition of shedding of immature organs) — সময় সময় দেখা যায় যে গাছের ফুল এবং ফল পরিণতি লাভ করার আগে খসে পড়ে যায়। এই অকাল পতনকে অক্সিন প্রয়োগ করে রোধ করা যায়।

10. **পরিণত উদ্ভিদের গঠন** (Formation of matured trees) — **ক্যামবিয়াম** (ভাজক) কলার কর্মক্ষমতা বাড়ায় অর্থাৎ শাখাপ্রশাখা বিস্তার কিংবা উদ্ভিদকে লম্বায় বাড়তে সহায়তা করে।

● **II. জিব্বেরেলিনের ভূমিকা (Role of Gibberelins) ঃ** 1. বীজ ও মুকুলের সুপ্ত অবস্থা ভাঙতে ও বীজকে অঙ্কুরিত করতে **জিব্বেরেলিন** বিশেষ কার্যকর। 2. বিভিন্ন প্রকার ফল গঠন, যেমন—আঙুর, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতির ফল গঠনের জন্য জিব্বেরেলিন স্প্রে করা হয়। 3. **বীজহীন ফল অর্থাৎ পার্থেনোকার্পিক ফল** গঠনে ও জিব্বেরেলিনের ভূমিকা রয়েছে।

● **III. সাইটোকাইনিনের ভূমিকা (Role of Cytokinins) ঃ** 1. কলা পালনে উদ্ভিদের অগ্রমুকুল থেকে প্রচুর নতুন মুকুল তৈরি করতে **সাইটোকাইনিন** প্রয়োগ করা হয়। 2. বিভিন্ন প্রকার বীজ ও ফল গঠনে ও ফলের আয়তন বাড়াতে **সাইটোকাইনিন** ব্যবহার করা যায়। 3. অক্সিনের সঙ্গে একত্রে প্রয়োগ করলে কোশ দ্রুত বিভাজিত হয় এবং কোশের বৃদ্ধি ঘটে। তা ছাড়া পাতায় স্প্রে করলে ক্লোরোফিল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

● **IV. ইথিলিনের ভূমিকা (Role of Ethelene) ঃ** 1. ইথিলিন অক্সিনের মতো ফুল ফুটতে সাহায্য করে। 2. কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকাতে **ইথিলিন** প্রয়োগ করা হয়। 3. ইথিলিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কমলা, আঙুর, কলা, আপেল, তরমুজ প্রভৃতি ফল সংরক্ষণ করা যায়।

❂ 14.2F. প্রাণ-ভেষজ প্রয়োগ (Bio-medical Application) ❂

▲ রোগনির্ণায়ক যন্ত্রসমূহ (Diagnostic Instruments)

◆ I. ই. সি. জি (E C G—Electrocardiogram) ঃ

● (a) **ব্যাখ্যা ঃ** ই. সি. জি. (E C G) শব্দের সম্পূর্ণ নাম **ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম** (Electrocardiogram)। হৃৎপিণ্ডের SA নোড থেকে বৈদ্যুতিক আবেগ (Electrical impulse) উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের সব অংশে ও পরে তার চারপাশের কলাকোশে এবং শেষে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের দূরবর্তী অংশে গ্যালভানোমিটার প্রকৃতির ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের যথোপযুক্ত ইলেকট্রোড সঙ্গে সংযুক্ত করলে হৃৎপিণ্ডের তড়িৎবিভবের পরিবর্তনগুলি ধরা পড়ে। এই পরিবর্তনগুলি গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা যায়।

R
P
T
Q
S
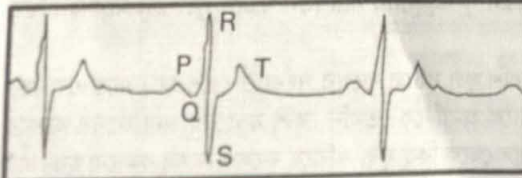
চিত্র 14.23 ঃ ই.সি.জি-র লেখচিত্রের রেকর্ড।

❖ **(b) সংজ্ঞা ঃ হৃৎচক্রের সময় হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপন্ন তড়িৎ বিভব দেহের তরল বিভিন্ন অংশের উপরিতল থেকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) সংক্ষেপে ECG বলে।**

● (c) **রোগ নির্ণয়ে ECG-এর প্রয়োগ (Clinical application of ECG) ঃ** ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা, যেমন— হৃৎস্পন্দন ও তার হারের ত্রুটি, হৃৎপিণ্ডের ছন্দ বিচ্যুতি, অ্যানজিনা পেক্টোরিস (বুকে যন্ত্রণা), বুক ধড়ফড় করা, চেতনালোপ ও কষ্টদায়ক অনুভূতি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial infarction) হার্ট ব্লক্, হার্ট অ্যাটাক্, হৃৎপিণ্ডের উপর কার্যকর বিভিন্ন ওষুধের বা ড্রাগের প্রভাব, কৃত্রিম ছন্দনিয়ামকের কার্যকারিতার পরীক্ষা, হৃৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসার পর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

চিত্র **14.24** ঃ ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে ECG রেকর্ড করার পদ্ধতির চিত্ররূপ।

ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ যন্ত্রে স্বাভাবিক বিশ্রামরত অবস্থায় যে ECG লেখচিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়, তার প্রতি পাঁচটি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত, যেমন—PQRST তরল। এর মধ্যে P, R এবং T ঊর্ধ্বমুখী তরঙ্গ এবং Q ও S দুটি নিম্নমুখী তরঙ্গ। P তরঙ্গ অলিন্দের সক্রিয়তার ফলে উৎপন্ন হয় এবং QRST তরঙ্গ চারটি নিলয়ের সক্রিয়তার ফলে উৎপন্ন হয়।

◘ II. ই. ই. জি. (EEG—Electroencephalogram)

● (a) **ব্যাখ্যা ঃ** E E G শব্দের সম্পূর্ণ নাম হল **ইলেক্ট্রোএন্‌সেফালোগ্রাম**। মস্তিষ্ক অসংখ্য নিউরোন নিয়ে গঠিত। এইসব নিউরোন থেকে অনবরত কিছু না কিছু তড়িৎ (তড়িৎ বিভব) সক্রিয়তা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার তড়িৎসক্রিয়তা গুরুমস্তিষ্কে কর্টেক্স অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে মাথার খুলিতে বিস্তার লাভ করে। তড়িৎবিভবের জন্য **মস্তিষ্ক তরঙ্গ** (Brain waves) সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক তরঙ্গাকে **ইলেক্ট্রোএন্‌সেফালোগ্রাফ** যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যায়।
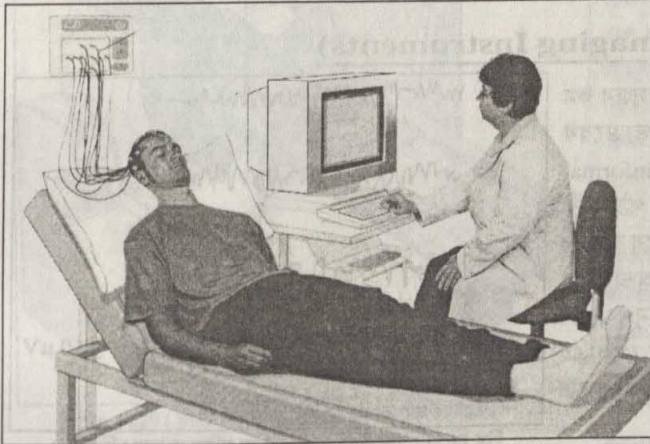
চিত্র **14.25** ঃ ইলেক্ট্রোএন্‌সেফালোগ্রাফে ই.ই.জি. রেকর্ড করার চিত্ররূপ।

❖ (b) **সংজ্ঞা ঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে গুরুমস্তিষ্ক থেকে অবিরাম উদ্ভূত তড়িৎ বিভবের তরঙ্গকে লেখচিত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph) বলে এবং লিপিবদ্ধ তরঙ্গাকারের লেখচিত্রকে ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম** (Electroencephalogram) সংক্ষেপে **EEG** বলে।

● (c) **রোগ নির্ণয়ে EEG-এর প্রয়োগ (Clinical application of EEG) ঃ** এপিলেপ্‌সি বা মৃগীরোগ, সংক্রামক রোগ, মস্তিষ্কে টিউমার, ট্রমা (গরুমস্তিষ্কের ক্ষত বা আঘাতের ফলে দৈহিক অসুস্থতা), হেমাটোমা, মেনিন্‌জাইটিস, স্নায়ুর অপজনন (degeneration of nerve) সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্করোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য, আবার কখনো-কখনো স্বাভাবিক মানুষের ঘুমের বা জাগ্রত অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য ইলেক্ট্রোএন্‌সেফালোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার হয়। মস্তিষ্কে উৎপন্ন তড়িৎ বিভব (মস্তিষ্ক তরঙ্গ) গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়।

● **মস্তিষ্ক তরঙ্গের প্রকৃতি (Nature of brain waves) :** স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিষ্ক থেকে চারপ্রকার তড়িৎ তরঙ্গাবলি পাওয়া যায়, যেমন— α (আলফা) তরঙ্গ, β (বিটা) তরঙ্গ, θ (থিটা) তরঙ্গ, এবং δ (ডেল্টা) তরঙ্গ।

◘ III. স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষক যন্ত্র (Autoanalyser) :

❖ (a) **সংজ্ঞা (Definition) : কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা দেহ তরল, রক্ত এবং মূত্রে অবস্থিত বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক পদার্থ (Biochemical substances), যেমন— গ্লুকোজ, ইউরিয়া, কোলেস্টেরল, উৎসেচক, প্রোটিন ইত্যাদির শতকরা পরিমাণ নির্ধারণ করে, তাকে স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষক যন্ত্র বা অটোঅ্যানালাইজার (Autoanalyser) বলে।**

● (b) **রোগ নির্ণয়ে অটোঅ্যানালাইজারের প্রয়োগ** (Clinical application of Autoanalyser)— আজকাল প্রায় প্রতিটি হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে অথবা নার্সিং হোমে অটোঅ্যানালাইজারের ব্যবহার করা হয়। অটোঅ্যানালাইজার যন্ত্রে মাইক্রোপ্রোসেস নামে একটি সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশ থাকে, যার সাহায্যে পরীক্ষিত নমুনা-দ্রবণের (Sample solution) অথবা বিকারক (Reagents)-এর পরিমাণ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় এদের তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ নির্ণয় করে। এই যন্ত্রটি একটি কী বোর্ডের (Key board) সাহায্যে পরিচালিত হয়। পরীক্ষার পর গণনা করার ফলাফল (Computed result) নির্দিষ্ট প্যারামিটার সহ কম্পিউটারে ছাপানো হয়। আজকাল অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের বহুকাজ একসঙ্গে করা যায় এমন **স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষকযন্ত্র** বা **অটোঅ্যানালাইজার** আবিষ্কৃত হয়েছে, এতে মানুষের রোগনির্ণয়ের কাজ অনেক সহজ হয়েছে।
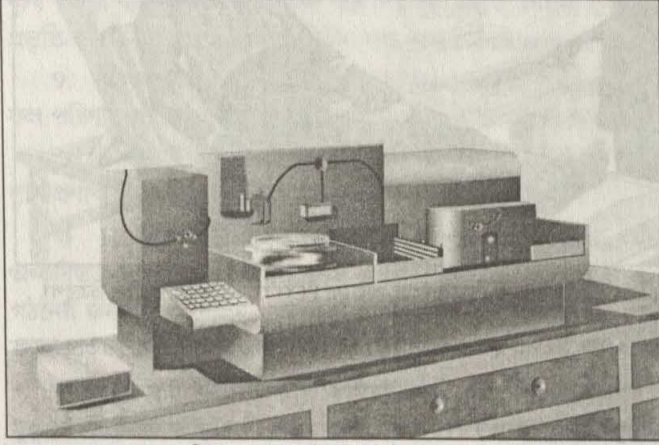
চিত্র **14.26** : অটোঅ্যানালাইজার যন্ত্র।

▲ প্রতিচ্ছবি গঠনকারী যন্ত্র (Imaging Instruments)

প্রতিচ্ছবি গঠনকারী যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল যথাসম্ভব কম ঝুঁকি এবং কম অস্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় দেহের অভ্যন্তরের অংশবিশেষের চিত্র পরিশোভিত তথ্য (Pictorial information) উপস্থাপন করা। আজকাল অধিকাংশ প্রতিচ্ছবি গঠনকারী যন্ত্রে উচ্চমানের পরিগণক যন্ত্র বা কম্প্যুটার সুসংবদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এইরকম যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে দেহের অভ্যন্তরের শল্যচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অংশবিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ফলে এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট কলা বা একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ কতটা কার্যকর তা জানা যায়।
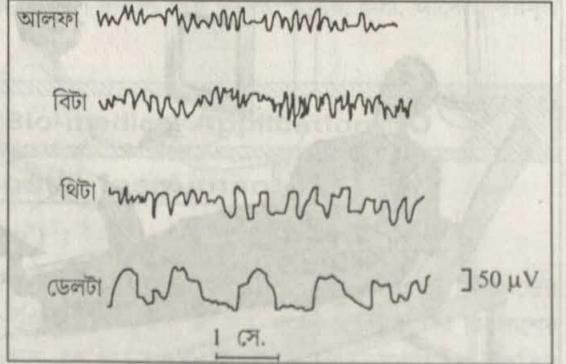
চিত্র **14.27** : স্বাভাবিক EEG বিভিন্ন মস্তিষ্ক তরঙ্গের চিত্ররূপ।

◘ IV. ইউ. এস. জি. (USG— Ultrasonogram) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : আলট্রাসোনিক (শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী) তরঙ্গ বা তাদের প্রতিধ্বনিকে আলট্রাসোনোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করে যে প্রতিচ্ছবি গঠিত হয়, তাকে আলট্রাসোনোগ্রাম সংক্ষেপে USG বলে।**

● (b) **রোগ নির্ণয়ে ইউ. এস. জি.-র প্রয়োগ (Clinical application of USG) :** রোগ-চিকিৎসায় ট্রান্সডিউসার প্রকৃতির যন্ত্র যা হাতে ধরে নড়াচড়া করা যায়, তার সাহায্যে উচ্চ কম্পাংক শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ করা হয়। দেহের যে অংশ পরীক্ষা করার প্রয়োজন সেই অংশে এই যন্ত্রটিকে চালিত করে পরীক্ষিত অংশ থেকে ফিরে আসা (প্রতিফলিত) শব্দ তরঙ্গ রেকর্ড করা

যায়। যেহেতু স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দেহ কলার ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকারের হয়, সেইহেতু এইসব কলা থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শব্দ প্রতিফলিত হবে। এইসব প্রতিফলিত শব্দকে (তথ্যকে) পর্দার (Screen) উপর প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্যও ফোটো তুলে রাখা হয়। এইসব প্রতিচ্ছবির মধ্যে কয়েকটি নিশ্চল আর কয়েকটি সচল হয়, যেমন—হৃৎপিণ্ড ও ভ্রূণ (সচল), প্রোস্টেটগ্রন্থি (নিশ্চল) ইত্যাদি।

চিত্র 14.28 ঃ আলট্রাসোনোস্কোপ যন্ত্রের ব্যবহারের চিত্ররূপ।

● (c) **USG -এর ব্যবহার ঃ** আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে উদর গহ্বরে অবস্থিত অধিকাংশ আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায় যেমন—পিত্তাশয়ে পাথর (Gall stone), শ্রোণি অঞ্চলের অঙ্গসমূহের রোগ, ধমনি ও শিরার মধ্যে রক্তের প্রবাহের ত্রুটি (by Doppler ultrasound), হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা (by Ecocardiography), বাড়ন্ত ভ্রূণের অবস্থা (by foetal ultrasound) ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়।

◻ V. সি. টি. স্ক্যান (Computed Tomography Scanning or C. T. Scan) ঃ

● (a) **ব্যাখ্যা ঃ** সি. টি. স্ক্যানের (C. T. Scan) সম্পূর্ণ নাম **Computed Tomography Scanning** অথবা **Compu-terized axial Tomography Scanning**। এই রকম নামকরণ হওয়ার কারণ C. T. Scan প্রধানত রঞ্জক-রশ্মি (X-rays) এবং পরিগণক যন্ত্র অর্থাৎ কম্প্যুটার (Computer) নামে দুটি যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত যন্ত্র। দেহের এক বা একাধিক কোশ রোগাক্রান্ত কিনা তার পরীক্ষার জন্য খুব কাছাকাছি বিন্যস্ত বিভিন্ন কোণ থেকে X- rays-এর সাহায্যে সমগ্র দেহ অথবা দেহের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতিচ্ছবি তুলে সেই সব প্রতিচ্ছবি একত্রিত করে অথবা এক-একটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। 1971 খ্রিস্টাব্দে প্রথমে এই যন্ত্রটির ব্যবহার শুরু হয়।
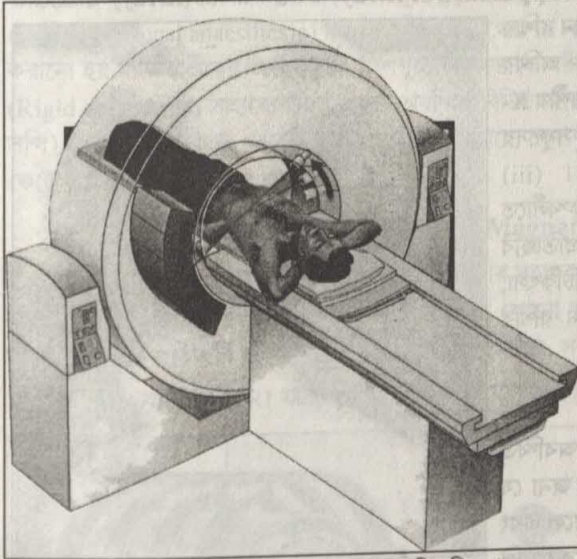
চিত্র 14.29 ঃ সি.টি. স্ক্যান যন্ত্রে স্ক্যান করার পদ্ধতির চিত্ররূপ।

❖ (b) **সংজ্ঞা ঃ মানুষের দেহের ভিতর দিয়ে ধারাবাহিক X-rays (রঞ্জন-রশ্মিগুচ্ছ) বিভিন্ন কোণ থেকে অতিক্রম করালে দেহের প্রস্থচ্ছেদ মাত্রিক (Cross sec-tional) যে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাকে টোমোগ্রাম (Tomograms) বলে এবং কম্পিউটারে সৃষ্ট এই প্রতিচ্ছবিকে একত্রে এককথায় সি. টি. স্ক্যান (C. T. Scan) বলে।**

● (c) **রোগ নির্ণয়ে সি.টি স্ক্যানের প্রয়োগ (Clinical application of C. T. Scan) ঃ** সি. টি. স্ক্যান মাথার ও পেটের রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কের সি. টি. স্ক্যানিং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মস্তিষ্কের স্ট্রোক (Cerebral stroke) হলে বা মস্তিষ্কে টিউমার হলে সি. টি. স্ক্যানিংয়ের প্রয়োজন হয়। পেটে টিউমার হয়েছে কিনা এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য অথবা বৃক্কে সিস্টজনিত ব্যাধি নিরূপণের জন্যও সি. টি. স্ক্যান করা হয়। ফুসফুস সংক্রান্ত কোনো রোগ জানার জন্য অথবা বায়োপ্সির (Biopsy) পরীক্ষার জন্য দেহের কোনো অংশ থেকে কলাকোশ পরীক্ষার জন্য নিতে হবে, তার জন্যও সি. টি. স্ক্যানিং-এর প্রয়োজন ঘটে।

◘ VI. রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে (X-rays) :

● (a) **ব্যাখ্যা :** সাধারণ আলোক-তরঙ্গের মতোই রঞ্জন-রশ্মি এক ধরনের আলোক বিকিরণ রশ্মি। এই রশ্মি সাধারণ রশ্মি থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী রশ্মি। এই কারণে এইপ্রকার অধিক শক্তিযুক্ত রশ্মি (X-rays) সহজেই দেহের বিভিন্ন অংশকে ভেদ করতে পারে। রঞ্জন-রশ্মির ভেদ করার ক্ষমতা কলাকোশের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। এই রশ্মি দেহের কোমল কলাকোশের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই অতিক্রম করে কিন্তু অস্থির মতো নিবিড় (দৃঢ়) কলার মধ্য দিয়ে ভেদ করতে পারে না। রঞ্জন-রশ্মির একটি আলোক রেখা যখন দেহের কোনো অংশে পড়ে তখন সাধারণত তিন ধরনের প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। যখন আলোক রশ্মি ফুসফুসের বায়ুপূর্ণ বায়ুথলির মধ্য দিয়ে যায় তখন সেইসব স্থানের প্রতিচ্ছবি ফিল্মে কালো দেখা যায়, কোমল কলাতে (যেমন ফ্যাট এবং পেশিতে) ধূসর এবং অস্থির মতো বেশি ঘনত্বের কলাগুলির প্রতিচ্ছবি সাদা দেখা যায়। এইপ্রকার পার্থক্যগুলির জন্য যে প্রতিচ্ছবি ফটো ফিল্মের উপর ধরা পড়ে সেটিই **রঞ্জন রশ্মির আলোকচিত্র নেগেটিভ** (X-rays negative film)।
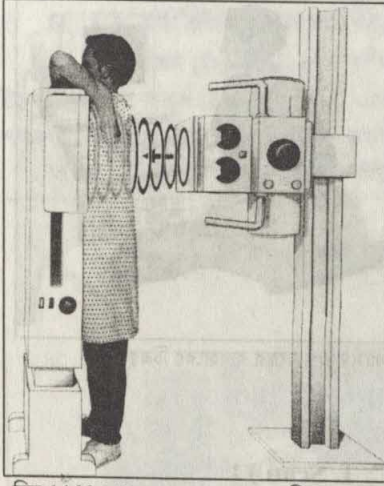
চিত্র **14.30 :** X-rays-এর ব্যবহারের চিত্ররূপ।

❖ (b) **সংজ্ঞা : উচ্চ শক্তি বিকিরণ রশ্মি (High energy radiation) যার সাহায্যে দেহের দৃঢ় কলা (অস্থি) বা কোমলকলা (মেদ কলা) দেখার জন্য প্রতিচ্ছবি (Image) নেওয়া হয় তাকে রঞ্জন রশ্মি (X-rays) বলে।**

● (c) **রোগ নির্ণয়ে এক্স-রে-এর প্রয়োগ (Clinical application of X-ray) :** রঞ্জন-রশ্মির **(X-ray)** ব্যবহারের প্রধান কারণ হল (i) **অস্থি-সম্পর্কীয় X-rays**—এই প্রকার রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে অস্থির স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থা, যেমন— অস্থির ভাঙনের প্রকৃতি বা স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। (ii) **বক্ষদেশীয় X-rays** — এই প্রকার রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের বা ফুসফুসের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক (রোগাবস্থা) অবস্থা জানা যায়। (iii) **উদরদেশীয় X-rays**—এই প্রকার রঞ্জক-রশ্মির সাহায্যে পাকস্থলীতে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে আলসার (ক্ষত), অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। (iv) **দেহের অন্যান্য স্থানের X-rays**—দাঁতের চিকিৎসা, বৃক্কে বা পিত্তথলিতে পাথরের উপস্থিতি ইত্যাদির জন্য রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে এই সবের প্রতিচ্ছবি তুলে রোগ নির্ণয় করা যায়।
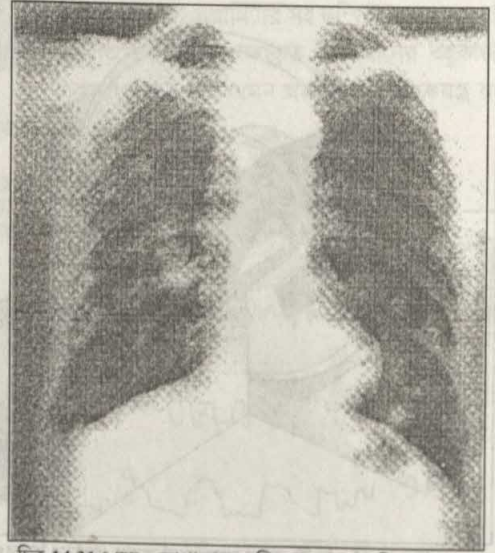
চিত্র **14.31 :** TB রোগাক্রান্ত ব্যক্তির X-ray-এর চিত্র। ছায়াচ্ছন্ন এলাকা হল টি.বি. সংক্রামিত অংশ।

◘ VII. ফ্লুওরোস্কোপি (Fluoroscopy) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রের গঠন এবং তাদের বিচলন সম্বন্ধে জানার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ফ্লুওরোস্কোপ (Fluoroscope) বলে এবং যে কাজের জন্য এই যন্ত্রটির ব্যবহার করা হয় তাকে ফ্লুওরোস্কোপি (Fluoroscopy) বলে।**

● (b) **রোগ নির্ণয়ে ফ্লুওরোস্কোপির প্রয়োগ (Clinical application of Fluoroscopy) :** ফ্লুওরোস্কোপ যন্ত্রে থাকে ফ্লুওরোস্কোপি পর্দা (Fluoroscopy screen) যা ক্যাডমিয়াম ট্রানজস্টেট (Cadmium transtate) স্ফটিক নিয়ে গঠিত। ফ্লুওরোস্কোপ এবং রঞ্জন রশ্মি (X- ray) যন্ত্রের কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকমের হয়। রঞ্জন রশ্মি যন্ত্রে যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা স্থির প্রকৃতির চিত্র কিন্তু ফ্লুওরোস্কোপের সাহায্যে সচল অঙ্গগুলি সরাসরি একটানা টেলিভিশন পর্দার মতো ফ্লুওরোস্কোপি পর্দায় দেখা যায়। রেকর্ড করার জন্য একটি ছবি সময় সময় নেওয়া হয় এবং শল্যচিকিৎসকেরা পরবর্তী সময় ওই ছবি দেখে অস্ত্রোপচারের সঠিক পদক্ষেপ নেন।

ফ্লুওরোস্কোপির সাহায্যে পাঁজরের এবং মধ্যচ্ছদার বিচলন দেখে ফুসফুসের বায়ুচলাচলের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়।

◘ VIII. এন্ডোস্কোপি (Endoscopy) : *Endon* = within—অভ্যন্তর; *Skopein* = to see—দেখা) :

❖ (a) **সংজ্ঞা : যে পদ্ধতিতে এন্ডোস্কোপ নামে যন্ত্রের সাহায্যে দেহ-গহ্বরে অবস্থিত বিভিন্ন ফাঁপা অংশ পরীক্ষার জন্য দেখা হয় তাকে এন্ডোস্কোপি (Endoscopy) বলে।**

● (b) **রোগ নির্ণয়ে এন্ডোস্কোপির প্রয়োগ (Clinical application of Endoscopy) :** **এন্ডোস্কোপ** হল একটি নলাকার যন্ত্র যাতে বৈদুতিক আলো এবং বিভিন্ন প্রকার লেন্স ব্যবহার করা হয়। এদের সাহায্যে দেহের গভীরে অবস্থিত বিভিন্ন অংশকে দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেহের ত্বকের একটি অংশ কেটে তার মধ্য দিয়ে এন্ডোস্কোপের একটি অংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত দেহের স্বাভাবিক ছিদ্র অর্থাৎ মুখছিদ্র বা পায়ু ছিদ্রর মধ্য দিয়েই এন্ডোস্কোপের একাংশ দেহের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়।
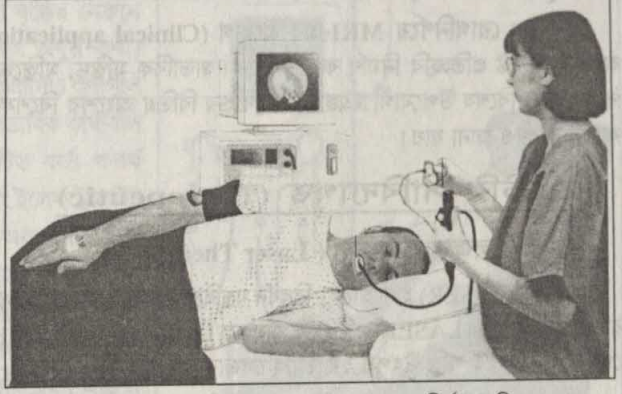
চিত্র 14.32 : এন্ডোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি।

● **এন্ডোস্কোপের প্রকারভেদ (Types of endoscope) :** (i) যেসব আন্তরযন্ত্র অঙ্গের গঠন সোজা নয় অর্থাৎ বাঁকানো হয় সেই সব অঙ্গের অভ্যন্তর অংশ দেখার জন্য **নমনীয় এন্ডোস্কোপ** (Flexible endoscope) ব্যবহার করা হয়। এটির ব্যবহারের সময় রোগীকে চিকিৎসকের দিক ঘুরে (মুখ করে) শোয়ানো অবস্থায় থাকতে হয় এবং এই অবস্থায় রোগীকে স্থানীয় চেতনালোপ (local anaesthesia) করে নমনীয় এন্ডোস্কোপের নলাকার অংশটিকে মুখ-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহের গভীরে প্রবেশ করানো হয় যাতে শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশগুলি চাক্ষুষভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। (ii) **শক্ত বা অনমনীয় এন্ডোস্কোপের** (Rigid endoscope) সাহায্যে উদর গহ্বরে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়। এছাড়া অস্থি সন্ধি (যেমন হাঁটুর সন্ধি) যা ত্বকের উপরিতল থেকে দৃঢ় এন্ডোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়। আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেহের উপরিতলের ত্বক কেটে দৃঢ় এন্ডোস্কোপ প্রবেশ করানো হয়।

◘ IX. চৌম্বক অনুনাদ-ভিত্তিক প্রতিচ্ছবি (Magnetic Resonance Imaging— MRI)

❖ (a) **সংজ্ঞা : একটি বিকিরণমুক্ত ও কম্পিউটার সহায়ক (Computer-assisted) প্রযুক্তি যা একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে দেহাভ্যন্তরের কোনো অঙ্গের উচ্চমানের আংশিক প্রতিচ্ছবি দেখায় তাকে চৌম্বক অনুনাদ-ভিত্তিক প্রতিচ্ছবি বা ম্যাগ্‌নেটিক রেজোনেন্স ইমাজিং, সংক্ষেপে MRI বলে।**

● (b) **ব্যাখ্যা :** MRI মাধ্যমে পরীক্ষা করার সময় বৃহদাকার শক্তিশালী চুম্বকবেষ্টিত স্ক্যানারের ভেতরে রোগীকে শুইয়ে রাখা হয়। এরপর দেহের যে অংশটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন সেটি MRI– Scanner-এর গ্রহণকারী চুম্বক (Receiving magnet) দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। যদি মানুষের উদরের মতো কোনো বৃহৎ অংশের প্রতিচ্ছবি নিতে প্রয়োজন হয় তাহলে গ্রহণকারী-চুম্বকটিকে তখন MRI–Scanner- এর ভিতর দিকে সংযুক্ত করে দিতে হয়। অস্থি-সন্ধির মতো সীমিত অংশের ক্ষেত্রে গ্রহণকারী চুম্বকটিকে পরীক্ষার স্থানটিকে ঘিরে রাখতে হয়। এর কারণ অন্যান্য সব কিছুর মতোই মানুষের দেহও পরমাণু নিয়ে গঠিত। স্ক্যানারে অবস্থিত বৃহৎ চুম্বক থেকে উৎপন্ন শক্তিশালী
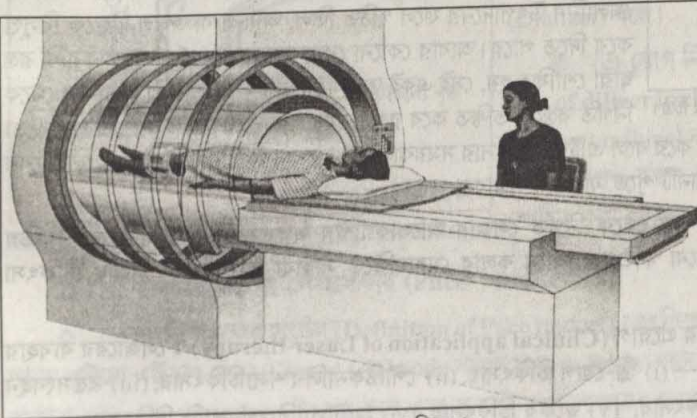
চিত্র 14.33 : MRI ব্যবহারের চিত্ররূপ।

চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে যখন মানুষকে রাখা হয় তখন দেহের পরমাণুগুলো পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। বেতার রশ্মি কম্পাঙ্ক চুম্বক থেকে উৎপন্ন ছোটো ছোটো বেতার তরঙ্গের স্পন্দন রোগীর দেহের পরমাণুকে আঘাত করে, ফলে পরমাণু থেকে সূক্ষ্ম সংকেত বিচ্ছুরিত হয়। এই সংকেত পরে কম্পিউটার যন্ত্রে যায়।

● (c) **রোগনির্ণয়ে MRI-এর প্রয়োগ (Clinical application of MRI) ঃ** MRI—প্রযুক্তি শরীরের যে-কোনো অংশের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করতে পারে। স্বাভাবিক মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে সন্ধান করার পক্ষে MRI বিশেষ উপযোগী। এছাড়া মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশের বিশেষত পিঠের ব্যথার কারণ সম্বন্ধে জানা যায় এবং হাঁটুর ব্যথার কারণও জানা যায়।

▲ চিকিৎসাবিদ্যাগত (Therapeutic)

◘ I. লেজার চিকিৎসা (Laser Therapy) ঃ

লেজার (LASER) হল আলো-বিবর্ধন যন্ত্রবিশেষ যার সাহায্যে আপাত আলোক রশ্মি থেকে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তীব্র রশ্মি বিকিরণ ঘটে। LASER-এর পুরো নাম হল Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। এই যন্ত্র থেকে যে আলোক শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে লেজার আলোক রশ্মি (Laser beam) বলে।

● (a) **ব্যাখ্যা ঃ** লেজার রশ্মি দেহের বিভিন্ন অংশের অভ্যন্তরীণ কলাগুলিকে বিদীর্ণ করে ও বিদীর্ণ কলাগুলিকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে অপসারিত করে। এছাড়া দেহের অভ্যন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হলে, ওই ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তকে তঞ্চিত করে রক্তপাত বন্ধ করে। এছাড়া লেজার রশ্মির সাহায্যে সেই ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটির কিনারাকে বা প্রান্তগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটিকে সারিয়েও তুলতে পারে। এই প্রকার কাজ করার ক্ষমতা আছে বলেই আজকাল শল্যচিকিৎসায় শল্যচিকিৎসকেরা স্ক্যালপেল (ছুরি), কাঁচি এবং সেলাইয়ের পরিবর্তে লেজার রশ্মি ব্যবহার করেন। আজকাল চিকিৎসকেরা চর্মরোগ, প্লাস্টিক সার্জারি, চোখের অস্ত্রোপচারের সময় এন্ডোস্কোপ যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লেজার রশ্মিও ব্যবহার করেন। এই প্রকার ব্যবহারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল লেজার রশ্মিকে সঠিকভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করা যায়। এই কারণে আশেপাশের স্বাভাবিক কলাগুলিকে অক্ষত রেখে শুধু আক্রান্ত অংশের সীমিত কলাগুলিকে যথাযথভাবে চিকিৎসা করা যায়। লেজার থেকে নির্গত বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (wave length) আলোক রশ্মিকে দেহের ভিন্ন ভিন্ন কলা শোষিত করে এবং বিভিন্নভাবে কাজ করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়— মেলানিন নামে ত্বকের রঞ্জক কণা যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিকে শোষণ করে, সেই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি আবার অত্যধিক মেলানিন উৎপাদনের ফলে গঠিত তিল, আঁচিল বা জড়ুল চিহ্নকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি রক্ত দ্বারা শোষিত হয়, সেই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তকে তঞ্চিত করে রক্তপাতকে বন্ধ করে। চিকিৎসার একটি বড়ো অসুবিধা হল—লেজার রশ্মি প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে বলে এটির চিকিৎসার সময়কাল অত্যন্ত কম হয়। কোনো কারণে লেজারের প্রয়োগকালের সময় বেড়ে গেলে প্রয়োগের স্থানটি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র 14.34 ঃ লেজার চিকিৎসায় আঁচিলের অপসারণের চিত্র।

❖ (b) **সংজ্ঞা ঃ যে চিকিৎসা লেজার যন্ত্র থেকে নির্গত লেজার আলোকরশ্মির সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের কলাকোশকে ধ্বংস করে অথবা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে কলার মেরামতিতে সাহায্য করে তাকে লেজার চিকিৎসা (Laser Theraphy) বলে।**

● (c) **রোগ নির্ণয়ে লেজার চিকিৎসার প্রয়োগ (Clinical application of Laser therapy) ঃ লেজারের ব্যবহার বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয়, যেমন— (i) স্ত্রী-রোগ চিকিৎসায়, (ii) পৌষ্টিকনালির শল্যচিকিৎসায়, (iii) রক্তসংবহন তন্ত্রের চিকিৎসায়, (iv) চক্ষু-রোগ সংক্রান্ত চিকিৎসায়, (v) ত্বকের চিকিৎসায়, (vi) অটোল্যারিংগোলোজি চিকিৎসায়।**

II. ঝিল্লিবিশ্লেষ যন্ত্র বা ডায়ালাইজার (Dializer) ঃ

(a) **ব্যাখ্যা ঃ** ঝিল্লিবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দিয়ে মানুষের দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৃক্কের নেফ্রনে রক্ত পরিস্রাবণের সময় কোলয়েড কণা (অর্থাৎ বৃহৎ অণুর কণা) গ্লোমেরুলাসের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যেতে পারে না তবে কেলাসিত কণাগুলি (সূক্ষ্ম কণা) যেতে পারে। কোনো মানুষের দুটি বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যাবলি যখন নষ্ট হয় তখন বৃক্ক রক্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ নির্গত করতে পারে না, তা ছাড়া রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ এবং ইলেকট্রোলাইট ও জলের সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই অবস্থায় রক্তকে পরিশোধন করার জন্য ডায়ালাইজার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ডায়ালাইজার (কৃত্রিম বৃক্কীয় যন্ত্র)-এর সাহায্যে ঝিল্লিবিশ্লেষণ ঘটিয়ে রক্তকে শোধন করা হয় অর্থাৎ রক্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ মুক্ত করা হয়। ডায়ালাইজার মধ্যে অবস্থিত ঝিল্লি বা মেমব্রেন ঝিল্লিবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। শোধন করার জন্য যখন দেহের রক্তের উপাদানকে এই ঝিল্লির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয় তখন বর্জ্যপদার্থের সূক্ষ্ম কণাগুলি রক্ত থেকে ঝিল্লির চারপাশে অবস্থিত দ্রবণে চলে যায় এবং দ্রবণ থেকে কিছু কিছু পুষ্টি-পদার্থ রক্তে চলে আসে। এরকম পরীক্ষা পুনঃপুন করার জন্য এবং দ্রবণ ও রক্তের মধ্যে উচ্চ গাঢ়ত্বের পার্থক্য বজায় রাখার জন্য দ্রবণটিকে বারেবারে পাল্টাতে হয়। এভাবে যন্ত্রে রক্তের শোধন সম্পন্ন হলে শোধিত রক্তকে দেহের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। রক্তের এই প্রকার শোধন ঝিল্লিবিশ্লেষণ (ডায়ালাইসিস) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় বলে একে **হিমোডায়ালাইসিস** (Hemodialysis) বলে।
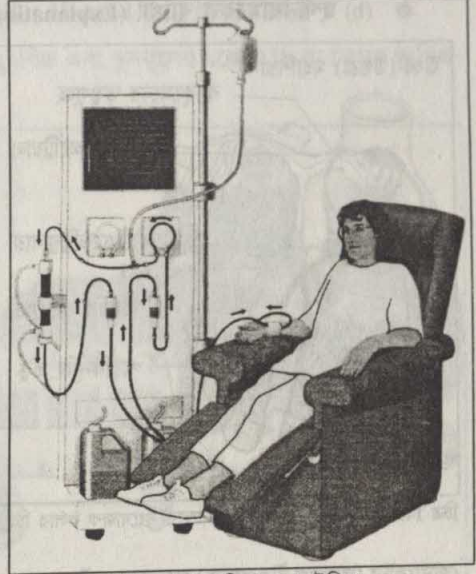
চিত্র 14.35 ঃ হিমোডায়ালাইসিস।
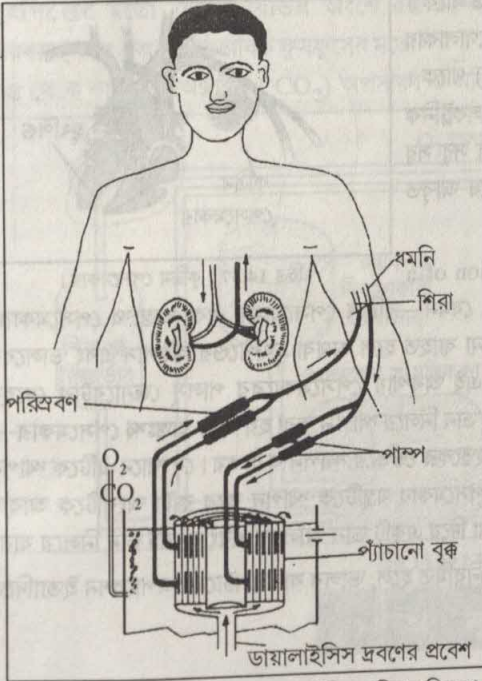
চিত্র 14.36 ঃ কৃত্রিম বৃক্কের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ।

❖ (b) **সংজ্ঞা ঃ ঝিল্লিবিশ্লেষণ হল একপ্রকার প্রাণ-ভৌত (Biophysical) প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দ্রবণের ক্ষুদ্র অণুর কণাগুলি বৃহৎ অণু কণা থেকে প্রভেদক ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে যন্ত্রের সাহায্যে পৃথক করা হয় তাকে ঝিল্লি- বিশ্লেষ যন্ত্র** (Dializer) **বলে।**

(c) **রোগ নিরসনে ডায়ালাইজারের প্রয়োগ (Application of dilizer in clinical condition)** ঃ কৃত্রিম যন্ত্র (Artificial Kidney machine) বা **ঝিল্লিবিশ্লেষের** (Dializer) সাহায্যে মানুষের দেহের বিশুদ্ধ রক্তকে দেহের বাইরে ঝিল্লি-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোধিত করা হয় তাকে কৃত্রিম বৃক্কীয় যন্ত্র বলে।

III. ছন্দনিয়ামক বা পেসমেকার (Pace maker) ঃ

❖ (a) **ছন্দনিয়ামকের সংজ্ঞা (Definition of Pace maker) ঃ হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে এবং ঊর্ধ্ব মহাশিরার প্রবেশের স্থানে সাইনো-এট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial node সংক্ষেপে S. A. node) নামে যে নিবিড় কোশপুঞ্জ থাকে এবং যা হৃৎস্পন্দনের আবেগ (Cardiac impulse) উৎপন্ন করে এবং স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের হারকে বজায় রাখে তাকে ছন্দনিয়ামক বলে।**

● (b) **ছন্দনিয়ামকের ব্যাখ্যা (Explanation of Pace maker) ঃ** S. A. নোড হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের স্বাভাবিক ছন্দময়তার (Rhythmicity) হার বজায় রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় এস্. এ. নোড থেকে প্রতি মিনিটে 70– 80 বার হৃৎস্পন্দনের আবেগ উৎপন্ন হয়। এই হৃৎস্পন্দন আবেগ হৃৎপিণ্ডকে ঠিক একই হারে অর্থাৎ প্রতি মিনিটে 70–80 বার (গড়ে 72 বার) স্পন্দিত করে বলে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোডকে **ছন্দনিয়ামক বা পেসমেকার** (Pacemaker) বলে।
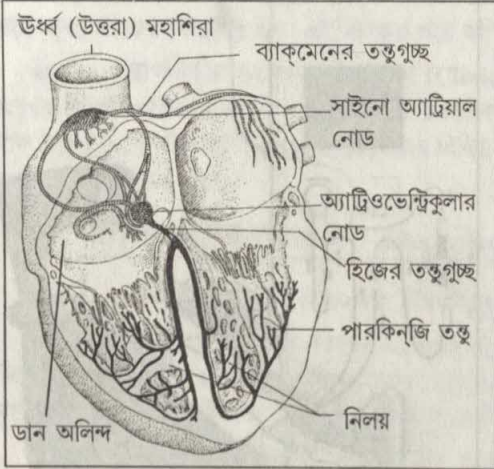
চিত্র **14.58** ঃ হৃৎপিণ্ডের বিশেষ ধরনের সংযোজক কলার চিত্র।

কোনো কারণে যখন হৃৎস্পন্দনের হার 70–80 বার থেকে অস্বাভাবিক ভাবে কমে গিয়ে প্রতি মিনিটে 30–40 বার বা বেড়ে গিয়ে 100 বার বা তার অধিক হয় অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত হয়, তখন হৃৎস্পন্দনের হারকে স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজন হয় কৃত্রিম পেসমেকার যার সাহায্যে হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক সক্রিয়তা বা ছন্দময়তা নিয়ন্ত্রিত হয়।

● (c) **কৃত্রিম পেসমেকারের গঠন (Structure of Artificial pacemaker) ঃ কৃত্রিম পেসমেকার হল কৃত্রিমভাবে নির্মিত যন্ত্র যা নির্দিষ্ট ছন্দে স্পন্দন আবেগের উৎপাদনের মাধ্যমে এবং হৃৎপিণ্ডের ছন্দময়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।** কৃত্রিম পেসমেকারে **পালস্ জেনারেটর (আবেগ উৎপাদক) যন্ত্র** বলে। এই যন্ত্রে যথাযথ **ইলেকট্রোড** থাকে। কৃত্রিম পেসমেকার তড়িৎ আবেগ বন্ধ (Electrical impulse) পাতলা গোলাকার বাক্স যার ভেতরে **লিথিয়াম হ্যালাইড সেল** (Lithium halide cells) থাকে। এই লিথিয়াম সেল উৎপাদনের আধার হিসাবে কাজ করে এবং ইলেকট্রনিক তড়িৎবর্তনী (Circuit) পালসের হার নিয়ন্ত্রণ করে। ইলেকট্রোডগুলি সরু সরু ধাতব তার যা মানুষের গ্রহণযোগ্য (Biocompatible) প্লাস্টিক দিয়ে আবৃত থাকে এবং পাল্‌স্ জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

চিত্র **14.37** ঃ কৃত্রিম পেসমেকার।

● (d) **পেসমেকার স্থাপন প্রক্রিয়া** (Process of Insertion of a pacemaker) ঃ দেহে স্থাপন অনুযায়ী পেসমেকার দু'প্রকারের হয়, যেমন—বহিস্থ পেসমেকার এবং অন্তঃস্থ পেসমেকার। (1) **বহিস্থ পেসমেকার**— হৃৎপিণ্ডের ছন্দময়তা সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাহত হলে অথবা হৃৎপিণ্ডের বাইপাস এবং ভালবের শল্যচিকিৎসার পর কিছুদিন বহিস্থ পেসমেকার ব্যবহার করা হয়। এই অবস্থায় পেসমেকারের পালস্ জেনারেটার দেহের উপরিতলে স্থাপন করে তার সঙ্গে যুক্ত ইলেকট্রোড ক্যাথেটারের মাধ্যমে ডান নিলয়ে স্থাপন করা হয়। (2) **অন্তঃস্থ পেসমেকার**— এই ধরনের পেসমেকার ডানদিকের ক্লাভিকল অস্থির সামান্য নীচে দেহত্বকের ভেতরে স্থাপন করা হয়। যে স্থানে এটিকে স্থাপন করা হয়, সেই অংশটিকে অনুভূতিলোপ করে সামান্য অংশ কেটে পেসমেকার যন্ত্রটিকে স্থাপন করে কাটা অংশটিকে আবার সেলাই করে দেওয়া হয়। পেসমেকারের দুটি ইলেকট্রোড ঊর্ধ্ব মহাশিরা দিয়ে একটি ডান অলিন্দে এবং অন্যটি ডান নিলয়ে যায়।

○ **ব্যবহার (Uses)**— হার্টব্লক, হৃৎস্পন্দন হার কমে গেলে ও অনিয়মিত হলে, ভালব বা সেপটামের অপারেশন ইত্যাদিতে পেসমেকার ব্যবহার করা হয়।

◘ সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক (Reserve pacemaker) ঃ

❖ **সংজ্ঞা—হৃৎপিণ্ডের A. V. node নামে অন্য একটি বিশেষ সংযোগী কলার সমষ্টি যা ডান অলিন্দে করোনারি সাইনাসের ছিদ্রের কাছে এবং আন্তর অলিন্দ প্রাচীরের উপরে এবং অলিন্দের পেছন দিকে থাকে তাকে সংরক্ষিত ছন্দনিয়ামক বলে।**

○ **কাজ**— A. V. নোড একাধারে যেমন S. A. node থেকে হৃৎস্পন্দনের আবেগকে গ্রহণ করে, তেমনি নিজেও প্রতিমিনিটে 40—60 বার (গড়ে 50 বার) স্পন্দন আবেগ তৈরি করে। কোনো কারণে S. A. node বিনষ্ট হলে সংরক্ষিত A. V. node তার নিজস্ব হৃৎস্পন্দন উৎপাদন হারে হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দিত করে।

IV. হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস সমন্বিত যন্ত্র বা হার্ট-লাং মেশিন (Heart-Lung Machine) ঃ

❖ (a) সংজ্ঞা ঃ যে যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য রোগীর হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মতো কাজ করে তাকে হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্র বা হার্ট-লাং মেশিন (**Heart-Lung machine**) বলে।

● (b) শল্যচিকিৎসায় সাহায্যকারী হার্ট-লাং মেশিনের প্রয়োগ (**Application of Heart-Lung machine for Helping in Surgery**) ঃ কোনো কোনো শল্যচিকিৎসায় যেমন— হৃৎপিণ্ডের প্রতিস্থাপন (Heart transplantation) অথবা মুক্ত হৃৎপিণ্ডের শল্যচিকিৎসায় (Open heart surgery-OHS), করোনারি বাই-পাস গ্রাফটিং, হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার পুনঃস্থাপন (Heart valve replacement) প্রভৃতি অস্ত্রোপচারের সময় হৃৎপিণ্ডফুসফুস যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র প্রধানত দু'রকমের জটিল কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করে, যেমন— (i) স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের মতো দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে এবং (ii) স্বাভাবিক ফুসফুসের মতো রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) অপসারণ ও অক্সিজেন (O_2) সংযোজন করে।
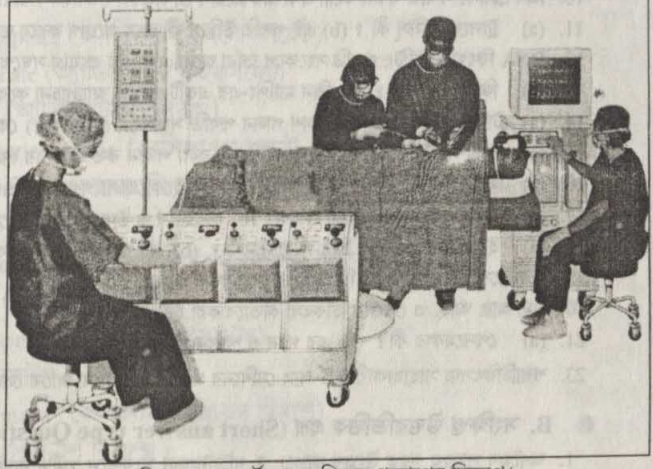
চিত্র 14.38 ঃ হার্ট-লাং মেশিনের প্রয়োগের চিত্ররূপ।
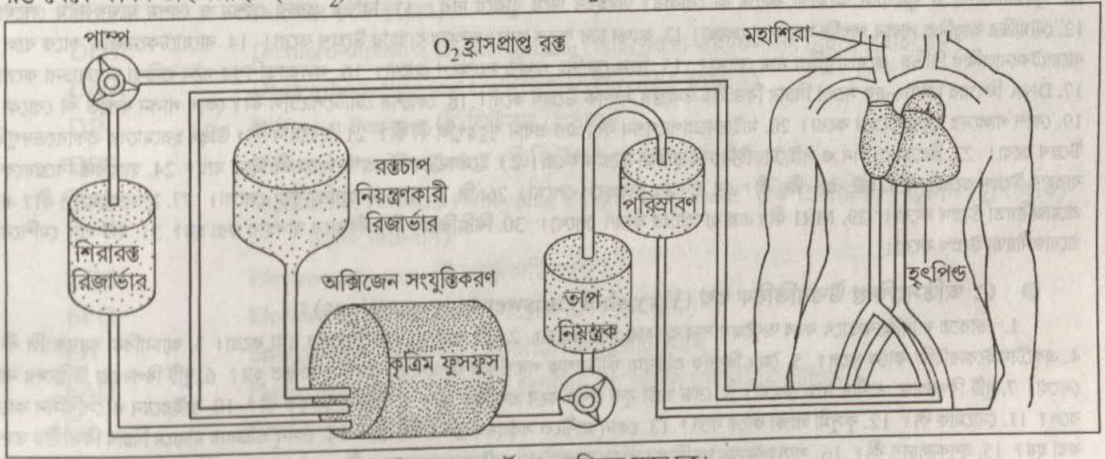
চিত্র 14.39 ঃ হার্ট-লাং মেশিনের সরল ছক।

০ অ নু শী ল নী ০

● **A. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) ঃ**

1. (a) অণুজীব সার কাকে বলে? (b) অণুজীব সার কত প্রকারের হয়? (c) অণুজীব সারের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
2. (a) কীটনাশকের সংজ্ঞা লেখো। (b) ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কী? (c) কীটনাশক ব্যবহারের কুফলগুলি লেখো।
3. প্রাণী গৃহপালিতকরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।
4. (a) মানুষ কৃষিকার্য কখন শিখেছিল? (b) কৃষিজাত উদ্ভিদের উৎপত্তি কেন্দ্রগুলির নাম লেখো। (c) বর্তমানকালে উদ্ভিদের উন্নতজাত উদ্ভাবনের জন্য কী কী প্রজনন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে?
5. (a) সংরক্ষণ কাকে বলে? (b) উদ্ভিদ ও প্রাণী কেন বিপদগ্রস্ত হয়? (c) দুটি বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদ ও দুটি প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।

6. (a) রেড ডাটা বুক কী? (b) রেড ডাটা বুকে রয়েছে এমন কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম করো।
7. (a) পতঙ্গ শ্রেণি প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (b) বিভিন্ন প্রকার রেশম উৎপাদিত হয় যে প্রজাতি থেকে তাদের নাম লেখো।
8. (a) মৌমাছি পালনের সংজ্ঞা লেখো। (b) মৌমাছির আধুনিক পালন পদ্ধতি লেখো।
9. জৈব প্রযুক্তি ও তার উপকারগুলি লেখো।
10. জিন ক্লোনিং পদ্ধতি বর্ণনা করো এবং এর প্রয়োগ দেখাও।
11. (a) ট্রান্সজেনেসিস্ কী? (b) এই পদ্ধতি উদ্ভিদে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা লেখো।
12. DNA ফিংগার প্রিন্টিং পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো এবং এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করো।
13. (a) জিন ম্যাপিং কী? (b) জিন ম্যাপিং-এর একটি পদ্ধতি আলোচনা করো।
14. (a) টোটিপোটেন্সি কী? (b) কোশ পালন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো। (c) কোশ পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
15. (a) কলা পালন কাকে বলে? (b) উদ্ভিদের কলা পালন কত প্রকারের হয়? (c) কলা পালনের গুরুত্বগুলি লেখো।
16. (a) মাইক্রোপ্রোপাগেশন কাকে বলা হয়? (b) মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো।
17. (a) উদ্ভিদ হরমোনের সংজ্ঞা লেখো। (b) কৃষিকার্যে ও উদ্যানবিদ্যায় হরমোনের ভূমিকা আলোচনা করো।
18. (a) ই. সি. জি. ও ই. ই. জির পুরো নাম কী? (b) এই যন্ত্রদুটি কী কাজে ব্যবহার করা হয়? (c) স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষক কী?
19. আলট্রাসোনোস্কোপ ও সি. টি. স্ক্যানের কাজ বর্ণনা করো।
20. এম. আর. আই. ও লেজার চিকিৎসা কীভাবে করা হয়?
21. (a) পেসমেকার কী? (b) এর গঠন ও স্থাপন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও।
23. শল্যচিকিৎসায় সাহায্যকারী হার্ট-ল্যাং মেশিনের প্রয়োগ সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short answer type Questions) :

1. অণুজৈব সারের গুরুত্ব উল্লেখ করো। 2. নাইট্রোজেন সংবন্ধনে স্বাধীন ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আলোচনা করো। 3. অণুজৈব সার হিসাবে মাইকোরাইজার কীভাবে কাজ করে? 4. অণুজৈব সারের গুরুত্বগুলি লেখো। 5. জৈব নিয়ন্ত্রণ কী? 6. ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনা বলতে কী বোঝো? 7. কীটনাশক ব্যবহারের কুফলগুলি লেখো। 8. প্রাণী গৃহপালিতকরণ বলতে কী বোঝো? 9. কৃষিজাত উদ্ভিদের উৎপত্তি কেন্দ্রগুলির নাম লেখো। 10. পুনর্গঠনযোগ্য ও পুনর্গঠন অযোগ্য বলতে কী বোঝায়? উদহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। 11. বিভিন্ন প্রকার রেশম ও রেশম মথের নাম লেখো। 12. মৌমাছির আধুনিক পালন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো। 13. লাক্ষা চাষ কাকে বলে? লাক্ষার ব্যবহার উল্লেখ করো। 14. বায়োটেকনোলজি কাকে বলে? বায়োটেকনোলজির বিভিন্ন প্রয়োগগুলির নাম লেখো। 15. জিন ক্লোনিং পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো। 16. নলজাতশিশুর গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করো। 17. DNA ফিংগার প্রিন্টিং-এর সঙ্গে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সম্পর্ক উল্লেখ করো। 18. কোশের টোটিপোটেন্সি কী? কোশ পালন বলতে কী বোঝো? 19. কোশ পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করো। 20. মাইক্রোপ্রোপাগেশন কী? এর প্রধান গুরুত্বগুলি কী কী? 21. হরমোন কী? উদ্ভিদ হরমোনের প্রকারভেদগুলি উল্লেখ করো। 22. জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিনের ভূমিকা উল্লেখ করো। 23. ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ দিয়ে কী জানা যায়? 24. স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষকের ব্যবহার উল্লেখ করো। 25. ইউ. এস. জি. কী? এর ব্যবহার সংক্ষেপে লেখো। 26. সি. টি. স্ক্যানের কার্যকারিতা লেখো। 27. ফ্লুওরোস্কোপি কী? এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো। 29. MRI কী? এর ব্যবহারের কারণ লেখো। 30. ঝিল্লিবিশ্লেষ কী? কীভাবে ব্যবহার করা হয়? 31. হার্ট-লাং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

C. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Very short answer type questions) :

1. ভারতে বাণিজ্যিকভাবে কবে অণুজৈব সার ব্যবহার আরম্ভ হয়? 2. দুটি সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার নাম করো। 3. অ্যানাবিনা অ্যাজোলি কী? 4. এক্টোমাইকোরাইজি কাকে বলে? 5. জৈব বিবর্ধক প্রক্রিয়ায় কীটনাশক পদার্থগুলি জীবদেহের কোথায় সঞ্চিত হয়? 6. দুটি বিপদগ্রস্ত উদ্ভিদের নাম লেখো। 7. দুটি বিপদগ্রস্ত প্রাণীর নাম লেখো। 8. রেড ডাটা বুক প্রথম কবে প্রকাশিত হয়? 9. গ্রিন ডাটা বুক কী? 10. ফাইব্রয়েন ও সেরিসিন কাকে বলে? 11. মৌমোক কী? 12. কুসুমী লাক্ষা কাকে বলে? 13. কোন্ প্রাণীকে সর্বপ্রথম ক্লোন করা হয়? 14. কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হয়? 15. ভ্রূণকালচার কী? 16. সাসপেন্‌সান অনুশীলন কাকে বলে? 17. মাইক্রোপ্রোপাগেশন কী? 18. কোন্ পদ্ধতিকে কম জায়গায় অনেকগুলি চারা তৈরি করা যায়? 19. প্রকল্পিত হরমোন কী? 20. ইথিলিন কী কাজে ব্যবহার করা হয়? 21. ই. সি. জি.-র পুরো নাম কী? 22. স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষক কী কাজে ব্যবহৃত হয়? 23. এন্ডোস্কোপ কী? 24. লেজার চিকিৎসা কী? 25. পেসমেকার কী কাজে লাগে?

D. টীকা লেখো (Write short notes on) :

1. নাইট্রোজেন সংবন্ধনে স্বাধীন ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা কী? 2. এন্ডোমাইকোরাইজি, 3. জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ, 4. ইনটিগ্রেটেড কীটনাশক পরিচালনার সুবিধা, 5. উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণ, 6. রেড ডাটা বুক, 7. গ্রিন ডাটা বুক, 8. ক্লোনিং, 9. ট্রানজেনেসিস 10. DNA-ফিংগার প্রিন্টিং, 11. জিন ম্যাপিং, 12. লাক্ষার ব্যবহার, 13. টোটিপোটিন্সি, 14. ব্যাচকালচার, 15. প্রোটোপ্লাস্ট অনুশীলন, 16. কৃষি ও উদ্যানবিদ্যায় অক্সিনের প্রধান ভূমিকা, 17. ই. সি. জি. 18. এন্ডোস্কোপি, 19. এম. আর. ই. 20. ঝিল্লি বিশ্লেষ, 21. হার্ট-লাং মেশিন।

◎ বইয়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ সংক্ষেপের তালিকা ◎
(List of abbreviations used in the book)

ABA	Abscisic acid (অ্যাব্‌সাইসিক অ্যাসিড)
ADP	Adenosine diphosphate (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট)
AMP	Adenosine monophosphate (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট)
ATP	Adenosine Triphosphate (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট)
ATS	Anti-Tetanus Serum (অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম)
BCG	Bacillus Calmette guerin vaccine (বেসিলাস ক্যালমেট গার্ন ভেক্‌সিন)
BOD	Biological Oxygen demand (বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)
BP	Blood pressure (ব্লাড প্রেসার)
CAM	Crassulacean acid metabolism (ক্র্যাসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম্)
CFC	Chloro-fluro-carbon (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন)
CNS	Central Nervous System (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম)
CoA	Coenzyme A (কোএনজাইম A)
COD	Chemical Oxygen demand (কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)
CR	Conditional reflex (কন্ডিসনাল রিফ্লেক্স)
C.T. Scan	Computed Tomographic Scan (কমপিউটেড টোমোগ্রাফিক স্ক্যান্)
Cyt.	Cytochrome (সাইটোক্রোম)
db	Decibel (ডেসিবেল)
DDT	Dichloro-diphenyl Trichloroethane (ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন)
DNA	Deoxyribonucleic acid (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)
DP	Diffusion Pressure (ডিফিউসন প্রেসার)
DPD	Diffusion Pressure deficit (ডিফিউসন প্রেসার ডেফিসিট)
DPT	Diphtheria, Pertussis (Whooping Cough) and tetanus (ডিপথেরিয়া পারটুসিস (হুপিংকাফ) এ্যান্ড টিটেনাস)
ECG	Electrocardiogram (ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম)
EEG	Electroencephalogram (ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম)
ER	Endoplasmic reticulum (এন্ডোপ্লাসমিক্ রেটিকুলাম
FAD	Flavin Adenine dinucleotide (ফ্লাভিন্ অ্যাডিনিন্ ডাইনিউক্লিওটাইড)
Fd.	Ferredoxin (ফেরিডক্সিন)
FSH	Follide-stimulating hormone (ফলিক্‌ল স্টিমুলেটিং হরমোন)
GA	Gibberellic acid (জিব্বারেলিক অ্যাসিড)
GH	Growth hormone (গ্রোথ হরমোন)
Hb	Haemoglobin (হিমোগ্লোবিন)
HCFC	Hydrochloro-flurocarbon (হাইড্রোক্লোরোফ্লুরোকার্বন)
HDL	High density lipoprotein (হাইডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন)
HIV	Human immuno deficiency virus (হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস)
IAA	Indole acetic acid (ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড)

IBA	Indole butyric acid (ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড)
IUCN	International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশান অব্ নেচার অ্যান্ড ন্যাচার্যাল রিসোর্সেস)
IPM	Integrated Pest Management (ইনটিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট)
IVF	Invitro fertilization (ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশান)
IVF-ET	Invitro fertilization embryo transfer (ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশান ইমব্রায়ো ট্রানস্ফার)
LASER	Light Amplification by stimulated Emission of Radiation (লাইট অ্যামপ্লিফিকেশান বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব্ রেডিয়েশন)
LDP	Long day plant (লং ডে প্লান্ট)
LH	Luteinizing hormone (লিউটিনাইজিং হরমোন)
LSD	Lysergic acid diethylamide (লাইসারজিক অ্যাসিড ডাই-ইথাইলঅ্যামাইড)
µm	Micron (মাইক্রন)
mm	Millimetre (মিলিমিটার)
MRI	Magnetic Resonance Imaging (ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং)
mRNA	Messenger ribonucleic acid (মেসেঞ্জার রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)
NAA	Naphthooxy acetic acid (নেপথোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড)
NAD	Nicotinamide adenine dinucleotide (নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড)
NADP	Nicotinamide ademine dinucleotide phosphate (নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট)
NID	National Immunization Day (ন্যাশানাল ইমুনাজেশান ডে)
nm	Nanometre (ন্যানোমিটার)
OHS	Open Heart Surgery (ওপেন হার্ট সার্জারি)
OP	Osmotic pressure (অস্মোটিক প্রেসার)
PAA	Phenyl acetic acid (ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড)
PAN	Peroxy-acetal nitrate (পারক্সি অ্যাসিটাল নাইট্রেট)
PEP	Phosphoenol pyruvate (ফসফোইনোল পাইরুভেট)
PGA	Phosphoglyceral dehyde (ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইড)
PNS	Peripheral nervous system (পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম)
PPI	Pulse Polio immunization (পালস্ পোলিও ইমুনাজেশান)
PQ	Plastoquinone (প্লাস্টোকুইনোন)
PSI	Pigment System I (পিগমেন্ট সিস্টেম I)
PSII	Pigment System II (পিগমেন্ট সিস্টেম II)
RBC	Red blood Corpuscle (রেড ব্লাড করপাসেল)
Rh Factor	Rhesus factor (রিসাস্ ফ্যাক্টর)
RNA	Ribonucleic acid (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)
RQ	Respiratory quotient (রেসপিরেটারি কোসেন্ট)
rRNA	Ribosomal ribonucleic acid (রাইবোজোমাল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)
RV	Residual Volume (রেসিডুয়াল ভল্যুম)
SA-node	Sino atrial node (সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড)
SCP	Single cell protein (সিঙ্গল সেল প্রোটিন)

SDP Short day plant (সর্ট ডে প্লান্ট)

STH Somatotrophic hormone (সোমাটোট্রফিক হরমোন)

TCA Trichloro acetic acid (ট্রাইক্লোরো অ্যাসিটিক অ্যাসিড)

TMR Total metabolic rate (টোটাল মেটাবলিক রেট)

TPC Threated Plant Community (থ্রেটেড প্লান্ট কমিউনিটি)

tRNA Transfer ribonucleic acid (ট্রান্সফার রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)

THS Thyroid Stimulating hormone (থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন)

TPP Thyamin Pyrophosphate (থায়ামিন পাইরোফসফেট)

TV Tidal volume (টাইডাল ভল্যুম)

UNCED United Nation Conference on Environment and development (ইউনাইটেড নেশান কনফারেন্স অন এনভাইরনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট)

USG Ultra sonogram (আল্ট্রাসোনোগ্রাম)

VAM Vascular arbuscular mycorrhiza (ভাসকুলার অরবাসকুলার মাইকোরাইজা)

WBC White blood corpuscle (হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল)

WHO World Health organization (ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন)